রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

(সাহিত্য ও সমাজ)

ডঃ মনোরঞ্জন জানা, এম. এ., ডি. ফিল. (কলিঃ)
রিডার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, (বঙ্গ-সাহিত্য বিভাগ) ।

ভারতী বুক স্টল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক
শ্রীহৃষীকেশ বারিক
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট্
কলিকাতা-৯।

দ্বিতীয় (পরিবর্ধিত) সংস্করণ

মূল্য ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

মুদ্রক
ঊষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৯সি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬।

নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থতালিকার মধ্যে আরো অন্ততঃ তিনটি উপন্যাসের নাম পাওয়া যাইবে, যেগুলির কোন আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে করা হয় নাই।

উপন্যাসকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার যে ভাব-জীবনটি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতে ঐ উপন্যাস কয়টির বিশেষ কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। তাঁহার সামগ্রিক জীবন-দর্শনের একটি দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে ('রবীন্দ্র-নাটকের ভাব-ধারা'-র মধ্যে সে পরিচয় দানের সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি) বর্তমান আলোচনায় আর একটি দিকের পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে। তাঁহার কবিতাবলী আশ্রয় করিয়া আর যে একটি দিক পরিস্ফুট হইয়াছে, পৃথক একটি গ্রন্থে তাঁহার পরিচয় দানের চেষ্টা করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবন-দর্শন সম্পর্কে আমার যে উপলব্ধি, তাহা এই তিনটি গ্রন্থে নিঃশেষ করিয়া বলিয়াছি।

গোরার সাহিত্য-আলোচনা সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া সমাজ-তত্ত্বমূলক সামান্য আলোচনা করিয়াছি। সংহিতা, স্মৃতি, মহাকাব্য, পুরাণ এবং ঐ সকল রচনার টীকা ও সারসংগ্রহ (নিবন্ধজাতীয় রচনা) প্রভৃতির ভিতর দিয়া বর্ণাশ্রমাশ্রয়ী আদর্শ সমাজের যে হিন্দু-ধারণা (ধর্মশাস্ত্রে ইহাকে সর্বত্র সত্যযুগ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে) এবং তাহাকে সমাজে রূপায়িত করিতে যে বিচিত্র কলা-কৌশল—তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের আদর্শ সমাজ, কল্পনার মূলতঃ পার্থক্য আছে। যে উন্নততর জীবনবোধ ও অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারের ফলে তাহা সম্ভব হইয়াছে, তাহারই সামান্য পরিচয়-দানের চেষ্টা করিয়াছি। সেই সঙ্গে প্রসঙ্গতঃ হিন্দুশাস্ত্রকারগণের উপলব্ধির তুলনা-মূলক আলোচনাও করিতে হইয়াছে।

এই দুইটি জীবনবোধের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করিতে হইলে, পৃথক গ্রন্থের অবতারণা প্রয়োজন। ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ।

ইহাও বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন, যে সমাজ-সাধনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যে জীবন-বোধ ও সাক্ষাৎকারের পরিচয়দানের চেষ্টা করিয়াছি, তাহা কেবল তাঁহারই বিশিষ্ট কোন উপলব্ধি নয়, তাহা আধুনিক কালের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সকল চিন্তাশীল কবি ও দার্শনিকের উপলব্ধি। এ দেশের শ্রীঅরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চেতনার এক একটি বিকাশ-পর্যায়ে এক একটি ভাবনা-লোক এমনি করিয়া বিশ্বের কয়েকটি বিশিষ্ট সত্তাকে আশ্রয় করিয়া উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তেমনি একটি বিশিষ্ট সত্তা। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র মানব-চেতনা একটি বিকাশ পর্যায় অতিক্রম করিয়াছে।

এই যে দুই বিশিষ্ট জীবন-বোধের কথা বলিয়াছি, তাহাকে তাই কোন একটি দেশ-কালের দ্বারা চিহ্নিত করিতে পারা যাইবে না। তাহা দুটি (নিম্নতর ও উর্ধ্বতর) চেতনালোকের সঙ্ঘাত।

এই সঙ্ঘাত চলিতেছে সমগ্র জাতির চিত্তে, জাতির গভীরতম অধ্যাত্ম সত্তায়, সমাজের সকল স্তরে, সকল অঙ্গে, সৃষ্টি প্রেরণার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে। এই সঙ্ঘাতের ভিতর দিয়া একটি সমগ্র জাতি নূতন ব্যক্তিত্ব-লোকে ধীরে ধীরে জন্মলাভ করিতেছে।

সেই ধীর রূপান্তরের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি উপন্যাসের মধ্যেও লাভ করিতে পারা যায়। সমগ্র জাতির ভাব-জীবনের এই সুবৃহৎ পট-ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পাঠ করিতে না পারিলে, তাঁহার উপন্যাস-পাঠ বৃথা।

মহাভারত হইতে যে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য কৃত মহাভারতের অনুবাদ হইতে সংগৃহীত।

৩৬, সাউথ এণ্ড পার্ক
কলিকাতা-২৯
১৯শে ডিসেম্বর ১৯৬০

মনোরঞ্জন জানা

দ্বিতীয় সংস্করণ

অনেক বিলম্ব হইলেও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। গোরার সাহিত্য আলোচনা এবং শেষের কবিতার আলোচনা নূতন করিয়া সংযোজিত হইল। যখন প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন আমার তরুণ বয়স, আজ প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইয়াছি। এই সুদীর্ঘ কয়েক বৎসরের মধ্যে আমার ভাব-জীবনের ও চিন্তাধারার কোন পরিবর্তন হয় নাই। যৌবনের চিন্তা প্রৌঢ়ে আরও পরিণত ও সুগভীর হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর বহুগ্রন্থ লিখিয়াছি। কতক প্রকাশিত হইয়াছে, কতক প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। যৌবনে উপলব্ধ সেই মূল ভাবনা-বীজ আজ পল্লবিত, পুষ্পিত হইয়াছে মাত্র।

বর্ধমান
১৯শে নভেম্বর
১৯৬৮।

মনোরঞ্জন জানা

উৎসর্গ

সুমন ও

সুপ্রতিমকে

বাবা

সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

(সাহিত্য ও সমাজ)

চোখের বালি

১

'চোখের বালি'র মধ্যে ঔপন্যাসিকের যে জীবন-বোধ ব্যক্ত হইয়াছে সর্ব্বাগ্রে তাহার পরিচয় লাভ প্রয়োজন, তাহাতে পরে উপন্যাস অন্তর্গত চরিত্রগুলি উপলব্ধি করিতে সুবিধা হইবে। কেবল তাহাই নয়, ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য-সাধনাশ্রয়ী একটি বিশিষ্ট ভাবধারা যে কতদূর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে। সেইজন্য 'চোখের বালি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব যে অভিমত, "আমার সাহিত্যের পথ-যাত্রী পূর্ব্বাপর অনুসরণ করে দেখলে ধরা পড়বে যে 'চোখের বালি' উপন্যাসটা আকস্মিক"—ইহা মানিয়া লইতে পারা যায় না।

বস্তুতঃ সার্থক যে-কোন সৃষ্টি স্রষ্টার মূল সাক্ষাৎকার বহির্ভূত হইতে পারে না। একটি ভাব-কলিকা (জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ইহা স্রষ্টার একপ্রকার অপরোক্ষ অনুভূতি) জীবন বিকাশের সঙ্গে বস্তু ও ভাব-জগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আশ্রয় করিয়া একটির পর একটি দল মেলিয়া ধীরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই বিকাশ-ধর্ম্ম বা পরিণাম-ধারা না থাকিলে, কিংবা একটি পরিণত স্থিরদৃষ্টির গ্রন্থন সূত্রে গ্রথিত না হইলে বুঝিতে পারা যায় যে স্রষ্টার জীবন যে-কোন সত্য সাক্ষাৎকার বঞ্চিত। তাহা কতকগুলি বহুবিচিত্র জটিল চিত্ত-বৃত্তি ও ভাব-ভাবনা এবং তাহাদের আশ্রয় করিয়া কতকগুলি অবিন্যস্ত, উদ্দেশ্যবিহীন ফল পরিণামশূন্য ঘটনা সমাবেশ মাত্র।

সৃষ্টি-প্রেরণা যত গভীর, অধ্যাত্ম দৃষ্টি যত স্থির ও উন্নত হয়, মানুষ ততই আপাত সামঞ্জস্যশূন্য উদ্দেশ্যবিহীন, শৃঙ্খলা বিরহিত জাগতিক ঘটনাবলী অনুবিদ্ধ করিয়া তাহার অন্তরালবর্ত্তী একটি সামঞ্জস্যের সন্ধান লাভ করে। এই সামঞ্জস্যবোধ যত ব্যাপ্ত, যত গভীর তাহার অধ্যাত্ম পিপাসা তত পরিতৃপ্ত, তাহার সৃষ্টি ততই সার্থক।

নর-নারীর বিগ্রহাশ্রয়ী প্রেম যদি ধীরে বিশ্বময় না পরিব্যাপ্ত হয়, যদি পরিণামে এই উপলব্ধি না ঘটে যে নর-নারীর বিচিত্র প্রেম সম্পর্কের মধ্য দিয়া এক শাশ্বত, অমর্ত্ত্য, নির্ব্বিশেষ প্রেমলীলা নিত্যকাল সংঘটিত হইতেছে তাহা হইলে প্রেম নর-নারীকে মুক্তি দেয় না।

প্রেম নর-নারীর জীবনে সীমা, রূপ বা বিশেষের সাধনা। প্রেম যেখানে

ধীরে বিকাশ লাভ করিয়া পরিণামে বিশেষের বোধ ছাড়াইয়া এক নির্ব্বিশেষ অমূর্ত্ত্য পরিণাম লাভ করে প্রেমের সেইখানেই সিদ্ধি। এই প্রেমে সকল রূপ অরূপের, সকল মূর্ত্তি অমূর্ত্তের প্রতীক হইয়া দেখা দেয়। প্রেম যদি ওই পরিণাম না লাভ করে, ওই বোধের মধ্যে যদি সকল হৃদয় সম্পর্কের না প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে বিচ্ছেদ বা বিয়োগ নর-নারীর অন্তরে অতলস্পর্শ শূন্যতার সৃষ্টি করে। এই শূন্যতাকে তখন আর কোন কিছুর দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইতে পারা যায় না।

রূপ যেখানে এই প্রতীক স্বরূপতা লাভ করিয়াছে সেখানে প্রেমে প্রতারণা নাই, বিচ্ছেদ ও বিয়োগ নাই, প্রত্যাশাও নাই। প্রেম তখন অসীমের বোধে সকল সীমার শূন্যতা পূর্ণ করিয়া দেয়।

'আমার সকল কর্ম্ম, সকল ত্যাগ, সকল নিষ্ঠা ও সেবা নানা ব্যক্তিরূপ আশ্রয় করিয়া অনন্তের স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে' -নর-নারীর অন্তরে এই উপলব্ধি যখন সত্য হয় তখন আর কোন ক্ষতি কোন বঞ্চনা নিরতিশয় দুঃখ দান করিতে পারে না।

অন্নপূর্ণা কাশীধামে আশাকে প্রেম-সাধনার এই স্বরূপটিই বুঝাইতে চাহিয়াছিল। আমি সেই অংশটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"চুনি, দুঃখে কষ্টে যে শিক্ষা লাভ হয়, শুধু কানে শুনিয়া তাহা পাইবি না। তোর মাসিও একদিন তোর বয়সে তোরই মত সংসারের সঙ্গে মস্ত করিয়া দেনা-পাওনার সম্পর্ক পাতিয়া বসিয়াছিল। তখন আমিও তোরই মত মনে করিতাম, যাহার সেবা করিব তাহার সন্তোষ না জন্মিবে কেন। যাহার পূজা করিব তাহার প্রসাদ না পাইব কেন। যাহার ভালোর চেষ্টা করিব সে আমার চেষ্টাকে ভালো বলিয়া না বুঝিবে কেন। পদে পদে দেখিলাম সেরূপ হয় না। আজ দেখিতেছি আমার কিছুই নিষ্ফল হয় নাই। ওরে বাছা, যার সঙ্গে আসল দেনা-পাওনার সম্পর্ক, যিনি এই সংসার হাটের মূল মহাজন, তিনিই আমার সমস্তই লইতেছেন, হৃদয়ে বসিয়া আজ সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। তখন যদি জানিতাম! যদি তাঁর কর্ম্ম বলিয়া সংসারের কর্ম্ম করিতাম, তাঁকে দিলাম বলিয়াই সংসারকে হৃদয় দিতাম তাহা হইলে কে আমাকে দুঃখ দিতে পারিত।"

প্রেমের আর এক ধর্ম্ম যাহা রবীন্দ্র-সাহিত্যে নানা রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে তাহার যে সামান্য এবং কতকটা পরোক্ষ পরিচয় 'চোখের বালি'র মধ্যে রহিয়াছে এই প্রসঙ্গে তাহাও নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন।

অন্নপূর্ণার যে সাধনা তাহাতে ব্যক্তি পরিণামে গৌণ হইয়া যায়। উহা আদৌ নির্ব্বিশেষ রস-সাধনা, ইহাতে বিশেষের কোন আস্বাদ নাই। কিন্তু

প্রেম রূপাশ্রয়ী হইয়াও একপ্রকার বিশ্বব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে। ইহাতে একদিকে ব্যক্তির বিশ্ব-স্বরূপতা লাভ, অন্যদিকে বিশ্বের ব্যক্তিতে বিশিষ্টতা বা অ-সামান্যতা লাভ। ব্যক্তি ও বিশ্বের তাহা এক অপরূপ মিলন লীলা। এই প্রেমে তাই রূপ হারাইয়া গেলে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত অমন প্রেমও মুহূর্ত্তে শূন্য হইয়া যায়। এই প্রেম রূপের যোগে বিশ্ব-রূপে বিহার করে। ইহা যে-কোন পরিণামে নির্ব্বিশেষ বা অরূপকে পরিহার করে। ইহা মর্ত্ত্য-জীবনাশ্রয়ী। ইহার সীমার মধ্যে নর-নারী অসীমের আস্বাদ পায়। এই আস্বাদ তাই যে-কোন পরিণামে বিশিষ্ট বা অনন্য।

প্রেমের এই যে দুই স্বরূপ উপলব্ধি তাহাতে একটিকে অপরটির উন্নততর পরিণাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে দার্শনিক সমস্যা সমাধানের গুরু দায়িত্ব পরিহার করিতে পারা যায়, কিন্তু অমন করিয়া সমস্যা সমাধান করিতে পারা যায় না। জীবনের এই জাতীয় উপলব্ধির স্বরূপ বিচার ভারতীয় ধর্ম্ম-দর্শনে হয় নাই বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। ভারতীয় ধর্ম্ম-দর্শন নানা দিক হইতে যে মূল উপলব্ধি সঞ্চার করিতে চাহিয়াছে অন্নপূর্ণা সেই উপলব্ধির কথাই বলিয়াছে। সে সাধনায় রূপ বা বিশেবের রহস্য উদ্ঘাটনের কোন চেষ্টা নাই।

আশা অন্নপূর্ণার এই সাধনায় এবং সাধন-লব্ধ সত্যবোধে যে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে নাই তাহার জন্য তাহার অপরিণত মন, তাহার অসামর্থ্যটাকেই কেবল দায়ী করিলে চলিবে না, তাহার প্রেম প্রকৃতিও ভিন্ন। নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে ইহার একপ্রকার আভাস লাভ করিতে পারা যাইবে।

"আমি বালিকা, তোমাকে জানি না, আমি কেবল আমার স্বামীকে জানি, সেজন্য অপরাধ লইও না। আমার স্বামীকে আমি যে পূজা দিই, ভগবান, তুমি তাঁহাকে তাহা গ্রহণ করিতে বলিয়ো। তিনি যদি তাহা পায়ে ঠেলিয়া দেন, তবে আমি আর বাঁচিব না। আমি আমার মাসীমার মত পুণ্যবতী নই, তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমি রক্ষা পাইব না।"

আশার এই রূপাশ্রয়ী প্রেমের স্বরূপ সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে পারা যায় যখন দেখি আশা স্খলিত মহেন্দ্রকে কোন তত্ত্বাশ্রয়ী করিয়া লাভ করিবার চেষ্টা না করিয়া বিনোদিনীর কলঙ্ক পারাবারে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। হিন্দু পৌরাণিক প্রেমের যে আদর্শে অন্নপূর্ণা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে আশার প্রেম যে সেই আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ তাহা অন্ততঃ বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ মানবিক বোধকে ছাড়াইয়া

উঠিবার যে কোন তত্ত্ব-দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ প্রথম হইতে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, শেষে পরিহার করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসাবলী পাঠে ক্রমে ইহা সুস্পষ্ট হইবে।

বিনোদিনীর প্রেম অন্নপূর্ণার মত আপনাতে আপনি একটি ধ্যানলোকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতে পারে নাই। ওই প্রেম যতদিন না প্রেমাস্পদের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং উহার ভিতর দিয়া যতদিন না সে নারীর পূর্ণ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে ততদিন সে কোন প্রকারেই সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে নাই। এই রূপকে আশ্রয় করিয়া একদিন তাহার প্রেম হয়ত নির্ব্বিশেষ কোন পরিণাম লাভ করিবে কিন্তু সেই নির্ব্বিশেষ উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিশেষের অধিষ্ঠান চাই।

বিহারীর অন্তরে প্রেম সঞ্চারিত করিয়া দিতে বিনোদিনী অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অবশেষে বিনোদিনী যখন বিহারীর শ্রদ্ধা ও প্রেম লাভে সমর্থ হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে যখন সে নিঃসংশয় হইয়াছে তখন আমরা তাহার কোন্ রূপ প্রত্যক্ষ করিলাম।

বিনোদিনী তাহার পর ওই প্রেমটুকু সম্বল করিয়া ইহ-সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার কাশী যাত্রা তাহার চরিত্রের ওই পরিণামটিকেই ইঙ্গিত করে। ওই তরণী তাহাকে পরিণামে কোন্ স্বর্ণকূলে পৌঁছাইয়া দিবে কে জানে!

(২)

উপন্যাস অন্তর্গত কাহিনী হইতে জানিতে পারা যায় বিনোদিনীর পিতা ছিলেন দরিদ্র গ্রামবাসী, কিন্তু গৃহে মিশনারি মেম রাখিয়া কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বেই বিনোদিনীর পিতৃবিয়োগ ঘটে। সমাজে তৎকালে সচরাচর যে বয়সে কন্যার বিবাহ হইত বিনোদিনীর অবশ্য সেই বয়স পার হইয়া গিয়াছিল। যে পিতা দরিদ্র গ্রামবাসী হইয়াও কন্যাকে মিশনারির নিকট পড়াইয়া উপযুক্ত শিক্ষা দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই তিনি যে সুযোগ্য পাত্রের হস্তে কন্যা সমর্পণের ইচ্ছা পোষণ করিবেন এবং কেবল মাত্র দায় ভাবিয়া জাতি-কুল রক্ষার মানসে যে-কোন একজনের হাতে তুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিবেন ইহা স্বাভাবিক। বিনোদিনীর বিবাহযোগ্য বয়স অতিক্রম করিয়া যাইবার ইহাই যে একমাত্র কারণ তাহা অনুমান করিতে পারা যায়।

বিধবা মাতা অধিক বয়স্কা অনূঢ়া কন্যা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তাহার পর অনেক অনুরোধ উপরোধ অনেক অনুসন্ধানের পর পরিশেষে

যাহার সহিত বিনোদিনীর বিবাহ দিতে সমর্থ হইলেন সে বেচারা বিবাহের মাত্র তিনমাসের মধ্যে প্লিহার অতিরিক্ত ভার বহনে অসমর্থ হইয়া একপ্রকার বিরাগ লইয়াই পৃথিবী হইতে বিদায় লইল।

বিনোদিনী বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যে তাহার মাতারও মৃত্যু হইয়াছে। সেখানে দূর সম্পর্কীয়া এক বৃদ্ধা দিদিমা ছাড়া আর কেহ ছিল না। দেহ-মনের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য লইয়া বিনোদিনীর তখন ভরা যৌবন।

খৃষ্টান মিশনারির নিকট শিক্ষা লাভ করিবার জন্য এবং অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকায় বিনোদিনীর প্রাণ-মনের শক্তি একপ্রকার অক্ষুন্ন ছিল, অর্থাৎ সচরাচর নারীর শক্তি গৃহের ভিতরের এবং বাহিরের সহস্রবিধ বাধায় প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিহত হইতে হইতে যে-ভাবে অকালে ক্ষীণ হইয়া পড়ে বিনোদিনীর জীবনে তাহা ঘটিতে পারে নাই। মিশনারি মেমের নিকট বিনোদিনী আর যাই শিক্ষা করুক অকারণ আত্মনিগ্রহ শিক্ষা করে নাই। প্রাণ-মনের ধর্ম্মকে অন্যান্য সকল ধর্ম্মের ন্যায় তাহারা পূর্ণ মর্য্যাদা দেয়। যৌবন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিনোদিনীর প্রাণ-মনের শক্তি বাড়িয়া গিয়াছিল বই কমে নাই। কিন্তু গ্রামের ওই একান্ত দীন, মলিন অবরুদ্ধ পরিবেশে বিনোদিনীর প্রাণ-মনের কোন ক্ষুধাই মিটিতে পারে না। কোথাও কোন আশা নাই, ভরসা নাই, বৈচিত্র্য নাই, উদ্দীপনা নাই, একপ্রকার তামসিক জড়তার মধ্যে কতকগুলি নর-নারীর জীবন ক্রমাগত আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে।

এইকালে বিনোদিনী যে কীরূপ অসহায় বোধ করিত তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। এমনি করিয়া কেবল ঘোরের মধ্যে বৈধব্যের কতকগুলি আচার পালন করিয়া তাহার একের পর এক দিন মাস বৎসর, বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া জীবন অবসিত হইয়া যাইবে!

জীবনের এই পর্য্যায়ে হিন্দু নারী যে সাধন পথ অবলম্বন করিয়া দুঃসহ জীবন ভার বহনে সমর্থ হয়, অর্থাৎ স্বামীকে ঈশ্বরীয় তত্ত্বের সহিত যুক্ত করিয়া তাঁহারই প্রতীকরূপে নিত্য অনুধ্যান ও পূজা, এইরূপে প্রাণ-মনের বহির্মুখী সমগ্র প্রেরণাকে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখীন করিয়া পরিণামে সমগ্র সত্তাকে এক সম্পূর্ণ ভিন্নতর বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করা,—ওই সমাজে থাকিয়া বিনোদিনী হয়ত তাহার কোন পরিচয় লাভ করিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহার আবাল্যের শিক্ষা ও সংস্কার ওই সাধনায় তাহাকে কিছুমাত্র সান্ত্বনা দান করিতে পারে নাই। উহা তাহার নিকট শূন্যতার সাধনা, সেইহেতু আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু বলিয়া বোধ হয় নাই।

ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শন নারীর এই যে সাধন পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা জীবনের দুঃখভার বহনে সামর্থ্য দান করিবার জন্য নয়, প্রাণ-মনকে নিশ্চেতন করিবার জন্যও নয়, তাহার চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক ফল লাভ আছে। কিন্তু এই ফল লাভ সমাজে দুই একটি নারীর জীবনে কোথাও সত্য হইলেও অধিকাংশেরই জীবনে বঞ্চনাই ঘটাইয়াছে। পরিণাম শূন্য, ফল লাভ হীন আচার অনুষ্ঠান তাহাদের প্রাণ মনের শক্তিকে ধীরে ধীরে কেবল আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। ইহা অধিকাংশ নারীর জীবনে কতকটা নৈতিক বন্ধন দান করিলেও আধ্যাত্মিক কোন ফল লাভ ঘটাইতে পারে নাই। যেখানে আধ্যাত্মিক কোন ফল লাভ নাই অথচ প্রাণ-মনের শক্তি কতকটা অপরিমিত যাহাকে সহস্র আচার অনুষ্ঠান ও উপবাসের কৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও বাঁধিয়া রাখিতে পারা যায় না সেখানে নারীর জীবনে যে স্খলন ঘটিবে তাহা স্বাভাবিক। দুই-ই মৃত্যুর পথ।

অবশ্য ইহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই যে সাধনা, অর্থাৎ প্রাণ-মনের অতীত সত্তার বোধ তাহা ভারতীয় ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম সাধনার মর্ম্মবাণী, তাহা কেবলমাত্র নারী বা পুরুষের বিশিস্ট কোন জীবনপর্য্যায়ের সাধনা নয়। ভারতবর্ষীয় সভ্যতা এই সাধনাকে স্বীকার করিয়াছে বটে, কিন্তু জীবনের স্বাভাবিক পরিণতিকে অস্বীকার করে নাই। অর্থাৎ নিম্নতর সকল ধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া, চরিতার্থ করিয়া একের পর এক সামঞ্জস্য সাধন করিয়া পরিণামে উহাকে লাভ করিতে চাহিয়াছে। অকাল বৈধব্যে নারী-জীবনের এই স্বাভাবিক পরিণতি ক্ষুন্ন হয় (অন্যান্য নানা কারণে এই স্বাভাবিক পরিণতি ক্ষুন্ন হইতে পারে)। অবশ্য আদৌ নিবৃত্তির সাধনা যে নাই তাহা নহে, তবে তাহা অধিকাংশেরই পথ নহে। আর সেইজন্য এই জীবন পর্য্যায়ে প্রাণ-মনকে ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টায় অধিকাংশ নারীর জীবন বিকৃত, পঙ্গু হইয়া যায়।

বিনোদিনীর এই মানসিক অবস্থার কালে রাজলক্ষ্মী তাঁহার জন্মস্থান বারাশতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে সে যেন আলোর ক্ষীণ একটু আভাস। বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীকে যেরূপ ব্যাকুল আগ্রহে জড়াইয়া ধরিয়াছে তাহাতে ওইকালে বিনোদিনীর মানসিক অবস্থা কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়। কোন একটা উপায়ে ত্যাগ করিবার, সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিয়া বিনোদিনী যেন বাঁচিয়া গিয়াছে। কোন প্রত্যাশাই সেদিন তাহার অন্তরে ছিল না, শুধু আপনাকে ভুলিতে পারিবার এমন সুযোগ লাভ করিয়া বিনোদিনী ধন্য হইয়া গিয়াছে। আপনার ভার বিনোদিনী আর বহিতে পারিতেছিল না।

ওই সময় মহেন্দ্র আপনার উদ্দাম দাম্পত্য লীলার পরিচয় দিয়া বিহারীকে যে পত্র দিয়াছিল বিনোদিনী সকলের অগোচরে তাহা বারবার আগ্রহ ভরে পাঠ করিয়াছে, আর আপনার শূন্য জীবনের দিকে ফিরিয়া তাকাইয়াছে। তাহার জীবনে এ বঞ্চনা কেন, কেন তাহার সকল সাধ অকালে ফুরাইয়া গেল। এক দুর্জ্জয় অভিমান তাহার বক্ষের উপর পাষাণ-ভার চাপাইয়া দিল। এ অভিমান কাহার প্রতি তাহা বিনোদিনী জানে না। নারীর জীবনে সার্থকতার এই দিকটি বিনোদিনী ইতিপূর্ব্বে এত স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করে নাই।

রাজলক্ষ্মীর স্নেহ বিনোদিনীর শূন্য জীবনকে আরও শূন্যময় করিয়া দিয়াছে। ইহার পর বিনোদিনীর পক্ষে একাকী গ্রামে থাকা একপ্রকার অসম্ভব। কলিকাতায় আসিবার প্রস্তাব করিবামাত্রই বিনোদিনী তাই সম্মত হইয়াছে।

বিনোদিনী আসিয়া দেখিল রাজলক্ষ্মীর সংসার-তরণী সুখের বাতাসে পাল তুলিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। মধ্যস্থলে মহেন্দ্র-আশার যুগল মূর্ত্তি। সাংসারিক বিচিত্র কর্ম্মধারা সেই যুগল মূর্ত্তি বেষ্টন করিয়া যেন ধন্য হইয়া কলস্বর তুলিয়াছে। যে গৃহে একদিন সকল সৌভাগ্যকে পাদপীঠ করিয়া সে আশার মত এমনি স্বামীর পার্শ্বে সুখাসীন থাকিতে পারিত, আজ ভাগ্য বিড়ম্বনায় সেই গৃহে সে একজন কৃপাপ্রার্থী। অথচ পুরুষের জীবনকে সকল দিক হইতে সার্থক করিবার মত নারীর সকল ঐশ্বর্য্য তাহার ছিল, আজও সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ আছে।

ইহার জন্য সামাজিক বিধান কতটা দায়ী, কতটা মনুষ্য-বিধান বহির্ভূত চির দুর্জ্জেয় শক্তি তাহা বিনোদিনী জানিত না। তাহার অভিমান ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া তীব্র আক্রোশে রূপান্তরিত হইয়াছে। বিনোদিনী স্থির করিল এই সুখের সংসার সে ছারখার করিবে। যে ভাগ্য তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে সেই ভাগ্যকে সে এমনি করিয়া আঘাত ফিরাইয়া দিবে।

এই অভিমানই তো অজ্ঞানতা। জীবনের বিচিত্র প্রয়াস এমনি এক একটি অজ্ঞানতাকে আশ্রয় করে। এই অজ্ঞানতার অবসান যেখানে সেখানে জীবনেরও সমাপ্তি। উপন্যাসের পাত্র পাত্রীর জীবনে এই উপলব্ধি না ঘটিলেও ঔপন্যাসিককে কোন একটা উপায়ে এই সাক্ষাৎকার ঘটাইতে হয়। স্রষ্টা মাত্রেই মনুষ্য জীবনাশ্রয়ী এক একটি বিশিষ্ট অজ্ঞান প্রেরণার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ওই অজ্ঞানতার পাষাণতটে মানুষের সকল প্রয়াস আছড়াইয়া পড়িয়া শূন্যে কান্না-হাসির ফেনপুঞ্জ ছড়াইয়া দিতেছে।

বিনোদিনীর এই মানসিক পরিণাম ঘটিয়াছে অনেক পরে। আশার

সংসার কর্ম্মে যে ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা ছিল বিনোদিনী আসিয়া কয়েকদিনের মধ্যেই তাহা পূর্ণ করিয়া দিল। সংসার কর্ম্মের মধ্যে বিনোদিনী অমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিল তাহার কারণ অবশ্য বিনোদিনীর কর্ম্মস্পৃহা। আপনার সুচারু কর্ম্মনৈপুণ্য ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের এমন ক্ষেত্র বিনোদিনী ইতিপূর্বে কোথাও পায় নাই। একটি বৃহৎ সংসারের বিচিত্র দাবী তাহার অন্তর্লীন সুপ্ত সমস্ত ঐশ্বর্য্যের ধীর বিকাশ ঘটাইয়াছে। আপনাকে প্রকাশ করিবার এই আনন্দই বিনোদিনীকে কর্ম্মে এমন নিরলস করিয়াছে।

কিন্তু তাহার এই কর্ম্মের পশ্চাতে আরও একটি সুপ্ত বাসনা সক্রিয় ছিল। তাহার এই বিচিত্র কর্ম্ম প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে যে মহেন্দ্রেরই সেবায় লাগিতেছে ইহাতেই বিনোদিনীর এক প্রকার পরিতৃপ্তি। কিন্তু এমনি করিয়া নারীর অন্তরের ক্ষুধা মেটে না। তাহার এই কর্ম্মের জন্য মহেন্দ্র কতটুকু কৃতজ্ঞ! সে তো মহেন্দ্রের সংসারে আশ্রিতা একজন সহায় সম্বলহীনা নারী মাত্র। আর মহেন্দ্রের কৃতজ্ঞতায় তাহার কতটুকু প্রয়োজন!

মহেন্দ্র যদি তাহার দেহ-মনের অতুলনীয় ঐশ্বর্যের কোন পরিচয় লাভ করিত! তাহার তুলনায় আশার মূল্য কতটুকু! সর্ব্বগুণ লেশহীনা, সংসার অনভিজ্ঞা, স্বল্পবুদ্ধি আশা পুরুষের কতটুকু ক্ষুধা মিটাইতে পারে, তাহাকে দিয়া গৃহের কতটুকু কল্যাণ বা সমৃদ্ধি সাধিত হয়।

মহেন্দ্রর সহিত পরিচিত হইবার জন্য আশার সখিত্ব পাশে বিনোদিনী তাই সহজেই ধরা দিয়াছে। প্রথম দিনের স্বল্প পরিচয়ে মহেন্দ্রের অন্তরে ক্ষীণ একটু সাড়া জাগাইয়া বিনোদিনী পুনরায় একটু আড়ম্বরের সহিত দূরে দূরে সরিয়া থাকিতে লাগিল। বিনোদিনীর স্থির বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর, হৃদয় বৃত্তির উপর তাহার আশ্বর্য্য নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। কয়েকদিন দূরে সরিয়া থাকাতে মহেন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা সত্যই তীব্র হইয়াছে। আশাকে মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া মহেন্দ্র ও বিনোদিনী ইতিমধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। উভয়ের আচরণের এখন আর সঙ্কোচ সাধ্বসের কোন স্থান নাই। এইরূপে বিনোদিনী একদিকে যেমন মহেন্দ্রকে একান্ত নিকটে লাভ করিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে মহেন্দ্রের প্রতি, সংসারের প্রতি আশার সমস্ত করণীয় আপনার দুই সেবা-কুশল হস্তে সম্পন্ন করিয়াছে। সংসারের মধ্যে এখন কোথাও কোন অমিতাচার বা শৈথিল্য নাই। মহেন্দ্রের কর্ত্তব্য ত্রুটিকেও বিনোদিনী কিছুমাত্র প্রশ্রয় দান করে নাই।

সংসারে আশার অস্তিত্বমাত্র রহিল, বিনোদিনীই বধূর সমস্ত কর্ত্তব্য একাকী সমাধা করিতে লাগিল। বিনোদিনী কেবল বাইরের কর্ম্ম করে নাই, অন্তরের কর্ম্মও করিয়াছে। আশার সকল অঙ্গ সজ্জায় ও প্রসাধনে

তো বিনোদিনীরই অনুরাগ স্পর্শ, আশার কথাও আশার নয়, বিনোদিনীর। মাঝখানে আশাকে রাখিয়া বিনোদিনী বস্তুতঃ আপনার হৃদয়কে মহেন্দ্রের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। আশা বধূ হইয়াও এ সংসারে কত অনাবশ্যক, ভার স্বরূপ, কত তুচ্ছ! ইহার জন্য আশা কতটা দায়ী সে বিচার এখানে তুলিয়া লাভ নাই। বিনোদিনী সংসারের বাহিরের একজন অনাত্মীয়া রমণী হইয়াও সংসারের কতবড় আশ্রয়। একজন সংসারকে আশ্রয় করিয়া আছে, একজন সংসারকে আশ্রয় দিয়াছে। উভয়ের আধ্যাত্মিক মূল্য যাহাই হোক, সামাজিক মূল্য? কোথায় আশা, কোথায় বিনোদিনী!

এইখানে কয়েকটি বিষয় বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। বিনোদিনী যদি এমনি কোন পরিবারে বধূর পদ লাভ করিত তাহা হইলে সে কত অনায়াসে একজন পুরুষের জীবনকে, তাহার সংসারকে সকল দিক দিয়া পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিত। ঔপন্যাসিক বিনোদিনীর এই পরিচয় দান করিয়াছেন। বিনোদিনী ভাগ্য বিড়ম্বনায় বিধবা বলিয়া সংসার তাহার নিকট হইতে এই সমস্ত গুণ কিছুমাত্র প্রত্যাশা করে না। যৌন বোধের কথা নয়। আত্মসংযমে বিনোদিনীর অসামান্য ক্ষমতা। আত্মবিকাশের প্রেরণা যদি জীবনের স্বাভাবিক প্রেরণা হয়, ইহার সহিত বিজড়িত হইয়া যদি একান্ত সুস্থ যৌন আবেগ থাকে তবে তাহার জন্য বিনোদিনী কতটা দায়ী, কতটা সমাজ, কতটা বা অন্য কিছু তাহারও সংস্কারমুক্ত বিচার প্রয়োজন।

বিহারীর দীর্ঘ কয়েক দিনের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া এবং আর কোন দিক হইতে কোন বাধা না পাইয়া মহেন্দ্র বিনোদিনী পরস্পরকে আরও নিকটে লাভ করিয়াছে। ইতিমধ্যে বিহারী একদিন মহেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া স্পষ্টই দেখিল যে মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর মধ্যে যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে আশু কোন একটা ব্যবস্থা না করিলে আশার সুখের সংসারে বিপর্যয় ঘটিবে। মহেন্দ্র আশা ও বিনোদিনীকে সতর্ক করিয়া দিতে বিহারী সেদিন কোন সংকোচ, শালীনতার কোন অন্তরাল রাখে নাই।

এমনি করিয়া মহেন্দ্রকে নিকটে লাভ করিবার জন্য বিচিত্র ছলনা জাল বিস্তার করিয়া বিনোদিনী একদিকে যেমন মহেন্দ্রের পরিচয় ধীরে ধীরে লাভ করিতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনি বিহারীর বারংবার হস্তক্ষেপে, তাহার সহিত আলাপ আলোচনা, তিক্ত তীক্ষ্ণ বাক্য বিনিময়ের ভিতর দিয়া বিনোদিনী বিহারীর পরিচয়ও ধীরে ধীরে লাভ করিতে লাগিল।

বিহারীর স্পষ্ট অভিযোগের পর বিনোদিনীকে অনিবার্য রূপে যে মহেন্দ্রের সংসার ত্যাগ করিতে হইবে এ সম্বন্ধে বিহারীর মনে কোন সংশয়

ছিল না ; কিন্তু বিনোদিনী অন্যত্র যাওয়া তো দূরের কথা বরং আশ্চর্য কৌশলে সংসারে আপনার আসন স্থায়ী করিয়া লইল। মহেন্দ্র আশা রাজলক্ষ্মী সকলকে দিয়া বিনোদিনী থাকিবার অনুরোধ করাইয়া লইল।— কেবল তাহাই নয়, যে বিহারী বিনোদিনীকে আশার সুখের কণ্টক বলিয়া বোধ করিয়াছিল সেই বিহারীই আশার কল্যাণের জন্য বিনোদিনীকে মহেন্দ্রের গৃহে থাকিবার অনুরোধ করিয়াছে ! সমস্ত সংসারকে এইরূপে বিনোদিনী সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়াছে, তাহার বুদ্ধি দিয়া, ব্যক্তিত্ব দিয়া, অক্লান্ত সেবা ও যত্ন দিয়া। এইরূপে বিনোদিনী যখন সমস্ত কিছু আপনার আয়ত্তের মধ্যে লাভ করিয়াছে তখন তাহার ঔৎসুক্য শিথিল হইয়াছে।

মহেন্দ্রের স্বভাব দীনতায় একদিকে বিনোদিনী যেমন পীড়িত হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে বিহারীর দুর্লভ পৌরুষের সামান্য আভাস লাভ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছে।

এই প রণামে বিনোদিনীর মানসিক অবস্থাটিকে আর একবার বুঝিয়া লইতে হইবে। মহেন্দ্রের প্রতি বিনোদিনী আকৃষ্ট হইয়াছিল নারীর স্বাভাবিক হৃদয় বোধ লইয়া। সে হৃদয় দীন নয়, ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ। তাহা হীন প্রবৃত্তি চরিতার্থতার বাসনা নয়। মহেন্দ্রকে সে আকৃষ্ট করিয়াছে তাহাকে ভালোবাসে বোধ করিয়া। এই সত্য প্রেমের বাসনা ছিল বলিয়া মহেন্দ্রকে সে তাহার কর্ত্তব্য হইতে এতটুকু স্খলিত করে নাই, (প্রত্যক্ষে হোক পরোক্ষে হোক, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আশা তাহার জীবনে এই স্খলন ঘটাইয়াছিল) পরন্তু সকল দিক হইতে তাহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

কিন্তু মহেন্দ্রকে আয়ত্তের মধ্যে লাভ করিয়া বিনোদিনী নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে এই পুরুষ নারী হৃদয়ের কোন ক্ষুধাই পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। মহেন্দ্র স্বভাবদীন, লোলুপ, অস্থিরচিত্ত, একান্ত স্বার্থপর। আর অন্যদিকে বিহারী ! সেই আপনভোলা, নিঃস্বার্থ, পরোপকারী, ভোগবিমুখ নিরাসক্ত পুরুষটির প্রকৃত পরিচয় এ সংসারের কেহই জানে না, তাহার মূল্য দান তো দূরের কথা। বিনোদিনীর অন্তর-আকাশে এখন হইতে উজ্জ্বল দুটি নক্ষত্রের মত মহেন্দ্র ও বিহারী বিরাজ করিতে লাগিল। এখন হইতে একটির দীপ্তি যেমন ক্রমাগত ম্লান হইতে সুরু করিয়াছে তেমনি অন্যটির দীপ্তি ক্রমাগত উজ্জ্বল হইয়া তাহার হৃদয়কে মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

দমদমে চড়িভাতি উপলক্ষ্যে বিনোদিনীই বিহারীকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিয়াছে। বিনোদিনীর এই অনুরোধের দুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ বিহারীকে তাহার মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করিয়া দেওয়া। পুরুষ

হিসাবে সে যে কত মহৎ কত দুর্লভ তাহা সে আপনিই জানে না। দ্বিতীয়তঃ তাহার সান্নিধ্য লাভের গূঢ় গোপন বাসনা।

মহেন্দ্রের সহিত আচরণে তাহার যে পরিচয়ই প্রকাশ হোক-না-কেন তাহা যে বিনোদিনীর যথার্থ পরিচয় নয় এবং তাহার মধ্যকার সেই যথার্থতাটুকুই যে বাহিরে এমন বিকৃত উপায়ে প্রকাশ লাভ করিয়াছে তাহাও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিনোদিনী একান্ত সুস্থ, প্রেম ও কল্যাণময়ী রমণী। কিন্তু তাহার অন্তরের এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য যে বোধকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হইবে, যে বোধে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিবে, প্রেমের সেই যে বোধ, নারী চিত্তের সেই যে একমাত্র আলোক বিনোদিনী তাহারই আশায় অমন অন্ধকারে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। তাহার এই অধ্যাত্ম পিপাসাই তাহাকে একবার মহেন্দ্রের প্রতি একবার বিহারীর প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে।

বিনোদিনীর সেই নিভৃত চিত্ত-লোকটিকে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন। এ কথাও সত্য একমাত্র মহৎ পুরুষের সান্নিধ্যেই নারীর উন্নত পরিচয় ব্যক্ত হয়। মহেন্দ্রের মত পুরুষ তাহার সুখ সম্ভোগ ও ঐশ্বর্য্য দিয়া তাহার প্রবৃত্তি দিয়া নারীর অন্তরে কেবল দীপ্ত বাসনার দীপ জ্বালাইতে পারে। বিনোদিনীর সমগ্র সত্তার কেবল সেই ভাগটাই চন্দ্রের আকর্ষণে স্ফীত সমুদ্রবক্ষের মত আকৃষ্ট হইয়াছে। বিহারীর সান্নিধ্যে বিনোদিনীর উন্নততর সত্তা জাগ্রত হইয়া চরিতার্থতা লাভের আশায় উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে।

—"ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণ মধ্যাহ্নের বাতাস তরু পল্লব মর্ম্মরিত করিয়া চলিয়া গেল, ক্ষণে দিঘির পাড়ে জাম গাছের ঘন পত্রের মধ্য হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপ মায়ের কথা, তাহার বাল্য সখির কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল, বিনোদিনীর মুখে খর যৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্ব্বদাই বিরাজ করিত বাল্যস্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। বিনোদিনীর মুখে যে কৌতুক তীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিহারীর মনে এ পর্য্যন্ত নানা প্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বল কৃষ্ণ জ্যোতি যখন একটি শান্ত সজল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল তখন বিহারী যেন আর একটি মানুষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্ত মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে কোমল হৃদয়টুকু এখনও সুধা ধারায় সরস হইয়া আছে, অপরিতৃপ্ত রঙ্গ রস—কৌতুক বিলাসের দহন জ্বালায় এখনও নারী প্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই। বিনোদিনী সলজ্জ সতী স্ত্রীভাবে একান্ত ভরে পতিসেবা

করিতেছে, কল্যাণপূর্ণা জননীর মতো সন্তানকে কোলে ধরিয়া আছে, এ ছবি ইতিপূর্বে মুহূর্তের জন্যও বিহারীর মনে উদিত হয় নাই—আজ যেন রঙ্গ-মঞ্চের পটখানা ক্ষণকালের জন্য উড়িয়া গিয়া ঘরের ভিতরকার একটি মঙ্গল দৃশ্য তাহার চোখে পড়িল।”

বিহারী এতদিন পরে বিনোদিনীর এই পরিচয় লাভ করিয়া সশ্রদ্ধ ও আশ্বস্ত হইয়াছে। কিন্তু বিহারী নারীর কোন স্বরূপ জানিত না, নারীর সহিত তাহার পরিচয় অল্প, নারী চিত্তের রহস্য উদ্ঘাটনে তাহার সে কৌতূহলও ছিল না। আপনার বুদ্ধি দিয়া সে উহাদের সম্পর্কে আপনার মত করিয়া একটি ধারণা গড়িয়া তুলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

বিহারী বিনোদিনীর এই দুটি সত্তার মধ্যে বস্তুতঃ কোন সম্পর্ক নির্ণয় করিতে পারে নাই। এই অবস্থায় একটিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে অন্যটিকে কোন একটি উপায়ে অস্বীকার করিতে হয়। বিহারী তাহাই করিয়াছে। বিনোদিনীর মধ্যে স্নেহশীলা, করুণাময়ী নারী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া বিহারী যেমন মুগ্ধ হইয়াছে তেমনি বিনোদিনীর অন্য পরিচয়কে সম্পূর্ণ ভ্রম, আপনারই দীন মনের পরিচয় মনে করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে।

বিনোদিনীর জীবনে এই দুটি প্রেরণাই সত্য। বিনোদিনীর এই যে সমৃদ্ধ ধ্যান-লোক তাহার এই যে কল্যাণময়ী মূর্ত্তি তাহা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক হইয়া থাকিতে পারে না। প্রাণ বৃন্তে একটি বিশেষ রূপাশ্রয়ী হইয়া মানস-লোকে ধ্যানের ওই ফুল ফুটে। নারী-প্রেম কোন স্বরূপে প্রাণের সম্পর্ক শূন্য নয়। বিহারীর মত জীবনবোধ শূন্য বুদ্ধি-সর্ব্বস্ব পুরুষ নারীর এই উভয় সত্তাকে পৃথক বলিয়া জানে।

বিনোদিনীর জীবনে প্রবৃত্তির পীড়া যেমন সত্য তেমনি সত্য তাহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের ধ্যান। মহেন্দ্র বিনোদিনীর মধ্যে এই প্রাণসর্ব্বস্ব নারীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, বিহারী প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহার মানস-রূপ।

এতদিন পরে বিনোদিনীর অন্তরে সেই সত্য প্রেম অনুভূত হইয়াছে যে বোধে নারীর উভয় সত্তার মধ্যে ধীরে সামঞ্জস্য সাধিত হইয়া এক অখণ্ডতা প্রাপ্ত হয়। বিনোদিনী আপনার অন্তরের এই পরিচয় আপনিও বুঝি জানিত না। মহেন্দ্রের মত পুরুষের নিকট নারীর সে পরিচয় উদঘাটিত হয় না। বিহারীর দুর্লভ পৌরুষ ও মহত্বই বিনোদিনীর ওই স্বরূপ উদঘাটিত করিয়াছে।

বিনোদিনী আপনার উন্নততর সত্তার পরিচয় লাভ করিয়াছে, আর সে পরিচয়ে একজন প্রকৃত পুরুষ কেমন শ্রদ্ধান্বিত হয় তাহাও মুগ্ধ হইয়া দেখিয়াছে। ইহাতে বিনোদিনী যেন ধন্য হইয়া গিয়াছে। আছে আছে

তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা দেখিয়া পুরুষ শ্রদ্ধান্বিত হয়। এই লাঞ্ছিত বঞ্চিত জীবনে বিনোদিনীর সে যেন এক অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার। বিনোদিনী এতদিন পরে বাঁচিয়া থাকিবার একটা সার্থকতা বোধ করিয়াছে।

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে বিনোদিনী আশাকে বলিয়াছে, "আমার মনে হইতেছে আমি যেন মরিয়া গেছি, যেন পরলোকে আসিয়াছি, এখানে যেন আমার সমস্তই মিলিতে পারে।"

যে প্রেম প্রবৃত্তির নিত্য সংঘর্ষ, উহার পঙ্কিল আবর্ত্ত হইতে নারীকে রক্ষা করিতে পারে বিনোদিনী এতদিন পরে তাহার আস্বাদ লাভ করিয়াছে, কিন্তু উহাকে চরিতার্থ করিবার তাহার কোন উপায় নাই। কতকটা আত্মস্থ হইয়া বিনোদিনী আপনাকে এবং আপনার চতুষ্পার্শ্বের আর সকলকে নূতন করিয়া বিচার করিয়াছে।

বিনোদিনী বুঝিয়াছে মহেন্দ্রের মত পুরুষ কোন নারীকে ভালোবাসিতে পারে না। এই জাতীয় পুরুষের নিকট নারী কেবল বাসনার সম্পদ। বিনোদিনী আরও বোধ করিয়াছে তাহার প্রেম যাহাকে লাভ করিয়া সার্থক হইতে পারে, সেই বিহারীকে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। নারীর স্বধর্ম সম্পর্কে সে শুধু অনভিজ্ঞ নয়, আপনার মিথ্যা বোধকে সত্য বলিয়া জানিয়া সে একপ্রকার আশ্চর্য্য নৈতিক পরিতৃপ্তি বোধ করে। তাহার দৃষ্টিতে বিনোদিনী নারী নয়, বিধবা। বিধবা সম্পর্কে সামাজিক সর্ববিধ সংস্কার তাহার মনের মধ্যে অত্যন্ত দৃঢ় মূল।—অর্থাৎ সে নারী কেবল ত্যাগ করিবে, সকলের সেবা ও যত্ন করিবে, শুচিতা ও সংযমের আদর্শ স্বরূপিনী হইবে। সে যে ভালবাসিতে পারে, ভালবাসিয়া ধন্য হইতে পারে, সে অধিকার লাভে সমাজ বিধি ক্ষুন্ন হইলেও বিধাতার চিরন্তন নীতি ধর্ম্ম যে ক্ষুন্ন হয় না তাহা বিহারী বোধ করিতে পারে না।

ইহার পর হইতে বিনোদিনী মহেন্দ্রের নানা দুর্ব্বলতার যেমন পরিচয় লাভ করিয়াছে তেমনি অন্যদিকে বিহারীর মহত্ত্বের পরিচয় নানা ভাবে লাভ করিয়াছে। মহেন্দ্র ও বিহারী বিনোদিনীর আরও নিকটে আসিয়াছে। মহেন্দ্র বিনোদিনীর নিকটে আসিয়াছে নিছক প্রবৃত্তি প্রেরণায়, আর বিহারী আসিয়াছে কতকটা ভাগ্যের লীলায়,—আশার কল্যাণ কামনায়? উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য যতই থাক, ইহাতে বিনোদিনীর উভয়কে আরও ভালো করিয়া চিনিয়া লইতে সুবিধা হইয়াছে। বিনোদিনী একদিকে মহেন্দ্রের দুর্ব্বলতা, অন্যদিকে বিহারীর দুর্লভ পৌরুষের সঙ্গে অমোঘ নিয়তির মত একটি বন্ধনও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কোন্ ঘোরের মধ্যে যে বিহারী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহা বুঝিয়া লইতে বিনোদিনীর কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই। হায় পুরুষ,

হায় তাহার নৈতিক দম্ভ ! অ-দৃষ্ট কত ক্ষীণ সূত্রে না বাঁধা পড়িয়া তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায় !

মহেন্দ্রের অসংযত হৃদয়বোধের উপর বিনোদিনীর অশ্রদ্ধা দিনের পর দিন বাড়িয়াছে। পুরুষের সহিত নারীর ওই জাতীয় কোন সম্পর্কে বিনোদিনীর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। তবু বিনোদিনী নানা ভাবে মহেন্দ্রকে আকর্ষণ করিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ যে তাহার শিথিল ইন্দ্রিয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই। এ প্রেরণা সুস্থ সবল নারীর পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু বিনোদিনী স্বভাবদীনা নয়. প্রবৃত্তি চরিতার্থতায় তাহার মর্ম্মান্তিক ঘৃণাই ছিল। তাই মহেন্দ্রকে সে একবার নিকটে আকর্ষণ করিয়াছে আবার পরমুহূর্ত্তে অসামান্য মানসিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া আপনাকে সংযত করিয়াছে। বিনোদিনীর মধ্যে এই উভয় প্রেরণার কোন দ্বন্দ্ব জাগিত না যদি বিনোদিনী মহেন্দ্রকে ভালোবাসিতে পারিত।

এখন বিনোদিনীর হৃদয় একদিকে, বিনোদিনীর প্রবৃত্তি একদিকে। প্রেমের আধার পরিবর্ত্তন না করিতে হইলে বিনোদিনীকে নিশ্চয়ই এই দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হইতে হইত না। তাহার এই নবলব্ধ প্রেম যদি পরিণতি লাভের অনুকূল অবস্থা লাভ করিত, তাহা হইলে মুহূর্ত্তেই বিনোদিনীর বিকৃত সকল প্রয়াস নিরুদ্ধ হইয়া যাইত। মহেন্দ্রের সহিত তাহাকে আর এমন খেলা খেলিতে হইত না। অবশ্য এখনও পর্য্যন্ত বিনোদিনী আপনার প্রেম সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে পারে নাই। প্রেম সকল চঞ্চল হৃদয়বৃত্তিকে একটি রূপমুখীন করিয়া শান্ত করিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর এই কালের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

"যে মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে, যে-মহেন্দ্র তাহার মতো স্ত্রী রত্নকে উপেক্ষা করিয়া আশার মতো ক্ষীণ বুদ্ধি দীন প্রকৃতি বালিকাকে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বিনোদিনী ভালোবাসে, কি বিদ্বেষ করে, তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবে, না তাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিবে, তাহা বিনোদিনী ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে নাই। একটা জ্বালা মহেন্দ্র তাহার অন্তরে জ্বালাইয়াছে, তাহা হিংসার না প্রেমের. না দুয়েরই মিশ্রণ, বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না।"

মহেন্দ্রের প্রতি যেমন বিহারীর প্রতি তেমনি আকর্ষণের স্বরূপ সম্পর্কে বিনোদিনী আজও যে নিঃসংশয় হইতে পারে নাই, তাহা উপরে উদ্ধৃত অংশটি হইতে একপ্রকার বুঝিতে পারা যায়। বলিয়াছি প্রেমের আধার পরিবর্ত্তনের জন্য বিনোদিনীর অন্তর্জীবনে এমনি একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। আরও বলিয়াছি বিহারীর নিকট প্রেম প্রতিহত না হইলে অত্যন্ত দ্রুত বিনোদিনী

এই মানসিক বিপর্য্যয় কাটাইয়া উঠিতে পারিত। প্রেম বিকাশের অনুকূল পরিবেশ না পাইবার জন্য বিনোদিনীর এই মানসিক অবস্থা কতকটা দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে।

বিহারীর সান্নিধ্যে বিনোদিনীর সমস্ত অন্তর উন্মুখ হইয়া উঠে। তাহার প্রেম তাহার এক প্রকার অজ্ঞাতেই অমনি করিয়া চরিতার্থতা লাভের জন্য পথ খুঁজিয়া মরিয়াছে। কিন্তু বিহারী সংস্কার অন্ধ, এবং ওই সংস্কার-প্রসূত নৈতিক অহঙ্কারবোধও তাহার মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। বিহারী তাহাকে শ্রদ্ধা করে সত্য, কিন্তু বিধবা বলিয়া তাহার প্রেম, প্রেমে সার্থকতা লাভের কথা চিন্তাও করিতে পারে না। বিধবার হৃদয়বোধকে সে অন্যায়, অসঙ্গত, অমূলক বলিয়া বোধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। সমাজ যেমন করিয়া যে স্বরূপে নর-নারীকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে সে ঠিক সেই স্বরূপে তাহাদের গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের সম্পর্কে গভীর করিয়া কোনোদিন কোন কিছু ভাবিবার মত মনের অবস্থা তাহার হয় নাই! বিনোদিনী দেখিয়াছে বিহারীর হৃদয় যত বড়ই হোক তাহা জাগ্রত নহে।

এক প্রকার নৈতিক ও মানসিক শক্তি বলে নারী সহজেই আপনার ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। কিন্তু এই নিবৃত্তি সাধনায় বিনোদিনী সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে নাই। প্রেম যে মানসিক শক্তি দেয়, যে নৈতিক বোধ জাগ্রত করে বিনোদিনী সেই জাতীয় মানসিক শক্তি সেই জাতীয় নৈতিক প্রেরণাই লাভ করিতে চায়। বিনোদিনী প্রেম-নিয়ন্ত্রিত, সংযত, সুন্দর জীবন লাভ করিতে চায়। ইহারই উন্নততর পরিণামে যে আধ্যাত্মিক ফল একমাত্র তাহাই বিনোদিনীর কাম্য।

যে বিহারীর কোন মর্য্যাদা মহেন্দ্র আশা কেহই দান করে না, বরং তাহাকে বিঘ্ন বলিয়াই বোধ করে, মহেন্দ্রের রূঢ় অসংযত অভিযোগে সেই বিহারী যখন দুঃখে, শোকে, অপমানে, ঘৃণায় মহেন্দ্রের গৃহ হইতে বিদায় লইয়াছে তখন বিনোদিনী মনে মনে খুশি না বোধ করিয়া পারে নাই। তাহার অসম্মানের জন্য নয়, এমনি করিয়া যদি তাহার অন্ধতা ঘুচে, যদি আপনার মূল্য সম্পর্কে সচেতন হয়, আর যদি এমনি করিয়া তাহার হৃদয় মিথ্যা ঘোর হইতে মুক্ত হইয়া সত্য প্রেম লাভের জন্য উন্মুখ হয়, তাহা হইলে হয়ত কোন দিন গভীর বেদনায় জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে আপনার বক্ষের মাঝখানে ফিরিয়া লাভ করিতে চাহিবে।

বিহারীর অন্তরকে রাজার ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করিয়া দিতে পারে যে নারী, তাহার জীবনকে সকল দিক দিয়া যে নারী সার্থক করিতে পারে সে আশা নহে, বিনোদিনী। বিনোদিনী তাই এই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পরে

বিহারীকে পত্র লিখিয়া আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছে। সকলের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়া বিহারী আজ যে শূন্যতা বোধ করিতেছে বিনোদিনী সেই শূন্য হৃদয় সুধাপূর্ণ করিয়া দিবে। বিহারী তখন পশ্চিমে। অবশ্য তাহার পূর্ব্বেই মহেন্দ্র সেই পত্র হস্তগত করিয়া বিনোদিনীকে লজ্জা দিবার জন্যই খোলা অবস্থায় ফিরাইয়া দিয়াছে। বিনোদিনী ভাবিয়াছে বিহারী তাহার পত্র পাঠ করিয়া ঘৃণায় তাহার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এই কালে বিনোদিনীর সেই মানসিক অবস্থার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ এইভাবে দান করিয়াছেন—

"ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই দংশন করে, ক্ষুব্ধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে যাহা চায় তাহাতেই বাধা? কোন কিছুতেই কি সে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। সুখ যদি না পাইল, তবে যাহারা তাহার সকল সুখের অন্তরায়, যাহারা তাহকে কৃতার্থতা হইতে ভ্রষ্ট, সমস্ত সম্ভবপর সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদিগকে পরাস্ত ধূলিলুণ্ঠিত করিলেই তাহার ব্যর্থ জীবনের কর্ম্ম সমাধা হইবে।"

সে যেন বিশেষ করিয়া বিহারীকে আঘাত করিবার জন্যই বিহারীর প্রিয়জন মহেন্দ্র ও আশার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে উদ্যত হইল। ইতিপূর্ব্বে বিনোদিনী এই পথ অবলম্বন করিয়াছিল আশার সুখ সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া, ইহার সহিত মিলিয়াছিল তাহার অকৃতার্থ যৌবনাবেগ। আজ বিনোদিনীর এই চেষ্টার মূলে আছে যেন একমাত্র বিহারীর সর্ব্বনাশ কামনা। যাহারা তাহার হৃদয় জুড়িয়া আছে তাহাদের পুড়াইয়া ওই নিষ্ম্মম বুকটাকে সে পুড়াইয়া দিবে।

এইরূপে বারংবার প্রেম প্রতিহত হইতে মর্ম্মান্তিক আঘাত লাভের ভিতর দিয়া বিনোদিনী সাময়িকভাবে আত্মবিস্মৃতা হইয়াছে। এই আত্মবিস্মৃতির কালে বিনোদিনী আবার আপনার প্রবৃত্তি বন্ধনকে অনেকটা শিথিল করিয়া দিয়াছে। আশা ও বিহারীর সাময়িক অনুপস্থিতি তাহাকে অপ্রত্যাশিত সুযোগ দানও করিয়াছে। তাহার মন এইভাবে একান্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া না পড়িলে সে যে এতটা অগ্রসর হইতে পারিত না তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। বিক্ষুব্ধ অন্তর শিথিল ইন্দ্রিয়কে শাসন করিতে পারে না।

কিন্তু ইহাই বিনোদিনীর সম্পূর্ণ চারিত্রিক রূপ নয়। তাই কিছুদিনের মধ্যেই বিনোদিনীর বিক্ষুব্ধ অন্তর আবার শান্ত হইয়া গিয়াছে। মহেন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে আপনার আয়ত্তের মধ্যে লাভ করিয়া, তাহার সকল নৈতিক চেষ্টাকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া বিনোদিনী ভাবিয়াছে, না-হয় সে মহেন্দ্রকে

সম্পূর্ণরূপে স্খলিত করিয়া দিল, অনভিজ্ঞা আশার সুখের সংসারকে না হয় সে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিল, কিন্তু তাহারও যে সেই সঙ্গে ইহপরকালের সকল ধর্ম্ম চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যাইবে।

প্রেম প্রতিহত হইতে বিনোদিনী যে ভাবে আত্মবিস্মৃতা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায় যে তাহার ওই প্রেমের বোধ এখনও যথেষ্ট সত্য হইয়া উঠে নাই, তাহার অনেকখানি আসক্তি বিজড়িত। হৃদয় শান্ত হইতে ওই প্রেমবোধই আবার ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়াছে।

তাহার প্রেম যদি চরিতার্থতা লাভের পথ না পায়, বিহারীর মন যদি চিরকালের জন্য বিরূপ হইয়াই থাকে, তবে তাহাকে সে ভাগ্য বলিয়া মানিয়া লইবে। কিন্তু এখনও যদি সে মহেন্দ্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন না হয়, এখনও যদি সে তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় আকর্ষণ করিয়া চলে তাহা হইলে মহেন্দ্রের অন্তরে সে যে কামনার আগুন জ্বালাইয়াছে তাহাতে মহেন্দ্র তো পুড়িবেই, সেই আগুনে তাহাকেও আত্মাহুতি দিতে হইবে। মহেন্দ্রের রাত্রাভিসার তাহাকে এই আসন্ন ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন করিয়া দিয়াছে।

বিনোদিনী এতদিন পরে মহেন্দ্র সম্পর্কে নিঃসংশয় হইয়াছে। তাহার জীবনে যে পরিণামই ঘটুক, মহেন্দ্রকে এখন নির্ম্মমভাবে দূরে সরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। বিনোদিনী তাই পত্রে মহেন্দ্রকে জানাইয়াছে—"ভালোবাসিবার তৃষ্ণায় আমার হৃদয় হইতে বক্ষ পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছে - সে তৃষ্ণা পূরণ করিবার সম্বল তোমার হাতে নাই, সে আমি বেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছি।"

ইতিপূর্ব্বে বিহারীর সহিত আরও দুইবার বিনোদিনীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। বিনোদিনীর সাময়িক মানসিক বিপর্যায়ের কালে বিহারী তাহার যে পরিচয় পাইয়াছে তাহা তাহার সত্য পরিচয় নয়। বিহারী কাশী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহেন্দ্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে গিয়া দেখিল, বিনোদিনী মহেন্দ্রের শয়ন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে, আর মহেন্দ্র কাতর অনুনয়ের ভঙ্গীতে তাহার দুই বাহু দিয়া বিনোদিনীর পদযুগল বেষ্টন করিয়া আছে।

এই দৃশ্য দেখিয়া বিহারীর সমস্ত অন্তর ধিক্‌কারে ঘৃণায় ভরিয়া গিয়াছে। তাহার এই ঘৃণা, তাহার এই প্রবল প্রত্যাখ্যান বিনোদিনীকে মহেন্দ্রের প্রতি আবার আকৃষ্ট করিয়াছে। যে মানসিক অবস্থায় মানুষ মুহূর্ত্তের জন্য আত্মহত্যার চিন্তা করে বিনোদিনী সেই মানসিক অবস্থা লইয়া মহেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। যাহাই হোক, যে চিন্তার ফলে বিনোদিনীর এই চিত্তবিকার পরিশেষে সম্পূর্ণ রূপে দূর হইয়া যায়, তাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। ইহার পর বিনোদিনী স্বয়ং রাজলক্ষ্মীর নাম করিয়া বিহারীকে

আর একবার মহেন্দ্রের গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে। বিনোদিনী সমস্ত ক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছে, তাহার সম্পর্কে বিহারীর মনোভাব এখনও পর্য্যন্ত কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

বিহারীর বিরূপতা বিদ্বেষ এমন কি ঘৃণা সত্ত্বেও তাহার প্রতি বিনোদিনীর প্রেম দিনের পর দিন গভীর হইয়াছে। বিহারী তো অন্তর্য্যামী নয়, ভাগ্য বিড়ম্বনায় তাহার যে পরিচয় সে বারবার পাইয়াছে, তাহাতে তাহার অশ্রদ্ধা বোধ করা অস্বাভাবিক নয়।

বিনোদিনী বোধ করিয়াছে. মহেন্দ্রের অন্তরে সে যে প্রবৃত্তির আগুন জ্বালাইয়াছে, তাহা শীঘ্রই লেলিহান হইয়া উঠিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসিবে। এখন এই আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে একমাত্র যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে, সে বিহারী। বিনোদিনী তাই শেষবারের মত বিহারীর আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছে। এইকালে বিনোদিনী ও বিহারীর মধ্যে যে কথোপকথন হয় তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। বিনোদিনী তাহার সকল কথার ভিতর দিয়া তাহার এই প্রেম স্বরূপটিই বিহারীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে।

"বিনোদ। আমার বুকের জ্বালা লইয়া আমি মহেন্দ্রের ঘর জ্বালাইয়াছি। একবার মনে হইয়াছিল, আমি মহেন্দ্রকে ভালবাসি, কিন্তু তাহা ভুল।"

"বিহারী। ভালবাসিলে কি কেহ এমন অগ্নিকাণ্ড করিতে পারে।"

"বিনোদ। ঠাকুর পো! এ তোমার শাস্ত্রের কথা। এখনও ও-সব শুনিবার মতো মতি আমার হয় নাই। ঠাকুর পো তোমার পুঁথি রাখিয়া একবার অন্তর্য্যামীর মতো আমার হৃদয়ের মধ্যে দৃষ্টিপাত করো।"

নারী প্রেম যে দেহের আশ্রয়মুক্ত নয়, তাহা বিহারী মূঢ় বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। বিনোদিনীর এই কান্নাতেও তাহার মূঢ়তা ঘুচে নাই। প্রেমাশ্রয়ী হইয়াও এই যে প্রবৃত্তি-প্রেরণা—তাহার প্রকৃত স্বরূপটিই বা কি। রবীন্দ্রনাথ তাহার পরিচয় দান করিয়াছেন। বিহারী যে শিশু বালকটিকে পড়াইবার জন্য আপনার নিকট আনাইয়া রাখিয়াছিল, সেই বালকটি তাহাদের উভয়ের কথাবার্ত্তায় আকৃষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে বিহারীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। "বিনোদিনী দুই হাত বাড়াইয়া দিল। বসন্ত প্রথমে একটু দ্বিধা করিয়া ধীরে ধীরে বিনোদিনীর কাছে গেল। বিনোদিনী তাহাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।" জানিনা, বিহারী সেদিন বিনোদিনীর এই বুকফাটা কান্নার অর্থ বুঝিতে

পারিয়াছিল কি-না। হয়ত বুঝিতে পারে নাই, পারিলে তাহাকে অমন অরক্ষিত নিরাশ্রয় অবস্থায় গ্রামে পাঠাইয়া দিতে পারিত না।

বিহারীর নির্দ্দেশ মাথায় তুলিয়া লইয়া, বিনোদিনী একাকী তাহার গ্রামের পূর্ব্ব পরিবেশে ফিরিয়া গেল। বিহারীর প্রেম তাহাকে গ্রামের অমন দীন পরিবেশে সকল প্রকার প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া দেবার যে শক্তি দিতে পারিত, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু ইহা বিহারীর আশ্রয় দান, না চিরকালের নির্ব্বাসন তাহা বিনোদিনী বুঝিতে পারে নাই। বিহারীর পত্রের আশায় দিনের পর দিন কাটাইয়া শেষে ধৈর্য্য হারাইয়া বিনোদিনী বিহারীকে পত্র দিল। পত্রের মধ্যে একপ্রকার এই জিজ্ঞাসাই ছিল, অন্তরের মধ্যে কোন্ প্রাপ্তি তাহাকে বাহিরের এই সকল বঞ্চনাকেও করুণায় বরণ করিয়া লইতে শক্তি দিবে? বিনোদিনী সে পত্রেরও উত্তর পাইল না।

বিনোদিনী আপনাকে সংযত করিলে কি হইবে। মহেন্দ্রের মধ্যে প্রবৃত্তির যে আগুন সে জ্বালাইয়া তুলিয়াছে, তাহাকে সে নির্ব্বাপিত করিবে কোন্ উপায়ে। পাপ এমনি করিয়া তাহার শাস্তি বহন করিয়া আনে। মহেন্দ্রের স্থূল ক্লেদলিপ্ত লালসাসিক্ত বাসনাকে নিয়ত প্রতিরোধ করিতে তাহাকে প্রতিমুহূর্ত্তে যে একান্ত গ্লানিকর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, তাহার ভিতর দিয়াই তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হইয়াছে। পাপ হইতে তাই অত সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায় না। কোন একটি উপায়ে সে তাহার মূল্য আদায় করিয়া লইয়া তবে মানুষকে মুক্তি দেয়। বিনোদিনীর জীবনে সে প্রায়শ্চিত্তের পরিচয় রবীন্দ্রনাথ এইভাবে দান করিয়াছেন।

"বিনোদিনী বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই মহেন্দ্রকে সে কিছুতেই আর দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারিবে না। এই ক্ষুদ্র বাসায় মহেন্দ্র তাহার কাছে ঘেঁসিয়া সম্মুখে আসিয়া বসিবে—প্রতিদিন অলক্ষ্য আকর্ষণে তিলে তিলে তাহার দিকে অধিকতর অগ্রসর হইতে থাকিবে—এই অন্ধকূপে, এই সমাজভ্রষ্ট জীবনের পঙ্কশয্যায় ঘৃণা ও আসক্তির মধ্যে যে প্রাত্যহিক লড়াই হইতে থাকিবে, তাহা অত্যন্ত বীভৎস। বিনোদিনী স্বহস্তে স্বচেষ্টায় মাটি খুঁড়িয়া মহেন্দ্রের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এই যে একটা লোলু জিহ্বা লোলুপতার ক্লেদাক্ত সরীসৃপকে বাহির করিয়াছে, ইহার পুচ্ছপাশ হইতে সে নিজেকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে। একে বিনোদিনীর ব্যথিত হৃদয়, তাহাতে এই ক্ষুদ্র অবরুদ্ধ বাসা তাহাতে মহেন্দ্রের বাসনা তরঙ্গের অহরহ অভিঘাত—ইহা কল্পনা করিয়াও বিনোদিনীর সমস্ত চিত্ত আতঙ্কে পীড়িত হইয়া উঠে। জীবনে ইহার সমাপ্তি কোথায়। কবে সে এই সমস্ত হইতে বাহির হইতে পারিবে।"

এই আগুন সঙ্গে লইয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আগুন সমস্ত গ্রামে ছড়াইয়া পড়িতে কালমাত্র বিলম্ব করিল না। এখন বিনোদিনীর পক্ষে গ্রামে থাকা একপ্রকার অসম্ভব। আর বিহারীর সংবাদ লইতে হইলে মহেন্দ্রের আশ্রয় তাহাকে লইতেই হইবে। মহেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া বিনোদিনী গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল। বিনোদিনী একদিকে প্রাণপণ বলে মহেন্দ্রের কামনা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে, অগ্নিশিখার স্পর্শ মাঝে মাঝে লাগিয়া তাহার দেহে যে দগ্ধচিহ্ন অঙ্কিত করে নাই তাহা নহে এবং অন্যদিকে মহেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াই চতুর্দ্দিকে বিহারীর অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। বিনোদিনীর এই শক্তি আসিয়াছিল দুইদিক হইতে, একদিকে তাহার 'দুর্দ্দান্ত প্রেম', অন্যদিকে তাহার 'আত্মরক্ষার একান্ত আকাঙ্ক্ষা'।

কলিকাতায় পেঁছাইয়া বিনোদিনী যখন বিহারীর নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছে—তখন বিহারী পশ্চিমে। মহেন্দ্র সেই পত্র খোলা অবস্থায় বিনোদিনীকে ফিরাইয়া দিতে বিনোদিনী বোধ করিল বিহারী নিশ্চয় তাহা ঘৃণায় ফিরাইয়া দিয়াছে, উত্তর দানেরও প্রয়োজন বোধ করে নাই। তাহার সঙ্গ পরিহার করিবার জন্যই বিহারী পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে অনুমান করিয়া বিনোদিনী কী নিম্মর্ম ভাবেই না আপনাকে পীড়ন করিয়াছে। সে আত্মগ্লানিতে হৃদয় পর্যান্ত শুষ্ক হইয়া উঠে। বিনোদিনী সে শূন্যতাও জয় করিয়া উঠিয়াছে।

বিহারীর বারংবার ঘৃণিত প্রত্যাখ্যান, তাহার সঙ্গ পরিহার করিবার সচেতন প্রয়াস বিনোদিনীর প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে প্রতিহত তো করে নাই, বরং উত্তরোত্তর তীব্র করিয়াছে। বিনোদিনী মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে বিহারীকে তাহার সত্য পরিচয় লাভ করিতেই হইবে। বিনোদিনী তাই মহেন্দ্রের আশ্রয়ে বিহারীর অন্বেষণে পশ্চিম যাত্রা করিয়াছে। বিনোদিনীর এই দীর্ঘ অভিসার ব্যর্থ হয় নাই।

কিন্তু বিনোদিনীর অমন প্রেম বিহারীর সকল মহত্ত্ব ও পৌরুষ সত্ত্বেও সার্থকতা লাভ করিতে পারিল না। ইহার একটা সাধারণ স্পষ্ট কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, সমাজ। বিনোদিনী অবশ্য সেই কথাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছে। এই সমাজে বিধবা বিবাহে পুরুষ ও নারী উভয়েই শ্রদ্ধা হারায়। বিহারীর বিবাহ প্রস্তাবে বিনোদিনী বলিয়াছে ;—

"আমার ভাগ্য এমন যে, তোমার সম্মান রক্ষা করিয়া তোমার পাশে দাঁড়াইবার আমার কোন উপায় নাই।"

রাজলক্ষ্মীর সাধনা বিনোদিনীর সাধনা নয়। বিনোদিনী বিবাহে

সম্মতি দান করিতে পারে নাই তাহার অত্যাজ্য সতীধর্ম্মের (স্বামী সম্পর্কে হিন্দু পৌরাণিক বোধ) কথা স্মরণ করিয়া নয় (তাহা হইলে পরজন্মে বিহারীকে স্বামীরূপে লাভ করিবার জন্য বিনোদিনীর ইহজন্মে তপস্যার কথা উঠিত না) ; বিনোদিনী সম্মত হইতে পারে নাই জীবনে অমোঘ বিচার-বোধের কথা স্মরণ করিয়া। ইহাই মানবভাগ্য বা নিয়তি।

মহেন্দ্র সম্পর্কে সে যে ভুল করিয়াছে, সেই ভুল তাহার বিবাহিত জীবনে বারংবার স্মৃতির ছায়া জাগাইয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত বিনিদ্র করিয়া তুলিবেই। আর তাহার এই ভুল ঘটিয়াছে বিহারীর দুই চক্ষের সম্মুখে। বিহারীর দাম্পত্য প্রেমেও কি বারংবার সেই স্মৃতির ছায়াপাত ঘটিয়া যাইবে না ? বিনোদিনী বিহারীকে সেই কথাই বলিয়াছে—

"পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিব—এ জন্মে আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই। আমি অনেক দুঃখ দিয়াছি, অনেক দুঃখ পাইয়াছি, আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। সে শিক্ষা যদি ভুলিতাম, তবে আমি তোমাকে হীন করিয়া আরো হীন হইতাম। ভুল করিয়ো না—আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে—আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব।"

বিনোদিনী এই পরিণাম মানিয়া লইয়াছে তাহার ইতিপূর্ব্বের সকল কর্ম্মের অনিবার্য্য শাস্তি স্বরূপে। তাই সে পশ্চাতে কোন ক্ষোভ রাখিয়া গেল না, সকলের নিকট কেবল ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গেল।

৩

বিনোদিনীর আকর্ষণ মুক্ত হইয়া অনুতপ্ত মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা তাহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছে—

"মহিন, ভালোই হইয়াছে। নিজেকে ভালো বলিয়া তোর অহংকার ছিল, নিজের পরে বিশ্বাস তোর বড়ো বেশি ছিল, পাপের ঝড়ে তোর সেই গর্ব্বটুকু ভাঙিয়া দিয়াছে, আর কোন অনিষ্ট করে নাই।'

অর্থাৎ ঔপন্যাসিক যেন ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, মহা দুঃখের আগুনে পুড়িয়া মহেন্দ্রের চরিত্র একটি সত্য পরিণাম লাভ করিয়াছে। ইহা সেই মহাতাপ, যে তাপ দগ্ধ না হইলে, মানুষ আত্মার শুদ্ধ রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

বস্তুতঃ কোন মহৎ জীবনাদর্শ হইতে মহেন্দ্র যেমন স্খলিত হয় নাই, তেমনি কোন উন্নততর জীবন বোধ আশ্রয় করিয়া, সে এই স্খলিত জীবন হইতে উঠিয়া আসে নাই। তাহার অধঃপতন যেমন, তাহার অধ্যাত্ম-সংগ্রামও তেমনি অকিঞ্চিৎকর।

বিবাহিত জীবনে স্ত্রী ও মাতার সহিত আচরণে তাহার চরিত্রের যে পরিচয় লাভ করা যায়, বিনোদিনীর সহিত আচরণে তাহার বিশেষ কিছু লক্ষিত হয় না। সামাজিক নীতিবোধের কথা বলিতেছি না, তাহার চরিত্রের অধ্যাত্ম পরিণামের কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছি। এইদিক হইতে মহেন্দ্রের চরিত্রের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই!

একজাতীয় স্বার্থপর, ভোগ সর্ব্বস্ব পুরুষ যে-কারণে নিশ্চিন্ত ভোগ সুখের জীবনকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে চায়, সেই একমাত্র কারণে মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার জীবনে আর সমস্ত কারণ, আর সমস্ত প্রেরণা গৌণ। মহেন্দ্র সম্পর্কে বিনোদিনীর এই মন্তব্য বড় যথার্থ। তাহার মত সত্য করিয়া মহেন্দ্রকে আর কে চিনিতে পারিয়াছে।

"একসময় মনে করিতে তুমি আশাকে ভালোবাসিতেছ—সেও মিথ্যা। এখন মনে করিতেছ, তুমি আমাকে ভালোবাসিতেছ—এও মিথ্যা। তুমি কেবল নিজেকে ভালোবাস।"

তাহার চরিত্রে যে হৃদয়াবেগ মাত্র সম্বল ছিল, ওই সামান্য বিক্ষোভে তাহাও নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ তাহার জীবনে আশ্রয় করিবার মত সকল অবলম্বন পরিশেষে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মহেন্দ্র আপনার জীবনের এই পরিণাম লক্ষ্য করিয়াই বিহারীকে বলিয়াছে—

"যে জীবন আমি গঠন করিয়াছি, তাহাকে লইয়া আলস্যভরে আর উপভোগ করিবার যো নাই—কর্ম্মের দ্বারা তাহাকে যদি টানিয়া লইয়া না চলি, তবে কোনদিন সে আমাকে টানিয়া অবসাদের মধ্যে ফেলিবে।"

অধ্যাত্ম সম্পদে মহেন্দ্র সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া সে আপনাকে অমন নিয়ত কর্ম্মের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে চাহিয়াছে। অন্তরের আশ্রয় যখন থাকে না, তখন মানুষ বাহিরে অমন করিয়া আশ্রয় খুঁজিয়া মরে। এমনি করিয়া মানুষ আপনার নিকট হইতে আপনি পলাইয়া বাঁচিতে চায়।

অন্তর ও বাহির উভয়ের যোগে জীবনের ধীর বিকাশ ঘটে। অন্তরের ভাব ও ভাবনাই বাহিরে কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত হইতে চায়। এই প্রকাশ না থাকিলে অন্তর তো বন্ধ্যা। যেখানে এই উভয় সত্তা, অন্তর ও বাহির দ্বিধা হইয়া যায়, সেখানে জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি ঘটে না। ভাব-প্রেরণা শূন্য কর্ম্মের মধ্যে কোন রূপ নাই, আনন্দ নাই, তাহা মানুষের প্রাণ শক্তিকে কেবল ছুটাইয়া ঘুরাইয়া নিঃশেষ করিয়া দেয়।

নীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন নয়, মানুষের সমগ্র সত্তার, তাহার দেহ-প্রাণ-মন মথিত করিয়া সকল নীতি ও ধর্ম্মবোধেরও ঊর্দ্ধে মানবাত্মার যে চকিত

বিদ্যুদ্দীপ্ত প্রকাশ, যে প্রকাশে জগৎ ও জীবনের সকল দৃশ্যপট মুহূর্ত্তের জন্য পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, প্রাত্যহিক জীবনে যে উপলব্ধির স্মৃতি মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠিয়া মানুষকে বিহ্বল করিয়া তুলে, মহেন্দ্র-চরিত্র সৃষ্টির পশ্চাতে জীবন সাক্ষাৎকারের সেই জাতীয় কোন গভীর প্রেরণা নাই।

মানুষ তাহার নৈতিকবোধ, তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচারবোধ লইয়া জীবনে এক-একটি মূল্য আরোপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু যেখানে মন ও বুদ্ধির সকল আলোক নিভিয়া যায়, যে-লোক হইতে মনুষ্যের চিন্তা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, যেখানে আর এক নিয়মে এই জীবন ও জগৎ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, যে নিয়মে এই সমস্ত কিছুর আর এক অর্থ ধরা পড়ে, তাহার সহিত সাক্ষাতে মানুষের সকল মূল্যবোধ কেমন করিয়া মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা সাক্ষাৎ করিবার মত সেই অতিস্থির, অতিগভীর অন্তর্দৃষ্টি মহেন্দ্র-চরিত্র সৃষ্টির মূলে নাই।

মহেন্দ্র ধনীর সন্তান। দারিদ্র্যে অনিবার্য্যভাবে যে সংযম শিক্ষা হয়, যে ইচ্ছার বেগ নিয়ন্ত্রিত হয়, মহেন্দ্রের জীবনে তাহা ঘটিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। শৈশবে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়! মাতার নিকট হইতে অসংযত, অপরিমিত, অন্যায় স্নেহ ছাড়া কোন শিক্ষাই সে লাভ করে নাই।—তাহার আশৈশব এই অশিক্ষার কথা ঔপন্যাসিক সর্ব্বাগ্রেই উল্লেখ করিয়াছেন। "বাল্যকাল হইতে মহেন্দ্র দেবতা ও মানবের কাছে সর্ব্বপ্রকার প্রশ্রয় পাইয়াছে, এইজন্য তাহার ইচ্ছার বেগ উচ্ছৃঙ্খল।"

ইহার পর মহেন্দ্র দুঃসহ দুঃখভোগের ভিতর দিয়া পরিণামে কেমন করিয়া যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করিল, তাহার পরিচয় দান করাই যে ঔপন্যাসিকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। এই উদ্দেশ্যের কথা তিনি ভূমিকায় একভাবে উল্লেখও করিয়াছেন। "নামতে হল মানব সংসারের সেই কারখানা ঘরে, যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্ত্তি জেগে উঠতে থাকে।"

মহেন্দ্রকে জীবনে দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার ভিতর হইতে "দৃঢ় ধাতুর (কোন) মূর্ত্তি" জাগিয়া উঠে নাই। মহেন্দ্রের চরিত্রে তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অগ্নিতে স্বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়, শুষ্ক দারুখণ্ডের কেবল ভস্মাবশেষ থাকে। ওই সামান্য সংগ্রামে মহেন্দ্রের প্রাণ-মনের শক্তি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

যথেষ্ট বয়স পর্য্যন্ত মহেন্দ্রের অবিবাহিত থাকিবার কোনও কারণ ছিল না। তাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কোনটাই যুক্তি আশ্রয় করে না। বিবাহে তাহার সম্মতি ছিল না এই মাত্র।

মহেন্দ্রের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত হৃদয়াবেগের প্রাবল্য ছিল বলিয়া, তাহার মধ্যে সর্ব্বদাই একটা অতিরেক দৃষ্টি হয়। এই হৃদয়াবেগের একটা প্রধান ধর্ম্ম হইল ঈর্ষা বোধ। এই সমস্ত মানুষের জীবনে তাই সামান্য কারণে কিংবা অকারণেই ঈর্ষার সঞ্চার হয়। হৃদয়াবেগে আবার সহজেই প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়। হৃদয়াবেগের সহিত তাই প্রবৃত্তি ও ঈর্ষা অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। বিহারীর প্রতি ঈর্ষাই মহেন্দ্রকে আশা-সম্পর্কে সচেতন করিয়াছে এবং পরিশেষে আশাকে বিবাহ করিতে সংকল্পবদ্ধ করিয়াছে। পরে লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে, বিহারীর প্রতি ঈর্ষা, তাহার প্রবৃত্তি, প্রেরণাকে প্রবলতর এবং তাহার দুর্ব্বলতাকে আরও বেশি করিয়া অনাবৃত করিয়াছে। তাহার পর "যেই বিবাহের ব্যাপারে মহেন্দ্র মনকে লাগাম ছাড়িয়া দিল, সেই তাহার পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।"

রাজলক্ষ্মী পুত্রের প্রকৃতি বুঝিতেন। আশাকে বিবাহ করিতে মহেন্দ্র যখন একবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, তখন কোন বাধাই সে মানিবে না।

ঐশ্বর্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-প্রিয়জন যে যেখান হইতে যতটা সুযোগ দিতে পারে, আজ পর্য্যন্ত মহেন্দ্র তাহার সমস্ত কিছুই পাইয়াছে। মহেন্দ্রের তাই একপ্রকার ধারণা জন্মিয়াছে যে ইহ সংসারে চাহিলেই সমস্ত কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু সংসারে তেমনটি ঘটে না, নিষ্ঠুর আঘাতে জাগিয়া উঠিয়া একদিন মহেন্দ্রকে তাহা বোধ করিতে হইয়াছে।

প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রকাশ তখনি ঘটে, যখন মানুষ অন্তরের ভিতর হইতে কামনা ত্যাগের জন্য সংগ্রাম করে। অন্তরের মধ্যে নিয়ত কামনা জাগাইয়া তুলিয়া বাহিরে তাহা লাভ করিবার প্রাণপণ প্রয়াসের মধ্যে কোন মনুষ্যত্ব নাই। মানুষকে একদিন নির্ম্মম আঘাতে থমকাইয়া দাঁড়াইতে হয়। এই পর্যন্ত তাহার শক্তির সীমা। তখন হইতে তাহার জীবনে অর্থের পরিবর্ত্তন ঘটে, জীবনের মান বদলাইয়া যায়—তখন হইতে মানুষ অশ্রুজলে অন্তরের কামনাকে একে একে উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করে।

মহেন্দ্রের এই চরিত্র বিহারীর অজ্ঞাত থাকিবার কথা নয়। আশাকে বিবাহ করিবার সংকল্প পরিহার না করিলে এই ঘটনা আশ্রয় করিয়া উভয় বন্ধুর মধ্যে যে অত্যন্ত ক্ষোভজনক এবং লজ্জাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, বিহারী তাহার স্থির বুদ্ধি দিয়া মুহূর্ত্তেই বোধ করিতে পারিয়াছিল! অনুরোধ মাত্রেই বিহারী তাই আশাকে বিসর্জ্জন দিয়াছে।

এই অসংযত হৃদয়াবেগ মহেন্দ্র মাতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিল। তাহার মাতার অসংযম ও অশিক্ষাই মহেন্দ্র লাভ

করিয়াছিল। বিবাহ ব্যাপারে রাজলক্ষ্মীর সকল ক্রোধ গিয়া পড়িল অন্নপূর্ণার উপর। তাহার পর রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের পাঠের অজুহাত তুলিয়া আশাকে মহেন্দ্রের নিকট হইতে সম্পূর্ণ দূরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিল। মহেন্দ্রও মাতার এই ইচ্ছাকে অধিক দিন কার্য্যকরী হইতে দিল না। লক্ষ্য করিতে পারা যায়, বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতে সুরু করিয়া এ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, তাহার কোনটাই সুস্থ সবল মনের পরিচয় বহন করে না। মহেন্দ্র বধূকে নিকটে লাভ করিবার বাসনা প্রকাশ করিতে রাজলক্ষ্মী আবার অভিমান করিয়া আশাকে সাংসারিক কর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিয়াছে। আশাকে যতদিন নিকটে রাখিয়াছিল, ততদিন রাজলক্ষ্মী তাহাকে আকণ্ঠ কর্ম্মের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে এতটুকু অবসর লাভ করিতে দেয় নাই। তাহার পর অভিমান করিয়াই রাজলক্ষ্মী আশাকে সংসার কর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরাইয়া দিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর এই মান অভিমানে মাঝখানে মহেন্দ্র ও আশা উভয়েরই ক্ষতি হইয়াছে। অসংযত যদৃচ্ছা ভোগে মহেন্দ্রের কর্ত্তব্যে ত্রুটি ঘটিতে লাগিল, বালিকা আশাও সাংসারিক কোন শিক্ষাই লাভ করিতে পারিল না। রাজলক্ষ্মী এইরূপে মহেন্দ্রের এই অসংযমের জন্য প্রত্যক্ষে না হইলেও পরোক্ষে যে দায়ী তাহাতে কোন সংশয় নাই।

বালিকা আশা তাহার স্বাভাবিক হৃদয় বোধ দিয়া যখন এই পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হইয়া রাজলক্ষ্মীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখনও রাজলক্ষ্মী অভিমান ভুলিয়া তাহাকে নিকটে টানিয়া লয় নাই, বরং তিরস্কার করিয়া দূরে সরাইয়া দিয়াছে। একদিকে মহেন্দ্রের অন্যদিকে রাজলক্ষ্মীর অপরাধের জন্য বালিকা আশার যে অসম্পূর্ণতা, তাহা মহেন্দ্র যেমন, রাজলক্ষ্মীও তেমনি বিনোদিনীকে আশ্রয় করিয়া পূর্ণ করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে।

আশার দিক হইতে মহেন্দ্র যদি কোন অভাব বোধ করিয়া থাকে, তাহা পূর্ণ করিতে আশাকেই সচেষ্ট হইতে হইবে। আশাকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে মহেন্দ্র তাহার মধ্যে কোন অভাব না বোধ করিতে পারে। আশার সাংসারিক অনভিজ্ঞতার ত্রুটি যদি রাজলক্ষ্মীকে পীড়িত করে, তবে সেই ত্রুটি সংশোধনের জন্য রাজলক্ষ্মীকেই আগ্রহশীল হইতে হইবে। তাহা না করিয়া মাতা ও পুত্র উভয়েই সে অভাব অন্য নারীকে দিয়া পূর্ণ করিয়া লইতে সচেষ্ট হইয়াছে! আর সেই কারণে অনিবার্য্যরূপে বিষবৃক্ষে ফল ফলিয়াছে এবং অনিবার্য্যরূপেই মাতা ও পুত্রকে তাহা ভোগ করিতে হইয়াছে।

এককালে মাতার প্রতি মহেন্দ্রের আকর্ষণের অন্ত ছিল না। বিবাহের পর ওই হৃদয়াবেগ আশার প্রতি ধাবিত হইবামাত্র, মুহূর্ত্তে মাতার দিকটা শূন্য হইয়া গিয়াছে! চরিত্রই সামঞ্জস্য সাধন করে। মহেন্দ্রের সে চরিত্র ছিল না। তাই হৃদয়াবেগ ক্রমে একান্ত হইয়া তাহাকে কেবল তাহার মাতার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দেয় নাই—আত্মীয়-প্রিয়জন হইতে, গৃহের ও সমাজের সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত করিয়া দিয়াছে। বিবাহের পর কেবলমাত্র বালিকা আশাকে কণ্ঠলগ্ন করিয়া মহেন্দ্রের দিনরাত্রি কাটিয়া যাইতে লাগিল।

আশার বয়স অল্প, তাহার উপর সংসার অনভিজ্ঞা। পুরুষের ভোগের আবেষ্টনের মধ্যে নারী যদি সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয়, তাহা হইলে পুরুষ তো ডোবেই, সেই সঙ্গে নারীও আপনার সর্ব্বনাশ সাধন করে। অন্তরাল ও অগোচরতা সৃষ্টি করিয়া নারীকে পুরুষের সৌন্দর্য্যমোহ জাগাইয়া রাখিতে হয়। ক্ষীণবুদ্ধি অল্পবয়স্কা আশা তাহা জানিত না।

দাম্পত্য প্রেমকে কেমন করিয়া সাংসারিক বিচিত্র কর্ম্মের খাদে প্রবাহিত করিয়া দিতে হয়, ভোগকে এইরূপে কর্ম্মের শাসনে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কেমন করিয়া সুন্দর করিয়া তুলিতে হয়, আশা তাহা জানিত না। তাই দেখিতে পাই, বিবাহের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই মহেন্দ্রের বাহুপাশ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্রের বাসনায় নানাভাবে ইন্ধন যোগাইতে যোগাইতে অত্যল্পকালের মধ্যেই আশা নিঃশোষিত হইয়া গিয়াছে। মহেন্দ্রের নিকট তাহার কোন রহস্য কোন মাধুর্য্যই আর নাই।

এই অবস্থায় এই জাতীয় পুরুষের মন স্বাভাবিক ভাবে অন্য কোনও নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, কারণ তাহার ওই মোহের প্রয়োজন। মহেন্দ্র তাহার পর হইতে ধীরে ধীরে বিনোদিনী সম্পর্কে সচেতন ও কৌতূহলী হইয়াছে।

যে নৈতিক বোধের বশবর্ত্তী হইয়া মহেন্দ্র প্রথমে বিনোদিনীকে সংসারের বাহিরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া লিখিতেছেন—

"হৃদয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে মহেন্দ্রের উচিত অনুচিতের আদর্শ সাধারণের অপেক্ষা কিছু কড়া। পাছে মাতার অধিকার লেশমাত্র ক্ষুন্ন হয়, এইজন্য ইতিপূর্ব্বে সে বিবাহের প্রসঙ্গমাত্র কানে আনিত না। আজকাল, আশার সহিত সম্বন্ধকে সে এমন ভাবে রক্ষা করিতে চায় যে, অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি সামান্য কৌতূহলকেও সে মনে স্থান দিতে চায় না। প্রেমের বিষয়ে সে যে বড়ো খুঁত খুঁতে এবং অত্যন্ত খাঁটি, এই লইয়া তাহার মনে একটা বড়

গর্ব্ব ছিল। এমন কি, বিহারীকে সে বন্ধু বলিত বলিয়া, অন্য কাহাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতেই চাহিত না।"

ভাবাবেগ-সর্ব্বস্ব পুরুষ কাহারও সহিত একটা সীমা রাখিয়া মিশিতে পারে না। তাই স্ত্রী বা একান্ত নিকট আত্মীয়া ছাড়া অন্য কোন নারীর সহিত তাহারা হৃদয়ের কোন সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে না। কারণ, হৃদয় সম্পর্কে তাহাদের আচরণ কোথাও সংযত বা সীমিত নয়। তাহারা হয় একান্ত নিকটে লাভ করে নতুবা সম্পূর্ণ দূরে সরাইয়া দেয়। বিশ্বসংসার তাহাদের নিকট তাই অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাই দেখিতে পাই বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইবামাত্রই মহেন্দ্রের আর সকল হৃদয়-বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সাংসারিক বিচিত্র সম্পর্ককে সেই মানুষই যথাযোগ্য স্থান দিতে পারে, যাহার হৃদয়বোধ সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত ও অনুশীলিত।

নৈতিক প্রেরণা ও পরিণামবোধ মহেন্দ্রের জীবনে একান্ত ক্ষীণ। যে জীবনে এই প্রেরণা প্রবল হইয়া দেখা দেয়, আশৈশব মহেন্দ্র সেই জাতীয় জীবন গঠনে কখন প্রয়াসী হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে তাহার জীবনে কোন প্রকার পরীক্ষা আসে নাই বলিয়া, তাহার তথাকথিত চরিত্র এক প্রকার অক্ষুণ্ণ ছিল।

পুরুষের মোহ কেমন করিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, প্রখর বুদ্ধিশালিনী বিনোদিনী তাহা জানিত। মহেন্দ্রের উচ্ছৃঙ্খল প্রেমকে সে সাংসারিক বিচিত্র কর্ম্মের বন্ধন দিয়া ধীরে ধীরে সংযত করিয়া তুলিল। তাহার পর, আশাকে মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া মহেন্দ্রের চক্ষে নিত্য নূতন মোহ-অঞ্জন পরাইয়া দিতে লাগিল। নারী সেই অফুরন্ত মোহ সৃষ্টি করিতে পারে. যাহাকে পুরুষ কখন নিঃশেষ করিয়া দিতে পারে না।

ঔপন্যাসিক এক্ষেত্রে স্পষ্ট করিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নারীর সামর্থ্য ও শিক্ষা কেমন করিয়া পুরুষের জীবনকে সংযত ও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারে। আশা যাহা পারে নাই, বিনোদিনী তাহা পারিয়াছে।

এই দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথ আর একটি সমস্যার ইঙ্গিত করিয়াছেন। যে বিনোদিনী পুরুষের জীবনকে এমন সংযত, সুন্দর ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে, একটা সুবৃহৎ সংসারের মধ্যে নিয়ম-শাসন-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করিয়া চতুর্দ্দিকে কল্যাণ শ্রী পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতে পারে, সে বিনোদিনীকে বধূরূপে সংসারের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার চিন্তা সমাজ করিতে পারে না। সমাজের নিকট হইতে নারীর ওই মর্য্যাদা বিনোদিনী কোনদিন লাভ করিতে পারিবে না। তাহাকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, ত্যাগের পথ অবলম্বন করিতেই হইবে! সমাজ এমনি করিয়া আপনাকে যেভাবে বঞ্চিত

করিয়া চলিয়াছে, তাহাতে একটা পরিণামে উহা অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িবে। —হইয়াছেও তাই। উহার আত্মবঞ্চনার সহস্র দিকের মধ্যে ইহা একটি মাত্র দিক।—তাহার অমন দুর্লভ সংখ্যাতীত নারী সম্পদকে সে শুধু নির্ম্মম পায়ে দলিত করিয়া আসিয়াছে!

যে কারণেই হোক, ইহার পর বিনোদিনী কিছুকালের জন্য আপনাকে দূরে সরাইয়া লইয়াছে। ইহাতে মহেন্দ্র সাময়িক এক প্রকার শূন্যতাবোধ না করিয়া পারে নাই, কেবল তাহাই নয়, বিহারীর স্পষ্ট অভিযোগ মহেন্দ্রকে বিনোদিনী-সম্পর্কে আরও সচেতন করিয়া দিয়াছে। মহেন্দ্র ইতিপূর্বে বিনোদিনী-সম্পর্কে আপনাকে যে ভুল বুঝাইয়া আসিতেছিল, যে বহুবিধ আত্মপ্রতারণা, বিহারীর অভিযোগের পর তাহার আর কোন সুযোগ রহিল না। তাহার এবং বিনোদিনীর সম্পর্ক এখন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ছলনা করিবার মত, আপনার মনকে ভুলাইবার মত, এখন কোথাও আর কোন অন্তরাল রহিল না। এখন মহেন্দ্রকে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়াই হয় ফিরিতে হইবে, নতুবা স্খলনের এক-একটি সোপান নিম্নে অবতরণ করিতে হইবে।

ইতিমধ্যে বিনোদিনী মহেন্দ্রের জীবনে এতখানি অংশ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, যাহার ফলে তাহার এই আত্মগোপনে মহেন্দ্র আপনার চতুর্দ্দিকে হঠাৎ শূন্যতা বোধ করিল।—প্রবৃত্তি প্রেরণার জন্যই শুধু নয়, সাংসারিক নানা প্রয়োজন ও অভাব-অসুবিধার ভিতর দিয়া মহেন্দ্র প্রতি মুহূর্ত্তে বিনোদিনীর অভাব বোধ করিয়াছে।

এই মানসিক অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে মহেন্দ্রের সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল আশার উপর। আশার শূন্য পাত্র এতদিন বিনোদিনী পূর্ণ করিয়া আসিয়াছে। আশার সমস্ত করণীয় এতদিন বিনোদিনী অন্তরালে থাকিয়া নিপুণভাবে সমাধা করিয়াছে। আজ বিনোদিনী সরিয়া যাইতে আশা তাই সম্পূর্ণ অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। সে এত তুচ্ছ, এত সামান্য।

তবু ইহাতে আশার যে কোন অপরাধ নাই, এবং আশার সহিত আচরণে সে যে সম্পূর্ণ অপরাধ করিয়াছে, ইহা বোধ করিয়া মহেন্দ্র আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিয়াছে। আশার সাংসারিক অনভিজ্ঞতার জন্য বস্তুতঃ আশা তো দায়ী নয়, দায়ী মূলতঃ সে-ই, কতকাংশে রাজলক্ষ্মী ও বিনোদিনী। আশার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, মহেন্দ্র আপনার অশান্ত মনকে সংযত করিবার জন্য কিছুকালের জন্য গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র একাকী বাসা লইয়াছে।

আপনার উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি দমন করিতে মহেন্দ্র কখন গৃহের বাহিরে বাসা

লয়, কখন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে, কখন কাশী ছুটিয়া যায়! ইহার জন্য যে অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়, মনকে পরিশুদ্ধ করিতে যে দীর্ঘদিনের নির্জ্জনতা ও নিয়ত আত্মবিশ্লেষণ প্রয়োজন, মহেন্দ্র তাহা জানিত না। ইহা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আত্মজিজ্ঞাসা ও অন্তর্মুখীনতা বলিতে তাহার জীবনে কোন কালেই কিছু ছিল না।

আপনাকে সংযত করিবার মত, ধারণ করিয়া রাখিবার মত মহেন্দ্রের মধ্যে কোন উন্নততর বোধের প্রেরণা ছিল না। তাহার এই অসংযম এবং সাময়িকভাবে সংযত হইবার চেষ্টা, তাহার সম্পূর্ণ প্রেরণা আসিয়াছিল বিনোদিনীর দিক হইতে। অর্থাৎ, বিনোদিনী যখন আকর্ষণ করিয়াছে তখন মহেন্দ্র আকৃষ্ট হইয়াছে, আবার বিনোদিনী যখন সে আকর্ষণের পাশ কতকটা শিথিল করিয়াছে, মহেন্দ্রের আবেগকে প্রতিহত করিয়াছে, তখনই মহেন্দ্র আপনাকে ধিক্‌কৃত করিয়াছে, অনুতপ্ত হইয়া সংযত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। বিনোদিনীর অন্তর্দ্বন্দ্বের, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের সে সামান্য একটি খেলনা-মাত্র।

তাই দেখিতে পাই, মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই মহেন্দ্র আবার বিনোদিনীর ছলনা-জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে। পত্রে আশার নামাঙ্কিত থাকিলে কী হইবে?—মহেন্দ্র জানিত এই আহ্বান বিনোদিনীর। মহেন্দ্র সমস্ত জানিয়া শুনিয়াই পুনরায় গৃহে ছুটিয়া আসিয়াছে।

অন্তরের গোপন অপরাধ আকাঙ্ক্ষা বাহিরে এমনি নানা যুক্তির ছদ্মবেশ লইয়া প্রকাশ পায়। এমনি করিয়া মানুষ আপনাকে আপনি বঞ্চনা করে।

গৃহে ফিরিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর সহিত আচরণে সংযম রক্ষা করিতে পারে নাই, আত্মগ্লানিতে পুড়িয়া আপনাকে ধিক্‌কার দিতে দিতে কাশীধামে অন্নপূর্ণার নিকট ছুটিয়া গিয়াছে। পুণ্যময়ী কাকীমার স্নেহচ্ছায়ায় কিছুকাল কাটাইয়া আসিতে পারিলে, তাহার অন্তরের মালিন্য হয়ত ধৌত হইয়া যাইবে।

পাপের প্রথম সোপানে অবতরণ করিয়া মানুষ প্রথমে এমনি প্রতিহত হয়। এইরূপে অন্তরের বিক্ষোভ কতকটা শান্ত হইয়া আসিলে মানুষ ভাবে, বোধহয় অপরাধ হইতে মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু ওই সুপ্ত অপরাধ প্রবৃত্তি নূতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া মানুষকে মুহূর্ত্তে অনেকখানি নিম্নে টানিয়া আনে। মহেন্দ্রের জীবনেও তাই ঘটিয়াছে দেখিতে পাই। অন্তরের বিক্ষোভ কতকটা শান্তভাব ধারণ করিতে মহেন্দ্র বড় নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। আর তাহার কোন ভয় নাই, সকল অপরাধ হইতে সে মুক্ত হইয়া বাঁচিয়াছে,

এখন হইতে তাহার পুণ্যময়ী কাকীমার আশীর্ব্বাদ তাহাকে সকল স্খলন পতন হইতে রক্ষা করিবে। মহেন্দ্র এমনি লঘুচিত্ত, এমনি জীবন বোধ-শূন্য। মনকে সংযত করিতে যে সুদীর্ঘ কালের অনুশীলন নিয়ত প্রয়োজন মহেন্দ্র তাহা জানিত না। ইহার জন্য মানুষকে কী মরণান্তিক সংগ্রামই না করিতে হয়। গৃহে ফিরিবামাত্র, তাই মহেন্দ্রের সুপ্ত প্রবৃত্তি আবার প্রবলবেগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

বিনোদিনীকে নিকটে লাভ করিতে অখণ্ড অবসর সৃষ্টি করিবার জন্য মহেন্দ্র কী নির্ম্মম ভাবেই না আশাকে লাঞ্ছিত করিয়া কাশী পাঠাইয়া দিয়াছে। এই মহেন্দ্রই মাত্র কয়েকদিন পূর্বে আপনাকে সংযত করিতে কাশী ছুটিয়া গিয়াছিল। এই অবস্থাতেও মহেন্দ্র দ্বারে অর্গল বন্ধ করিয়া আপনাকে সংযত করিবার অভিনয় করে। এই তুচ্ছতার ভিতর দিয়া মহেন্দ্রের নিবীর্য্যতার পরিচয় একান্ত স্পষ্ট হইয়া উঠে।—অর্থাৎ তাহার ওই নিষ্ঠার অভাব। বড় কোন অপরাধ করিবার মত তাহার প্রাণের কোন শক্তি ছিল না! অথচ অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হইবার মত হীন লোলুপতা আছে। মহেন্দ্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে তাই মহত্ত্বের পরিচয় লেশমাত্রও নাই।

মহেন্দ্রের এই দীন স্বভাব, লঘুচিত্ততার, নিছক কাম প্রবৃত্তিই বিনোদিনীকে ধিক্‌কৃত করিয়াছে। বিনোদিনী তাই আপনাকে পুনরায় সংযত করিয়াছে।

মহেন্দ্রের রাত্রি অভিসারের পর, রাজলক্ষ্মী ও আশা সকলের নিকট মহেন্দ্রের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা অনাবৃত হইয়া পড়িল।

ইহার পর বিনোদিনীর পক্ষে মহেন্দ্রের গৃহে থাকা অসম্ভব। অবশ্য মহেন্দ্রের সহিত গৃহত্যাগ করিয়া যাইবারও প্রশ্ন উঠে না। মহেন্দ্রকে বিনোদিনী মিথ্যা আশ্বাস দিয়াছে—রাজলক্ষ্মী এবং আশাকে শেষ আঘাত হানিবার জন্য। অনাবৃত কামনার সেই আদিম লীলার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে দান করিয়াছেন, নর-নারীর জীবনের সেই এক মহা সংকটময় মুহূর্ত্তের পরিচয় লাভ করিতে আমি নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এখানে মানুষের সমাজ নাই, সামাজিক বিচিত্র সম্পর্ক বন্ধন নাই, শিক্ষা নাই, নীতি নাই, ধর্ম্ম নাই, সৌন্দর্য্যের ক্ষীণতম অন্তরাল পর্য্যন্ত নাই।

"মহেন্দ্র। কেন যাইবে না। তুমিই আমাকে সর্ব্বনাশের মুখে টানিয়া আনিয়াছ, আজ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তোমাকে যাইতেই হইবে।

"বলিয়া মহেন্দ্র সুদৃঢ় বলে বিনোদিনীকে বুকের উপর টানিয়া লইল, জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া কহিল, তোমার ঘৃণাও আমাকে ফিরাইতে

পারিবে না, আমি তোমাকে লইয়া যাইবই. এবং যেমন করিয়াই হউক, তুমি আমাকে ভালোবাসিবেই।

"বিনোদিনী সবলে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল।

"মহেন্দ্র কহিল, চারিদিকে আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছ, এখন আর নিবাইতেও পারিবে না।"

"বলিতে বলিতে মহেন্দ্রের গলা চড়িয়া উঠিল, উচ্চৈঃস্বরে সে কহিল, এমন খেলা কেন খেলিলে বিনোদ। এখন আর ইহাকে খেলা বলিয়া মুক্তি পাইবে না। এখন তোমার আমার একই মৃত্যু।

"রাজলক্ষ্মী ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, মহিন, কী করছিস্!

"মহেন্দ্রের উন্মত্ত দৃষ্টি এক নিমেষমাত্র মাতার মুখের দিকে ঘুরিয়া আসিল; তারপরে পুনরায় বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া মহেন্দ্র কহিল, আমি সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি; বলো তুমি আমার সঙ্গে যাইবে?

"বিনোদিনী ক্রুদ্ধা রাজলক্ষ্মীর মুখের দিকে একবার চাহিল। তাহার পর অগ্রসর হইয়া অবিচলিতভাবে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল, যাইব।"

বিনোদিনী সেই দিন রাত্রে একাকী গোপনে গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া উন্মত্ত মহেন্দ্র শেষে বারাসতে বিনোদিনীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে। মহেন্দ্রের ওই প্রকাশ্য ব্যভিচারের পর বিনোদিনীর পক্ষে একাকী গ্রামে থাকা অসম্ভব। গ্রাম-জীবনের সহিত বিনোদিনীর মর্ম্মে মর্ম্মে পরিচয় ছিল। বিনোদিনীকে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে হইবেই, অথচ মহেন্দ্রের আশ্রয়ে কলিকাতায় আসিতে পারিলে সে আর একবার বিহারীর আশ্রয় ভিক্ষা করিতে পারিবে। তাহার এমন বিপদে বিহারী ছাড়া আর কে তাহাকে আশ্রয় দিবে। এই আশায় বিনোদিনী মহেন্দ্রের আশ্রয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিয়াছে।

নিছক প্রবৃত্তি প্রেরণার একটি রহস্য এই যে উহা মানুষকে অধিক কাল শক্তি জোগাইতে পারে না। এই সামান্য কয়েকদিনের উত্তেজনায়, অনিয়মে মহেন্দ্র ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিনোদিনী ইতিমধ্যেই মহেন্দ্রের জীবনে ভার স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

মহেন্দ্রের জীবনে কোন গভীরতর জীবন-জিজ্ঞাসার কোন গভীর অধ্যাত্ম ব্যাকুলতার কিছুমাত্র পরিচয় আমরা লাভ করি না। মানুষ যে-কোন বোধকে আশ্রয় করুক-না কেন, তাহার জন্য যদি ত্যাগ স্বীকার করিতে, দুঃখ ভোগ করিতে প্রস্তুত হয়, তবে সেই বোধ পরিণামে তাহাকে উন্নততর জীবন-বোধে প্রতিষ্ঠিত করিবেই। মহেন্দ্রের চরিত্রে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কোথাও এই ত্যাগের বোধ কিছুমাত্র সত্য হইয়া উঠে নাই।

বিনোদিনীকে সামাজিক সকল মর্য্যাদার বন্ধন হইতে ছিন্ন করিয়া, সে কেবল একাকী একটি সংসারের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার বহনের কল্পনা করিয়া পীড়িত হইয়াছে। ইহাতে তাহার নিশ্চিন্ত সুখোপভোগটি ক্ষুন্ন হইবে। অমন ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে কি-না কেবল এই চিন্তা করিয়াছে। বিনোদিনী তাহার এই চরিত্রের কথাই একদিন তাহার মুখের উপর স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিল—"কী করিবার সাধ্য আছে তোমার। না জান ভালবাসিতে, না জান কর্ত্তব্য করিতে। মাঝে হইতে আমাকে কেন লোকের কাছে নষ্ট করিতেছ। * * * লুকোচুরি, ঢাকাঢাকি, একবার এদিক, একবার ওদিক—তোমার এই চোরের মতো প্রবৃত্তি দেখিয়া আমার ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে।"

মহেন্দ্রের অন্তরের কোন গভীর অধ্যাত্ম পিপাসা যদি ক্ষীণ বুদ্ধি অসমৃদ্ধমনা আশা আদৌ না পূর্ণ করিতে পারিত এবং ঐ ক্ষুধা প্রবল হইয়া যদি তাহাকে অনিবার্য্যরূপে ঐশ্বর্য্যময়ী বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট করিত, তাহা হইলে একদিকে প্রচলিত নীতিবোধ অন্যদিকে গভীরতর অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা এই উভয় প্রেরণার সংঘাতে জীবনের এক আশ্চর্য্য দিক উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত। মহেন্দ্র সেই জাতীয় কোন প্রেরণায় বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিনোদিনীর প্রতি তাহার মনোভাব কিছুমাত্র শ্রদ্ধেয় ছিল না। তাহাকে লইয়া সে যে-কোন অবস্থায় কিছুদিনের জন্য কামনা চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছে মাত্র। বিনোদিনীর নারী-জীবনের যে-দিক, তাহার যে নারী-ধর্ম্ম ইহ-পরকাল পরিব্যাপ্ত করিয়া অন্তহীন রূপে বিরাজিত সেই দিক সম্পর্কে সে কিছুমাত্র চিন্তা করে নাই। তাহার আপনার জীবন যেমন, বিনোদিনীর জীবনকে তেমনি সে একান্ত সংকীর্ণ করিয়া দেখিয়াছে। তাই দেখিতে পাই, বিহারী যখন বিনোদিনীর বিবাহ সম্পর্কে অন্নপূর্ণার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছে, তখন মহেন্দ্র বিস্মিত ও কুণ্ঠিত হইয়া সম্পূর্ণ জোরের সহিত আপনার অসম্মতি জানাইয়াছে। বিধবা বিনোদিনী সম্পর্কে মহেন্দ্রের মনোভাব এই যে, সেই হয় অন্নপূর্ণার মত সংসার ত্যাগ করিবে, নতুবা ভ্রষ্ট জীবন যাপন করিবে। বিবাহিত জীবনে তাহার সার্থকতা লাভের কোন প্রশ্ন উঠে না।

একদিকে মাতা ও পত্নী, গৃহের নিশ্চিন্ত সুখভোগ, অন্যদিকে বিনোদিনী, সেই সঙ্গে সামাজিক সর্ব্ববিধ অসম্মান ও লাঞ্ছনা, মহেন্দ্রকে কোন একটি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এমনি পারস্পরিক ছলনা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে মানুষ দীর্ঘকাল কাটাইতে পারে না।

কিন্তু সে কথা নয়, মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়া, আবার গৃহের সহিত যে কেমন করিয়া যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারে ভাবিলে বিস্মিত

হইতে হয়। রুগ্না মাতাকে, নিরপরাধিনী স্ত্রীকে এমন অবস্থায় ত্যাগ করিয়া যাওয়া মহেন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব নয়, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে সে গৃহে ফিরিয়া গেল কেমন করিয়া, আশার সহিত ওইটুকু ছলনাই বা কেমন করিয়া করিতে পারিল। ইহার একটা কারণ অবশ্য তাহার চরিত্রের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। সেই কথাই সর্ব্বাগ্রে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ওই নিশ্চিন্ত আরামটাকে সে কোন প্রকারেই ত্যাগ করিতে পারিতেছিল না। বিনোদিনী যতই ভার হইয়া উঠিয়াছে ততই সে গৃহে বারংবার ছুটিয়া গিয়াছে। ওই মানসিক অবস্থায় ঘরও তাহার পক্ষে কণ্টকময়। আপন গৃহে আপন পরিজনের নিকট সে হেয় হইয়া গিয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তের এই বোধটাও মহেন্দ্রের অসহ্য। আবার অন্যদিকে বিনোদিনীও তাহার সুখ-সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দিতে চায় না। এমন অবস্থায় আরও কিছুদিন হয়ত কাটিয়া যাইত, কিন্তু বিহারীর প্রতি ঈর্ষা বিনোদিনীকে যে-কোন অবস্থায় মানিয়া লইতে মহেন্দ্রকে ব্যগ্র করিয়া তুলিল। বিনোদিনী পশ্চিমে যাইবার প্রস্তাব করিতে মহেন্দ্র তাই বিনা দ্বিধায় সম্মত হইয়াছে।

মহেন্দ্র বিনোদিনীকে লইয়া গৃহ রচনা করিবার চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্যও করে নাই। সামান্য কয়েকদিন তাহাকে লইয়া সে শুধু তাহার কামনা চরিতার্থ করিয়া লইতে চায়। ইহার পর বিনোদিনীর ভবিষ্যৎ জীবন কি দাঁড়াইবে, তাহার স্ত্রী পরিবার ইহার পর তাহাকে ক্ষমা করিবে কেন, যদি ক্ষমা না করে তাহা হইলে সে বিনোদিনীকে চিরকালের জন্য স্বীকার করিয়া লইতে পারিবে কি-না এই সমস্ত দিক সে চিন্তা করিয়া দেখে নাই। যে-কোন অবস্থায় মহেন্দ্রের চিন্তা বলিয়া কিছু জাগে না। মহেন্দ্রের বর্ত্তমান ভাবনাটা এইরূপ, যাহা হইবার হইবে এখন সুখ-শয্যায় বিনোদিনীকে বক্ষে লইয়া তাহার কয়েকটা দিনরাত্রি আবর্ত্তিত হইয়া যাক। বিনোদিনী জানে মহেন্দ্রের মত পুরুষ নারীকে ভালবাসিয়া কখন চূড়ান্ত ত্যাগ করিতে পারে না। বিনোদিনী তাই তাহাকে বিশ্রাম সুখ তো উপভোগ করিতে দেয় নাই, বরং তাহার প্রণয় নিবেদনকে বারংবার ঘৃণার সহিত কেবলই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

ইহাতে মহেন্দ্রের মোহের ঘোর দ্রুত কাটিয়া গিয়াছে। বিনোদিনীকে দিয়া যদি তাহার কামনা চরিতার্থ না হয়, তবে তাহার এই মিথ্যা ভূতের বোঝা বহিয়া লাভ কী। মহেন্দ্রের বল প্রয়োগেরও সুযোগ নাই, পরিশেষে বিহারী আসিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে। মহেন্দ্রকে তাই বাধ্য হইয়া বিনোদিনীর আশা ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

৪

শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ার ফলে বিহারীর স্নেহের ক্ষুধা যেমন মিটে নাই, তেমনি আশৈশব গৃহ বন্ধন না থাকিবার জন্য তাহার মধ্যে এক প্রকার ঔদাসীন্য ও নিশ্চেষ্টতার ভাব গড়িয়া উঠে। এই স্নেহের অভাব ছিল বলিয়াই সে যে রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণার স্নেহের কাঙাল হইয়া ফিরিত তাহাতে কোন সংশয় নাই। শৈশবে স্নেহের অভাব মনের স্বাভাবিক বিকাশকে ক্ষুণ্ণ করে। পরবর্ত্তী জীবনে বিহারীর আচরণে যে অস্বাভাবিকতা আমরা লক্ষ্য করি তাহার মূল এখানে। শৈশব হইতেই তাহার পারিবারিক বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল বলিয়া যথেষ্ট উদ্যম ও তীক্ষ্ম বুদ্ধি সত্ত্বেও সে স্থির হইয়া কোন কিছু সম্পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তুলিতে পারিত না।

কলেজে ডিগ্রি লইয়া সে শিবপুরে কিছুকাল মনোযোগের সহিত ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়াছিল; কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা না দিয়াই আবার ডাক্তারি পড়িতে সুরু করে। "সকলেই জানিত, বিহারী ভালো রকম পাস করিয়া নিশ্চয়ই সম্মান ও পুরস্কার পাইবে, কিন্তু তাহার আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না।"

বিহারীর এই অস্থির-চিত্ততার কারণ তাহার অন্তরের ওই শূন্যতা বোধ। বাহিরের কোন কিছু দিয়া সে ওই শূন্যতা পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না। এই স্নেহের অভাব তাহাকে যেমন উদাসীন করিয়াছে, তেমনি আপনার এই অসহনীয় একাকীত্ব বোধ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সহস্র কর্ম্মের মধ্যে সে আপনার দিন-রাত্রিকে ডুবাইয়া দিয়াছে।

এই মানসিক অবস্থার কালে বিহারী একদিন অন্নপূর্ণার বারংবার অনুরোধে আশাকে দেখিতে গেল। বালিকা আশাকে দেখিয়া বিহারীর মনে কোন্ ভাবনা জাগিয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু আশাকে দেখিবার পর হইতে তাহার স্নেহ-বুভুক্ষু হৃদয় যে একটি স্নেহনীড় রচনার স্বপ্ন দেখিবে ইহাই স্বাভাবিক;—কারণ বিবাহে এক প্রকার সম্মত হইয়াই বিহারী আশাকে দেখিতে গিয়াছিল। ইহার সহিত পুণ্যময়ী অন্নপূর্ণার প্রতি শ্রদ্ধা বিজড়িত হইয়া তাহার ওই স্বপ্ন সাধকে আরও আকাঙ্ক্ষিত, আরও মধুর করিয়া তুলিয়াছিল।

বিহারীর চরিত্র আনুপূর্ব্বিক বিশ্লেষণ করিবার পূর্ব্বে তাহার একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহা তাহার চরিত্রকে একদিক দিয়া যেমন সামর্থ্য দান করিয়াছে তেমনি অন্যদিক দিয়া দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছে। তাহার চরিত্রের সামর্থ্য ও অসামর্থ্য উভয়ের মূল ওই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত। অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টি, গভীর মানব চরিত্রাভিজ্ঞান,

প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা সত্ত্বেও তাহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য তাহার জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবার পথে একমাত্র অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে।

আশার জন্য তাহার গোপন আকাঙ্ক্ষা ও শ্রদ্ধাবোধের পশ্চাতে প্রকৃত কারণ কি থাকিতে পারে তাহা সে কোন দিন বিচার করিয়া দেখে নাই। বস্তুতঃ বিহারী কোন দিনই আশার যথার্থ মূল্য বিচার করিতে চায় নাই। আশাকে সে প্রথম দিন হইতেই সম্পূর্ণরূপে আদর্শায়িত করিয়া দেখিয়াছে। আশাকে দেখিয়া ফিরিবার পথে অন্যমনস্ক বিহারী মহেন্দ্রের প্রশ্নে এক প্রকার আত্মগত ভাবেই বলিয়াছে, "উহাকে দেখিয়া উহার মাসীমার কথা মনে পড়ে, বোধ হয় অমনি পুণ্যময়ী হইবে"। বিহারী কোন কিছুকেই বাস্তবতার দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিতে চায় না। কতকটা অকারণ শ্রদ্ধা (এই শ্রদ্ধার পশ্চাতে সকল ক্ষেত্রে একটি ভাব-প্রেরণা ক্রিয়া করে) তাহার এই বাস্তব বিচারবোধটিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। অন্নপূর্ণার প্রস্তাব মাত্রেই বিহারী তাই সম্মত হইয়াছে। আশাকে প্রথমে দেখিতে যাইতেও সে সম্মত হয় নাই। তাহার এই সময়কার প্রত্যেকটি আচরণ ও প্রত্যেকটি উক্তির মধ্য হইতে বাস্তববোধ শূন্যতার পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়।

আদর্শ-লোক হইতে নামাইয়া আনিতে গেলে সকল বাস্তব দশা ও সমস্যা জড়িত হইয়া ওই বিশেষ সম্পর্ক যে দেখিতে দেখিতে একান্ত কালো হইয়া উঠিবে বিহারীর মত আদর্শবাদী পুরুষের পক্ষে তাহা চিন্তারও অগোচর। আশা বন্ধুপত্নী, পরস্ত্রী। আশাকে সে তাই আপনার অজ্ঞাতেই একটি ভাব-লোকের সামগ্রী করিয়া তুলিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। আশার প্রতি তাহার যে মনোভাব তাহার সহিত বাস্তব দশা বিজড়িত ছিল না বলিয়া বিহারীর জীবনে এই সম্পর্কে কোন সমস্যা দেখা দেয় নাই।

অনুরাগ কাহারও প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিলেও বাস্তব দশাকে কোন উপায়ে অস্বীকার করে না। প্রকৃত প্রেম সমগ্র জীবনকে আশ্রয় করিতে বা স্বীকার করিয়া লইতে চায়। প্রেম নর-নারী সমগ্র সত্তার প্রকাশ। প্রেম যেখানে তত্ত্বমাত্র রূপে আপনাকে আপনি সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতে চায়, বাস্তব সকল সমস্যাকে পরিহার করিবার চেষ্টা করে, সেখানে জীবনের সম্পূর্ণতা ক্ষুণ্ণ হয়। আর এই কারণে নর-নারীর অন্তর নিয়ত অশ্রুমুখীন হইয়া থাকে। জীবনে ইহার আধ্যাত্মিক কোন ফল লাভ থাকে না। আশার প্রতি তাহার এই যে বিশিষ্ট মনোভাব, তাহাও আবার সচেতন নয়, সুতরাং তাহার জীবনে প্রেমের আধ্যাত্মিক কোন ফল লাভের প্রশ্নই উঠে না।

বিনোদিনী সম্পর্কেও বিহারী এই একই ভুল করিয়াছে। তাহাকে সেই যে একবার সে অন্তরের মধ্যে দেবী রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহার পর হইতে

তাহার বাস্তব জীবনকে কোনদিন বিচার করিয়া দেখিবার, উহার সমস্যা সমাধানের কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করে নাই।

পরিশেষে দেখিতে পাই, বাস্তব জীবনের রূঢ় সংস্পর্শে তাহার সকল আদর্শবাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহার আদর্শনিষ্ঠ জীবন বাস্তবতাকে স্বীকার করিয়া লইয়া পরিণামে সত্য ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

বিহারীর প্রেমে বাস্তব দশা বিজড়িত ছিল না বলিয়া, বন্ধুপত্নী আশাকে ভালবাসিতে তাহার জীবনে কোন অধ্যাত্ম সমস্যাদেখা দেয় নাই। জীব-জীবনের সকল দশামুক্ত এই বোধ মানুষের সমগ্র সত্তাকে, তাহার দেহ-প্রাণ-মনকে চরিতার্থ করিতে পারে না বলিয়াই তাহা সত্য নহে।

মহেন্দ্রের রূঢ় অভিযোগে ওই ভাবের মুখোসটি ভাঙ্গিয়া পড়িলে বিহারী তাহাকে আবার বাস্তব দশা মুক্ত করিয়া অত্যুচ্চ ভাব-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে দুঃসাধ্য সাধনায় ব্রতী হয় নাই। প্রেমের এই জাতীয় সাধনা বিহারীর মত পুরুষের সাধ্য নহে। তাহার মধ্যে নৈতিক সংস্কার এত প্রবল যে ওই বোধটা সম্পর্কে সচেতন হইবামাত্র সে শুধু বিহ্বল হইয়া আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিয়াছে। যাহা অন্তর্লোকে মাণিক্যের স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ করিত, তাহার সমস্ত অন্তরাল ভাঙ্গিয়া দিয়া মহেন্দ্র তাহাকে প্রখর দিবালোকে টানিয়া আনিয়া একান্ত কালো করিয়া তুলিয়া এমন ভাবে লাঞ্ছিত করিয়া ধুলায় লুটাইয়া দিল!

যে বোধ বিহারীর সচেতন মনের অতীতে থাকিয়া তাহার সকল প্রেরণাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল, যাহা তাহার জীবনে নিয়তি রূপে লীলা করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহার পরিচয় দান করিতে গিয়া লিখিতেছেন—

"কন্যা দেখিবার উপলক্ষ্যে সেই যে একদিন সূর্য্যাস্ত কালে বাগানের উচ্ছ্বসিত পুষ্পগন্ধ প্রবাহে লজ্জিতা বালিকার সুকুমার মুখখানিকে সে নিতান্তই আপনার মনে করিয়া বিগলিত অনুরাগের সহিত একবার চাহিয়া দেখিয়াছিল, তাহাই বারবার মনে পড়িতে লাগিল, এবং একটা অত্যন্ত কঠিন বেদনা কণ্ঠের কাছ পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল। দীর্ঘ রাত্রি ছাদের উপর শুইয়া শুইয়া, বাড়ির সম্মুখের পথে দ্রুতপদে পায়চারি করিতে করিতে যাহা একদিন অব্যক্ত ছিল তাহা বিহারীর মনে ব্যক্ত হইয়া রইল। যাহা সংযত ছিল তাহা উদ্দাম হইয়া উঠিল; নিজের কাছেও যাহার কোন প্রমাণ ছিল না, মহেন্দ্রের বাক্যে তাহা বিরাট প্রাণ পাইয়া বিহারীর অন্তর বাহির ব্যাপ্ত করিয়া দিল।"

আশার প্রতি বিহারীর মনোভাবের স্বরূপ যেমনই হোক, আশা যে

বিহারীর আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে কোন সংশয় নাই। রাজলক্ষ্মী আশাকে পরিত্যাগ করিবার অনুরোধ করিলে বিহারী তাই নিঃসঙ্কোচে অসম্মতি জানাইয়াছে। অন্তরের ক্ষুধাকে বিহারী সেই প্রথম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল বলিয়া অমন জোরের সহিত সে আপনার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। বিহারী চিরকাল মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীর ইচ্ছাকে, তাহা যেমনই হোক-না-কেন, আপনার জীবনে জয়ী করিয়া বন্ধু প্রীতির গৌরব বোধ করিয়াছে। কিন্তু আজ সে এমন একটা কিছুর আস্বাদ লাভ করিয়াছে, যাহা লাভ করিলে আর সমস্ত কিছু তুচ্ছ হইয়া যায়।

অন্নপূর্ণার অনুরোধকে বিহারী কিন্তু উপেক্ষা করিতে পারিল না। আশাকে সে দেখিয়াছে অন্নপূর্ণার বোনঝি রূপে। অন্নপূর্ণার প্রতি শ্রদ্ধা, তাহারই স্মৃতি বিজড়িত হইয়াই আশা তাহার নিকট বহু আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইয়াই উঠিয়াছিল। অন্নপূর্ণার অনুরোধে (ইহা যেন আশারই অনুরোধ) তাহার অমন প্রেমটাই যে তুচ্ছ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণার এই আচরণে বিহারী যে কতদূর মর্ম্মাহত হইয়াছিল তাহা তাহার এই সংক্ষিপ্ত উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়। "কিন্তু আমাকে আর কাহারও সঙ্গে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিয়ো না।"

আশাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহার জীবনে মাত্র এই কয়েকটা দিনের ঘটনা ঘটিয়া গেল। তাহার পর দীর্ঘকাল বিহারীর আর কোন সংবাদ আমরা পাই না। আশার প্রতি বিহারীর গোপন আকাঙ্ক্ষা ইহার পর হইতে তাহার অবচেতন মন আশ্রয় করিয়া তাহার জীবনের সকল চেষ্টা নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। এই অজ্ঞাত প্রেরণাই ইহার পর হইতে তাহার জীবনে নিয়তিরূপে লীলা করিয়াছে।

রাজলক্ষ্মীর সহিত বারাসতে বেড়াইতে গিয়া বিনোদিনীর সহিত বিহারীর সেই প্রথম পরিচয়। বিনোদিনী যে সাধারণ গ্রাম্য নারী নহে বিহারী তাহার নানা পরিচয় লাভ করিয়াছিল, কিন্তু এই পরিচয়কে আশ্রয় করিয়া তাহার অন্তরে বিশেষ কোন বোধ গড়িয়া উঠে নাই। আশা বিহারীর সমস্ত অন্তর অধিকার করিয়া বসিয়াছিল বলিয়া বিহারী যে বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, তাহা নহে। এখনও পর্য্যন্ত বিহারীর অন্তরে সেই জাতীয় কোন ক্ষুধা জাগে নাই। জীবনের সত্য পিপাসায় সচেষ্ট বা নিশ্চেষ্ট, জ্ঞাত বা অজ্ঞাত যে-কোন ধ্যান-রূপ ভাঙ্গিয়া পড়ে। যে ধ্যান-রূপ প্রাণ-মন মথিত করিয়া গড়িয়া উঠে না, তাহাতে জীবনের কোন পিপাসাই মিটে না।

প্রেমোপলব্ধিতে নর-নারীর সত্তা স্পষ্ট দ্বিধা হইয়া যায়—একটি অন্তর্জীবন, একটি বহির্জীবন, একটি অধ্যাত্ম, একটি জাগতিক। প্রেম যতই গভীরতা

লাভ করে, বহির্জীবন ততই গৌণ হইয়া যায়, সেই সঙ্গে অন্তর্জীবন সমৃদ্ধ হইয়া নর-নারীর চেতনাকে ক্রমাগত ঊর্দ্ধ পরিণাম, এবং বিশ্বের সহিত মিলন বোধকে ততই গভীরতা ও ব্যাপ্তি দান করিতে থাকে। প্রেমের ইহাই অধ্যাত্ম ফল লাভ।

আশার প্রতি তাহার মনোভাব তাই সর্ব্বপ্রকার অধ্যাত্ম ফল লাভ শূন্য কেবল আত্মবঞ্চনা মাত্র। বিহারী এমনি করিয়া আত্ম বঞ্চনা করিয়া চলিয়াছিল বলিয়া বিনোদিনীর অমন প্রেমকেও কোনদিন উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

বিহারীর মত প্রবল নৈতিক সংস্কারসম্পন্ন আদর্শবাদী পুরুষের দৃষ্টিতে জীবন সমগ্র স্বরূপে প্রকাশ পায় না। তাহার ওই বোধ জীবনকে দ্বিধা করিয়া উহার বাস্তব দিকটাকে সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া একটি ভাবের মধ্যে চরিতার্থতা অন্বেষণ করিয়াছে। ইহা পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের সাধনা নয়। আশাকে যেমন, বিনোদিনীকেও তেমনি সম্পূর্ণ আদর্শায়িত করিয়া বিহারী নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। জীবন-পিপাসা সত্য করিয়া অনুভূত হইতে তাহার এই জীবন-বোধ একদিকে যেমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তেমনি অন্যদিকে ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে সে আবার সচেষ্ট হইয়াছে।

একদিকে বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্যবোধ, অন্যদিকে অন্নপূর্ণার কাতর অনুরোধ এই উভয় প্রেরণায় বিহারীর গোপন অনুরাগ কর্ত্তব্য বোধ রূপে প্রকাশ লাভের সুযোগ পাইয়াছে। বিনোদিনী সম্পর্কে বিহারী মহেন্দ্রকে যেমন, তেমনি আশাকেও বারংবার সতর্ক করিয়াছে। এই সতর্কতায় লাভ যে বিশেষ কিছু হইবে না তাহাও অবশ্য বিহারী বুঝিত। মহেন্দ্রের মত দুর্ব্বল চিত্তের পুরুষের সঙ্গে বিনোদিনীর মত রূপসী, বুদ্ধিমতী, গুণবতী নারীর আকর্ষণ জয় করিয়া উঠা অসম্ভব না হইলেও সহজসাধ্য নয়। সেখানে উচিত বিনোদিনীকে অন্য কোথাও রাখিবার বন্দোবস্ত করা। বিনোদিনীর মত নারীকে গ্রামে চিরকালের জন্য পাঠাইয়া দিবার চিন্তা করিতেও বিহারীর বিবেকে লাগিয়াছে। এমনি অনিশ্চয়তার মধ্যে বিহারীর দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল।

বিনোদিনী সম্পর্কে বিহারীর আশঙ্কা খুবই স্বাভাবিক। শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে যে নীতিবোধ জাগে এবং ওই নীতিবোধ আশ্রয় করিয়া যে বিশিষ্ট জীবন-জিজ্ঞাসা ও বিচার বোধ গড়িয়া উঠে বিহারীর জীবনে তাহার অধিক কোন সঞ্চয় ছিল না।

আদর্শ জীবনাশ্রয়ী না হইলে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। নীতি-শাস্ত্র আহৃত আদর্শ একান্ত হইয়া কোথাও জীবন ও জগতের রহস্যানুসন্ধানের সর্ব্বাধিক আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতাকে নিরুদ্ধ করিয়া দেয়।

বিহারী লক্ষ্য করিয়াছে মহেন্দ্রই কেবল বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, বিনোদিনীও সচেতনভাবে তাহার এই চিত্ত-দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিতেছে। আর আশার মূঢ়তা তাহাদের উভয়ের ব্যবধানকে দিনে দিনে সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছে।

বিহারীর নিকট বিনোদিনীর ছলনা গোপন না থাকিলেও বিনোদিনীর মনুষ্য চরিত্রাভিজ্ঞান অসাধারণ। বিহারী মহেন্দ্রের মুখের উপর অভিযোগ করিয়া বলিয়াছে, "বিনোদিনী তোমায় ইচ্ছা করিয়া অধর্ম্মের পথে টানিতেছে এবং তুমি না জানিয়া মূঢ়ের মতো অপথে পা বাড়াইতেছ।" বিহারী জানিত এই অভিযোগ একটা প্রবল সঙ্ঘাত জাগাইয়া বিনোদিনীকে অনিবার্য্যভাবে ওই পরিবেশ হইতে দূরে সরাইয়া দিবে। এই স্থির সংকল্প ছিল বলিয়া বিহারী তাহার অভিযোগের মধ্যে সৌন্দর্য্য ও শালীনতার কিছুমাত্র অন্তরাল রাখে নাই। কিন্তু এই বিনোদিনীই পরিশেষে বিহারীকে দিয়া মহেন্দ্রের গৃহত্যাগ না করিবার জন্য অনুরোধ করাইয়া লইয়াছে! বিনোদিনীর মত চতুরা নারীর ছলনায় বিহারী এমনি করিয়া বারংবার পরাভূত হইয়াছে।

দমদমে চড়িভাতি করিতে গিয়া বিহারী বিনোদিনীর আর এক পরিচয় লাভ করিয়াছে।

নারীর এই উভয় পরিচয়ই সত্য। বিনোদিনীর সেবাতুরা কল্যাণী মূর্ত্তি যতখানি সত্য, মহেন্দ্রের প্রতি তাহার আকর্ষণ, তাহার প্রেম লাভের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষাও ঠিক ততখানি সত্য। এই উভয় প্রেরণা একই জীবনে কেমন করিয়া সত্য হইতে পারে, ইন্দ্রিয়-প্রাণের নিপীড়নে মনের ঐশ্বর্য্য ধীরে ধীরে কেমন করিয়া ম্লান হইয়া যায়, মনের ঐশ্বর্য্যই যে অমনি ইন্দ্রিয়-প্রাণ আশ্রয় করিয়া প্রকাশ লাভ করিতে চায় বিহারী তাহা জানিত না।

বিনোদিনীর এই পরিচয় লাভের পর হইতে বিহারী তাহাকে দেবীরূপে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সেই সঙ্গে বিনোদিনীর অন্য পরিচয়কে ভ্রমবোধে পরিত্যাগ করিয়াছে। বিহারীর জীবনবোধে নারীর এই উভয় প্রকাশ এক-যোগে সত্য হইতে পারে না। একটি সত্য হইলে আর একটিকে মিথ্যা হইতেই হইবে।

ইহার কয়েকদিন পরে বিহারী মহেন্দ্রের খোঁজে আসিয়া দেখিল প্রায়ান্ধকার গৃহে বসিয়া "আশা কাঁদিতেছে এবং বিনোদিনী তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহার চোখ মুছাইয়া দিতেছে।"

এই দৃশ্য দেখিয়া বিহারীর অন্তর বিনোদিনীর প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতায় বিগলিত হইয়াছে, আর ভাবিয়াছে, বিনোদিনীকে ভারী ভুল বুঝিয়াছিলাম। "সেবায় সান্ত্বনায়, নিঃস্বার্থ সখী প্রেমে সে মর্ত্ত্যবাসিনী দেবী।"

এই বোধ হইতে বিহারীর আশ্চর্য্য সারল্যের পরিচয় লাভ করা যায়। সংসার ও মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে সে এমনই অনভিজ্ঞ। বিনোদিনী তো বিহারীর ওই গুণে মুগ্ধ হইয়াছে, কী আশ্চর্য্য পবিত্র তাহার অন্তর, কী আশ্চর্য্য সারল্য, কী নির্লোভ ঔদাসীন্য।

বিনোদিনী যে তাহাকে ভালবাসে, তাহার প্রেম প্রত্যাশায় সে যে উন্মুখ, তাহা বিহারী বুঝিতে পারে নাই। শুধু শ্রদ্ধায় নারী হৃদয়ের ক্ষুধা মেটে না। বিহারীর শুধু শ্রদ্ধা লইয়া বিনোদিনী কী করিবে।

বিহারী বিনোদিনীর এই স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাহার জন্য তাহার সামাজিক সংস্কারবোধই একমাত্র দায়ী নয়। সামাজিক সংস্কার বলিতে বিধবা নারী সম্পর্কে তাহার মনোভাবের কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছি, কারণ এই সমাজ বিধবার প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে কেবল অস্বীকারই করে নাই, তাহার চিন্তামাত্রকে দমিত করিতে চাহিয়াছে। বিধবা রমণীর নিকট তাহার দাবী একমাত্র ত্যাগের ও বৈরাগ্যের। ইহার বিপরীত যে-কোন আচরণকে দলিত করিতে সমাজ সর্ব্ববিধ সুস্থ অসুস্থ পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। দীর্ঘদিনের প্রয়াস একদিন সংস্কাররূপে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়।

প্রাণ শক্তির প্রাচুর্য্য যেখানে অমন সংস্কারের পাষাণ ভারকেও উৎক্ষিপ্ত করিয়া বাহির হইয়া আসে সেখানে উহা জীবনে স্বাভাবিক ভাবে লীলায়িত হইবার সুযোগ না পাইয়া এবং কতকটা আতিরেক বশত নানা ভয়াবহ বিকৃত পরিণাম লাভ করে। উভয়ের চারিত্রিক ও ঘটনাগত নানা কারণও এই উপলব্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহাই মানবভাগ্য বা নিয়তি। উভয়ের জীবন আশ্রয় করিয়া সেই দুর্জ্ঞেয় নিয়তি লীলার স্বরূপ আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে।

মহেন্দ্রকে সংযত করিতে আসিয়া বিহারী মহেন্দ্রের নিকট হইতে মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়াছে। সে আঘাতে বিহারীর জীবন-গ্রন্থি পর্য্যন্ত শিথিল হইয়া গিয়াছে। কেবল মহেন্দ্র নয়, ইহার পর হইতে আশাও তাহাকে ভুল বুঝিতে সুরু করিয়াছে। যে অন্নপূর্ণাকে বিহারী মাতার অধিক শ্রদ্ধা করিত তিনি আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে তাহাকে ধিক্কার দিয়া তাহার গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন।

বিহারী সম্পর্কে রাজলক্ষ্মীর মনোভাব কোনদিন শ্রদ্ধান্বিত ছিল না। বিহারী সম্পর্কে তাহার মনোভাবের স্বরূপ উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "রাজলক্ষ্মী বিহারীকে ষ্টিমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোটের মত দেখিতেন ও সেই হিসাবে মমতাও করিতেন।"

তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন, "বিহারীকে রাজলক্ষ্মী এমনি মহেন্দ্রের

ছায়া বলিয়া জানিতেন যে, তাহার কথা তিনি বিশেষ কিছু ভাবিতেন না— সে তাহাদের বিনা-মূল্যের বিনা-যত্নের, বিনা-চিন্তার অনুগত লোক ছিল।" তাই রাজলক্ষ্মীর স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবার উল্লেখ আর নাই বা করিলাম। বিহারীর সহিত মহেন্দ্রের পারিবারিক সম্পর্ক যে আদৌ শ্রদ্ধার ছিল না তাহা আশার বিবাহ সম্পর্কিত একটিমাত্র ঘটনা হইতেই নিঃসংশয় হইতে পারা যায়।

বিহারীর জীবনে আজ সকল বন্ধন একে একে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, মহেন্দ্র-আশা-অন্নপূর্ণা-রাজলক্ষ্মী। এমনি করিয়া বিহারীর অন্তর শূন্য করিয়া একে একে সকলে যখন সরিয়া গিয়াছে তখন কি মুহূর্তের জন্যও বিনোদিনীর কথা তাহার মনে পড়ে নাই? হয়ত একমাত্র বিনোদিনীকে দিয়াই তাহার সকল অভাব পূর্ণ হইয়া যাইবে! হয়ত বিনোদিনী তাহাকে ভুল বুঝিবে না।

মহেন্দ্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিঃশেষে বিদায় লইতে আসিয়া সে মহেন্দ্র ও বিনোদিনীকে এমন একটা অবস্থায় দেখিল যাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। বিনোদিনীর সে পরিচয়ে বিহারী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। এই সেই বিনোদিনী যাহাকে এতকাল সে অন্তরে দেবীর আসনে বসাইয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আসিয়াছে! তাহার দেবীর আবরণ উদ্ভিন্ন হইয়া আজ তাহার ভিতরকার খড়মাটি বাহির হইয়া পড়িতে বিহারী ঘৃণায় তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল, বাক্যালাপ তো দূরের কথা বারেকের জন্য পশ্চাতেও ফিরিয়া তাকাইল না।

বিহারীর জীবনে আর কোথাও কোন বন্ধন রহিল না। কক্ষচ্যুত গ্রহের মত বিহারী তখন আপনার হৃদয়াবেগকে নিঃশেষ করিয়া দিবার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চতুর্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বিহারী চরিত্রের পরিণামের জন্য এতবড় আঘাতের প্রয়োজন ছিল। ইহার ভিতর দিয়া বিহারী আপনার সম্পর্কে যেমন সচেতন হইয়াছে, তেমনি অভাববোধের ভিতর দিয়া একে একে সকলেই বিহারীর প্রয়োজন তীব্রভাবে বোধ করিয়াছে।

বিনোদিনী এই বোধকে আরও গভীর করিয়া দিয়াছে। বিনোদিনী সাংসারিক প্রত্যেকটি অভাব অসুবিধাবোধের ভিতর দিয়া তাহাদের প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে বিহারী তাহাদের পরিবারে কতখানি নির্ভরস্থল ছিল। তাহার সামর্থ্য ও মহত্ত্ব সম্পর্কে বিনোদিনীই তাহাদের বারংবার সচেতন করিয়া দিয়াছে।

বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীকে দিয়া বিহারীকে পুনরায় সেই উপেক্ষিত গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছে। সকল সেবা ও যত্নের বিনিময়ে বিনোদিনী সেদিন বিহারীর নিকট হইতে শুধু ঘৃণা ও উপেক্ষা লাভ করিয়াছে। হায় বিনোদিনীর ভাগ্য এমনি বিড়ম্বিত! বিহারী যাহাদের কণামাত্র স্নেহ লাভের জন্য ব্যাকুল, যাহাদের কল্যাণ কামনায় তাহার চক্ষে ঘুম নাই, তাহারা তাহাকে বারবার অশ্রদ্ধা করিয়া দূরে সরাইয়া দিয়াছে, বঞ্চিত বলিয়া একপ্রকার করুণা করিয়াছে; অথচ যে তাহার অন্তরের সকল অভাব পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, যে তাহার জীবনকে সকল দিক দিয়া সার্থক করিয়া তুলিতে পারে, তাহার প্রতি তাহার ঘৃণা ও উপেক্ষার অন্ত নাই। তবু বিহারীকে ওই পরিবারের মধ্যে তাহার পূর্ব্ব মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া বিনোদিনীর অন্তর ভরিয়া গিয়াছে। তাহার শূন্য জীবনে ওইটুকুই শুধু সান্ত্বনা।

মহেন্দ্রের সহিত গৃহত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া বিনোদিনী তাহার পূর্ব্বরাত্রে এই আত্মবিস্মৃত মানুষটার অন্ধতা ঘুচাইয়া দিতে শেষবারের মত চেষ্টা করিয়াছে। কারণ বিনোদিনী জানে একমাত্র বিহারী তাহাকে নারী জীবনের এই চরম লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিতে পারে।

সেদিন রাত্রে বিহারীর সহিত বিনোদিনীর যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"বিহারী। সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলাম।

"বিনোদিনী। ভুল কর নাই ঠাকুর পো। কিন্তু বুঝিলেই যদি, শ্রদ্ধা করিলেই যদি, তবে সেইখানেই থামিলে কেন। আমাকে ভালবাসিতে তোমার কি বাধা ছিল। ** আমার পোড়া কপাল। তুমিও কিনা আশার ভালবাসায় মজিলে। *** তুমি যে আশাকে ভালবাস সেকথা তুমি যখন নিজে জানিতে না, তখনও আমি জানিতাম। আশার মধ্যে তোমরা কী দেখিতে পাইয়াছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। ভালোই বল আর মন্দই বল, তাহার আছে কী। বিধাতা কি পুরুষের দৃষ্টির সঙ্গে অন্তর দৃষ্টি কিছুই দেন নাই। তোমরা কী দেখিয়া, কতটুকু দেখিয়া ভোল। নির্ব্বোধ! অন্ধ!"

এই নিরতিশয় নির্ম্মম, অসংবৃত ও অসংকোচ অভিযোগের প্রয়োজন ছিল। সেই আঘাতে বিহারীর প্রসুপ্ত যৌবন প্রথম ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া প্রবল ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াছে।

ইহাই বিহারীর জীবনে প্রথম অধ্যাত্ম জাগরণ। জাগ্রত প্রাণের স্পর্শে মনুষ্য-সত্তা কেমন করিয়া মুহূর্ত্তে দ্বিধা হইয়া যায় এবং অন্তর্লোকটি গড়িয়া

উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমগ্র সত্তা কেমন অন্তর্মুখীন হইয়া কেবল উহার মধ্যে চরিতার্থতা অন্বেষণ করে নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে তাহারই পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"চারিদিকের সংসারকেই সে নিজের চেয়ে প্রাধান্য দিয়া আনন্দে ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন প্রবল আঘাতে তাহার চারিদিক যেন বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল ; প্রলয়ের অন্ধকারে অভ্রভেদী বেদনার গিরিশৃঙ্গে নিজেকে একলা লইয়া দাঁড়াইতে হইল।"

প্রাণের এই ক্ষুধার ভিতর দিয়া পরিণামে বিহারীর সমগ্র সত্তার অর্থাৎ তাহার ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের মধ্যে একদিন পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ দেহ ও আত্মায় মানুষকে অমন দ্বিধা করিয়া দিবার কোন উপায় নাই। আত্মার সকল লীলার অধিষ্ঠানভূমি দেহ। একের রহস্যের সহিত অন্যের রহস্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া আছে। তাই কোন একটিকে অস্বীকার করিলে জীবনই অস্বীকৃত হইয়া যায়।

এমনি করিয়া গভীর বেদনায় একবার বিশ্বের সমস্ত কিছু হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া আবার আনন্দে ওই সমস্ত কিছুকে পুনরায় ফিরিয়া লাভ করিতে হয়। প্রথমে ব্যক্তিত্ববোধের পূর্ণ বিকাশ, (বহির্বিশ্বের সহিত নিয়ত সংঘাতে এই বিকাশ ঘটে এবং সংঘাত জাগাইয়া রাখিতে হয় বলিয়া ইহা পরম বেদনার) তাহার পর বিশ্বের সহিত ধীর মিলনবোধের ভিতর দিয়া ওই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিলুপ্তি। এই বেদনাবোধ, দুঃসহ একাকীত্ব বোধের ভিতর দিয়া বিহারীর ব্যক্তিত্বের ধীর বিকাশ ঘটিয়া চলিবে।

বিশ্বের সহিত মিলন ঘটে অন্তশ্চেতনায়, ধ্যান আশ্রয় করিয়া। প্রাণ-সমুদ্র মথিত করিয়া বিহারীর চিত্ত-লোকে সেই সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী ভাসিয়া উঠিয়াছে। উহা একটা পরিণামে বিশ্ব-সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর সহিত মিলিয়া একাকার হইয়া যায়।

আজ বিহারী যাহা লাভ করিয়াছে তাহা ভাব মাত্র নয়, তাহা তাই বিহারীকে প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতেছে। তাহার প্রাণের ওই ক্ষুধায় সকল সংস্কার সকল নৈতিক জিজ্ঞাসা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। সকল নীতি ও সংস্কারের ঊর্দ্ধতর সত্যের আলোক নামিয়া আসিয়া আজ তাহার হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছে। বিনোদিনীর প্রতি তাহার প্রবল ঘৃণা ও বিদ্বেষকেও তাহার প্রাণ বারংবার ভুলাইয়া দিয়াছে।

"সেই পরমা সুন্দরী প্রহেলিকা তাহার ঘন কৃষ্ণ অনিমেষ দৃষ্টি লইয়া কৃষ্ণ পক্ষের অন্ধকারে বিহারীর সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। গ্রীষ্মরাত্রির উচ্ছ্বসিত দক্ষিণ বাতাস তাহারই ঘন নিশ্বাসের মতো বিহারীর গায়ে আসিয়া পড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে সেই পলকহীন চক্ষুর জ্বালাময়ী দীপ্তি ম্লান

হইয়া আসিতে লাগিল, সে তৃষ্ণা শুষ্ক খর দৃষ্টি অশ্রুজলে সিক্ত স্নিগ্ধ হইয়া গভীর ভাব রসে দেখিতে দেখিতে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল; মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই মূর্ত্তি বিহারীর পায়ের কাছে পড়িয়া তাহার দুই জানু প্রাণপণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরিল—তাহার পরে সে একটি অপরূপ মায়ালতার মতো নিমেষের মধ্যেই বিহারীকে বেষ্টন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়া সদ্যোবিকশিত সুগন্ধি পুষ্প-মঞ্জরী তুল্য একখানি চুম্বনোন্মুখ মুখ বিহারীর ওষ্ঠের নিকট আনিয়া উপনীত করিল।"

এমনি করিয়া অনল রেখায় অন্তরের মধ্যে ধ্যান-রূপ চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া যায়। অন্তর্লোকটি উদ্ঘাটিত হইয়া যাইতে বিহারীর নিকট সকল প্রয়াস নিরর্থক, মূল্যহীন হইয়া গিয়াছে। বিনোদিনীর প্রেমকে জীবনে নিঃসংশয়ে স্বীকার করিয়া লইতে বিহারীকে যে নৈতিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হইতে হয় নাই তাহা নহে, তবে অত্যল্প কালের মধ্যেই বিহারী উহা জয় করিয়া উঠিয়াছে। অনুরাগ-বিরাগ, আশা-নৈরাশ্য নীতি-দুর্নীতির দ্বন্দ্ব শেষে বিনোদিনী বিহারীর অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আজ বিনোদিনী তাহার হৃদয়-প্রতিমা, তাহার ধ্যানের অগম পারের আনন্দ দূতী, তাহার সর্ব্বার্থ সাধিকা।

অধ্যাত্ম প্রেরণা মানুষকে কর্ম্মবিমুখ করে না। কিন্তু কর্ম্মের সহিত যেখানে অন্তশ্চেতনার নিবিড় মিলন নাই, কর্ম্ম যেখানে অন্তরের আনন্দকেই বাহিরে মূর্ত্ত করিয়া তুলে না, সেখানে উহা পাষাণ ভার হইয়া উঠে।

বিহারী কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিতে চায় কিন্তু নিরানন্দময় কর্ম্মে মুহূর্ত্তে তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে। ঔপন্যাসিক বলিতেছেন, "কাজের কল্পনা বিহারীকে কখনও ইতিপূর্ব্বে এমন করিয়া ক্লিষ্ট করে নাই।" কারণ ইতিপূর্ব্বে তাহার আনন্দ ও কর্ম্মের মধ্যে এমন ব্যবধান গড়িয়া উঠে নাই।

অধ্যাত্ম-চেতনা বিকাশের প্রারম্ভে অন্তরের আনন্দে এবং বাহিরের কর্ম্মে এমনি ব্যবধান সৃষ্টি হইয়া যায়। তাহার পর উহা যতই বিকাশ লাভ করিতে থাকে, যতই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এই ব্যবধান সীমা ততই সংকীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে।—পরিণামে উভয়ের মধ্যে পূর্ণ যোগ স্থাপিত হয়। অন্তরের আনন্দে এবং বাহিরের কর্ম্মে তখন আর কোন পার্থক্য থাকে না। স্রষ্টার আনন্দের যোগে তাঁহার সৃষ্টির অন্তহীন কর্ম্মও আনন্দরূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। তাঁহার আনন্দের যোগ না থাকিলে এই অখণ্ড সৃষ্টি মুহূর্ত্তে আপনার ভারে আপনি গুঁড়াইয়া যাইত, তখন কোথায় থাকিত এই অন্তহীন আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের অনিঃশেষ প্লাবন।

পশ্চিমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রাণ-মনের সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষে ক্ষয় করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াও বিহারী যখন আপনার অন্তরগুহা বাসী সেই মহাপ্রাণীর মহৎ ক্ষুধার নিপীড়ন, তাহার নিয়ত আর্ত্তনাদ মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারিল না তখন দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। যেমন করিয়া হোক তাহাকে কাজ করিতেই হইবে নহিলে অন্তরের অতলস্পর্শ শূন্যতার মধ্যে সে যে তলাইয়া যাইবে।

কিন্তু তাহার আর কাজে মন বসে না। মন কেবলই ফিরিয়া ফিরিয়া অজ্ঞাতে বিনোদিনীর চিন্তা করিয়া চলে। তখনও পর্য্যন্ত বিহারী বিনোদিনীকে নিকটে লাভ করিবার কোন চিন্তা করিতে পারে নাই। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় এই প্রেমের ব্যাপারে বিহারীর জীবনে সকল অধ্যাত্ম সমস্যার নিরসন তখনও পর্য্যন্ত হয় নাই।

বিনোদিনী বিধবা বলিয়া তো সমস্যা নয়, বিনোদিনীর জন্য মহেন্দ্র তখন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিনোদিনীকে লইয়া উভয় বন্ধুর মধ্যে যে অত্যন্ত গ্লানিকর সংঘর্ষের সৃষ্টি হইবে তাহাতে এই প্রেমের সকল শ্রী মলিন হইয়া উঠিবে।

এমনি অনিশ্চয়তার ভিতর দিয়া নির্জ্জন গঙ্গাতীরে বিনোদিনীর ধ্যানে বিহারীর মন্থর দিনগুলি একটির পর একটি কাটিয়া যাইতে লাগিল। সেই সৌন্দর্য্যস্রোতে বিহারীর মানস-ভেলা দুলিয়া দুলিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে কোন এক অপূর্ব্বের কূলে।

এমনি করিয়া বিনোদিনীর ধ্যানে যখন বিহারীর একটির পর একটি দিন কাটিয়া চলিয়াছে, তখন অন্নপূর্ণা কোথা হইতে তাহার খোঁজ করিয়া তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্নপূর্ণার মুখে বিহারী সংবাদ পাইল যে বিনোদিনী-মহেন্দ্র পশ্চিমে নিরুদ্দিষ্ট হইয়া আছে।

বিহারীর চোখে মুহূর্ত্তে জল-স্থল-আকাশের সমস্ত রঙ বদলাইয়া গেল, তাহার কল্পনা ভাণ্ডারের সমস্ত সঞ্চিত রস মুহূর্ত্তে তিক্ত হইয়া গেল। এমনি তাহার ভাগ্য! সে যাহাকেই আশ্রয় করিতে চায় ভাগ্য বিড়ম্বনায় সেই কণ্টক হইয়া উঠিয়া একেবারে তাহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করে। আর্ত্তনাদে তাহাকে একদিন হৃদয় হইতে সরাইয়া ফেলিতে হয়। অন্তরের সেই রক্তক্ষরা আর্ত্তনাদে তাহার দিন রজনী উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া কোথায় হারাইয়া যায়।

পশ্চিমে নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিহারী শেষে এলাহাবাদে এক বাগানবাড়িতে উভয়ের সন্ধান পাইয়াছে। এমন সর্ব্বনাশের পরেও বিহারীর অনুসন্ধান তৎপর হইবার দুটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ মহেন্দ্রকে গৃহে

ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া, দ্বিতীয়তঃ বিনোদিনীর সেই ছলনাময়ী রহস্যময়ী মূর্ত্তিটিকে শেষবারের মত একবার দেখিয়া লওয়া। এই সত্যটিকে সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়া লইতে চায়, যে জীবনে বিশ্বাস করিবার মত, নির্ভর করিবার মত কিছু নাই। একটা সম্পূর্ণ মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া যদি জীবনে এমন নিবিড়বোধ গড়িয়া উঠিতে পারে, তবে জগৎ ও জীবনের এতবড় প্রকাশ, এমন সত্য, এমন প্রত্যক্ষ, এমন নিবিড়, কোন এক বৃহৎ মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া আছে !

এই নাস্তিক্য বোধ হইতে বিহারী রক্ষা পাইয়াছে। বিহারী বিনোদিনীর সত্য পরিচয় লাভ করিয়াছে। এই পরিচয় লাভে বিহারী যে কত বড় মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়াছে তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

মিথ্যা এক জীবনবোধ আশ্রয় করিয়া এ পর্য্যন্ত সে যে ভুল করিয়া আসিয়াছে তাহাকে অমন করিয়া শুধরাইয়া লইতে পারা যায় না। কারণ জীবনের সমস্ত অতীতকে ফিরিয়া লাভ করিবার কোন উপায় নাই। বিনোদিনী তাহার জীবনে এ কোন্ ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল। বিনোদিনীকে শাস্তি দিবার সে কত না চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পরিশেষে বিনোদিনী তাহার মস্তকে এ কোন্ শাস্তির বোঝা চাপাইয়া দিয়া গেল। সমস্ত জীবনভোর এ বোঝা সে কেমন করিয়া বহিয়া বেড়াইবে।

পরিশেষে বিহারীর সেই উক্তিটি উদ্ধৃত করিতেছি। "এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে, যাহা কিছু সহ্য করিয়াছি, তাহার সমস্ত আবর্ত্তন, সমস্ত আন্দোলন শান্ত করিতে না পারিলে জীবনের সমাপ্তির জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব না। যদি সমস্ত অতীতকাল অনুকূল হইত, তবে সংসারে একমাত্র তোমার দ্বারাই আমার জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারিত—এখন তোমা হইতে আমাকে বঞ্চিত হইতে হইবে। এখন আর সুখের জন্য চেষ্টা বৃথা, এখন কেবল আস্তে আস্তে সমস্ত ভাঙচুর সারিয়া লইতে হইবে।"

নৌকাডুবি

১

যে দুর্লভ মুহূর্তে প্রাণের কোন গভীর জিজ্ঞাসা, কোন আশ্চর্য্য উপলব্ধি বাহিরের উপাদান আশ্রয় করিয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে চায়, নৌকাডুবির মধ্যে সেই সমস্ত অভাবনীয় মুহূর্ত্তের একান্ত অভাব। সৃষ্টি প্রেরণা যদি অব্যাহত থাকে এবং প্রাণের ওই জিজ্ঞাসা অতন্দ্রিত হইয়া কোন একটা উত্তর লাভের জন্য যদি ব্যাকুল হইয়া উঠে, তবে কোন এক আকাঙ্ক্ষিত আবিষ্ট মুহূর্ত্তে উভয়ের মধ্যে মিলন সাধিত হইয়া ওই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা একটা সৃষ্টিরূপ লাভ করিয়া ধন্য হয়, কারণ সৃষ্টিই উত্তর অর্থাৎ সত্য।

ঔপন্যাসিকের জীবনে জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধির যে একটি ধারা পূর্ব্বাপর কোন-না-কোন ভাবে অব্যাহত থাকে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে নৌকাডুবির ভাব-প্রেরণাটি বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। জীবনের এই সাক্ষাৎকার কোথাও সার্থক রূপ লাভ করে, কোথাও ব্যর্থ হইয়া যায়।

কমলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, "স্বামী সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে-সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কি-না যাতে অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্‌কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে।"

কিন্তু (সাধারণ) হিন্দুনারীর সতীত্ব সংস্কারের গভীরতা ও শক্তি পরিমাপ করিতে যে মানস-বলের পরিচয় দান করা উচিত ছিল রবীন্দ্রনাথ তাহা দান করেন নাই। এই পরীক্ষায় কিছুদূর মাত্র অগ্রসর হইয়া তিনি আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ওই মন্থনে যে পরিমাণ বিষ উঠিবে সেই পরিমাণ বিষের জ্বালাকেও প্রশমিত করিবার মত অমৃত পরিণামে আহরণ করিতে পারিবেন কি না এই সংশয় তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতে তিনি এই সর্ব্বনাশা পরীক্ষা কার্য্য হইতে কতকটা সভয়ে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন।

জীবনে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি, পাপ-পুণ্য, সামর্থ্য-অসামর্থ্য, সকল নীতি ও সংস্কারবোধের ঊর্দ্ধে এক শাশ্বত ভাব-ভূমি আছে। স্রষ্টা এই সমস্ত কিছু আশ্রয় করিয়া এই সমস্ত কিছুর অতীত সেই চিরন্তন বোধের সহিত মানুষের পরিচয় করাইয়া দেন।

পরীক্ষা যেখানে শুধুমাত্র কৌতূহল, পরীক্ষার আকাঙ্ক্ষা যেখানে গভীরতর জীবনবোধ-প্রসূত নয় জীবনে তাহার ফল লাভ কিছু নাই। এই জাতীয়

মনোবৃত্তিকে তাই পরিহার করাই শ্রেয়, উহা জীবন সৃষ্টির জীবন ধর্ম্মের বিপরীত প্রেরণা।

আত্মীয়গৃহে অযত্ন-পালিতা, সর্ব্ব স্নেহ-সুখ-বঞ্চিতা বালিকা কমলার যখন বিবাহ হইয়াছে তখন তাহার বয়স চোদ্দ। এই বয়সে নারী আপন হৃদয়ের নিগূঢ় বেদনার স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না। কেবল তাহাই নয়, ওই বয়সে নারীর আপন সম্পর্কে সচেতনতা বোধ পর্য্যন্ত জাগে না। প্রারম্ভে কমলার এই বয়সের উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে, যে-হৃদয়ের সংস্কার শক্তি পরিমাপ করা হইয়াছে, তাহা এমনি একান্ত অপরিণত।

দ্বিতীয়তঃ রমেশের স্নেহ-কিরণ স্পর্শে কমলার হৃদয়-কলিকা তখন সবে একটি কি আধটি দল মেলিতে সুরু করিয়াছে কি করে নাই, এমন সময় রমেশের মোহ ভঙ্গ হইয়াছে। বিবাহের তিন মাসের মধ্যেই রমেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে কমলা তাহার স্ত্রী নহে।

সেই মুহূর্ত্ত হইতে রমেশ আপনার হৃদয়াবেগকে প্রাণপণ বলে নিরুদ্ধ করিয়াছে, অন্তরের সকল স্নেহ-মমতার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। ইতিমধ্যে বালিকার হৃদয় অনুরাগে যদি কিছুমাত্রও আরক্তিম হইয়া গিয়া থাকে তবে তাহা একান্ত বিবর্ণ। বক্ষস্থল পূর্ণ করিয়া আঘ্রাণ লইবার পূর্ব্বে সে প্রেম-মুকুল বাতাসে মৃদু সৌরভ ছড়াইয়া দিয়া কখন অলক্ষ্যে ঝরিয়া গিয়াছে।

এই জিজ্ঞাসাটিকে সুস্পষ্ট করিয়া উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। যদি রমেশের ভুল আরও কিছু পরে ভাঙ্গিত,, ইতিমধ্যে কমলার অপরিণত দেহ-মন রমেশের স্নেহ ধারায় ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিত এবং সেই প্রেম-পূজায় কমলা যদি তাহার সমগ্র সত্তাকে অর্ঘ্যস্বরূপে উৎসর্গ করিয়া দিত, তখন কমলা সতীত্বের সংস্কারবোধ দ্বারা নারী জীবনের অমন বন্ধনকেও কাটাইয়া উঠিতে, অমন গ্লানিকেও জয় করিয়া উঠিতে সমর্থ হইত কি-না এবং এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া নারী-হৃদয়ের চিরন্তন কোন রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত কি-না বলিতে পারি না। কারণ এ সংগ্রাম তাহার দেহ-প্রাণ-মনের বিরুদ্ধে। মানুষ ইন্দ্রিয়-প্রাণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মনের এবং তদাশ্রয়ী বিচিত্র সাধন ফলের ভিত্তি-ভূমির উপর দাঁড়াইয়া। সেক্ষেত্রে কমলার মনের আশ্রয় পর্য্যন্ত থাকিত না। মনেরও ঊর্দ্ধতর কোন তত্ত্বের সহায়তায়, উহাকেই নিয়ত ধ্যান করিয়া পরিণামে ওই স্বরূপতা লাভ করিয়া প্রাণ-মনের সকল বোধ জয় করিয়া উঠা সম্ভব হইলেও ওই দেহ-প্রাণ-মন দিয়া তাহার পক্ষে আর স্বামী-সেবা সম্ভব হইত না। কারণ এই পূজায় দেহ-প্রাণ-মনের উপচার প্রয়োজন।

ঔপন্যাসিকের জীবনে এই জাতীয় শক্তি সাক্ষাৎকার যদি থাকিত, যদি তিনি আপনার জীবনে ওই সত্যকে অপরোক্ষ করিতেন, এই রহস্যের আদি

অন্ত পরিণাম যদি তাঁহার ধ্যান-নেত্রে কোন এক অলৌকিক মুহূর্তে উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত, তাহা হইলে তিনি কমলাকে দারুণতম পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া ওই জাতীয় সংস্কারের শক্তি ও অশক্তির সীমা পরিমাপ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না।

২

বিবাহের পর প্রথম তিনমাস কমলা রমেশের নিকট হইতে যে আচরণ লাভ করিয়াছে, পরস্পরের আত্মসমর্পণের যে অপূর্ব্ব অনুভূতি, পরস্পরের জন্য যে ব্যাকুলতা, নানা তুচ্ছ বাক্য-বিনিময় ও নানা সাংসারিক কাজ কর্ম্মের ভিতর দিয়া পরস্পরের হৃদয়ের যে সুখ স্পর্শ লাভ, তাহার মধ্যে সেই প্রথম বেসুর বাজিল, যখন রমেশ তাহাকে এক প্রকার জোর করিয়া বোর্ডিং-এ রাখিয়া আসিল।—তাহার পাঠের প্রতি আত্যন্তিক মনোযোগের জন্য যে নিশ্চয়ই নয়, তাহা কমলা একপ্রকার অনুমান করিতে পারিয়াছিল, যখন দেখিল দীর্ঘ কয়েক মাস পরেও পূজার ছুটিতে রমেশ তাহাকে বোর্ডিংএ বন্দী করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। রমেশের এখনকার এই আচরণের সঙ্গে মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বের আচরণের পার্থক্য এত বেশি যে কমলা বালিকা হইলেও তাহা বোধ না করিয়া পারে নাই। তবে কোন কিছু সম্পর্কে গভীর করিয়া ভাবিবার মত বয়স তাহার নয়। রমেশের এই আচরণ বৈষম্যের সে তাই সম্ভাব্য অসম্ভাব্য কোন কারণই খুঁজিয়া দেখিবার চেষ্টা করে নাই, কেবল অভিমানে তাহার বুক ভরিয়া গিয়াছে।

স্কুল ছুটির পর দর্জিপাড়ার বাসায় রমেশ কমলাকে আনিয়া রাখিয়াছিল মাত্র এক রাত্রের জন্য। কোন কিছু সম্পর্কে তলাইয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার মত বয়স কমলার ছিল না। রমেশের মধ্যে পরিবর্ত্তন, তাহার আচরণ বৈসাদৃশ্য সে তাই প্রথম দিন কিছু মাত্র বোধ করিতে পারে নাই। রমেশকে এতদিন পরে নিকটে লাভ করিয়া তাহার মন সকল অভিমান ভুলিয়া আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আনন্দে বিভোর হইয়া সে আর সব কিছু ভুলিয়া গেল।

ইহার পরদিনই রমেশ কমলাকে লইয়া গন্তব্যস্থল ঠিক না করিয়াই কাশী যাত্রী এক স্টীমারে উঠিয়া বসিয়াছে। এই ব্যস্ততার মধ্যে কমলা আপনার মনকে যেমন, রমেশের মনকেও তেমনি বুঝিবার কোন অবকাশ পায় নাই।

তাহার আশৈশবের বদ্ধ, নিরানন্দময় জীবন, শোক-মলিন শ্বশুর-গৃহবাস, তাহার পর স্কুল বোর্ডিং-এর এই কয়েকটা মাসের বন্ধনময় জীবনের পর কমলা সেই প্রথম বুক ভরিয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে। স্বামীর আসঙ্গ লাভের নিবিড় সুখের আনন্দে কমলা মুক্ত বিহঙ্গিনীর মত চঞ্চল

হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর প্রেমে নিঃশেষে আত্ম সমর্পণ করিবার মধ্যে নারী জীবনের যে চরম সার্থকতা, এতদিন পরে কমলা আজ তাহাই লাভ করিতে চলিয়াছে।

স্টীমারে উঠিয়া কমলা সমস্ত দিন ধরিয়া জিনিসপত্র গুছাইয়াছে, রান্নার আয়োজন করিয়াছে। তাহার সকল কর্ম্মের মধ্যে গৃহিণীর কী আত্মপ্রত্যয়, কী পরিতৃপ্তি, কী নিপুণ তৎপরতা,—আর সমস্ত কিছু বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে একটি পরিব্যাপ্ত মাধুর্য্য। রমেশের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া ইতিমধ্যেই সে একটি সুধা জাল বুনিয়া চলিয়াছে। কমলার বালিকা হৃদয়ে কত সাধ, কত কল্পনা, ভাবী জীবনের আস্বাদটুকু সে এখন হইতে কিছু কিছু পাইতে সুরু করিয়াছে। হতভাগ্য, বিতাড়িত বালক উমেশের মাতৃ সম্বোধনে বালিকার অন্তরের সুপ্ত মাতৃত্ব সাড়া দিয়াছে। তাহার এই বধূ-জীবনের সেইখানেই তো পূর্ণতা।

সারাদিন এমনি করিয়া নানা কাজে অতিবাহিত হইয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে বিরাট বিশ্বে প্রসারিত মানুষের সমস্ত মন গুটাইয়া আসে কোথাও কিছু সমর্পণ করিয়া দিবার জন্য। কমলা তেমনি করিয়া তাহার সমস্ত ছড়াইয়া পড়া মনকে গুটাইয়া আনিয়া একটি কুসুম অর্ঘ্যের মত স্বামীর চরণে সমর্পণ করিয়া দিবার জন্য জনশূন্য অন্ধকারে ডেকের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রতীক্ষার পর প্রতীক্ষায় রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। নানা কথা, নানা গল্পও হইল (এই সমস্ত কথা ও গল্পের মধ্যে হৃদয়ের সেই সুরটুকু কমলা কোথাও শুনিতে পাইল না, যেমনটি সে শুনিতে পাইত তাহার শ্বশুর গৃহে), কিন্তু রমেশ তাহাকে নিকটে ডাকিয়া লইল না। রুদ্ধ অভিমানে কমলার বুক ভরিয়া গেল। অবশেষে কমলা একাকী শয্যায় সমস্ত দিনের ক্লান্ত দেহভার এলাইয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া কমলা তাহার বুকের মধ্যে এক বেদনাভার বোধ করিল। মাত্র কালও তো তাহার বুক ভরিয়া সমস্ত কিছু ছিল। তাহার আত্মীয় নাই, পরিজন নাই, শ্বশুর নাই, শাশুড়ী নাই, সঙ্গিনী নাই, তবু বহু দূর বিদেশযাত্রায় বারেকের জন্য সে নিঃসঙ্গ বোধ করে নাই। কিন্তু আজ সে অসহায় বোধ না করিয়া পারিল না। এই অপরিচিত বিরাট বিশ্বে কমলা আপনাকে সেই প্রথম বড় একা, বড় নিঃসহায়, বড় ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ করিল। একা রমেশকে আজ প্রথম তাহার নির্ভরস্থল বলিয়া বোধ হইল না।

কাল রমেশ তাহাকে শয্যায় ডাকিয়া লয় নাই—এই জন্যই যে কমলা আজ এমন একাকী বোধ করিয়াছে তাহা নহে, কমলা একাকী বোধ করিয়াছে অন্তরে শূন্যতা বোধের জন্য। তাহার প্রতি যে রমেশের আন্তরিকতা নাই, তাহা কমলা

একপ্রকার বোধ করিয়াছে। তাহার এই উপলব্ধিবঞ্চিত জীবন মুহূর্ত্তেই তাই ভার হইয়া উঠিয়াছে, তাই আজ তাহার সকল কর্ম্ম নিরানন্দময় বলিয়া মনে হয়। অন্তরের মধ্যে পূর্ণতার সেই আস্বাদ নাই বলিয়া, কমলা আজ প্রথম আত্মীয় ও পরিজনের অভাব বোধ করিয়াছে।

পুরুষের অন্তরে এই প্রেম আছে কি-না তাহা প্রেমের আলোকে নারী সহজেই বোধ করিতে পারে, এখানে কোন ফাঁকি চলে না। প্রেম নারীর সমগ্র সত্তা বলিয়া নারী প্রেম-বঞ্চনা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে পারে। এই প্রেমের আলোকে কমলা রমেশের হৃদয়ের গভীরতম তল পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেখানে কোন প্রেম নাই, সে হৃদয় নিকটের নহে বড়ো দূরের, সে হৃদয়ও ভয়ানক একলা।

রমেশের কুশল জিজ্ঞাসায় কমলা তাই সংকুচিত হইয়া নিরুত্তর রহিয়াছিল। পুরুষের প্রেমশূন্য সেবা যত্নে, সুখ বিধানে নারীর কোন প্রয়োজন নাই। নারীর জীবনে ইহার অধিক বঞ্চনা, ইহার অধিক লজ্জা, ইহার অধিক অসম্মান আর কি হইতে পারে?

রমেশের সান্নিধ্য আজ তাহার অন্তরের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে লজ্জার উদ্রেক করিয়াছে। নারী প্রেমে আপনাকে প্রস্ফুটিত কুসুমের মত সম্পূর্ণ অনাবৃত করিয়া দেয়—তাহার অন্তরের সকল মাধুর্য্যের সম্পদ। নারীর ইহা যে সর্ব্বাধিক লজ্জার, সর্ব্বাধিক পবিত্রতার ধন। একমাত্র পুরুষের প্রেম অবগুণ্ঠনের মত বিশ্বের কৌতূহলী দৃষ্টি হইতে নারীকে রক্ষা করে। আজ কমলা রমেশের কোন্ প্রেমে আপনাকে গোপন করিবে?

রমেশ কমলার শূন্য অন্তর পূর্ণ করিবার জন্য বাহিরে সহস্র সম্পদ ঢালিয়া দিলে কী হইবে; তাহাতে তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে,—তাহা কেবল ভার, কেবল বোঝা, কেবল লজ্জা। পুরুষের এই সোহাগে নারীর অন্তর ভরিয়া ধিক্কার জাগে।

কোন কিছু বোধ অন্তরে স্থায়ী হইয়া যাইবার মত বয়স কমলার নয়। আর ওই বয়সে প্রাণ-মনের ক্ষুধা কোন অবস্থাতেই একান্ত হইয়া উঠে না। তাই প্রতিঘাতের বেদনাও তত গভীর হয় না। সেদিন তাই নানা কাজে ও হাস্য-কৌতুকে কমলার হৃদয়-ভার লঘু হইয়া কখন যে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া গেল, তাহা কমলা বোধ করিতে পারিল না।

সাংসারিক কাজে কর্ম্মে দিনটা একরকম করিয়া কাটিয়া যায়, কিন্তু রাত্রি দুঃসহ হইয়া উঠে। সমস্ত দিবসের কর্ম্মের পর ধরিত্রী যেমন করিয়া রজনীর অঞ্চল মুখের উপর টানিয়া দিয়া শ্রান্ত দেহ ভার এলাইয়া দেয়, নিবিড় উপলব্ধির মধ্যে আপনাকে গুটাইয়া আনে, তেমনি মানুষও চায় দিবসের বিচিত্র কর্ম্ম-

শেষে প্রেমে আপনাকে একান্ত করিয়া অনুভব করিতে, সকল শ্রান্তি. সকল ক্লান্তি সমর্পণ করিয়া দিতে। হৃদয় সম্পর্কে মানুষ তখনই সচেতন হয়, তখনই মানুষ আপনার একান্ত পার্শ্বে হৃদয়ের জনকে খুঁজিয়া ফিরে।

রমেশের পূর্ব্ব রাত্রির আচরণকে কমলা কোন সাময়িক মানসিক অশান্তি-প্রসূত বলিয়া বোধ করিয়াছিল। তাই সে আজও রাত্রে শয্যায় যাইবার পূর্ব্বে রমেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও কমলা যখন দেখিল যে রমেশ আসিতেছে না, তখন সে তাহার খোঁজে জাহাজের ছাদে আসিয়া দেখিল, রমেশ চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া আছে। "চাঁদের আলো রমেশের মুখের উপর পড়িয়াছিল; সে মুখ যেন দূরে, বহু দূরে; কমলার সহিত তাহার সংস্রব নাই। ধ্যানমগ্ন রমেশ এবং এই সঙ্গিবিহীনা বালিকার মাঝখানে যেন জ্যোৎস্না উত্তরীয়ের দ্বারা আপাদ মস্তক আচ্ছন্ন একটি বিরাট রাত্রি ওষ্ঠাধরের উপর তর্জ্জনী রাখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে।"

রমেশের এই হৃদয় বোধ শূন্যতার, এই বিসদৃশ, অস্বাভাবিক আচরণের নানা কারণ থাকিতে পারে। হয়ত সে অন্য কোন নারীকে ভালোবাসে, তাহারই স্মৃতিভারে তাহার হৃদয় পীড়িত, হয়ত সে কোন কারণে তাহাকে ভালবাসিতে পারে নাই, কিংবা অন্য কিছু, কিন্তু কমলা ইহার কোনো কিছু চিন্তা করিয়া দেখে নাই। তাহার কারণ প্রথমতঃ হৃদয়ের এই সমস্ত জটিল বোধ লইয়া চিন্তা করিবার মত বয়স ও মানস গঠন কোনটাই তাহার ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, স্বামী সম্পর্কে এই জাতীয় চিন্তা করাকে কমলা তাহার আশৈশবের সংস্কার দিয়া অপরাধ বলিয়া বোধ করে। কমলা যাহাকে তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসে, তাহার প্রেম হইতে সে স্ত্রী হইয়া কেন বঞ্চিত হইবে কেবল ইহাই চিন্তা করিয়া অভিমানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মাত্র দুই দিনের মধ্যেই কমলা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এমনি করিয়া সে বাঁচিবে কেমন করিয়া।

একাকী বিছানায় শুইয়া তাহার আজ আর কিছুতেই ঘুম আসিল না। শয্যা ত্যাগ করিয়া আবার যখন সে ছাদে আসিয়াছে, তখন রমেশ তাহার শয্যায় সুপ্তিমগ্ন।

"দুই ধারের শস্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া যে সংকীর্ণ পথ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে সেদিকে চাহিয়া কমলা ভাবিতে লাগিল, এই পথ দিয়া কত মেয়ে জল লইয়া প্রত্যহ আপন ঘরে যায়। ঘর! ঘর বলিতেই তাহার প্রাণ যেন বুকের বাহিরে ছুটিয়া আসিতে চাহিল। একটুখানি মাত্র ঘর—সে ঘর কোথায়! শূন্য তীর ধু ধু করিতেছে—প্রকাণ্ড আকাশ দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত স্তব্ধ। অনাবশ্যক আকাশ—অনাবশ্যক পৃথিবী—ক্ষুদ্র বালিকার পক্ষে

এই অন্তহীন বিশালতা অপরিসীম অনাবশ্যক – কেবল তাহার একটি মাত্র ঘরের প্রয়োজন ছিল।"

কমলার এই নিঃসহায়তা, এই বিদ্রোহী মন তাহাকে যে খুব শীঘ্রই ভয়াবহ কোন পরিণামের দিকে টানিয়া লইয়া যাইত, তাহাতে কোন সংশয় নাই। কমলা যদি তাহার শ্বশুরগৃহে অনাদর বা উপেক্ষা লাভ করিত, তাহা হইলে সে এত সহজে, এত শীঘ্র এমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারিত না। তাহার শ্বশুরগৃহে থাকিবার কালে সে রমেশের নিকট হইতে যে নিঃসংকোচ নৈকট্য, যে স্নেহ ও প্রীতি, যে আচরণ লাভ করিয়াছে তাহার সহিত রমেশের বর্ত্তমান আচরণের পার্থক্য এত বেশি যে, কমলা তাহা গভীরভাবে অনুভব না করিয়া পারে নাই।

এমন সময় ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী আসিয়া কমলাকে আশ্রয় দিল। কমলার অসহায়তা-বোধ এত প্রত্যক্ষ অনুভবগম্য, তাহার সকল আচরণের মধ্যে তাহা এমনি পরিস্ফুট যে বালক উমেশ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী হয়ত দূর হইতে কমলার এই মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। বৃদ্ধ ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী সরল আমুদে সামাজিক মানুষ হইলেও বুদ্ধিমান যে তাহাতে কোন সংশয় নাই। রমেশের প্রত্যেকটি আচরণকে সে যে দূর হইতে মনে মনে বিচার করিয়া দেখিত, উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে কোন একটি রহস্য উদ্‌ঘাটনের যে চেষ্টা করিত, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। কমলাকে সংশয় করিবার কিছু নাই, তাহার সূক্ষ্ম গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়া যতদূর গভীরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিয়াছে সে অন্তরে কোনোও লেশমাত্র ছায়া নাই। বাধা যে একমাত্র রমেশের দিক হইতে, তাহা বৃদ্ধ নিঃসংশয়ে বুঝিয়া লইয়াছিল। রমেশের আচরণে অস্বাভাবিকতা ও বৈসাদৃশ্য থাকিলেও, গোপনতার কোন চেষ্টা ছিল না। রমেশ সম্পর্কে তাহার সংশয় তাই উত্তরোত্তর বাড়িয়া গিয়াছে।

এমনি করিয়া আরও কয়েকটি দিন কাটিয়া গেল। ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর স্নেহ ও সান্নিধ্য লাভ করিয়া কমলা আপনার সম্পর্কে আর কোন চিন্তা করিবার অবকাশ পাইল না। কমলা এখন কতকটা স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন প্রভাত হইতে শূন্যে, জলে, স্থলে, প্রকৃতি যেন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। বাতাস সুদীর্ঘ কালের নিয়ম সংযমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া অন্তরের বেদনাকে যেন হাহা রবে সর্বদিকে ব্যক্ত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই অসংযমের দিন কমলার অন্তরের সমস্ত সান্ত্বনা-বন্ধন, সমস্ত নিয়ম-সংযমকেও উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিল।

কমলা একদিকে তাহার হৃদয়াবেগকে আর যেমন সংবরণ করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, তাহারই ভারে সে প্রতিমুহূর্ত্তে যেমন দলিত পিষ্ট হইতেছিল, অন্যদিকে ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী রমেশ সম্পর্কে নিঃসংশয় হইয়াছে। উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে যে কোন একটা সর্বনাশ আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহা যে-কোন মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিয়া বিষধর সর্পের মত ফণা বিস্তার করিয়া উভয়কেই দংশন করিবে তাহা ত্রৈলোক্য রমেশের ওই পৃথক শয্যা রচনা হইতে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহা না হইলে অমন দুর্য্যোগময়ী ঝটিকাবিক্ষুব্ধ রজনীতে বালিকা কমলাকে একাকী পৃথক গৃহে পৃথক শয্যায় রাখিবার অমন নিষ্ঠুর চেষ্টার আর কী অর্থ হইতে পারে !

মনে মনে কমলাকে রক্ষা করিবার একটা সংকল্প ছিল বলিয়া ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী যে গাজিপুরে তাহাদের উভয়কে আমন্ত্রণ করিয়া আনে, এমন একটা অনুমানও করা যাইতে পারে।

ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর স্নেহচ্ছায়ায় নির্ভরতা ও আশ্রয় লাভ করিবার আশায় কমলা এমন কি রমেশের ইচ্ছাকেও মানিয়া লয় নাই। কমলা যে আপনার নিঃসঙ্গতা বোধকে আর কোন উপায়ে সহ্য করিতে পারিতেছিল না, এমনি করিয়া সে যে আপনার নিকট হইতে আপনি পলাইয়া বাঁচিতে চাহিয়াছিল, তাহা তাহার এই আচরণ হইতে স্পষ্টই অনুমান করিতে পারা যায়।

কমলা আজকাল রমেশকে কেমন যেন ভয় করিতে সুরু করিয়াছে। এমন একজন সম্পূর্ণ নিস্পৃহ মানুষকে নারী দীর্ঘ কাল সহ্য করিতে পারে না। রমেশ যে তাহাকে ভালবাসে না, ইহা কমলা আপনার হৃদয় দিয়া বোধ করিয়াছিল। অথচ, সে হৃদয়হীনও নয়, তাহার উপর সে অত্যাচারও করে না (বিকৃত হইলেও তাহা হৃদয়বোধেরই প্রকাশ)। উভয়ের মাঝখানে দূর গ্রহের ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া এক অন্তহীন প্রহেলিকার মত কে সে তাহার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ! সে কি তাহার স্বামী,—তাহার জন্ম জন্মান্তরের সাধনার ধন !

কমলার জন্য রমেশের এতটুকু স্নেহ ও মমতাও যে বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্ব-বিক্ষত হৃদয়ের রক্তিমা বিজড়িত হইয়া প্রকাশ পাইত, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। হৃদয়ের এই সংশয়, সংকোচ ও গ্লানি বিজড়িত থাকিবার জন্য রমেশের সকল স্নেহের দান আজকাল তাহার অন্তরে কেমন যেন অশুচি বোধ জাগ্রত করে। রমেশের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিক্ষত অন্তর কমলার অবচেতন মনের উপর পড়িয়া যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে ইহাই স্বাভাবিক। অথচ কমলা ইহার কোন কারণ খুঁজিয়া পায় না। ইহা সে শুধু বোধ করিয়াছে, কেমন করিয়া কাহার অভিশাপে উভয়ের সম্পর্ক ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া পড়িতেছে ! তাহার সতী প্রেমের কেমন যেন অবমাননা। একটা রাহুর ছায়া তাহার সীমন্তের উজ্জ্বল

সিন্দুর বিন্দুর উপর পড়িয়া তাহাকে ধীরে ধীরে কেমন ম্লান করিয়া ফেলিতেছে। ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর স্নেহচ্ছায়ায় তাই সে অমন করিয়া আত্মগোপন করিতে চাহিয়াছে। একা রমেশকে তাহার কেমন যেন ভয় হয়, অকারণ এক গ্লানি বোধ জাগে।

গাজিপুরে ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর গৃহে কমলাকে লইয়া আনিবার প্রয়োজন নানা দিক হইতে ছিল। ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী এবং কমলার দিক হইতে যে প্রয়োজন ছিল তাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ঔপন্যাসিকের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল এবং তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

কমলা তাহার বিবাহের পর তিনমাস শ্বশুর গৃহে থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই শোকসন্তপ্ত পরিবারের মাঝখানে থাকিয়া তাহার নবস্ফুট যৌবন যতটা বিকশিত হইয়া উঠা সম্ভব, ততটা বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার বিবাহ-পূর্ব্ব জীবনের কথা আর নাই বা উল্লেখ করিলাম। মাতুলালয়ে অনাদরে, অতিরিক্ত শ্রমে তাহার যৌবন সমাগম একান্ত কুণ্ঠিত হইয়াছিল। তবু কমলা জীবনের যতটুকু আস্বাদ পাইয়াছে, তাহা তাহার ওই শ্বশুর গৃহবাসের মাত্র তিন মাসের মধ্যে। কমলার প্রাণ-মনের শক্তির প্রাচুর্য্য ছিল অনেকখানি, তাই অনুকূল এতটুকু পরিবেশ লাভ করিবামাত্রই তাহার প্রাণ-মন অত্যন্ত দ্রুত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। মানসিক এই বিকাশে আকস্মিক একটা বাধা আসিয়াছিল তাহার বোর্ডিং-এ বাসের জন্য। তাহার শ্বশুর গৃহবাসের সামান্য স্মৃতি, তাহার ওই প্রষুপ্ত যৌবন যে ওই অবস্থাকে কতকটা সহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

তাহার পর স্টীমার যাত্রার প্রায় একসপ্তাহ কাল সে শুধু রমেশের হৃদয় দ্বারে বারংবার আঘাত করিয়া ফিরিয়াছে, কিন্তু দ্বার খোলা পায় নাই। কমলা অভিমান করিয়াছে, আপন ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে, আপনার হৃদয়কে আপনি নানা ভাবে নিপীড়িত করিয়াছে। স্টীমার যাত্রার ওই কয়েকটা দিনে তাহার হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য বিকাশ লাভ তো করে নাই, বরং বারংবার প্রতিহত হইয়া কতকটা নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই জীবনটাই যেন সত্য, তাহার স্বামীগৃহ বাসের সেই কয়েকটা মাসের স্মৃতিই যেন মিথ্যা।

এমনি করিয়া আরও কিছু দিন অতিবাহিত হইয়া গেলে এবং রমেশের মানসিক অবস্থা একই রূপ থাকিলে কমলা হয়ত ইহাকেই স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্ক বলিয়া মানিয়া লইত। এমনিভাবে কমলা হয়ত তাহার কুণ্ঠিত জীবন লইয়া ধীরে ধীরে এক শূন্যতার মধ্যে তলাইয়া যাইত।

স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃত সম্বন্ধটা যে কী, প্রেমের সে সম্পর্কে স্ত্রীর জীবন-যৌবন তাহার ইহকাল পরকাল কেমন করিয়া সফল হইয়া উঠে, তাহা এই পরিবেশের মধ্যে না পড়িলে কমলা এত দ্রুত গভীর করিয়া অনুভব করিতে পারিত না।

হরিভাবিনীর নারীসুলভ নানা কৌতূহলী প্রশ্নে কমলা সেই প্রথম আপনার সম্পর্কে বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছে। রমেশ তাহার স্বামী এবং তাহার বিবাহ ব্যাপারও দীর্ঘ ছয় সাত মাসের ঘটনা, অথচ রমেশ সম্পর্কে তাহার জ্ঞান যে কত অল্প, হরিভাবিনীর প্রশ্নে তাহা সে বোধ না করিয়া পারে নাই। স্বামী সম্পর্কে স্ত্রীর অজ্ঞতা অত্যন্ত অসঙ্গত, লোক-সমাজেও লজ্জার বিষয়। এইদিক হইতে সে কোনদিন তাহাদের উভয়ের সম্পর্ককে বিচার করিয়া দেখে নাই। যাহার সহিত তাহার হৃদয়ের নিকটতম সম্পর্ক তাহার সম্পর্কে এই অজ্ঞানতা অন্যের নিকট অদ্ভুত বলিয়া তো বোধ হইবেই, স্বয়ং কমলাও ইহাতে লজ্জা বোধ না করিয়া পারে নাই।

ইহার পর শৈলজা তাহার স্বামী সম্পর্কে, তাহার সংসার সম্পর্কে, উভয়ের অনুরাগ সম্পর্কে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কত কথা কমলাকে বলিয়াছে। তাহা হৃদয়ের উত্তাপে উত্তপ্ত, ভাবে রঙ্গিন, মধুর কল্পনা ও স্বপ্ন বিজড়িত। কতদিন গল্প করিতে করিতে বেলা পড়িয়া আসে। সকল কর্মের মাঝখানে শৈলজার একটি হৃদয় যে নিয়ত কোথায় পড়িয়া থাকে কাহার পদশব্দ শুনিবার আশায়, তাহা কমলা স্পষ্টই বোধ করিতে পারে। কিন্তু তাহার জীবনে তো এমন কোন অনুভূতির স্মৃতি নাই। সুদীর্ঘ কয়েক মাস তাহারা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, পরস্পরকে নিকটে লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের উভয়ের মধ্যে এমন কোন ভাবময় সূক্ষ্ম আর কোন সত্তা তো গড়িয়া উঠে নাই।

শৈলজার এই বোধের জগৎ কমলার সম্পূর্ণ অনুভূতি অগম্য নয়। শ্বশুর গৃহে থাকিতে ইহার যেন একটা আভাস তাহার অন্তরের মধ্যে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল, এমনি একটা রাগিনী যেন শ্রুত হইতেছিল। স্কুল হইতে ফিরিয়া এ পর্যন্ত এই কয়েকদিনের মধ্যে এমন কোন সুর, এমন কোন ছবি ছিল না যে, সময় বিশেষে ফুটিয়া উঠিতে চায় নাই, কিন্তু সেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন সুর, সেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন ছবি কোন একটা পূর্ণ পরিণাম লাভ করিতে পারে নাই। ইহার মধ্যে কোন সমগ্রতা নাই, ধারাবাহিকতা নাই, সমস্ত কিছু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, ভাঙাচোরা।—অবসান লাভের মাঝখানে কোথায় যেন প্রতিহত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া আবার ছড়াইয়া পড়ে।

কমলা মনকে গুছাইয়া লইয়া সমস্ত দেহ-প্রাণ-মনকে পূজার উপচারের মত সাজাইয়া মাঝে মাঝে সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু রমেশ যে গ্রহণ

করিতে পারে না, (প্রেমের অর্ঘ্যকে একমাত্র যে প্রেম দিয়া গ্রহণ করিতে হয়, রমেশের অন্তরে সে প্রেম ছিল না) তাই তাহা বারংবার অমন স্খলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। "কাছে পাইলেই যে পাওয়া হইল, ডাকিয়া আসিলেই যে আসা হইল, তাহা নহে—আসল জিনিসটি যে কী তাহা গাজিপুরে আসার পরে কমলা অতি অল্প দিনেই যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে।" কমলা নারী হইয়া সেই আসল জিনিসটির অভাব বোধ না করিয়া পারে নাই।

ইহার পর দীর্ঘ দিন, প্রায় একমাস রমেশের অনুপস্থিতির কালে কমলার দ্রুত মানসিক পরিণতি ঘটিয়াছে। উষার দিবসে পরিণাম লাভের মত, কমলা যেন অত্যন্ত দ্রুত কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণকে নিঃশেষে অতিক্রম করিয়া নারীর পূর্ণ মহিমা লাভ করিয়াছে।

ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী গঙ্গার ধারে একটি বাংলোর ব্যবস্থা করিয়াছেন। রমেশ ও কমলা দূরে বিদেশে সেইখানেই তাহাদের সংসার রচনা করিবে। কমলা তাহারই স্বপ্নে বিভোর। রমেশের মনও যেন একটু অনুকূল হইয়া উঠিয়াছে। বাংলোখানিকে বাসোপযোগী করিয়া তুলিতে আরও কয়েকদিন সময় লাগিবে। মিলন উৎসুক রমেশ এদিকের সমস্ত আয়োজন করিয়া এলাহাবাদ চলিয়া গেল তাহার আইন ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যবস্থা করিতে। এলাহাবাদ হইতে রমেশের ফিরিতে সপ্তাহ কাল লাগিবে। আসিবার দিন স্থির করিয়া রমেশ পূর্ব্বে পত্রে কমলাকে জানাইবে। সেইদিন কমলা যেন তাহার নূতন পাতা সংসারের মাঝখানে কেবল তাহারই জন্য প্রতীক্ষায় থাকে।

কমলার আজকাল দেহ-প্রাণ-মন ভরিয়া প্রিয়-মিলনের রাগিণী বাজে। কতদিন পরে সে তাহার স্বামীকে তাহার বুকের মাঝে একান্তভাবে লাভ করিবে। আনন্দে কমলার সমস্ত দেহ-ভার, সকল কর্ম্ম-ভার লঘু হইয়া গেল। উজ্জ্বল আনন্দমুখর দিনগুলি সোনার থালায় ভরিয়া একটির পর একটি দ্রুত কাটিয়া যাইতে লাগিল! রমেশের ফিরিতে তখনও প্রায় তিন চারদিন বাকি। এমন সময়, কমলা আকস্মিক ভাবে রমেশের হেমনলিনীর নিকট লিখিত পত্র কুড়াইয়া পাইল। তাহাতে কমলার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া ছিল।

কমলার সংসার রচনার সব সাধ মুহূর্ত্তেই ফুরাইয়া গেল। তাহাকে জোর করিয়া স্কুলে রাখিবার চেষ্টা, স্টীমারে তাহার সহিত রমেশের সকল আচরণের অর্থ এখন কমলা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল।

কমলা এই মুহূর্ত্তে যে কী করিতে পারে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। এই পরিচয়ে তাহার বোধশক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গেছে। চীৎকার করিয়া কাঁদিবারও তাহার সুযোগ নাই। কাহাকেও এই কথা খুলিয়া বলিয়া সে

যে আপনার হৃদয়ের ভার লঘু করিয়া লইবে, তাহারও উপায় নাই। নারীর জীবনে এমন বিড়ম্বনাও ঘটে! সে যাহাকে স্বামী বলিয়া জানিয়া, তাহার প্রেম লাভের জন্য নিয়ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, যাহার সকল সুখ দুঃখকে সে আপনার বুক পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য নিয়ত অতন্দ্রিত হইয়া কাছে কাছে ফিরিয়াছে, যাহার কল্যাণ-চিন্তায় তাহার অন্তর সদাজাগ্রত, সে তাহার স্বামী নহে! নারীর জীবনে ইহার অধিক লজ্জা আর কি থাকিতে পারে!

এই নিদারুণ আঘাত সামলাইয়া উঠিতে কমলার আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে রমেশের নিকট হইতে চিঠি আসিল। রমেশ কাল সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিতেছে। মাঝখানে মাত্র একটি দিন। তাহার পর! ভাবিতেই কমলা শিহরিয়া উঠিয়াছে! রমেশ, রমেশের গৃহ ও সংসার তাহার মনের মধ্যে একটা বিভীষিকার মত ভাসিয়া উঠিল। ইহার পর তাহার জন্ম, মৃত্যু একাকার হইয়া যাইবে, কোন্ শূন্যতার মধ্যে সে যে চিরকালের জন্য উৎক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে, কে জানে?

কমলা একপ্রকার অনৈসর্গিক ভয়ে ভীত হইয়া যেন প্রেত দৃষ্টের ন্যায় একাকী গোপনে রমেশের গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। সম্পূর্ণ অপরিচিত, বিপুল সংসারের মাঝখানে আসিয়া সে যে কোথায় যাইবে, তখন তাহার কোন ভাবনাই তাহার মনে উদিত হয় নাই। তাহার অন্তরের গ্লানি ও লজ্জা তাহাকে কেবল রমেশের গৃহ ও তাহার পরিচিত জগৎ হইতে ঠেলিয়া ঠেলিয়া ক্রমাগত দূরে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল। একপ্রকার ত্রাসগ্রস্ত হইয়া কমলা কেবল সম্মুখ পথ ধরিয়া চলিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত আমরা কমলার যে পরিচয় পাইলাম, তাহাতে তাহার অন্তরে প্রেম, যাহার মূল দেহে, যাহার শাখা-প্রশাখা মানসলোক ছাড়াইয়া আরও ঊর্দ্ধে অরূপ ফুলের সৌন্দর্য বিস্তার করে সেই কাম-শোধিত প্রেমের প্রকাশ তো দূরের কথা, তাহার তৃষাতপ্ত হৃদয়ের সঞ্চিত অভিমান তাহার চিত্তকে একপ্রকার বিমুখ করিয়া তুলিয়াছিল।

যে তরণী বাহিয়া কমলা ধ্যানের নিত্য মিলন-লোকে পৌঁছাইয়াছে, তাহা স্বামীর 'নাম'-তরণী। কমলা রমেশের পত্রে তাহার স্বামীর নামটুকু মাত্র জানিতে পারিয়াছিল। এই 'নাম' মাত্র সার করিয়া কমলা অকূল সংসার সমুদ্রে তাহার জীবন-তরী ভাসাইয়া দিয়াছে। তবু এই 'নাম'-টুকুরও প্রয়োজন ছিল। নাম-রূপও একপ্রকার রূপ। নারীর এই বিশিষ্ট সাধনাও তাই সম্পূর্ণ অরূপ বা নৈর্ব্যক্তিক নয়।

"জীবনের এই শেষ মুহূর্ত্তে জীবনেশ্বরকে স্মরণ করিবার সম্বল তাহার কিছুমাত্র নাই। সেদিকে একেবারে অন্ধকার—কোন মূর্ত্তি নাই, কোন

বাক্য নাই, কোন চিহ্ন নাই। নলিনাক্ষ এই নামটি তাহার মনের মধ্যে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল, এই নামটি তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন ভরিয়া তুলিল, এই নামটি যেন এক বস্তুহীন দেহ লইয়া তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল—তাহার চোখ দিয়া অবিশ্রাম জলধারা বহিয়া তাহার হৃদয়কে স্নিগ্ধ করিয়া দিল—মনে হইল, তাহার অসহ্য দুঃখের দাহ যেন জুড়াইয়া গেল। কমলার অন্তঃকরণ বলিতে লাগিল, এ তো শূন্যতা নয়, এ তো অন্ধকার নয়। আমি দেখিতেছি, সে যে আছে, সে আমারই আছে।"

এই নাম-ধ্যান যে কী, কেমন করিয়া ওই 'নাম' রূপময় হইয়া উঠে, অধ্যাত্মবাদীরা তাহা হয়ত বলিতে পারেন, কারণ নাম-জপ তাঁহাদেরও সাধনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। নিয়ত ধ্যান এবং দর্শন লাভের নিত্য ব্যাকুলতা যে পরিশেষে নলিনাক্ষকে তাহার সম্মুখে আকর্ষণ করিয়া আনে নাই, তাহা নিশ্চয় করিয়া কে বলিতে পারে।

নবীন কালীর গৃহে কমলা তাহার ধ্যানের রূপটিকে কত দীর্ঘ দিনের অধীর উৎসুক প্রতীক্ষার পর সেই প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়াছে। আকাঙ্ক্ষার গভীরতা, তাহার অন্তরের সেই অতি অসহনীয় ব্যাকুলতার কতকটা আভাসমাত্র লাভ করিতে পারা যায় কমলার ওই ভাব-বিক্রিয়ার মধ্যে। ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনকে যতদূর সজাগ করিয়া তুলিতে পারা যায় কমলা সমগ্র সত্তাকে ততদূর উন্মুখ করিয়া তুলিয়া নলিনাক্ষকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। রূপের চূড়ান্ত ধ্যান তন্ময়তায় মনুষ্য সত্তা না-কি ধ্যান স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। কমলা বোধ করিতে লাগিল, কে যেন ধ্যানের অসহনীয় উত্তাপে ধীরে ধীরে তাহার সমগ্র সত্তাকে বিগলিত করিয়া নলিনাক্ষের রূপের আধারে ঢালিয়া দিতেছে। কমলার ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন আত্মা এই মুহূর্তে নলিনাক্ষময়।

"অন্ধকারের ভিতর হইতে বেপথুমতী কমলা নলিনাক্ষের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চাহিতে চাহিতে তাহার দুই চক্ষে বারবার জল আসিতে লাপিল। তাড়াতাড়ি জল মুছিয়া ফেলিয়া সে তাহার. সমগ্র দৃষ্টির দ্বারা নলিনাক্ষকে যেন আপনার অন্তঃকরণের গভীরতম অভ্যন্তর দেশে আকর্ষণ করিয়া লইল। ওই যে উন্নত ললাটে স্তব্ধ মুখখানির উপর দীপালোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, ওই মুখ যতই কমলার অন্তরের মধ্যে মুদ্রিত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই তাহার সমস্ত শরীর যেন ক্রমে অবশ হইয়া চারিদিকের আকাশের সহিত মিলিয়া যাইতে লাগিল, বিশ্ব জগতের মধ্যে আর কিছুই রহিল না, কেবল ওই আলোকিত মুখখানি রহিল—যাহার সম্মুখে রহিল সেও ওই মুখের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গেল।"

কমলার উপলব্ধির যে ধীর পরিণামের উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন,

তাহার সহিত যোগের উপলব্ধির কোন বিশেষ নাই। প্রতীকত্ব ছাড়া উভয়ের প্রক্রিয়া ও উপলব্ধির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। অন্তরের মধ্যে এই যে প্রাপ্তি, তাহা সতীত্ব সাধনার যেমন, তেমনি সকল অধ্যাত্ম সাধনার ফললাভ। বাহিরের কোন ক্ষতি, কোন শোক-দুঃখ লাঞ্ছনা ওই আনন্দ-লোকটিকে আর লেশমাত্র বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণ সাধনভূত সামগ্রী বলিয়া ইহার স্বরূপ বিশ্লেষণ অসম্ভব। কারণ আমাদের মন ও বুদ্ধি বস্তু সাপেক্ষ, ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী, অন্যদিকে এই জাতীয় সাধনার লক্ষ্য হইল মনকে বস্তু নিরপেক্ষ, ইন্দ্রিয়াশ্রয় মুক্ত এক আনন্দ-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া। ইহা আপনার মধ্যে আপনি নিত্য সঞ্জীবিত, অপরিমেয়।

কমলার সাধনার ফল লাভ যে কী, তাহা তাহার এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

"ভগবান আমার সেই পূজার ফল দিয়াছেন—এখন আমার স্বামী আমার মনের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন—তিনি আমাকে গ্রহণ নাই করিলেন, কিন্তু আমি তাহাকে এখন পাইয়াছি।"

কমলার মধ্যে এই উপলব্ধি এত প্রত্যক্ষ, এমনি সাকারবদ্ধ যে হেমনলিনীর মত নারীও তাহা বোধ না করিয়া পারে নাই। তাহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে, "অমনি করিয়া পাওয়াই পাওয়া। আর সমস্ত পাওয়া লোভের পাওয়া—তাই নষ্ট হইয়া যায়!" সাধনার ফল যেখানে সমগ্র জীবন আশ্রয় করিয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠে, সেখানে তাহাকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় থাকে না।

ব্রাহ্ম সমাজে বক্তৃতার ভিতর দিয়া নলিনাক্ষ এই আধ্যাত্মিক সত্যটিকেই আর একভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কমলাকে হারাইয়া নলিনাক্ষও যে এক শূন্যতার বেদনা জয় করিয়া উঠিয়াছে। সেই বেদনা একান্ত হইয়া তাহাকে এমন দুর্লভ জীবনের সর্ব্বাধিক উন্নত প্রেরণা হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয় নাই। যে জীবনবোধ, যে বিশিষ্ট সাধনা মানুষকে সকল বেদনা জয় করিয়া উঠিতে সহায়তা করে, নলিনাক্ষ বক্তৃতার ভিতর দিয়া তাহার কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছিল।

"সংসারে যে ব্যক্তি কিছু হারায় নাই, সে কিছু পায় নাই। অমনি যাহা আমাদের হাতে আসে, তাহাকে আমরা সম্পূর্ণ পাই না, ত্যাগের দ্বারা আমরা যখন তাহাকে পাই, তখনই যথার্থ তাহা আমাদের অন্তরের ধন হইয়া উঠে। যাহা কিছু আমাদের প্রকৃত সম্পদ, তাহা সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেই যে ব্যক্তি ইহা হারাইয়া ফেলে, সে দুর্ভাগা। বরঞ্চ, তাহাকে ত্যাগ করিয়াই তাহাকে বেশি করিয়া পাইবার ক্ষমতা মানব চিত্তের আছে। যাহা

আমার যায়, তাহার সম্বন্ধে যদি আমি নত হইয়া করজোড়ে বলিতে পারি, "আমি দিলাম, আমার ত্যাগের দান, আমার দুঃখের দান, আমার অশ্রুর দান" তবে ক্ষুদ্র বৃহৎ হইয়া উঠে, অনিত্য নিত্য হয় এবং যাহা আমাদের ব্যবহারের উপকরণমাত্র ছিল, তাহা পূজার উপকরণ হইয়া আমাদের অন্তঃকরণের দেব মন্দিরের রত্ন ভাণ্ডারে চির সঞ্চিত হইয়া থাকে।"

হেমনলিনীর সহিত নলিনাক্ষের বিবাহ হইবে, ইহা স্থির জানিয়াই কমলা হেমনলিনীকে এমন কথা বলিতে পারিয়াছে। "আমরা দুই বোনে মিলিয়া সংসার চালাইব, তুমি তাঁহাকে সুখে রাখিবে, আমি তোমাদের সেবা করিব।" অন্তরে যে প্রেম থাকিলে নারীর পক্ষে এই উক্তিও সম্ভব, আমাদিগকে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে।

কমলার গাজিপুর ত্যাগের পর হইতে ধারাবাহিক ভাবে আর কোন ঘটনার উল্লেখ করি নাই। ইতিপূর্বে ঘটনার সহিত তাহার চরিত্র বিকাশের নিবিড় যোগ ছিল বলিয়া, চরিত্র বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্যভাবে কাহিনী বিশ্লেষণ করিতে হইয়াছে।

নবীন কালীর গৃহে কমলার অবস্থান, মিরাটযাত্রী ট্রেন হইতে পলাইয়া বালক উমেশের সহিত কমলার ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর গৃহে আগমন, শৈলজার নিকট তাহার গৃহত্যাগের কারণ ব্যক্ত করা, সেই সঙ্গে ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীরও কমলার সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হওয়া, ক্ষেমংকরীর স্নেহ ও প্রশংসা লাভ করিবার জন্য ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর কমলাকে ক্ষেমংকরীর গৃহে রাখিবার ব্যবস্থা করা, (কারণ, কমলার সমুদয় বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিয়া কমলাকে বধূরূপে গ্রহণ করিবার অনুরোধ করিতে গেলে যে নানা জটিলতা, সংশয় ও অবিশ্বাস গড়িয়া উঠিবে, তাহা সংসার-অভিজ্ঞ বৃদ্ধ ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী ভালো রূপেই বুঝিয়াছিলেন। কমলাকে তাহার আচরণের ভিতর দিয়া চরিত্র মাধুর্য্যের পরিচয় দিতে হইবে, আর কোন প্রতিশ্রুতি, আর কোন অঙ্গীকার এক্ষেত্রে তাহাকে কিছুমাত্র সহায়তা করিবে না। কমলা যদি তাহার আচরণের ভিতর দিয়া তাহার স্বামীর বিশেষ করিয়া শাশুড়ীর হৃদয় জয় করিতে পারে, তাহা হইলে কমলার পরিচয় প্রকাশের পর কিছুমাত্র সংশয় ও দ্বিধার মেঘ যদি অন্তরের মধ্যে ভাসিয়া উঠে, তাহা ওই প্রেমে, ওই মায়ায় দূর হইয়া যাইবে। প্রেম যে দিব্য-দৃষ্টি দেয় সেই দিব্য-দৃষ্টি দিয়াই তাহারা তখন কমলার নিষ্পাপ হৃদয়টিকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।) ইত্যাদি যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার সহিত কমলার চরিত্র বিকাশের কোন সম্পর্ক নাই, তাই তাহার সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত কোন পরিচয় দান নিষ্প্রয়োজন। তাহা

ছাড়া, যেখানে চরিত্র বিকাশের সহিত ঘটনার কোন সম্পর্ক নাই, সেখানে ঘটনা কেবল নিরর্থক ভার মাত্র।

পরিশেষে আর একটি মাত্র বিষয় উল্লেখ করিয়া আমি কমলা প্রসঙ্গ শেষ করিব।

কমলার সাধনা ও ফল লাভের পরিচয় দানের পরও রবীন্দ্রনাথ যে ওই সাধনার সামর্থ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই, তাহাও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। তিনি তাঁহার এই সংশয়টিকে অত্যন্ত কৌশলে একটি ইঙ্গিতমাত্র রূপে প্রকাশ করিয়া নীরব রহিয়া গিয়াছেন। আমি সেই অংশটি কেবল পরিশেষে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কমলার নিকট হইতে বিদায় লইতে গিয়া হেমনলিনী কমলাকে বলিয়াছে, "কিন্তু তোমার পরিচয় হইতে বঞ্চিত করিবে কী বলিয়া। তোমার ভালোমন্দ সবই কি তাঁহার কাছে নিবেদন করিবে না? তাঁর কাছে কি কিছু লুকানো চলিবে?"

ঔপন্যাসিক লিখিতেছেন, এই প্রশ্ন শুনিয়া "হঠাৎ কমলার মুখ যেন বিবর্ণ হইয়া গেল—সে কোনো উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া নিরুপায় ভাবে হেমনলিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আস্তে আস্তে কমলা মেজের মাদুরের 'পরে বসিয়া পড়িল; কহিল, "ভগবান তো জানেন, আমি কোনো অপরাধ করি নাই, তবে তিনি কেন আমাকে এমন করিয়া লজ্জায় ফেলিবেন? যে পাপ আমার নয়, তার শাস্তি আমাকে কেন দিবেন? আমি কেমন করিয়া তাঁর কাছে আমার সবকথা প্রকাশ করিব।"

৩

নারীর যে প্রেম এই জাতীয় সংস্কার ও সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ঔপন্যাসিক তাহার শক্তির সীমা, তাহার আধ্যাত্মিক ফললাভের পরিমাপ করিয়াছেন হেমনলিনীর মধ্যে।

সমাজ ধারা হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া একমাত্র ইংরেজি শিক্ষা ও বিচিত্র তত্ত্ব জিজ্ঞাসা যে জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে, হেমনলিনী তাহারই দৃষ্টান্ত স্থল। এই শিক্ষাধারায় হেমনলিনীর অধ্যাত্ম জীবন সম্পূর্ণ রূপে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। এই বহিঃসর্ব্বস্ব শিক্ষায় হেমনলিনীর মধ্যে এক প্রকার রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে একপ্রকার নম্রতা, মাধুর্য্য ও সংযমবোধও লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তাহার অন্তর্জীবন যে কত অসমৃদ্ধ; তাহা বুঝিতে পারা যায় সে যে-কোন আধ্যাত্মিক সত্য, যে-কোন গভীর ভাবকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। তাহার সমগ্র মনটাই বহির্মুখী।

রমেশ হিন্দু, ইহা ছাড়া হেমনলিনীর রমেশকে ভালোবাসিবার পথে আর কোন অন্তরায় ছিল না। নারীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করিবার মত সকল গুণেই রমেশের ছিল। যে সময়ে উভয়ের মধ্যে পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, সে সময় রমেশের বাবা রমেশকে কলিকাতা হইতে দেশে লইয়া গিয়া জোর করিয়া তাহার বিবাহ দিলেন! এই বিবাহ ব্যাপারের সহিত জড়িত হইয়া রমেশের জীবনে একের পর এক নানা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল।

হেমনলিনী এদিকে কলিকাতায় রমেশের প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছে। রমেশের এই দীর্ঘকালের নীরবতায় হেমনলিনী শেষে অভিমানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। রমেশ সম্পর্কে তাহার মনে কোন সংশয় যে একেবারে জাগে নাই, তাহাও নয়। সম্ভব, অসম্ভব নানা চিন্তা হেমনলিনীর মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসে। তবে রমেশকে সে কি ভুল বুঝিয়াছিল? তাহার নিকট অনুচ্চারিত বাক্যে রমেশ কি প্রতিশ্রুতিবন্ধ ছিলনা? হয়, রমেশ তাহাকে কোনদিন ভালোবাসে নাই—যতটুকু মমতা আছে তাহাকে সে আজ দূরে থাকিয়া মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু রমেশের সেই স্নেহ পরিপূর্ণ উদার হৃদয়, সেই সরলতা মিশ্রিত দৃষ্টি—এ সমস্ত কি মিথ্যা হইতে পারে?

দীর্ঘ প্রায় তিন চার মাসের পর, পথে একদিন আকস্মিকভাবে রমেশের সহিত হেমনলিনীর যখন সাক্ষাৎ হইয়া গেল, তখন হেমনলিনী অভিমান না প্রকাশ করিয়া পারিল না। সে কলিকাতায় ফিরিয়াছে, অথচ হেমনলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করা তো দূরের কথা কোন সংবাদ তাহাদের জানায় নাই। মাত্র এই কয়েক মাসের মধ্যে রমেশের এমন পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া সম্ভব হইল? সে যে তাহার কলুটোলার বাসা ছাড়িয়া তাহাদের সংস্পর্শ এড়াইবার জন্যই দর্জ্জিপাড়ায় বাসা লইয়াছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। অথচ ইতিপূর্ব্বে,—ভাবিতেই হেমনলিনীর বুক ভারী হইয়া আসে।

বাসায় ফিরিয়া, হেমনলিনী রমেশের পিতৃ-বিয়োগের সংবাদ জানিতে পারিল। ইহা শুনিবামাত্র হেমনলিনীর হৃদয় সমস্ত অভিমান ভুলিয়া মুহূর্ত্তে রমেশের জন্য স্নেহব্যাকুল হইয়া উঠিল। শোকে রমেশের মন যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আছে, তাহাকে এখন যে পারিবারিক নানা সংকটের মধ্যে জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছে, এই সমস্ত ব্যবস্থা করিতে রমেশ যে তাহাদের সহিত কোনো যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারে নাই, মুহূর্ত্তের মধ্যে এই সমস্ত ভাবনা জাগিয়া উঠিয়া হেমনলিনীকে মনে মনে লজ্জিত করিয়া তুলিল। ইতিমধ্যে সে রমেশ সম্পর্কে কত অমূলক চিন্তাই না করিয়াছে।

আবার পূর্ব্বের ন্যায় হেমনলিনী রমেশের সহিত মেলামেশা করিতে সুরু

করিল, আবার পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদের সম্পর্ক সহজ হইয়া উঠিল। দীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদে তাহাদের যে হৃদয় সাময়িকভাবে নিরুদ্ধ হইয়া ছিল, তাহা পুনর্মিলনে দ্বিগুণ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। তাই দেখিতে পাই, হেমনলিনী ও রমেশ অত্যন্ত দ্রুত পরস্পর পরস্পরকে একান্ত নিকটে লাভ করিয়াছে। মুগ্ধতার মধ্যে ডুবিয়া গিয়া তাহারা কেহই সমাজ ও পরিবেশের কথা চিন্তা করে নাই সত্য, কিন্তু অন্তরের দিক হইতে হেমনলিনী কোন বাধা বোধ করে নাই। সে জানে, কোন এক দিন বিবাহে তাহার প্রেম এক মঙ্গলময় পরিণাম লাভ করিবে। সেই নিবিড় সুখের সম্ভাবনাময় বর্ত্তমানের এ জীবনও কত আকাঙ্ক্ষিত!

ক্রমে সেই দিনটিও ঘনাইয়া আসিল। মাঝে আর মাত্র একটি সপ্তাহ বাকি। একটা আশ্চর্য্য পরিতৃপ্তি হেমমলিনীর সমগ্র দেহে ও মনে। তাহার মনে হইল তাহার চতুর্দ্দিকের বস্তুভার যেন লঘু হইয়া গিয়াছে—যেন এক অখণ্ড সুরের স্পন্দনে সমস্ত কিছু স্পন্দিত।

বিবাহের মাত্র একদিন বাকি, এমন সময় রমেশ তাহার কোন বিশেষ প্রয়োজনে বিবাহের তারিখ পিছাইয়া দিবার জন্য অন্নদাবাবুকে অনুরোধ করিল। এ সংবাদ হেমনলিনীরও কর্ণগোচর হইল। ইহার জন্য হেমনলিনী আদৌ প্রস্তুত ছিলনা, তাহার উপর তাহাকে এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল কতকটা রূঢ় ভাবে। এই সংবাদ তাই একটি দারুণ আঘাতের মত হেমনলিনীর একেবারে মর্ম্মের মাঝখানে গিয়া বাজিল। তাহার হৃদয়-বীণার তারে তারে আজ সমস্ত দিন ধরিয়া সে যে অপূর্ব্ব রাগিনী বাজাইয়া চলিতেছিল কে যেন দারুণ আঘাতে একসঙ্গে তাহার সব কটি তার ছিন্ন করিয়া দিল। হেমনলিনী কোন কথা বলিতে পারিল না, কেবল বুক ভরা বেদনা লইয়া ধীরে ধীরে সরিয়া আসিল।

ইহার পরমুহূর্ত্তেই রমেশের নিকট হইতে এতটুকু স্নেহ, তাহার হৃদয়ের এতটুকু পরিচয় লাভ করিবামাত্র হেমনলিনীর সকল অভিমান অশ্রুধারা রূপে গলিয়া ঝরিয়া গেল। কেন যে রমেশ বিবাহের তারিখ পিছাইয়া দিতে চায়, তাহার কারণ রমেশ ব্যক্ত করিতে চাহিলেও হেমনলিনী শুনিতে চহিল না। যাহাকে সে সমস্ত হৃদয় সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, তাহার নিকট হইতে এই সামান্য কারণ শুনিয়া সে কী করিবে। রমেশের ইচ্ছা ও অনিচ্ছার সহিত সে তাহার ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে এক করিয়া দিয়াছে। তাহার বাবার নিকট যে কারণ ব্যক্ত করিতে রমেশ অনিচ্ছুক, তাহা সে নাই বা শুনিতে চাহিল। ইহাতে যে তাহার প্রেমের গৌরব। তাহা ছাড়া রমেশ তাহাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহার আর কোন ক্ষোভ থাকিতে পারে না। রমেশ সেদিন

হেমনলিনীকে প্রতিশ্রুতি দিয়া বলিয়াছিল, "এই কথা আমাকে বলো যে, তুমি আমাকে কখনো অবিশ্বাস করিবে না। আমিও অন্তর্যামীকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, তোমার কাছে আমি কখনো অবিশ্বাসী হইব না।" এই প্রতিশ্রুতি লাভের পর হেমনলিনীর অন্তর হইতে সব গ্লানি দূর হইয়া গিয়াছে।

এই ঘটনার পর মাত্র দুটি দিনও গত হয় নাই, এমন সময় যোগেন্দ্র আসিয়া সংবাদ দিল যে, রমেশ তাহার পিতার সহিত দেশে গিয়া প্রকৃতপক্ষে বিবাহ করিয়াছিল। রমেশ তাহা এতদিন প্রকাশ করে নাই। এখন তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িতে নানা স্থানে আত্মগোপন করিয়া ফিরিতেছে। যোগেন্দ্র নানা প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত এই তথ্য প্রকাশ করিল। যোগেন্দ্র আরও জানাইল যে, সে তাহার স্ত্রী কমলার সহিত রমেশের বাসাতেই আজ দেখা করিয়াছে।

এই সংবাদ হেমনলিনীকে যে কত বড় আঘাত দিতে পারে, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। সে আঘাতে হেমনলিনী মুহূর্তে সংজ্ঞাহীন হইয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এমন আঘাতকেও হেমনলিনী জয় করিয়া উঠিয়াছে কেবল অবিচলিত নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের জোরে। সত্য, প্রেম নারীকে যে দিব্য দৃষ্টি দেয়, সেই দিব্য দৃষ্টি দিয়াই সে বোধ করিতেছে, এ সংবাদ সত্য নয়। সকল যুক্তি ও প্রমাণ সত্ত্বেও, ইহা সত্য নয়। যুক্তি-প্রমাণও নানা কারণে ভ্রমাত্মক হইতে পারে, এমন কি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেও। কিন্তু 'বোধি' সরাসরি মানুষের হৃদয় প্রত্যক্ষ করে। সেই আলোকে হেমনলিনী যে রমেশের হৃদয় প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এ সংবাদ কখনই সত্য নয়।

সংশয়-বিরহিত অন্তরের এই বোধ বাহিরের যুক্তি-বিচার আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে না, যুক্তি-বিচার আশ্রয় করিতেও চায় না। এই সংবাদ এবং তাহার সমর্থনে সকল প্রত্যক্ষ ঘটনার বিস্তারিত বিবৃতি শুনিবার পর ধীর কণ্ঠে হেমনলিনী বলিয়াছে, "আমার যাহা ভাবিবার সব ভাবিয়াছি। যতক্ষণ তাহার নিজের মুখ হইতে না শুনিব, ততক্ষণ আমি কোন মতেই বিশ্বাস করিব না, ইহা নিশ্চয় জানিয়ো।"

তবু কোথা হইতে সংশয় জাগিয়া উঠিয়া তাহার বিশ্বাসের গ্রন্থি শিথিল করিয়া দেয়। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, কমলার প্রেমে কোথাও এই দ্বিধা বা সংশয় ছিল না। যুক্তিহীন মন বলিতে যাহা বুঝায়, কমলার মানসিক গঠন কিন্তু তাহা নহে, তাহা যুক্তিবোধের উন্নততর প্রেরণা। সেখানে কোন সংশয় জাগে না, সংশয় জয় করিয়া উঠিবার প্রশ্ন, তাই সেখানে অবান্তর।

হেমনলিনীর বহির্মুখী মন আধুনিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ। এখানে যুক্তি ও

বিচার বোধ বড় প্রবল। কমলার মন হেমনলিনীর বিশ্লেষণাত্মক মনের সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহা একপ্রকার সামগ্রিক বোধ। একটি বুদ্ধি আর একটি বোধি। কমলার এই বোধি কিন্তু যে-কোন পরিণামে বুদ্ধি আশ্রয় করে না, তাহা সামাজিক সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

হেমনলিনীর বিশ্লেষণাত্মক মন তাই এই সংশয় বেদনার ভিতর দিয়া কখন অলক্ষ্যে রমেশের প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি আচরণ, প্রত্যেকটি ইঙ্গিত ব্যাখ্যা করিয়া চলে, তাহার নিহিতার্থ অন্বেষণ করিয়া ফিরে।

রমেশ আকস্মিক ভাবে তাহার পিতার সহিত দেশে চলিয়া গেল, কিন্তু কোন সংবাদই দিয়া গেল না। আত্মীয়-বিয়োগ-শোকে মানুষ তো তাহার স্নেহের আশ্রয় স্থলগুলিকে আরোও একান্ত করিয়া জড়াইয়া ধরে। অথচ রমেশ দীর্ঘ তিন মাস ধরিয়া তাহাদের কোন সংবাদ দেয় নাই। দরজি পাড়ায় নূতন বাসা লইবার মধ্যে আত্মগোপনের স্পষ্ট ইচ্ছাই প্রকাশ পায়।

অক্ষয় যখন সংবাদপত্রে এক দুষ্কৃতকারী রমেশের উল্লেখ করিয়া রমেশকে পরিহাস করিয়া নাম পরিবর্তন করিতে বলিয়াছিল, তখন রমেশের মধ্যে যে ভাবান্তর ঘটে, তাহা এত স্পষ্ট যে সকলেই তাহা লক্ষ্য না করিয়া পারে নাই। তাহার পর কোন এক বালিকা বিদ্যালয়ে কোন এক রমেশের স্ত্রীর কথা উল্লেখ করিতে রমেশ যে ভাবে বিচলিত হইয়া টেবিল ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহা এমনি অস্বাভাবিক যে, বৃদ্ধ অন্নদাবাবু পর্যন্ত ইহা বোধ না করিয়া পারেন নাই। রমেশ কমলা নামের যে মেয়েটিকে এতকাল বোর্ডিং-এ রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছিল, তাহাকে কী কারণে কর্তৃপক্ষের নিকট স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিতে গেল, যদি না তাহার মধ্যে কোন সত্যতা থাকে। তিন মাসের উপর রমেশ তাহাকে বোর্ডিং-এ রাখিয়াছে, তাহার ব্যয়ভার বহনের জন্যও তাহার কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করিতে হইয়াছে। অথচ, কোন দিন কোন কারণে সে তাহার নিকট কমলার কথা ব্যক্ত করে নাই। রমেশ দেশে যাইবার পূর্ব পর্যন্ত কমলা নামে কোন আত্মীয়ার কথা তো সে শোনে নাই, অথচ ইতিপূর্বে রমেশ তাহার সকল আত্মীয় ও আত্মীয়ার কথা তাহাকে বলিয়াছে। বিবাহের তারিখ পিছাইয়া দেওয়াটা বড় কথা নয়। কিন্তু তাহার কোন কারণ সে তাহার বাবাকে কেন বলিতে চাহিল না। রমেশ কলুটোলা হইতে দরজি পাড়ায় বাসা লইল, অথচ কাহাকেও তাহা জানাইল না।

কমলার সম্মুখে যোগেন্দ্র-অক্ষয়ের নিকট সে তাহাদের উভয়ের সম্পর্কের কথাই বা কেন গোপন করিতে চাহিল।

এই সমস্ত দিক একের পর এক চিন্তা করিয়া হেমনলিনী বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। এমন সংশয় ও অবিশ্বাস সত্ত্বেও হেমনলিনী তাহার বিশ্বাস

অটুট রাখিয়াছে। ইহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে প্রেম হইতে এই বিশ্বাস গড়িয়া উঠে—প্রেমের সেই গভীরতার কথাই আমাদিগকে বিশেষ করিয়া চিন্তা করিতে হইবে।

ইহার পরদিন চায়ের টেবিলে যোগেন্দ্র বিশেষ করিয়া হেমনলিনীকে আঘাত করিবার জন্যই হঠাৎ এক সময় বলিল যে, রমেশ তাহার স্ত্রীকে লইয়া দেশে যাইতেছিল। এমন সময়, গোয়ালন্দ মেলে অক্ষয়কে দেখিতে পাইয়া আবার সে কলিকাতায় পলাইয়া আসিয়াছে।

ভূমিকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চলে কোন গৃহ যেমন সর্বাঙ্গে শত মৃত্যুর চিহ্ন লইয়া কোন মতে দাঁড়াইয়া থাকে, তেমনিভাবে হেমনলিনী জীর্ণ বক্ষে ততোধিক জীর্ণ বিশ্বাস লইয়া দেহে মনে শোকের শত চিহ্ন ধারণ করিয়া কোন মতে দাঁড়াইয়া রহিল। তবু হেমনলিনী তাহার বিশ্বাসকে ত্যাগ করে নাই। যোগেন্দ্রকে সে তাই স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছে, "বিবাহের কথা কে বলিতেছে? তোমরা ইহা ভাঙিয়া দিতে চাও, ভাঙিয়া দাও—সে তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু আমার মন ভাঙাইবার মিথ্যা চেষ্টা করিতেছ।"

চতুর্দিকে কেবল অন্তহীন বেদনার সমুদ্র। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত হেমনলিনী ওই ব্যথার সমুদ্র সাঁতার দিয়া চলিয়াছে। ইহার পার কোথায়? চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে তাহা তো দৃষ্টিগোচর হয় না।

তাহার নিষ্ঠা তাহাকে অন্য কোন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট করে নাই সত্য,—প্রেমের ইহা নিষেধাত্মক দিক, কিন্তু অন্তরের মধ্যে কোন আস্তিক্য বোধ না থাকিলে, তাহা অধিককাল আপনাকে বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। তখন নারী হয় ধর্ম বা সাধনভ্রষ্ট হয়, নতুবা অন্তহীন শূন্যতার মধ্যে ধীরে ধীরে হারাইয়া যায়।

হেমনলিনীর পক্ষে এই নিষ্ঠা যতটা সত্য, ততোধিক সত্য ওই বেদনা জয় করিয়া উঠিবার মত তাহার প্রাণশক্তির একান্ত অভাব। রমেশকে ভুলিতে পারিবার মত হেমনলিনীর প্রাণ-মনের শক্তিও ছিল না।

হেমনলিনীর দুঃখ যত বড়ই হোক, তাহা তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব, সেই দুঃখ দিয়া অন্যের দুঃখের ভার বাড়াইবার অধিকার তাহার নাই। তাহার সহিত গৃহের আর সকলের যে সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্ককে সে তাহার ব্যক্তিগত শোক দিয়া দিনে দিনে মলিন করিয়া তুলিতেছে। হেমনলিনী এতদিন আপনার শোকের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া আর সকলকে ভুলিয়া গিয়াছিল, আর সকলের প্রতি তাহার কর্তব্য বিস্মৃত হইয়াছিল। হেমনলিনী এতদিন পরে সে সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে। তাহার পিতার প্রতি, গৃহের আর

সকলের প্রতি তাহার যে কর্তব্য আছে, হেমনলিনী তাহা পালন করিবার জন্য এতদিন পরে তৎপর হইয়াছে। হেমনলিনী তাই সেদিন মনের মধ্যে জোর করিয়া কতকটা উৎসাহ সঞ্চার করিয়া নলিনাক্ষের বক্তৃতা শুনিবার জন্য ব্রাহ্মমন্দিরে গেল।

হেমনলিনী ইতিপূর্বে নলিনাক্ষের চরিত্র-মাধুর্য, মাতার জন্য তাহার আত্মোৎসর্গ ইত্যাদি অনেক কথাই শুনিয়াছিল। কিন্তু সে সমস্ত কথা নয়, সেদিন নলিনাক্ষের বক্তৃতা তাহার সম্মুখে এমন একটি জগতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, যাহার সহিত তাহার কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না। জীবনকে এই যে একটি বিশিষ্ট দিক হইতে দর্শন, জীবনের এই যে একটি বিশিষ্ট মূল্য নিরূপণ, এমন করিয়া হেমনলিনী জীবনকে কখনও দেখে নাই, জীবনকে এমন করিয়া কখন সার্থক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে নাই।

নলিনাক্ষ সেদিন তাহার বক্তৃতার ভিতর দিয়া মূল এই ভাবটিকেই ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছিল যে, জীবনে দুঃখ ও বঞ্চনা যত বড়ই হোক, জীবনের মূল্য তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি, জীবন তাহাতে দেউলিয়া হইয়া যায় না। জীবনের এই অসীমতা যাহারা বোধ করিয়াছে, তাহাদের জীবন দারুণতম দুঃখ ও বঞ্চনায় ভাঙিয়া পড়ে না। নলিনাক্ষ এই সঙ্গে আরও একটি দিক উল্লেখ করিয়া বলিয়াছে যে, আমরা আমাদের ভালোবাসার সম্পদকে একান্ত করিয়া হারাইতে পারি না। তাহাকে আমরা অনেক বড় করিয়া, অনেক বেশি মহিমায় অন্তরের মধ্যে আরও আপনার করিয়া লাভ করি। অন্তরের মধ্যে এমনি করিয়া যখন আমরা কোন কিছু লাভ করিতে সমর্থ হই, তখন বাইরের পাওয়া ও হারান, সুখ ও দুঃখ সমার্থ হইয়া ওঠে। একদিকে জীবনের এই অসীমতা, অন্যদিকে ধ্যানের মধ্যে এই মহত্তর প্রাপ্তি—এই দুটি দিক প্রকাশিত হইয়া হেমনলিনীর নিকট জীবনের সমগ্র অর্থটিকেই পরিবর্তিত করিয়া দিল। এই নূতন উপলব্ধি হেমনলিনীর অন্তরে একটি গভীর প্রশান্তি পরিব্যাপ্ত করিয়া দিল।

হেমনলিনী নলিনাক্ষকে গুরুরূপে বরণ করিয়া যে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ কি? সে সাধনা কোন একটা উপায়ে শোক-দুঃখকে ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করিয়া দমিত করিতে চায় নাই। ইহা আদৌ সেইরূপ কোন চেষ্টা নয়। একের স্মৃতি ভুলিবার জন্য আর এককে আশ্রয় করিয়া মনের গতি ফিরাইবার চেষ্টাও ইহা নয়। ইহা মনের সীমা ছাড়াইয়া উঠিবার সাধনা। মনের ভিতর দিয়াই মনের সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। প্রথমে মনকে পার্থিব সকল চিন্তা ও বোধ মুক্ত করিতে হয়। ইহার মধ্যে অবদমনের কোন চেষ্টা নাই। মনকে তাহার সকল বোধসমেত অসীমের

সম্মুখে মেলিয়া ধরিতে হয়। ইহাতে শোক, তাপ, গ্লানি, মনের যে-কোন তীব্র অনুভূতি ধীরে ধীরে লঘু হইয়া আসে। মনের মধ্যে গভীর প্রশান্তি ও নীরবতা নামিয়া আসে। বারংবার অনুশীলন বা অনুধ্যানের ভিতর দিয়া মনের মধ্যে এই প্রশান্তি ও নীরবতাকে স্থায়ী করিয়া তুলিতে হয়। সাধনার ইহা প্রথম পর্যায় এবং সর্বাধিক কষ্টসাধ্য পর্যায়। যে-কোন অধ্যাত্ম-সাধনার ইহা একেবারে গোড়ার কথা। অধ্যাত্ম-সাধনায় ইহার পরবর্তী যে বিকাশ বা অভিব্যক্তি, তাহা অনায়াসে স্বাভাবিকভাবে ঘটিয়া চলিতে থাকে।

ইহার পরবর্তী চেষ্টা হইল, মনের এই নীরবতার ভিতর দিয়া চেতনাকে ঊর্ধ্বে ক্রমাগত ঊর্ধ্বে প্রেরণ করা। অসীম পরিব্যাপ্ত একাকীত্বের ভিতর দিয়া একক চেতনায় তাহা মহা অভিসার। ইহা অপূর্ব এক শান্তাবস্থা হইলেও মন তখনও পর্যন্ত কোন আস্তিক্যবোধ লাভ করিতে পারে না। ইহাও অন্ধকারের পর্যায়। তাহার পর আলোর ক্ষীণরেখা মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে বিদ্যুচ্চমকের মত ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এখন হইতে ফল লাভের সুরু।

এই সাধনার সিদ্ধ রূপটির সম্পূর্ণ না হইলেও, ইহার কতকটা আভাস হেমনলিনী নলিনাক্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাহার মধ্যে কী আশ্চর্য প্রত্যয়, কী গভীর প্রশান্তি। নিয়ত কর্মচাঞ্চল্যের মাঝখানে থাকিয়াও অপার ধৈর্য। বিশাল ব্যক্তিত্ব আবার ভক্তিতে কেমন বিগলিত হইয়া যায়। অমন গভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে শিশুর সারল্য। সংস্কারমুক্ত হইয়াও সংস্কারের প্রতি শ্রদ্ধা, দুর্বলতামুক্ত হইয়াও, মানুষের দুর্বলতার প্রতি গভীর মমতা।

হেমনলিনী তাই নলিনাক্ষের সাধন-পথ অবলম্বন করিবার জন্য অমন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। হেমনলিনী তাহা হইলে এই শোকের অহর্নিশ দাহ হইতে মুক্ত হইয়া বাঁচে। সে যে আর পারে না।

ইহার জন্য হেমনলিনী বাহিরে নানা আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান-পালন করিতে শুরু করিল। সাধনায় এই নিয়ম সংযম ও শুদ্ধাচারেরও প্রয়োজন আছে, কারণ ইহা বাহির হইতে মনকে কতকটা আশ্রয় দেয়।

হেমনলিনী সামান্য কয়েকদিনের মধ্যেই আপনার মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছে। এখন সকলে তাহার মধ্যে একটি পরিতৃপ্তির দীপ্তি লক্ষ্য করিতে পারে। ইহার মধ্যে সে ইতিমধ্যেই এমন একটা কিছু আস্বাদ করিয়াছে এবং তাহা তাহার নিকট এমনি সত্য যে, আজকাল লোকের পরিহাস ও কৌতুক কটাক্ষেও সে কিছুমাত্র আহত না হইয়া মৃদু হাসিয়া নীরব হইয়া থাকে।

নলিনাক্ষ নিকটে থাকিলে সে মনের মধ্যে যতটা শক্তি ও শান্তি পায়,

আবার নলিনাক্ষ দূরে সরিয়া গেলে নৈরাশ্য আসিয়া তাহাকে ততটা গ্রাস করিয়া ফেলে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, হেমনলিনী এখনও পর্যন্ত অন্তরের মধ্যে কোন আশ্রয় লাভ করিতে পারে নাই। হয়ত হেমনলিনী কোন দিন অন্তরের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিতে পারিবে না (এইরূপ অনুমান করিবার নানা কারণ আছে)। তবে যদি কোন বিরাট ব্যক্তিত্ব তাহাকে আশ্রয় দান করে, তাহা হইলে হেমনলিনী হেমলতার মত তাহাকে বেষ্টন করিয়া আরও কয়েকটা দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সে লতায় যে কালে ফুল ফুটিবে না, তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে।

মাতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া নলিনাক্ষকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য কাশী চলিয়া যাইতে হইল।

''নলিনাক্ষের অবর্তমানে তাহার উৎসাহের মধ্যে যেন একটি ম্লান ছায়া আসিয়া পড়িল। তাই আজ সমস্ত দিন হেমনলিনী নলিনাক্ষের উপদিষ্ট সমস্ত অনুষ্ঠান অনেক জোর করিয়া এবং বেশি করিয়া পালন করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে শ্রান্তি আসিয়া এমনি বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল যে, সে অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। তাহাকে আবার সেই পূর্ব স্মৃতির বেদনা দ্বিগুণ বেগে আক্রমণ করিয়াছে, আবার তাহার মন যেন গৃহহীন আশ্রয়হীনের মতো হা হা করিয়া বেড়াইতে উদ্যত হইয়াছে।"

জীবনে সাধনার অর্থ হইল, দুঃখকে কোন একটি উপায়ে পরিহার করা নয়, তাহাকে অমৃতে রূপান্তরিত করা। তাহা না হইলে, কেবলমাত্র বাহিরের আচার অনুষ্ঠান অধিক কাল মানুষকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না ; আর তাহার আধ্যাত্মিক ফল লাভ কিছু মাত্র নাই। দুঃখকে অমৃতে রূপান্তরিত করিবার অর্থ হইল, মনুষ্য জীবনকে তাহার সকল বোধ ও কর্ম-সমেত একটি সম্পূর্ণ ভিন্নতর জীবনাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠা করা। তাহাতে জীবন একটি যজ্ঞে পরিণত হইয়া যায়। সমস্ত জীবন হয় একটি অখণ্ড প্রণাম এবং আত্মনিবেদনের ভাবে ভরা। এই বোধ এই সাধনার আদি ও অন্ত কথা। ইহার স্মরণ, মনন ও অনুশীলন—ইহাই সাধনা।

এই সাধনায় হেমনলিনী সফলকাম না হইলেও রমেশের প্রতি নিষ্ঠা তখনও অটুট ছিল। রমেশকে কোন কালে লাভ করিতে পারা যাইবে না জানিয়াও, সে তাহার জন্য হৃদয়ে বেদনা বহন করিয়া বেড়াইত।

ইতিমধ্যে অন্নদাবাবুর স্বাস্থ্য অত্যন্ত দ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়িল। ডাক্তারের উপদেশক্রমে তাঁহাকে এখন পশ্চিমে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাওয়া প্রয়োজন। হেমনলিনী ও অন্নদাবাবু উভয়ে স্থির করিলেন যে, তাঁহারা কাশী

যাইবেন। সেখানে নলিনাক্ষ আছে, তাহার মাতা ক্ষেমংকরীও আছেন। পরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে তাহাদের সব দিক দিয়া সুবিধাই হইবে।

হেমনলিনীর কাশী নির্বাচন করিবার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। বলিয়াছি, হেমনলিনী অন্তরের আশ্রয় হারাইয়া আজ কোন একটি বড় ব্যক্তিত্বের ছায়ায় আশ্রয়লাভ করিতে চায়। সে আশ্রয়ের স্বরূপ যাহাই হোক-না-কেন। অবশ্য নলিনাক্ষের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িবার প্রশ্ন উঠে না। রমেশের স্মৃতি-ভারে এখনও তাহার হৃদয় আকুল। তাহার প্রাণ-শক্তি ইহাতেই একপ্রকার নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। ইহা যদি অনুরাগও হয়, তবে তাহাতে প্রাণের কোন ঐশ্বর্য বিনিময় থাকিবে না। সে আজ শুধু পুরুষের আশ্রয় চায়, চায় শুধু স্নেহ, শুধু ক্ষমা ও করুণা। তাহাতে তাহার কালে অন্তরে কোন ঐশ্বর্যের কুসুম ফুটিলে, তাহা সেই পুরুষ আপনি আপনার হাতে তুলিয়া লইবে।

কাশীতে পোঁছাইবা মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে নলিনাক্ষের মাতা ক্ষেমংকরী অন্নদাবাবুর নিকট নলিনাক্ষের সহিত হেমনলিনীর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। অন্নদাবাবুর নিকট হইতে হেমনলিনীও ক্রমে ইহা শুনিতে পাইল।

রমেশকে যে পাওয়া যাইবে না, তাহা হেমনলিনী একপ্রকার বুঝিয়া লইয়াছিল। কিন্তু অন্যত্র বিবাহের কথা সে এখনও পর্যন্ত চিন্তা করিতে পারে না। এই চিন্তা মাত্রেই তাহার সমস্ত হৃদয় মথিত হইয়া যায়। এমনি করিয়া কি তাহার সমস্ত জীবন কাটিবে। এই সমাজে এই পরিবেশে থাকিয়া তাহার পক্ষে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে, তাহার পিতৃ-বিয়োগের পর তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে কি দাঁড়াইবে, এই সমস্ত দিক হেমনলিনী ইতিপূর্বে কখনও ভাবিয়া দেখে নাই। সে শুধু এতদিন আপনার ভাবনার স্রোতে আপনি ভাসিয়া বেড়াইয়াছে মাত্র। অথচ, এই সমস্ত দিক তাহার আশু চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন। নলিনাক্ষের সহিত বিবাহের প্রস্তাবে হেমনলিনী আজই সম্মতি দান করিতে পারিল না, কিন্তু ইহা তাহার জীবনকে নানা দিক হইতে সমস্যাসংকুল করিয়া তুলিল।

প্রেম-জীবনে সার্থকতা লাভ অপেক্ষাও বড় কথা হইল প্রেমাস্পদকে শ্রদ্ধা করিবার মত গৌরব লাভ। রমেশকে একদিন লাভ করিতে পারা যাইবে—এ আশা হেমনলিনীর ছিল না বটে, কিন্তু তাহার প্রতি শ্রদ্ধা অবিচলিত ছিল। তাই তাহার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ, সকল দুঃখ ভোগও রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই গৌরববোধ লইয়া হেমনলিনী আজও বাঁচিয়া আছে। বিদ্যুচ্চমকের মত কখন কখন তাহার মনে হয়, এই সমস্ত কিছু মিথ্যা, দারুণ দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া ওঠার মত। একদিন এই সমস্ত মিথ্যা হইতে মুক্ত হইয়া, তাহার জীবন আবার পূর্বের মত সহজ, সরল, সুন্দর ও আনন্দমুখর হইয়া উঠিবে।

ইহার পর বন্ধু ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর নিকট হইতে হেমনলিনী রমেশের যে ইতিবৃত্ত শুনিল, তাহাতে তাহার মনে হইল সমস্ত বিশ্ব যেন তাহার পায়ের তলা হইতে নিঃশব্দে সরিয়া যাইতেছে, আর এক শূন্যালোকের মধ্যে সে হারাইয়া যাইতেছে।

অন্তর্জীবনে সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া সব কিছু হারাইয়া হেমনলিনী তখন আপনাকে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য নলিনাক্ষের উপদিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানকে প্রাণপণ বলে জড়াইয়া ধরিয়াছে। এই সময়ে তাহার মন কীরূপ শূন্যময়, তাহার চেতনা কীরূপ স্তম্ভিত, তাহার বুদ্ধি কীরূপ জড়প্রায় হইয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার ওই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা হইতে কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়।

"আপনার উপদেশ মত চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে এক একবার বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার আমি পিছাইয়া পড়ি। আমার ভয় হয়, আমার যেন কোন আশা নাই। আমার কি কোনদিন মনের একটা স্থিতি হইবে না—আমাকে কি কেবলই বাহিরের আঘাতে অস্থির হইয়া বেড়াইতে হইবে।"

শোক যত বড়ই হোক, তাহাকে বাহিরে বিরাট বিশ্বের মহৎ ভাব ও বিচিত্র কর্মপ্রেরণার মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিতে পারিলে, তাহার ঐকান্তিকতা লোপ পায়, শোক লঘু হইয়া আসে।

নলিনাক্ষকে সে ভক্তি করে সত্য এবং সেই ভক্তি দিনে দিনে গভীরও হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহাকে প্রেম দৃষ্টিতে সে কোনদিন দেখে নাই। তাহাদের উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে আর যাহাই থাক, তাহাতে প্রেমের সেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট শিহরণ নাই, সেই স্বপ্ন-বিহ্বলতা নাই, সেই মুগ্ধতা নাই। কিন্তু তাহাতেই বা কী। নলিনাক্ষ নারীর নিকট হইতে এই সম্পদ আকাঙ্ক্ষা করে না। তাহার জীবনে এমন কোন অসম্পূর্ণতা নাই, যাহাকে কোন নারী পূর্ণ করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে। হেমনলিনী আর কিছু না দিতে পারিলেও, তাহার সেবা তো করিতে পারিবে। আর নলিনাক্ষের মত পুরুষকে কেবল সেবা করিতে পারাও যে-কোন নারীর পক্ষে সৌভাগ্যের। হেমনলিনী এই সমস্ত দিক চিন্তা করিয়া বিবাহ-প্রস্তাবে সম্মতি দানের জন্য মনে মনে আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছে।

আজ সকালে হেমনলিনী রমেশের জীবনের যে ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়াছে, তাহাতে সে মরণান্তিক আঘাত লাভ না করিয়া পারে নাই। এই আঘাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্যই তাহার সমগ্র শক্তি উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের জীবনে যে আঘাত আসে ভিতর দিয়া, মানুষ আপনাকে যেমন নিবিড় করিয়া উপলব্ধি করে, তেমনটি স্বাভাবিক অবস্থায় ঘটে না।

মানুষ তাহারই জন্য ব্যথা পায়, তাহাকেই বিচার করিয়া অপরাধী করিতে

চায়, যাহাকে কোন-না-কোন স্বরূপে সে ভালবাসে, যাহার সহিত কোন-না-কোন ভাবে সে সম্পর্কান্বিত। তাহা না হইলে, এই বিরাট বিশ্বে কত শত সহস্র নর-নারী কত ভালোমন্দ আচরণ করিতেছে, তাহার জন্য কেহ তো কোন ঔৎসুক্যবোধ করে না।

রমেশ সম্পর্কে হেমনলিনী আর কোন চিন্তা করিতে চায় না, তাহার কোন আচরণের কোনও বিচার করিতে চায় না। এই জন্য রমেশের সহিত তাহার যে-কোন সম্পর্কের স্মৃতিকে সে ঘৃণা করে। বৃদ্ধের উক্তির ভিতর দিয়া রমেশের চরিত্রের যে দিকটি আজ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সে মানুষ হিসাবে যে কত সামান্য, হেমনলিনী তাহা চিন্তাও করিতে পারে না। তাহা লইয়া বিচার করিতে যাইয়া মনকে আলোড়িত করিতেও হেমনলিনী আজ লজ্জা বোধ করে। ইহার পরদিন হেমনলিনী নলিনাক্ষের মাতার নিকট গিয়া বিবাহে আপনার সম্মতি জানাইয়াছে।

বিবাহে সম্মতি দিয়া আসিয়া হেমনলিনী ভাবিল, তাহার অতীতের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার জীবনে আজ হইতে নূতন পথ চলার সুরু। আবার নূতন করিয়া নূতন ভাবে সে জীবন গড়িয়া তুলিবে। পশ্চাতের কোন দুঃখ, কোন শোক, কোন গ্লানি, কোন বঞ্চনা তাহার এই নূতন জীবনের উপর লেশমাত্র ছায়াপাত করিতে পারিবে না। এক প্রকার মধুর স্বপ্নাবেশে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তাহার জীবন পর্যায়ের একটা দিকের নিঃশেষ অবসান, আর একটা দিকের সুরু। হেমনলিনী তাহার অতীত জীবনটাকে তাহার সুখ-দুঃখ সমেত স্বপ্ন-দৃষ্ট ঘটনার মত এখন প্রত্যক্ষ করিতে পারে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, শোক তাহার জীবনে ইতিমধ্যে অনেকটা সহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়কে মানুষ অমন কতকটা নিস্পৃহভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

কিন্তু হেমনলিনী জানিত না যে, অতীত জীবনকে অমন করিয়া নিঃশেষ করিয়া দিতে পারা যায় না। মানুষের নিঃসহায়তাবোধ তো এই জন্য। বর্তমান জীবনের উপর অতীত স্মৃতির ছায়াপাত ঘটিয়া উহাকে বারংবার অশুচি ও মলিন করিয়া দেয়। এমনিই হয়। কারণ, বাহিরের কর্ম হয়ত লোপ পায়, তাহার ফল ও পরিণাম অন্তরের মধ্যে থাকিয়া, তাহার অমোঘ নিয়তিরূপে লীলা করে। বিপরীত প্রেরণার নিয়ত অনুশীলন দ্বারা অতীতের কর্মফলকে দ্রুত নিঃশেষ করিয়া দিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু তাহার জন্য যে মানসিক বল, যে কৃচ্ছ্রতা ও তপশ্চর্যার প্রয়োজন, হেমনলিনীর তাহার কিছুই ছিল না।

এমনি করিয়া হেমনলিনী তাহার বিক্ষিপ্ত মনটাকে কতকটা গুছাইয়া

তুলিয়া সমর্পণের জন্য অন্তরে অন্তরে আপনাকে প্রস্তুত করিয়া তুলিল। কাল নলিনাক্ষের মাতা আসিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া তাহার হাতে কংকন পরাইয়া দিয়াছেন। আজ তাহার সেখানে আহারের নিমন্ত্রণ। আর কিছু নয়—এমনি করিয়া উভয় পক্ষের সম্পর্ককে নিকটতর করিয়া তুলিবার চেষ্টা।

সেদিন সকালে হঠাৎ কোথা হইতে যোগেন্দ্রর সঙ্গে রমেশ আসিয়া উপস্থিত। হেমনলিনী সেই মুহূর্তে রমেশকে তাহার জীবনের উদ্যত অভিশাপ বলিয়া বোধ করিল। মানুষ প্রেত মূর্তির অনুসরণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যেমন ভীত ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করে, হেমনলিনী রমেশকে দেখিয়া তেমনি ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

রমেশের এই আকস্মিক আবির্ভাবে হেমনলিনীর মন আবার বিপর্যস্ত হইয়া গেল। হেমনলিনী আবার সংশয় দোলায় দুলিতে লাগিল। আবার বিষাদ আসিয়া তাহার মনকে ছাইয়া ফেলিল।

অবসাদগ্রস্ত মনকে বারংবার উত্তেজিত করিয়া তুলিয়া হেমনলিনী ক্ষেমংকরীর গৃহে কোন প্রকারে আসিয়া উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু শীঘ্রই তাহার মন আবার অবসাদে ভাঙিয়া পড়িল। সে আজ নিঃসংশয়ে তাহার এই নূতন জীবন-যাত্রাকে শুভ বলিয়া বোধ করিতে পারিল না। এখন তাহার মন আবার বিপরীত চিন্তা করিতে সুরু করিয়াছে। "যে নূতন জীবনযাত্রার পথে সে পদক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা তাহার সম্মুখে অতি দূর বিসর্পিত দুর্গম শৈল-পথের মত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল।"

সে তাহার মনের গতি আপনিই স্পষ্ট করিয়া বোধ করিতে পারে না। এই অনিশ্চয়তায়, এই সংশয়ে, এই দ্বিধায় সে গ্লানিবোধ না করিয়া পারে না, কিন্তু তাহার মনের উপর এখন তাহার কিছুমাত্র নিয়ন্ত্রণ নাই। সে আজ এমনি অসহায়।

একবার তাহার মনে হইয়াছে, বিবাহ-বন্ধনের মধ্যে শীঘ্র ধরা দিলে সে ওই দ্বিধা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বাঁচে। আবার ক্ষেমংকরী যখন বিবাহের প্রস্তাব একপ্রকার প্রত্যাহার করিয়া লইলেন, তখন সে কতকটা স্বস্তি বোধ না করিয়া পারিল না।

শাস্ত্রে বলে সংশয়াত্মারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মন যত অগভীর এবং যত বহির্মুখী হয়, ততই তাহা বাহিরের ঘটনাস্রোতে বিক্ষুব্ধ হইতে থাকে। ইহাই মৃত্যু। অন্যদিকে মন যত গভীর, যত অন্তর্মুখীন হয়, বাহিরের ঘটনা তাহাকে তত কম অস্থির করে, তাহার বুদ্ধি তত স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। মনের স্বাভাবিক চাঞ্চল্যের সীমার একদিকে প্রমত্ততা, অন্যদিকে মহত্ত্ব। বস্তুতঃ,

মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিমাপ এই একমাত্র বুদ্ধির স্থিরতার দ্বারা সহজেই করিতে পারা যায়।

নলিনাক্ষের মধ্যে সাধনার পূর্ণ ফলটির প্রকাশ না থাকিলেও, কিছু ফল লাভ যে আছে, তাহা তাহার সংশয়মুক্ত স্থির বুদ্ধি হইতেই অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়। কমলাকে যখন সে তাহার স্ত্রী বলিয়া নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াছে, তখন অন্নদাবাবুকে সে সংবাদ দিয়া বিবাহের প্রস্তাব ফিরাইয়া লইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করে নাই। ইহার পর হেমনলিনীকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে যাওয়াও নিরর্থক। কারণ, নলিনাক্ষ জানে, এই চেষ্টায় হেমনলিনী সান্ত্বনা লাভ তো করিবেই না, বরং তাহার জীবনের জটিলতাকে আরও বাড়াইয়া তোলা হইবে।

ইহা হয়ত সত্য, হেমনলিনীর প্রেম কোন সংস্কার এবং তদাশ্রয়ী কোন ধর্ম ও অধ্যাত্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না বলিয়া অবিচলিত হইয়া থাকিতে পারে নাই, কিন্তু তাহাকে বারংবার নিষ্ঠুর পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া ঔপন্যাসিক যে ভাবে তাহার হৃদয়ের শক্তি-সীমা পরিমাপ করিয়াছেন, কমলাকে তদনুরূপ কোন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন নাই।

এই সংশয়দোলায় দুলিতে দুলিতে হেমনলিনী পরিশেষে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। হেমনলিনী কমলাকে একদিন বলিয়াছিল, "আমার মন বোবা হইয়া গিয়াছে।" হেমনলিনীর এই উক্তি অতি নিষ্ঠুর হইলেও সত্য।

(৪)

সকল সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ হৃদয়বোধও যে প্রকৃত অধ্যাত্ম পরিণাম লাভ করিতে পারে, রমেশ তাহার জীবনব্যাপী দুঃখভোগের ভিতর দিয়া তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছে।

রমেশের চরিত্রে অসম্ভাব্যতাজনিত যে-সমস্ত ত্রুটি, তাহা একান্ত প্রত্যক্ষগোচর বলিয়া এক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া তাহা আর উল্লেখ করিব না। বস্তুতঃ রমেশের জীবনে ঔপন্যাসিক যে ভাবটি ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, কেবল তাহারই উপর তাঁহার দৃষ্টি এতদূর স্থির নিবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহার ফলে কাহিনীর কোন অসঙ্গতি তাঁহার নিকট অসঙ্গতি বলিয়া বোধ হয় নাই।

জীবন-সৃষ্টির মূলে দৃষ্টির এই জাতীয় একমুখীনতা ভাল কি মন্দ, সে জিজ্ঞাসা একান্ত স্বাভাবিক। কারণ, কোন উদ্দেশ্য লইয়া ঔপন্যাসিক চরিত্রের অবতারণা করেন না। সৃষ্টি-প্রেরণা ইহার ঠিক বিপরীত বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি করা হয় না, অর্থাৎ সৃষ্টি-প্রেরণা ও উদ্দেশ্য-প্রেরণা সম্পূর্ণ বিপরীত। এক একটি মুহূর্তে স্রষ্টার দৃষ্টি সমক্ষে এক একটি মানুষের সমগ্র সত্ত্বা যেন

উদ্ভাসিত হইয়া যায়। এমন করিয়া কোন মানুষের সমগ্র সত্ত্বাকে আমরা দেখিতে পাই না। কারণ, আমাদের জীবনে সেই Revelation বা উদ্ঘাটন নাই। আমাদের জীবন কতকগুলি সুস্পষ্ট নীতি ও তত্ত্ববোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমরা আমাদের জীবন পরিচালিত করি—ওই কয়েকটি বাঁধা বোধের খাদে এবং এই বিপুল বিশ্ব ও বিশ্বের বিচিত্র নারীকে ওই সমস্ত বোধের সহিত অন্বিত করিয়া দেখি। এই সমস্ত বোধের উপর তাহাদের যে ছায়াপাত ঘটে (কিংবা আদৌ হয়ত তাহা আমাদের মানস প্রতিকৃতি !), তাহাই আমাদের নিকট তাহাদের একমাত্র স্বরূপ। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ এই সমস্ত বোধের সীমা ছাড়াইয়া অনন্ত ব্যাপ্ত।

স্রষ্টার অন্তর্দৃষ্টিতে এই অনন্তব্যাপ্ত জীবন অলৌকিক উপায়ে উদ্ভাসিত হইয়া যায়। এই বিস্ময়স্তম্ভিত অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারকে স্রষ্টা নানা মাধ্যমে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করেন। তাই রমেশের চরিত্রের ভিতর দিয়া লেখকের উদ্দেশ্য কতদূর সার্থক হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা রমেশ কেবল একটি চরিত্ররূপে কতদূর সার্থক হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই সর্বাধিক বিচার্য।

কলিকাতার পাঠ সম্পূর্ণ করিয়া এখন রমেশের দেশে ফিরিবার কথা। কিন্তু নানা কারণে তাহার বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। রমেশ যে গৃহে থাকিয়া পড়াশুনা করিত, তাহার পার্শ্ববর্তী এক গৃহে থাকিতেন ব্রাহ্ম অন্নদাবাবু, তাঁহার একমাত্র কন্যা হেমনলিনী ও একমাত্র পুত্র যোগেন্দ্র।

অন্নদাবাবুর সহিত পরিচিত হইবার পূর্বেই রমেশ ও হেমনলিনী উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। যোগেন্দ্র ছিল রমেশের সহপাঠী। তাহারই সঙ্গে যাতায়াত করিতে করিতে রমেশ ওই পরিবারের সকলের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। এখন রমেশ একাকীই অন্নদাবাবুর গৃহে যাতায়াত করিতে পারে। হেমনলিনীর সহিত আলাপ-আলোচনার মাঝখানে এখন কাহারও উপস্থিতির অনিবার্য প্রয়োজন হয় না। রমেশের দেশে ফিরিবার বিলম্বের কারণ এখানে। এ পর্যন্ত অন্নদাবাবুর নিকট হইতে বিবাহের কোন প্রস্তাব না আসিলেও, রমেশ তাহার হৃদয়বোধের ওই একমাত্র পরিণাম চিন্তা করিয়া আসিয়াছে। আদর্শবাদী, হৃদয়বান, সচ্চরিত্র রমেশ আর কোন কারণে হৃদয়বোধকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। আপনার এই নৈতিক বোধ দিয়াই রমেশ হেমনলিনীর এই একই মনোভাবের কথা চিন্তা করিয়া লইয়াছিল। বিবাহে পরিসমাপ্তির চিন্তা না করিলে কোন নারী কেমন করিয়া পুরুষের হৃদয়বোধকে প্রশ্রয় দিতে পারে ! উভয়ের অন্তরে এমনি একপ্রকার আভাস ফুটিয়া উঠিলেও, এমনি হৃদয় বিনিময় চলিলেও, উভয়ের কেহই তখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে

পৌঁছাইতে পারে নাই। কেহ কাহারও নিকট স্পষ্ট করিয়া প্রেম নিবেদন করে নাই, বিবাহের প্রস্তাব করাত আর ও বহু পরের কথা।

ইতিমধ্যে রমেশের পিতা আকস্মিকভাবে কলিকাতায় আসিয়া রমেশকে দেশে লইয়া গিয়া একপ্রকার জোর করিয়া রমেশের বিবাহ দিলেন। রমেশের আপত্তি, অজুহাত, যুক্তি, মৃদু প্রতিবাদ কিছুই তিনি কর্ণপাত করিলেন না। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে রমেশের কোন প্রকার চিন্তা ও মনস্থির করিবার পূর্বেই বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

কেবল এই জন্যই নয়, ওই ঘটনার সহিত বিজড়িত হইয়া আবার এক ভয়াবহ শোক আসিয়া রমেশকে বিহ্বল করিয়া দিল। পিতা, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব অনেককেই একসঙ্গে হারাইয়া রমেশ তখন কতকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এতকাল রমেশ যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছে, তাহার সহিত সাংসারিক জীবনের কোন যোগ ছিল না। সংসারের সহিত প্রথম পরিচয়ের মুহূর্ত হইতে এইরূপ একের পর এক আঘাত আসিয়া পড়াতে, রমেশ আপনাকে একান্ত নিঃসহায় বোধ করিল।

কিন্তু এখন কাতর হইয়া পড়িলে চলিবে না। পিতার অবর্তমানে তাঁহার বিষয়-আশয় ও বৃহৎ পরিবারবর্গের সর্ববিধ ব্যবস্থা করা, পরিবারের শোক-সন্তপ্ত রমণীদের সান্ত্বনা দেওয়া ইত্যাদি অনেক কাজ এখন একাকী রমেশকেই করিতে হইবে। ইহার মধ্যে রমেশের একমাত্র নির্ভরস্থল ছিল, তাহার বালিকা বধূ। নানা প্রয়োজনে ব্যাপৃত থাকিয়াও রমেশ স্বপ্ন দেখিত। তাহার এখানকার সমস্ত কাজ, সমস্ত দায়িত্ব ফুরাইয়া গেলে, সে কমলাকে লইয়া দূরে কোথাও নূতন করিয়া সংসার পাতিবে। বালিকা কমলা হইবে সে গৃহের গৃহিণী, তাহার প্রেয়সী, তাহার ভাবী সন্তানের কল্যাণময়ী জননী। কমলা তাহার সেবায়, যত্নে, স্নেহে, প্রেমে, করুণায়, মমতায় তাহার হৃদয়, তাহার সংসার পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিবে। মাঝে মাঝে হেমনলিনীর কথা তাহার যে মনে পড়েনা, তাহা নহে। কিন্তু এখন যখন সেদিক চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন কমলাকেই অনন্যমনা হইয়া ভালোবাসা ছাড়া রমেশের আর কি কর্তব্য থাকিতে পারে। কেবল স্ত্রী বলিয়া নয়, পুরুষের স্নেহ ও মমতা-লাভের মত গুণের অভাবও কমলার ছিল না।

রমেশ যখন এমনি মাধুর্য ও প্রেমে কমলাকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এই জীবনকে নিঃসংশয়ে মানিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তখন একদিন রমেশ জানিতে পারিল যে, কমলা তাহার স্ত্রী নহে। এই পরিচয় একটা দারুণ আঘাতরূপে রমেশের একেবারে মর্মস্থলে আসিয়া পড়িয়া তাহাকে শতধা করিয়া দিল। রমেশ সে ব্যথায় আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে।

এই সংবাদ বালিকার বক্ষে যে কী শেল বিদ্ধ করিবে, ইহার পর সমাজ যে তাহাকে ক্ষমা করিবে না, ফলে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এক দৈবাধীন অপরাধের জন্য তাহাকে সমস্ত জীবন সকলের ঘৃণা ও উপেক্ষা কুড়াইয়া কাটাইতে হইবে। তাহার আত্মীয়-পরিজনই বা কোথায়, কোথায় বা তাহার শ্বশুরগৃহ, তাহারা এবং বিশেষ করিয়া তাহার স্বামী কমলাকে এই অবস্থায় কেমন করিয়া স্বীকার করিয়া লইবে। এই সমস্ত দিক চিন্তা করিয়া রমেশ আকুল হইয়া পড়িয়াছে। অন্যদিকে বালিকা কমলার কি নিশ্চিন্ত নির্ভরতা! এই নিদারুণ সংবাদ বজ্রপাতের মত তাহার নিশ্চিন্ত জীবনের উপর নামিয়া আসিয়া যে-কোন মুহূর্তে তাহার জীবনকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারে। রমেশ বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছে, "বিধাতা ইহার ললাটে যে গুপ্ত লিখন লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আজও এই মুখে একটি আঁক কাটে নাই। এমন সৌন্দর্যের ভিতরে এমন ভীষণ পরিণাম কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছে।"

এই অবস্থায় রমেশের পক্ষে যে কর্তব্য একান্ত স্বাভাবিক, রমেশ তাহাই করিয়াছে। তবে, এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে তাহার সকল হৃদয়াবেগ নিরুদ্ধ করা, কমলার দাম্পত্যের ভাবটিকে যতদূর সাধ্য ঠেকাইয়া রাখা প্রয়োজন।

গ্রামে থাকিলে পাছে সমস্ত কিছু জানাজানি হইয়া পড়ে, রমেশ তাই কলিকাতায় কমলাকে লইয়া আসিয়া তাহার আত্মীয়বর্গের নিকট তাহার শ্বশুরগৃহের যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কাহারও নিকট হইতে কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া, অবশেষে তাহাকে এক বালিকা বিদ্যালয়ের বোর্ডিং-এ রাখিয়া আসিল। ইহাতে যে সমস্যার কোন সমাধান হইবে না, তাহা রমেশও জানে। তবে আপাততঃ কিছু দিনের জন্য এই বিসদৃশ আচরণ এবং দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া রমেশ কতকটা স্বস্তিবোধ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে তাহার জীবনে অনেক জট পড়িয়া গিয়াছে। মাত্র তিন মাসের মধ্যে তাহাকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইয়াছে, তাহা দৈবের নিরতিশয় নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া, সে আর কি বলিবে। হেমনলিনীকে প্রথম যৌবনের সমস্ত কল্পনা, মাধুর্য ও অনুরাগ দিয়া যখন চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে, তখন নিষ্ঠুর ভাগ্য তাহাকে দূরে সরাইয়া লইয়া গেল। অন্তরের অতল স্পর্শ স্নেহ বুভুক্ষা লইয়া যাহাকে সে আপনার বধূ জ্ঞান করিয়া একান্ত বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছে, সে এখন তাহার বধূ নহে।

হেমনলিনী আজ এই কলিকাতাতেই কত কাছে, তবু হৃদয়ের মধ্যে আজ কতদূরের ব্যবধান। রমেশ আজ অতীত তিন চার মাসের অভিজ্ঞতা লইয়া

তাহার নিকট হইতে কত দূরেই না সরিয়া আসিয়াছে। মাত্র এই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায়, তাহার অন্তরের সকল মাধুর্য তিক্ত হইয়া গিয়াছে।

কোন একটা কাজে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য রমেশ শেষে আলিপুর কোর্টে প্র্যাকটিশ সুরু করিল। তাহাতেও মন কিছুমাত্র শান্ত হইল না। অবশেষে স্থির করিল, কিছু দিনের জন্য সে পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবে। রমেশ তাহারই আয়োজনে ব্যস্ত, এমন সময় একদিন পথে আকস্মিকভাবে হেমনলিনী এবং তাহার পিতা অন্নদাবাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়া গেল।

দীর্ঘ কয়েক মাসের নিয়ত ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা, সুপ্ত বাসনা, স্নেহ লিপ্সা অকস্মাৎ সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া প্রবল বেগে পরস্পকে নিকটে টানিয়া লইল। হেমনলিনীর সহিত পূর্বের ন্যায় মেলামেশা করিতে রমেশ অন্তরের মধ্যে কোন বাধা বোধ করে নাই।—তাহার নৈতিক কোন বাধা ছিল না সত্য, কিন্তু হেমনলিনীর সহিত মেলামেশা করিতে ইহাই যথেষ্ট যুক্তি নয়, কারণ সমাজের নৈতিক বাধাও দূর করা প্রয়োজন। সেখানে কমলার সহিত তাহার ইতিপূর্বের পরিচয় যদি সমাজে ব্যক্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে কাহাকে কি উত্তর দিবে। রমেশ বস্তুতঃ এই সমস্ত দিক কিছুমাত্র চিন্তা করিয়া দেখে নাই। রমেশ কতকটা আত্মকেন্দ্রিক আদর্শবাদী পুরুষ। সে সমস্ত কিছু বিচার করিয়া দেখে কেবলমাত্র আপনার দিক হইতে। মনের দিক হইতে কোন বাধা লাভ না করিলে, সে কোন কাজে দ্বিধা বোধ করে না। রমেশ যে কোন দিক চিন্তা করিয়া দেখে নাই, তাহার আরও একটি কারণ ছিল। তাহার প্রাণের গভীর পিপাসাই সাময়িকভাবে তাহার সকল কর্তব্যবোধকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল।

অক্ষয়ের নিকট হইতে খোঁচা না পাইলে, রমেশ ওই পরিবেশেও বিবাহ প্রস্তাব করিত কি না সন্দেহ। নৈতিক বাধা না থাকিলেও যে একটা সীমা আছে, সে সম্পর্কে রমেশের কোন বোধ ছিল না। রমেশ ইহার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে যে বিবাহের দিন স্থির করিয়াছে, তাহা কেবল অন্নদাবাবুর ব্যস্ততার জন্য। কমলার পরিচয় গোপন করিয়া যতদূর সম্ভব শীঘ্র বিবাহ হইয়া গেলে, আর কোন বাধা থাকিবে না। এইরূপ কোন চিন্তা অবশ্য রমেশ করে নাই। সমাজের কথা চিন্তা করিয়াও রমেশ এই ব্যবস্থা করে নাই। কমলার সহিত বিজড়িত সকল সামাজিক সমস্যাকে সে এক প্রকার বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল।

কমলা সম্পর্কে রমেশ আদৌ যে কোন চিন্তা করে নাই তাহা কিন্তু ঠিক নহে। "রমেশ ঠিক করিয়াছে, এখন সে কমলাকে কিছু বলিবে না। বিবাহের

পর রমেশ হেমনলিনীকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া সুযোগ বুঝিয়া সকরুণ স্নেহের সহিত ক্রমে ক্রমে তাহাকে তাহার প্রকৃত ইতিহাস জানাইবে, যত অল্প বেদনা দিয়া সম্ভব, কমলার জীবনে এই জটিল রহস্যজাল ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া দিবে। তাহার পর দূরে বিদেশে তাহাদের পরিচিত সমাজের বাহিরে কোন প্রকার আঘাত না পাইয়া কমলা অতি সহজেই তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া আপনার হইয়া যাইবে।"

রমেশের এই চিন্তা যে কতদূর সঙ্গত, সে বিচার করিয়া লাভ নাই। বলিয়াছি, রমেশ সমস্ত কিছু বিচার করিয়া দেখে আত্মগতভাবে। আর আত্মগত বিচারে কোন সমস্যা বা জটিলতা নাই, তাহার সমাধানও একান্ত সহজ। সমস্যা যেখানে সমাজের সহিত বিজড়িত, সেখানে তাহাকে সমাজের দিক হইতেও বিচার করিতে হয়। এখানে সমস্যা সমাধান খুব সহজ নয়। এখানে মনের গতি বিচিত্র, তাহার রূপ বিচিত্র, এখানে সকল জিজ্ঞাসার সুস্পষ্ট উত্তর চাই।

হেমনলিনীর বিবাহের ব্যাপারে কমলার সকল সংবাদ তাহাকে খুলিয়া বলিতেই হইবে। তাহাতে কমলার ভাগ্যে যে পরিণাম আসুক না কেন এবং ইহাতে রমেশের দিক হইতে যত বড় নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেওয়া হোক-না-কেন। রমেশ আজ যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছে, তাহাতে দুই জনকে কোন রূপে একত্রে লাভ করিবার উপায় নাই।

বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। বিবাহ হইতে আর মাত্র দুই দিন বাকি। এমন সময় কমলা সম্পর্কিত কিছু কিছু সংবাদ অন্নদাবাবুর গৃহে আসিয়া পৌঁছাইতে লাগিল। রমেশ ইহাতে প্রমাদ গণিল! আশু কোন একটা ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এদিকে এমন একটা অবস্থা ঘটিয়াছে, যাহাতে কমলাকে আর বোর্ডিং-এ রাখাও চলিবে না। বিবাহের তখন মাত্র একদিন বাকি। একটা জটিলতার মধ্যে পড়িয়া রমেশ আবার দিশাহারা হইয়া পড়িল।

রমেশ তাহার পূর্ব স্বভাব অনুযায়ী স্থির করিল যে, এখন কমলাকে কলিকাতার বাহিরে কোথাও রাখিয়া আসা প্রয়োজন। তাহা না হইলে, অক্ষয়-যোগেন্দ্র তাহাকে নিষ্কৃতি দিবে না। আর বালিকার নিকট সে সংবাদ আকস্মিকভাবে আসিয়া পড়িয়া হয়ত তাহার জীবনে ভয়ংকর কোন পরিণাম চিরকালের জন্য চিহ্নিত করিয়া দিবে।

রমেশ বিবাহের তারিখ তাই এক সপ্তাহের জন্য পিছাইয়া দিল, কিন্তু অন্নদাবাবু বা হেমনলিনীর নিকট তাহার কোন কারণ ব্যক্ত করা প্রয়োজন বোধ করিল না। রমেশের যুক্তি এইরূপ, হেমনলিনীকে সে যখন অন্তর্যামী সাক্ষী

রাখিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, তখন আর কোন প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু অন্নদাবাবু সমাজকে কি বলিবেন, সেরূপ কোন চিন্তাই তাহার মাথায় আসিল না।

রমেশ তাহার দরজিপাড়ার বাসায় বোর্ডিং হইতে কমলাকে আনাইয়া লইল। সেইদিনই তাহারা দেশে যাইবে, এমন সময় অক্ষয় ও যোগেন্দ্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রমেশ এতদূর চিন্তা করিয়া দেখে নাই। যোগেন্দ্র ও অক্ষয়ের কোন অভিযোগের, কোন প্রশ্নের উত্তর রমেশ দিতে পারিল না। উত্তর দিতে গেলে কমলার দিক হইতে তাহা ভয়ংকর হইয়া উঠিবে। রমেশ তাহাদের সকল কটুক্তি, বিদ্রূপবাণ, সকল অভিযোগ নীরবে সহ্য করিয়া কেবল ইহাই বলিয়াছে, "এইটুকু পর্যন্ত আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি, পৃথিবীতে কাহারও সহিত আমার এমন সম্পর্ক নাই, যাহাতে হেমনলিনীর সহিত পবিত্র সম্বন্ধে বদ্ধ হইতে আমার বাধা থাকিতে পারে।"

রমেশ কমলার ক্ষতি হইবে বোধ করিয়া, যোগেন্দ্র-অক্ষয়ের নিকট তাহার কোন পরিচয় দান করিল না, কিন্তু এই নীরবতায় হেমনলিনীর যে ক্ষতি হইতে পারে (কারণ তাহার এই নীরবতাকে সমাজ নানা ভাবে ব্যাখ্যা করিবে), তাহা রমেশ চিন্তামাত্রও করিল না। রমেশ স্থির করিল, হেমনলিনীকে সকল কথা খুলিয়া লিখিবে। অবশ্য, তাহার পূর্বে কমলাকে দূরে কোথাও লইয়া যাওয়া প্রয়োজন। রমেশ কমলাকে সঙ্গে লইয়া দেশে চলিল। দেশে আত্মীয়া মহিলাদের মাঝখানে কমলাকে রাখিয়া রমেশ তাহার দাম্পত্যের ভাবকে কতকটা সংযত করিয়া রাখিতে পারিবে। কিন্তু পরে আকস্মিকভাবে তাহাকে কাশীযাত্রী এক স্টীমারে উঠিয়া বসিতে হইল। এক বিপদকে পরিহার করিতে গিয়া রমেশ আর এক বিপদজালে জড়াইয়া পড়িল। রমেশ কমলাকে তাহার অনিষ্ট আশংকায়, অপরের নিকট গোপন করিতে চাহিয়াছে কিন্তু একাকী স্টীমারে কমলার ওই মনোভাবকে সে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবে কেমন করিয়া ? ইহাতে যে কমলার আরও ক্ষতি !

স্টীমারে প্রথম দিন আহার আয়োজনের সমস্ত ব্যবস্থা করিতে কমলার এক প্রকার সমস্ত সকালটাই কাটিয়া গেল। সংসারের কর্মে কমলার আশ্চর্য নিপুণতা দেখিয়া, রমেশ মুগ্ধ না হইয়া পারিল না, কিন্তু পরক্ষণেই সমস্যার কথা জাগিয়া উঠিতে তাহার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল। উভয়ের মাঝখানে হেমনলিনী থাকিলে সমস্ত ব্যাপারটা সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু, হেমনলিনীকে যদি ত্যাগ করিতে হয় ! যোগেন্দ্র-অক্ষয়ের নিকট হইতে সে যে আচরণ পাইয়াছে এবং তাহাদের নিকট সে কমলার যে পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে হেমনলিনীর আশা আজ দুরাশা মাত্র। তবে কমলার সমস্যা সে একাকী কেমন করিয়া সমাধান করিবে। তাহার আচরণের মাঝখানে সে

যে কোথায় একটা সীমা টানিবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাহার আচার আচরণকে সে যতই সংযত ও সীমিত করুক, কমলা প্রতিমুহূর্তে সে সীমা লঙ্ঘন করিবেই, কারণ কমলা কোথাও কোন বাধা বোধ করিবে না। তাহার এই অস্বাভাবিক আচরণ কমলার মনকে যে শীঘ্রই সংশয়াকুল, বিদ্রোহী করিয়া তুলিবে, ইহা যে তাহার অপরিণত মনের উপর গভীর বিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। রমেশ তাই স্থির করিল, কমলাকে আজই সমস্ত কথা খুলিয়া বলিবে। তাহা ছাড়া, ইহার মধ্যে যেন একটা প্রতারণা আছে। কমলার এত সেবা-যত্ন নিয়ত উৎকণ্ঠা এই সমস্ত কিছু অসঙ্কোচে সে কোন্ বোধে গ্রহণ করিয়া চলিতেছে। কমলার নারীহৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে সে যেন চুরি করিয়া লইতেছে। কমলা স্বামীবোধে তাহাকে যাহা দিতেছে, তাহাকে সে স্বামী না হইয়া গ্রহণ করিতেছে! ইহা অপেক্ষা বড় অপরাধ আর কি হইতে পারে।

কেবল এই জন্যেই নয়, রমেশের অন্তর আজও নিয়ত হেমনলিনীকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে। হেমনলিনীকে পাওয়া যাইবে না, একথা আজও রমেশ কোন প্রকারেই মানিয়া লইতে পারিতেছে না। হেমনলিনীকে হারাইলে তাহার ভবিষ্যৎ সমস্ত জীবন যে অসার নিরর্থক হইয়া যাইবে। সে পরিণাম রমেশ কল্পনাও করিতে পারে না। কমলা যদি তাহার সার্থকতার পথে বন্ধন হইয়াই থাকে, তবে রমেশ কেন সেই বন্ধনজাল ছিন্ন করিবে না।

রমেশ সংকল্প করিলে কী হইবে, কমলাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে তাহার হৃদয় প্রতি মুহূর্তে মমতায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে। এই বোধ লইয়া রমেশ আবার চিন্তা করিয়াছে, কমলাকে ত্যাগ করিলে ইহ সংসারে তাহার আর কোথাও কোন আশ্রয় থাকিবে না। কেবল তাই নয়, সমস্ত জীবন তাহাকে লজ্জার বোঝা মাথায় করিয়া বেড়াইতে হইবে। অথচ এই কমলাকেই সে মাত্র কয়েকমাস পূর্বে তাহার স্ত্রীর সমস্ত মর্যাদা দিয়াছে। আজও কমলা তাহার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস লইয়া বসিয়া আছে। এই চিন্তা করা মাত্রেই তাহার সমস্ত হৃদয় অসহনীয় বেদনায় টন টন করিয়া উঠিয়াছে। রমেশ ভাবিয়াছে, "তবু হেমনলিনীর আশ্রয় আছে - এখনও হেমনলিনী রমেশকে ভুলিতে পারে, সে আর কাহাকে বিবাহও করিতে পারে।"

বুদ্ধি দিয়া স্থির করিলে কী হইবে, হৃদয়বোধকে তো অত সহজে নিরুদ্ধ করিতে পারা যায় না। হেমনলিনীকে বিদায় দিবার চিন্তামাত্রই রমেশের আগ্রহের অধীরতা আরও বাড়িয়া গেল। এমনি করিয়া একবার কমলা একবার হেমনলিনীর কথা চিন্তা করিয়া অন্তর্দ্বন্দ্বে রমেশের স্নেহকাতর মন

অন্তরে অন্তরে কেবল ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল, সে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারিল না।

কিন্তু শীঘ্রই রমেশকে একটা সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইবে, কারণ কমলা তাহাকে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে দিবে না। স্টীমার যাত্রার প্রথম দিনেই সে কমলার যে মনোভাবের পরিচয় পাইয়াছে, তাহাতে তাহার পক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা অসম্ভব। রমেশ পরিশেষে স্থির করিল, সে কমলাকেই জীবনে সম্পূর্ণ করিয়া মানিয়া লইবে। হেমনলিনী তাহার জীবন পর্যায় হইতে এইখানে বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল। এই চিন্তায়, এই ভাবনায় রমেশের হৃদয় আবার আত্মীয়বিয়োগ বিধুর হইয়া উঠিল। এই বেদনাভারকে লঘু করিয়া দিবার জন্য রমেশ ভাবিতে লাগিল, "তাহারই লজ্জা, তাহারই বেদনা সমস্ত দেশ ও সমস্ত কালকে আবৃত করিয়া নাই। আকাশ পূর্ণ করিয়া চিরকালের জ্যোতির্লোক সকল স্তব্ধ হইয়া আছে, রমেশ ও হেমনলিনীর ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু তাহাদিগকে স্পর্শও করিতেছে না, এই আশ্বিনের নদী তাহার নির্জন বালুতটে প্রফুল্ল কাশবনের তলদেশ দিয়া এমন কত নক্ষত্রালোকিত রজনীতে বিলুপ্ত গ্রামগুলির বনপ্রান্তচ্ছায়ায় প্রবাহিত হইয়া চলিবে, তখন রমেশের জীবনের সমস্ত ধিক্কার শ্মশানের ভস্মমুষ্টির মধ্যে চিরধৈর্যময়ী ধরণীতে মিশাইয়া চিরদিনের মতো নীরব হইয়া গিয়াছে।"

রমেশ ও হেমনলিনীর এই যে জীবন পর্যায় শেষ হইয়া গেল, তাহা উভয়ের দিক হইতে যতবড় বেদনার যতবড় লজ্জার পরিচয় বহন করিয়া থাকুক না কেন, তাহা কালে একদিন সহনীয় হইয়া উঠিবে এবং পরে একদিন বিস্মৃতির তলে বিলীন হইয়া যাইবে। এই ধরিত্রীর বক্ষে কোন স্মরণাতীত কাল হইতে কত নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সংসার পাতিয়াছে, দুঃখ দিয়াছে, দুঃখ পাইয়াছে, আনন্দ আস্বাদ করিয়াছে, আনন্দ সঞ্চার করিয়াছে, তাহার পর মৃত্যুতে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া, এমনি কত যাওয়া ও আসার লীলা চলিতেছে। এক দিনের গুরু বেদনা আর একদিনে লঘু হইয়া আসে, আর একদিন তাহার স্মৃতিমাত্রও থাকে না। রমেশের জীবনেও আজিকার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত ধিক্কার একদিন ধূলির সহিত ধূলি হইয়া হারাইয়া যাইবে।

দার্শনিক স্বরূপের কথা নয়, রমেশের এই মনোভাবটির স্বরূপ আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে। বাস্তব জীবন ও তাহার সমস্যাকে রমেশ সমস্ত অন্তর দিয়া সম্পূর্ণরূপে কখনই স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। তাই সত্য হোক, কল্পনা হোক, অন্তরের কোন বোধ আশ্রয় করিয়া হোক—একটা কোন ভাবনা উদয় হইলেই রমেশের স্বপ্নবিলাসী, স্পর্শকাতর মন নানা তত্ত্ব ও

ভাবনা সৃষ্টি করিয়া চলে, তাহার ভাবনা মুখর হইয়া কোন অনির্দেশ্য লোকে উধাও হইয়া চলে ঊর্ধ্বে—আরও ঊর্ধ্বে ক্লান্ত পক্ষ ঝাপটাইতে ঝাপটাইতে। সেই চিন্তায় সেই ভাবনায় রমেশ তাহার পরিবেশ পর্যন্ত ভুলিয়া গেল।

রমেশ স্থির করিয়াছে, কমলাকে স্বীকার করিয়া লইবে, কিন্তু কেমন করিয়া যে তাহাকে জীবনে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহা রমেশ চিন্তা করে নাই। কেবল চিন্তার কথা নয়, কমলা যে তাহার বিবাহিতা-স্ত্রী নয়, তাহাকে জীবনে স্বীকার করিয়া লইতে গেলে যে সমস্ত অধ্যাত্ম সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা যত বৃহৎ এবং যত ক্ষুদ্রই হোক, তাহার কোন সমস্যাই রমেশের জীবনে এখনও দেখা দেয় নাই। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, কমলাকে স্বীকার করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত এখনও পর্যন্ত রমেশের জীবনে একটা আইডিয়া বা ভাবুকতা মাত্র। এই ভাবুকতার মধ্যে ডুবিয়া গিয়া রমেশ আবার নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। রমেশ বারংবার সচেষ্ট হইয়া যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে, তাহা কেবল কমলার জন্য। কমলার বারংবার বিদ্রোহ তাহাকে বারবার বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করিয়াছে।

জীবনের এই বাস্তবদিকটিকে রমেশ যেমন সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লয় নাই, তেমনি উহার সকল সমস্যা সমাধানের জন্য প্রাণ-মনের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে নাই। রমেশের সেই জাতীয় মানসিক বল ও বিশিষ্ট চরিত্রের একান্ত অভাব ছিল। কমলা দিনের পর দিন যতই বিদ্রোহিনী হইয়া উঠিয়াছে, ততই রমেশ উত্তরোত্তর অসহায় বোধ করিয়াছে। বাস্তব কোন সমস্যার চিন্তা মাত্র করিতে গেলেই তাহার অন্তর শূন্যময় হইয়া যায়, তাহার সমাধান তো দূরের কথা। স্টীমার যাত্রার দ্বিতীয় দিনেই রমেশ ভাবিয়াছে, "আমার ভাগ্য যদি আমাকে ওই কেরানিটির মতো একটি সংকীর্ণ অথচ সুস্পষ্ট জীবন-যাত্রার মধ্যে বাঁধিয়া দিত, হিসাব লিখতাম, কাজ করিতাম, কাজে ত্রুটি হইলে প্রভুর বকুনি খাইতাম, কাজ সারিয়া রাত্রে বাসায় যাইতাম—তবে আমি বাঁচিতাম, আমি বাঁচিতাম।"

এই মনোভাবের স্বরূপ যাহাই হউক, তাহা যে বাস্তব যে-কোন গুরুতর সমস্যাকে যে কোন উপায়ে পরিহার করিয়া পলাইয়া বেড়াইতে চায়, পরিশেষে যাহাই ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে, তাহাকেই ভাগ্য বলিয়া মানিয়া লইয়া নানা দার্শনিক চিন্তায় মুখর হইয়া উঠে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। স্থির নিঃসংশয়াত্মক বুদ্ধি যে চরিত্রের প্রকাশ, রমেশের সে চরিত্র আজও গড়িয়া উঠে নাই। তাহার জীবনকে সে যে ভাবে ইচ্ছা ভাসাইয়া দিক, তাহার সহিত বিজড়িত হইয়া আর একটা জীবন যে সর্বনাশের অতলে তলাইয়া যাইতেছে, তাহা অনুভব করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। এমনি করিয়া

দ্বিতীয় দিনও কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিন কমলার মানসিক অবস্থা এমন একটি পরিণাম লাভ করিয়াছে, যাহাতে রমেশেরও স্বপ্ন ভঙ্গ না হইয়া পারে নাই। "রমেশ বুঝিল, সমস্যা ক্রমশ প্রতিদিনই কঠিন হইয়া আসিতেছে। অতি শীঘ্র ইহার একটা শেষ মীমাংসাও আবশ্যক। হেমননলিনীর সঙ্গে একবার স্পষ্ট বোঝাপড়া হইয়া গেলে, কর্তব্য নির্ধারণ যে সহজ হইবে, ইহা রমেশ মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিল।"

লক্ষ্য করিতে পারা যায়, রমেশের ইতিপূর্বের সিদ্ধান্ত কোন সিদ্ধান্তই ছিল না। কমলার বিদ্রোহে চমকাইয়া উঠিয়া সে অমনি একটা কিছু স্থির করে, ওই দিকটা কোন কারণে এতটুকু প্রশমিত হইলে, আবার সে উন্মনা হইয়া যায়। হেমনলিনীকে রমেশ তো মন হইতে একপ্রকার বিদায় দিয়াই ছিল, এবং সেই বেদনা প্রশমিত করিতে অমন বিরাট দার্শনিক চিন্তাও করিয়াছিল, আজ আবার নূতন করিয়া তাহার সহিত বোঝাপড়া করিবার কথা উঠে কেমন করিয়া। কমলাকে সে জীবনে সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লইবার জন্যই তো প্রস্তুত হইয়াছিল। তাই বলিয়াছিলাম, রমেশের জীবনে এই সংকল্প সত্য নয়। তাহার অন্তরে কমলার জন্য কোন সমস্যা জাগে নাই।

হেমনলিনীর সহিত তাহার বোঝাপড়া কেমন করিয়া হইবে, ততদিন বিদ্রোহিনী কমলার সহিত তাহার সম্পর্ক কোন্ পরিণামে আসিয়া পেঁছাইবে, কমলাকে তখন ত্যাগ করা আরও দুঃসাধ্য হইবে কি-না, রমেশ সেই সমস্ত দিক চিন্তা করিয়া দেখে নাই। যে কারণে সে কমলাকে তাহার সত্য পরিচয় দিতে এতদিন ইতস্ততঃ করিয়াছে, সে কারণ তো আজও অব্যাহত আছে। বরং তাহার এতদিনের দুর্বলতা কমলার ভাগ্যকে আরও শোচনীয় করিয়া তুলিবে।

ইতিমধ্যে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী আসিয়া পড়িলে, রমেশ আবার বাস্তব সমস্যা হইতে আত্মগোপন করিয়া ফিরিয়াছে। রমেশের এই মনোভাব তাহার সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত মনের পরিচয় বহন করে। রমেশের এই মানসিক বিপর্যয়ের স্বাভাবিক যে কারণ থাকুক-না-কেন, তাহার বিচার পৃথকভাবে করা যাইতে পারে। কিন্তু, তাহার এই বর্তমান মানসিক অবস্থার স্বরূপ অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। রমেশের চিন্তা ছিল, কল্পনা ছিল, তীক্ষ্ণ অনুভূতি ছিল, তীব্র হৃদয়বোধ ছিল, কিন্তু যে চরিত্রের উপর ভিত্তি করিয়া এই সমস্ত কিছু ফলপ্রসূ হয়, সে চরিত্র ছিল না।

এমনি করিয়া স্টিমারে আরও কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। গাজিপুরে পেঁছাইতে আর মাত্র একদিন আছে। রমেশ স্থির করিয়াছিল, হেমনলিনীর সহিত একটা বোঝাপড়া হইয়া গেলে, কমলা সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। কিন্তু হেমনলিনীর সহিত রমেশ বোঝাপাড়া করিবে কি, মাত্র

চিন্তা করিয়াই সে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার জন্য তাহাকে অনেক বাধা জয় করিয়া উঠিতে হইবে, অনেক অপমান সহ্য করিতে হইবে, অনেক সংশয়, অনেক অবিশ্বাস কাটাইয়া উঠিতে হইবে। কমলা তাহার পরিণীতা স্ত্রী নয়, ইহা প্রমাণ করিতে গেলে চতুর্দিকে যে কদর্য ও মালিন্যের ঢেউ জাগিবে, তাহার পর প্রেমের আর কোন গৌরব থাকিবে না।

রমেশের এই দুর্বলতার কথাই বারংবার উল্লেখ করিয়াছি। সংগ্রাম করা তো দূরের কথা, সমস্ত ব্যাপারকে তলাইয়া চিন্তা করিতে গিয়া রমেশের বুকের রক্ত হিম হইয়া গিয়াছে। তাই রমেশ এদিকের চিন্তা সভয়ে পরিহার করিয়াছে। রমেশ চিন্তা করিল, "হেমনলিনী তো রমেশকে ঘৃণা করিতেছে—এই ঘৃণাই তাহাকে উপযুক্ত সৎপাত্রে চিত্ত সমর্পণ করিতে আনুকূল্য করিবে।" আপনার হৃদয়ের দুর্বলতাকেই রমেশ হেমনলিনীর উপর এমন করিয়া প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে, কারণ হেমনলিনী সম্পর্কে এমন চিন্তা করিবার মত কোন পরিচয়—সে ইতিপূর্বেও যেমন ইতিমধ্যেও তেমনি, লাভ করে নাই।

এই সংগ্রাম বিমুখতা, নিশ্চেষ্টতা ও চিত্ত দৌর্বল্যের জন্যই হেমনলিনীর আশা পরিত্যাগ করিয়া রমেশ আবার কমলার সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছে,—"কমলাই আমার স্ত্রী—আমি তো তাহাকে স্ত্রী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। মন্ত্রপড়া হয় নাই বলিয়াই কোন সঙ্কোচ করা অন্যায়। যমরাজ সেদিন কমলাকে বধূরূপে আমার পার্শ্বে আনিয়া দিয়া সেই নির্জন দ্বীপের সৈকতে স্বয়ং গ্রন্থি বন্ধন করিয়া দিয়াছেন—তাঁহার মতো এমন পুরোহিত জগতে কোথায় আছে।"

কমলা সম্পর্কে তাহার চিন্তা যেমনই হোক, তাহা আদৌ আন্তরিক নয়। হেমনলিনীকে লাভ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া সে কমলা সম্পর্কে ওই জাতীয় চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়াছে। যদি কমলার প্রতি তাহার সত্য প্রেম থাকিত এবং ওই প্রেমে সে সকল অধ্যাত্ম সংগ্রাম, সকল বাস্তব দশা জয় করিয়া উঠিত,—সেই অতি স্থির গভীর আত্মপ্রত্যয়,—তাহা হইলে হেমনলিনীর চিন্তা ওই সঙ্গে বিজড়িত হইয়া জাগিত না। কমলাকে স্ত্রীরূপে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য সে মনে মনে যে যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছে, তাহা কতদূর ভারসহ, সে বিচার করিয়া লাভ নাই। কারণ, তাহা তাহার গভীর প্রেমপ্রসূত নয়।

গাজিপুরে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর গৃহে অতিথি হইয়া রমেশ আবার নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছে—কোন গভীর জিজ্ঞাসা নাই, আত্মবিশ্লেষণ নাই, বিরুদ্ধ সংস্কারের সহিত সত্যকারের কোন সংগ্রাম নাই। এমনি করিয়া তাহার একটির পর একটি দিন কাটিয়া চলিয়াছে। কমলার বিদ্রোহে আবার রমেশ

কতকটা আত্মস্থ হইয়া স্থির করিল, "না আর না। কালই কলিকাতায় গিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিবে। কমলাকে আমার স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে যতদিন বিলম্ব হইতেছে, ততই আমার অন্যায় বাড়িতেছে!"

লক্ষ্য করিতে পারা যায়, মাত্র এই কয়েক দিনের স্টিমার যাত্রায়, এবং গাজিপুরে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর গৃহে কয়েকদিন অবস্থানকালে, রমেশ তাহার নিস্তেজ মনটাকে কতবার সজাগ করিয়া কমলা সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে, কতবার ইহার ঠিক পরমুহূর্তেই কমলার ভাবনা একান্তে সরাইয়া রাখিয়া হেমনলিনীর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া তাহার সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবার জন্য সংকল্প করিয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া রমেশের যে কোন্ মনের পরিচয় লাভ করা যায়, তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

কমলা সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াই, রমেশ আইন ব্যবসাসংক্রান্ত কয়েকটি কাজ শেষ করিয়া আসিবার জন্য কলিকাতায় গেল। কলিকাতায় আসিয়া রমেশের এই সিদ্ধান্ত আবার শিথিল হইয়া পড়িল। আবার হেমনলিনীর স্মৃতি প্রবল হইয়া, তাহার সমস্ত চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল। আবার রমেশ মনে মনে হেমনলিনীর সহিত কমলার তুলনা না করিয়া পারিল না। তাই দেখিতে পাই, কলিকাতায় পেঁছাইয়া রমেশ হেমনলিনীর সাক্ষাৎ লাভের আশায় তাহার গৃহে ছুটিয়া গিয়াছে। কোন ফলাফল চিন্তা না করিয়াই রমেশ হেমনলিনীর গৃহে ছুটিয়া গিয়াছিল! কিন্তু রমেশ হেমনলিনীর সাক্ষাৎ পাইল না। আসিয়া শুনিল, তাহারা পশ্চিমে কোন এক স্থানে বেড়াইতে গিয়াছে। রমেশ নলিনাক্ষেরও সামান্য সংবাদ পাইল। রমেশ নলিনাক্ষের সংবাদ পাইবামাত্রই চিন্তা করিয়া লইল যে, হেমনলিনী তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে এবং নলিনাক্ষের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে চলিয়াছে। হেমনলিনীর দিক হইতে ইহা সত্য হইলেও, রমেশের ক্ষুণ্ণ বোধ করিবার কোন কারণ ছিল না। যে কারণের জন্যই হোক, এ পর্যন্ত হেমনলিনীকে কোন সংবাদ না দিয়া সে তো তাহার প্রতিশ্রুতির কোন মর্যাদাই রক্ষা করে নাই। বস্তুতঃ রমেশ তাহার নিজের দুর্বলতার জন্যই হেমনলিনী সম্পর্কে মুহূর্তেই অমন একপ্রকার চিন্তা করিয়া লইতে এতটুকু সংকোচ বোধ করে নাই। আপনার উপর শ্রদ্ধা হারাইয়া রমেশ এমনি করিয়া সকলকে অশ্রদ্ধা করিতে সুরু করিয়াছে। অথচ আমরা জানি এখনও পর্যন্ত হেমনলিনী তাহার অন্তরের মধ্যে রমেশের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা ও প্রেম লইয়া তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।

যাহাই হউক, রমেশ হেমনলিনীর আশায় জলাঞ্জলি দিয়া কমলাকে

স্বীকার করিয়া লইবার জন্য চিত্ত স্থির করিয়া, অন্তরের মধ্যে নানা স্বপ্ন সাধ গড়িয়া তুলিয়া গাজিপুরে ফিরিয়া আসিল।

ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সহায়তায় ও তত্ত্বাবধানে রমেশ গঙ্গার ধারে একটি বাংলো ভাড়া করিল। স্থির হইল, বাংলাটিকে বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়া রমেশ ও কমলা দুই চারি দিনের মধ্যে সেইখানে উঠিয়া যাইবে।

রমেশ ও কমলা দুইজনেই ভবিষ্যৎ সংসার গড়িয়া তুলিবার স্বপ্নে বিভোর। সেই স্বপ্নে বিভোর হইয়া, তাহারা দুইজনেই বাংলোখানিকে যত শীঘ্র সম্ভব বাসোপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠিল। কিন্তু আরও দুই চারিদিন বিলম্ব হইবে দেখিয়া, রমেশ তাহার আদালতে প্রবেশ সম্বন্ধীয় কাজে পরদিন এলাহাবাদে চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে কমলা হেমনলিনীর নিকট লিখিত রমেশের এক পত্রে আপনার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিল। জানিতে পারিল যে, রমেশ তাহার স্বামী নহে। আকস্মিক এই অতি নিষ্ঠুর পরিচয় লাভে অপরিসীম লজ্জায় ঘৃণায় কমলা মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে চাহিল। কি করিবে কমলা কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। নারী হইয়া এমন লজ্জার কথা সে কোন্ নারীকে খুলিয়া বলিবে। অথচ রমেশ যে-কোন মুহূর্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে।

মানসিক এই অবস্থা চলাকালে কমলা রমেশের একটি দীর্ঘ পত্র পাইল। সে পত্রে রমেশ কমলার নিকট আপনার অকুণ্ঠিত প্রেম নিবেদন করিয়াছিল। সেই প্রত্যাশা লইয়া রমেশ গাজিপুরে ফিরিয়া আসিতেছে। রমেশের অন্তরে কত স্বপ্ন, কত সাধ, কত না প্রেমের প্রতিশ্রুতি। কমলা সেইদিন রাত্রে একাকী গোপনে রমেশের গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। রমেশ গৃহে ফিরিয়া জানিল, কমলা তাহার পাতান নূতন সংসার, তাহার হৃদয় শূন্য করিয়া, তাহার সকল সাধ, সকল স্বপ্ন, সকল আশা ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

এই সংবাদ শুনিয়াই "রমেশের বুকের ভিতরটা যেন শুকাইয়া গেল—তাহার মধ্যে অশ্রুর বাষ্পটুকুও ছিল না। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, একদিন এই কমলা গঙ্গার জল হইতে উঠিয়া আমার পাশে আসিয়াছিল, আবার পূজার পবিত্র ফুলটুকুর মতো আর একদিন এই গঙ্গার জলের মধ্যেই অন্তর্হিত হইল।

"সূর্য যখন অস্ত গেল, তখন রমেশ আবার সেই গঙ্গার ধারে আসিল—যেখানে চাবির গোছা পড়িয়াছিল, সেখানে দাঁড়াইয়া সেই পায়ের চিহ্ন কটি একদৃষ্টে দেখিল, তারপরে তীরে জুতা খুলিয়া ধুতি গুটাইয়া লইয়া খানিকটা জল পর্যন্ত নামিয়া গেল এবং বাক্স হইতে সেই নূতন নেকলেসটি বাহির করিয়া দূরে জলের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিল।"

রমেশ উদ্ভ্রান্ত হইয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শোকের প্রথম প্রাবল্য কতকটা সহনীয় হইয়া আসিল বটে, কিন্তু অন্তরের অতল স্পর্শ শূন্যতাকে সে কেমন করিয়া পূর্ণ করিবে। মানুষের স্নেহলাভের জন্য, সংসারের জন্য তাহার চিত্ত নিয়ত হাহাকার করিতে লাগিল। আবার নূতন করিয়া হেমনলিনীর স্মৃতি তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। হয়ত হেমনলিনী তাহার এই জীবনকে একটা শান্ত পরিণাম দান করিতে পারে। হয়ত হেমনীলনী তাহার প্রেম লইয়া আজও প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। হেমনলিনী সম্পর্কে আজ পর্যন্ত সে যাহা ভাবিয়া আসিয়াছে, তাহা হয়ত সত্য নয়। দৈব তাহাকে যে বন্ধন দিয়াছিল আবার দৈবই তাহাকে সেই বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছে, কিন্তু মাঝখানে হৃদয় লইয়া এ-কী হার-জিতের খেলা হইয়া গেল। দৈবের নির্মম খেলার মাঝখানে সে-ই শুধু দেউলিয়া হইয়া গেল। এই বঞ্চিত জীবন লইয়া আজ যদি সে হেমনলিনীর প্রসাদ ভিক্ষা করে, তাহা হইলে হেমনলিনী কি তাহাকে দূরে সরাইয়া দিতে পারিবে? যে অপরাধ তাহার ইচ্ছাকৃত নয়, তাহা যদি আদৌ কোন অপরাধ হয়, তবে হেমনলিনী তাহাকে ক্ষমা করিবে না? প্রেম ত সকল অপরাধকে বুকে টানিয়া লয়।

রমেশ আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। অন্নদাবাবুর গৃহে খোঁজ করিয়া এক যোগেন্দ্র ছাড়া আর কাহারও কোন সংবাদ সে সংগ্রহ করিতে পারিল না।

রমেশ বিশাইপুরে গিয়া যোগেন্দ্রকে কমলাসংক্রান্ত আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। রমেশের এই বিবরণ যোগেন্দ্র অবিশ্বাস করিতে পারিল না। আর তাহার একটা অনুশোচনাও হইতে লাগিল, যে সেই রমেশকে সন্দেহ করিয়া বিবাহ ভাঙিয়া দিয়াছিল। ত্রুটি ক্ষালনের জন্য যোগেন্দ্র রমেশকে সঙ্গে লইয়া কাশী যাত্রা করিল। ইতিমধ্যে নলিনাক্ষের সহিত হেমনলিনীর বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে।

শিশিরসিক্ত একগুচ্ছ ফুটন্ত ফুলের মত হেমনলিনী তাহার অশ্রুজল-ধৌত শুভ্র অন্তরটিকে নলিনাক্ষের চরণে সমর্পণ করিতে চলিয়াছে। কাল নলিনাক্ষের মাতা তাহার হস্তে আশীর্বাদী কঙ্কন পরাইয়া গিয়াছেন। আজ প্রভাত হইতে তাহার মন শ্রদ্ধায় ভক্তিতে সমর্পণের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এমন সময় রমেশ আসিয়া উপস্থিত। তাহার পুণ্য জীবনে রমেশ আবার কি কোন অভিশাপ বহন করিয়া আনিল? প্রেতদৃষ্টের মত হেমনলিনী সভয়ে গৃহাভ্যন্তরে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। পথশ্রমে ক্লান্ত রমেশ

কিছুক্ষণ অভিভূতের মত দ্বারসম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর একাকী নীরবে পথে বাহির হইয়া গেল।

ইহ সংসারে রমেশের আর কোথাও কোন বন্ধন রহিল না। এখন তাহার আর একটি মাত্র কর্তব্য আছে। এই শহরে নলিনাক্ষ ডাক্তার নামে একজন ডাক্তার আছে। সে যদি কমলার স্বামী হয়, তবে সে তাহাকে কমলার সকল সংবাদ খুলিয়া বলিবে, বলিবে কমলাকে তাহার কোন অপরাধ স্পর্শ করে নাই। তাহার পর সে ছুটি পাইবে। সকল কর্ম, সকল দায়, সকল কর্তব্য হইতে সে মুক্তি লাভ করিয়া বাঁচিবে।

নলিনাক্ষের গৃহে খোঁজ করিতে আসিয়া ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তিনি তাহাকে তাঁহার গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। সেখানে কমলার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। কমলাকে দেখিয়া রমেশ চমকিয়া উঠিয়াছে। কমলা জীবিত আছে! সেদিন কমলা রমেশের কোন সংবাদই জানিতে চাহিল না, তাহাকে দিয়া তাহার জীবনের শেষ কণ্টকটুকু শুধু তুলাইয়া লইল। রমেশকে কমলা কেবল একটিমাত্র অনুরোধ করিল, তাহার পূর্ব জীবনের কোন সংবাদ সে যেন কাহারও নিকট প্রকাশ না করে। রমেশ কমলাকে সে প্রতিশ্রুতি দিল। কমলা তাহার জীবনদাতৃকে অন্তরের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ঢালিয়া নীরবে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমেশ তাহার পর ইহ সংসার ত্যাগ করিরা চলিয়া গেল। এই সময় রমেশ হেমনলিনীকে যে পত্র দিয়াছিল, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"এখনো কমলাকে সম্পূর্ণ ভুলিতে পারি নাই। ভুলি বা না ভুলি, তাহাতে সংসারে আমি ছাড়া আর কাহারো কোন ক্ষতি নাই। আমারই বা ক্ষতি কিসের! সংসারে যে দুটি রমণীকে আমি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, তাহাদিগকে বিস্মৃত হইবার সাধ্য আমার নাই এবং তাহাদিগকে চিরজীবন স্মরণ করাই আমার পরম লাভ।"

রমেশ হেমনলিনীকে ভালবাসিয়াছিল। যখন মিলনের লগ্নটি ঘনাইয়া আসিয়াছে, এমন সময় ভাগ্য তাহাকে দূরে সরাইয়া লইয়া গেল। কমলাকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালোবাসিবার পর সে জানিয়াছে—কমলা তাহার স্ত্রী নহে। তাহার পর আবার একবার হেমনলিনী আবার একবার কমলা,—এমনি করিয়া বারবার হৃদয় পূর্ণ করিয়া শুধু অশ্রু-সমুদ্র দুই চক্ষে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। জীবন ভোর সে যে এমন করিয়া শুধু দুঃখ ও বঞ্চনা ভোগ করিল, তাহার জন্য দায়ী কে? মানুষের জীবনে এই যে নিয়তি লীলার সাক্ষাৎকার, তাহাতে মানুষের সান্তনা কোথায়।

যে সাধনা এই নিয়তি লীলারও ঊর্ধ্বে মনুষ্যত্বের গৌরব ঘোষণা করে,

কেবলমাত্র সেই সাধনা প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে। যে সাধনায় মানুষ জীব-জীবনের সর্ববিধ লাঞ্ছনা জয় করিয়া উঠে, তাহাই অমৃতের সাধনা। রমেশ তাহার জীবনে গভীরতম দুঃখভোগ, নিরতিশয় নিষ্ঠুর বঞ্চনার ভিতর দিয়া সেই অমৃতের কতকটা আভাস লাভ করিয়াছে। তাই দেখিতে পাই, বাহিরের কোন দুঃখ, কোন ক্ষতি, কোন বঞ্চনা রমেশের জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে নাই।

যে শক্তিতে নর-নারীর দেহ দশা বিজড়িত প্রেম পরিণামে জীবের সকল দশা মুক্ত শুদ্ধ ধ্যান পরিণাম লাভ করে, নর-নারীর সেই শক্তি অধ্যাত্ম শক্তি। রমেশের প্রেম তেমনি এক নির্দ্বন্দ্ব, শান্ত পরিণাম লাভ করিয়াছে। এখানে বাস্তব জীবনের সকল লাভ ও ক্ষতি অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়!

গোরা

ভারত-সন্ধানে

১

গোরার ধ্যানের ভারতবর্ষ ও বাস্তব ভারতবর্ষের মধ্যে সংযোগ ও সামঞ্জস্য সাধনের সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও ব্যর্থতা, তাহার আধ্যাত্মিক শূন্যতাবোধ এবং এই শূন্যতাবোধের ভিতর দিয়া পরিণামে যে নব-চেতনার জন্ম,—এই প্রত্যেকটি পর্যায় রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনেও লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

যে লক্ষ্যাভিমুখীন করিয়া ভারতবর্ষ তাহার সমাজকে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছিল, তাহার সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, নীতি, ধর্ম ও দর্শনকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, ব্যক্তি ও সমাজের সকল দিক ছিল যে দিব্য-সাধনার প্রতীক, অন্তহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই যে এক তত্ত্বের বন্ধন, যাহা যুগে যুগে সকল বৈচিত্র্যকে আত্মসাৎ করিয়াছে, সেই যে স্থিতি ও গতি, স্থূল ও সূক্ষ্ম, অতীত ও বর্তমান, আদর্শ ও বাস্তব, জড় ও চিত্তের সামগ্রিক সমন্বয় সাধনের সাধনা, তাহা ঠিক কোন সময়ে ধীরে ধীরে দুর্বল হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়, ইহার প্রকৃত কারণ কি তাহার কোন আলোচনা আপাততঃ না করিয়া বলিতে পারা যায় যে, ইংরেজ-শাসন সুরু হইবার অনেক পূর্বেই তাহা সম্পন্ন হয়।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতেই মৃত সমাজের সহস্র বিকৃতি একান্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া উঠে। উহাকে আর কোন উপায়ে আর কোন তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া ঢাকিয়া রাখিতে পারা যাইতেছিল না।

এই সকল বিকৃতি দূর করিতে তখন হইতে নানা দিকে নানা চেষ্টা চলিতে থাকে।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যে একটি সম্প্রদায় সকল আদর্শভ্রষ্ট উন্মার্গ জীবন যাপন করিতে সুরু করে, জাগ্রত প্রাণ-মনের সেই যে এক প্রকার মোহন আত্মহত্যা তাহার উল্লেখ আর নাই বা করিলাম। এই দেশীয় সমাজের উপর ইংরেজি শিক্ষার প্রতিক্রিয়া দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থায় আত্মপ্রকাশ করে। একটি সম্প্রদায় এদেশের সমস্ত কিছুকে, বর্তমানসমেত তাহার সমগ্র ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া পাশ্চাত্ত্যের ভাব ও রীতিকে একমাত্র সত্যাদর্শরূপে অনুকরণ করিতে সুরু করে। ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে। এই জাতীয় চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, অর্থাৎ দেশের আর একটি সম্প্রদায় এই দেশের সমস্ত কিছুকেই তৎকালীন সমাজের সর্ববিধ ভ্রষ্টতা ও অনাচার পর্যন্তকেও শ্রেয় বলিয়া মানিয়া লইতে এবং তাহা

সপ্রমাণ করিতে সুরু করে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, আর একটি সম্প্রদায় গভীর হৃদয়বোধ বশতঃ জীবনের সকল গভীর জিজ্ঞাসাকে আপাততঃ একান্তে সরাইয়া রাখিয়া সামাজিক বিবিধ অনাচারের আশু প্রতিকার মানসে সংকল্পবদ্ধ হয়। এই সকল চেষ্টা ছাড়া, আরো কয়েকটি চেষ্টার রূপ ধীরে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এই সকল চেষ্টা আশু কোন সংস্কারসাধনে নিয়োজিত না হইয়া, ইহার মূল কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। এখান হইতে জাতি, সমাজ ও ব্যক্তির জীবন-সম্পর্কিত গভীরতর জিজ্ঞাসার সুরু।

তাঁহারা দেখিলেন, এই জাতি এবং এই সমাজের প্রাণ ধর্মে রহিয়াছে। তাঁহারা তাই এই ধর্মবোধকেই নানাভাবে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার সত্যরূপটির পরিচয় লাভ করিবার জন্য ইঁহাদের মধ্যে অনেকে অতীতের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, সুদূর বৈদিক কাল হইতে পৌরাণিক কাল পর্যন্ত যত ধর্ম ও দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে, একে একে তাহাদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। কেহ বেদকে, কেহ বেদান্ত বা উপনিষদকে একমাত্র সত্যরূপে আশ্রয় করিলেন, কেহ বা পৌরাণিক সংস্কৃতিকে, কেহ ইহাদের কোন একটিতে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া, নূতন ধর্মপথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতাত্মার সন্ধানলাভের এই বিচিত্র সাধনার ইতিহাস অচিন্তনীয় ব্যাপ্ত ও গভীর। কিন্তু এই সকল চেষ্টার একটি সাধারণ লক্ষণ হইল, ইঁহাদের সকলেই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে কোন না কোন রূপে স্বীকার করিয়াছেন।

ভারতীয় সাধনা, ভারতের বর্তমান সমস্যা ও ইহার সমাধানের স্বরূপ সম্পর্কে গোরা যে মত প্রচার করিয়াছে, সে মত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে এককালে পোষণ করিতেন, তাহা রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধ পাঠকমাত্রেই জানেন, এক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া, তাঁহার 'স্বদেশ' ও 'ভারতবর্ষ'—এই গ্রন্থ দুইখানির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতের সমাজ-সাধনা, ধর্ম-সাধনা, জীবন-সাধনা, তাহার বিচিত্র উপাসনা ও পূজাপদ্ধতি, জাতি-ভেদ প্রভৃতি সম্পর্কে গোরার যে অভিমত, তাহা এককালে রবীন্দ্রনাথেরও অভিমত ছিল।

বাস্তব ভারতবর্ষের সহিত গোরার পরিচয় যতই গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে, সে পরিচয় যতই দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, ততই তাহার বিচারের ভিত্তি ভাব-লোক হইতে সরিয়া আসিয়া বাস্তব জীবনকে আশ্রয় করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও বোধের এমনি একটি ধীর স্থানান্তরীকরণ বা রূপান্তরীকরণ ক্রিয়া চলিতে থাকে।

গোরার মত তিনিও একদিন স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করেন যে বর্তমান ভারতবর্ষীয় সমাজ যে কারণেই হোক, অতীত সমাজ-ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন

হইয়া গিয়াছে এবং এই বিচ্ছিন্নাবস্থা এত দীর্ঘকালের যে, তাহাকে তাহার সেই পূর্ব জীবনধারায় প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এমন অনেক নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে, যাহা প্রাচীন ভারতবর্ষে কোনকালে সম্ভব ছিল না।

অতীত ভারতবর্ষ যে লক্ষ্যাভিমুখীন করিয়া তাহার পূর্ণাঙ্গ সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা যতটা শাশ্বত জীবনাদর্শ, চিরন্তন মানব সত্যের অনুকূল, তাহার সেই যে অমর-ভাগ (ইহার যে নামই দেওয়া যাক না কেন), তাহা বর্তমান কালে যেমন থাকিবে, ভবিষ্যৎ কালেও তেমনি থাকিবে। তবে বিশিষ্ট স্থান-কাল ও অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া তাহার ওই আদর্শ রূপায়ণের যে বিশিষ্ট কলাকৌশল তাহা বর্তমান কালে আর কোন উপায়ে প্রয়োগ করা সম্ভব হইবে না। কারণ, ভারতীয় সমাজের সেই সম্পূর্ণ অবস্থাটাই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

এখন একমাত্র উপায় হইল, একদিকে বাস্তব জীবনে সকল সমস্যাকে যেমন সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হইয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, তেমনি অন্যদিকে স্বাভাবিক যুক্তি; বিচার ও কল্যাণবোধের সহায়তায় এই সমস্ত কিছুর সংস্কার-সাধন করিতে হইবে। আর এই সকল প্রয়াস যাহাতে সেই শাশ্বত জীবনাদর্শমুখীন হইয়া তাহারই প্রতীক বা রূপক হইয়া উঠে, অর্থাৎ তাহাকেই সার্থক করিতে চাহিয়া যাহাতে জীবনের সকল প্রয়াস নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহার জন্য সেই বোধটিকে হৃদয়ে সদা ধারণ করিয়া রাখিতে হইবে—তাহাকেই সর্বত্র সঞ্চারিত করিয়া দিতে হইবে।

সমাজ-সংস্কারের এই উভয়মুখী প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা রামমোহন রায় হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল চিন্তাশীল দেশনায়কই স্বীকার করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই চেষ্টায় কিছু বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বটিই তাঁহাকে অন্যান্য সংস্কারক হইতে কতকটা বিশিষ্ট করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম-সাধনায় ভারতীয় ধর্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনার কোন প্রতীককেই স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথকে আপন অন্তরের মধ্যে আপনার সাধন-পথ কাটিয়া লইতে হইয়াছে। তাহা জ্ঞান মাত্রেরই সাধনা নয়, ভাবেরও সাধনা বলিয়া সে সাধনায় প্রতীক থাকিতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনার ক্রমোন্নতির সঙ্গে প্রতীকের ধীর অভিব্যক্তির কোন ধারাবাহিক আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই। অথচ এই আলোচনা ব্যতিরেকে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনার স্বরূপ উপলব্ধি এক প্রকার অসম্ভব।

বর্তমান কালে অন্য যে কয়েকজন ভারতীয় মহাপুরুষ এই চিরন্তন

শ্রেয়কে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা অতীত ভারতবর্ষীয় সমাজ হইতে বর্তমান ভারতবর্ষীয় সমাজের (তাহার সহস্র বিকৃতি ও অনাচার সত্ত্বেও) বিচ্ছিন্নতাকে একান্তরূপে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহারা তাই অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে অতীত ভারতবর্ষের কোন-না-কোন প্রতীককে স্বীকার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের গোরা কোন বিশেষের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই। তাহাকে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া সকল বিশেষ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণের সন্ধান করিতে হইয়াছে। ইহা কোন বিশেষের ভিতর দিয়া নির্বিশেষ সত্যোপলব্ধি নয়। গোরার নিকট বিশেষের বোধ মাত্রেই বন্ধন। গোরা তাই পরিণামে সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে। এই বন্ধন রবীন্দ্রনাথকেও ছিন্ন করিতে হইয়াছিল এবং ইহার জন্য তাঁহাকেও দুশ্চর তপস্যায় নিমগ্ন হইতে হয়।

এই সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের যে অভিমত প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই, যে ভূমা বা ঈশ্বরীয় বোধের সাধনা নানা পরিণামে সকল কালের, সকল জাতি ও ধর্মসম্প্রদায় কোন-না-কোন ভাবে করিয়াছে এবং আজও করিতেছে, ভবিষ্যতে ইহাকেই উত্তরোত্তর গভীর করিয়া লাভ করিতে থাকিবে। আজ পৃথিবীর সকল দেশ, সকল জাতি ও সম্প্রদায় পরস্পরের একান্ত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। এখন প্রয়োজন, এই ভূমা বা শ্রেয়ের বোধটিকে সকল জাতি, দেশ ও সম্প্রদায়গত বিশেষত্ব হইতে মুক্ত করিয়া এক মহাভাবের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দেওয়া। এই এক সর্ব-বন্ধন-মুক্ত মহাজ্ঞান সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করিয়া বহিয়া যাইবে। যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের অধ্যাত্ম-সাধনা ও উপলব্ধিমাত্রেই এই স্রোত ধারাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করিয়া চলিবে।

ইহাতে জাতিগত সাধনার বৈশিষ্ট্য যে ক্ষুণ্ণ হইবে, এইরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। তবে এই বিশিষ্ট সাধনা এই সার্বভৌম বোধের যতখানি অনুকূল ততখানি সত্য এবং বিপরীতভাবে যতখানি অন্তরায় বা প্রতিকূল ততখানি মিথ্যা। কালে ওই চিরন্তন সত্য বোধের বিচারে ওই জাতীয় সাধনার বিশিষ্ট পন্থার সংস্কার সাধন করিতে হয়। এই সংস্কার সাধনের মধ্যে প্রাচীন অনেক বিষয়বস্তুকে যেমন বিসর্জন দিতে হয়, তেমনি নূতন অনেক বিষয়বস্তুকে স্বীকার করিয়াও লইতে হয়।

জাতীয় বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও আজ এমন একটা যুগ আসিয়াছে, যখন অধ্যাত্ম বা ধর্ম-সাধনা কোন উপায়ে সম্প্রদায়ের সাধনা থাকিবে না ধর্ম-সাধনা হইবে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত সামগ্রী। প্রত্যেক মানুষ আপন আপন ভাবে অধ্যাত্ম জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবে। ব্যক্তির সকল প্রয়াসকে বিচার করিতে হইবে এই ভূমাবোধের মানদণ্ডে। অর্থাৎ ব্যক্তির আচরণ যতখানি

ভূমাবোধের অনুকূল, ততখানি সত্য, যতখানি ইহার বিপরীত ততখানি মিথ্যা। ব্যক্তির আচরণের ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যা বিচারের আর কোন মানদণ্ড থাকিতে পারে না, সম্প্রদায়, সমাজ এমন কি দেশও নয়।

ধর্মের সাম্প্রদায়িক সাধনায় রবীন্দ্রনাথের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস ছিল না। এমনি করিয়া জীবনের আর সকল ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রেও তিনি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের একান্ত পক্ষপাতী।

নির্বিশেষ চেতনা নিম্নতর বোধের জগতে অর্থাৎ জাগতিক চেতনার ক্ষেত্রে যে বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া লীলা করে, তাহাই সাধকের বিশিষ্ট সাধন প্রতীক। সাধকের বিশিষ্ট মানস-গঠন অনুযায়ী নির্বিশেষ চেতনাই বস্তুতঃ সাধকের মানস-লোকে ওই বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া প্রত্যক্ষ গোচর হয়। প্রতীক তাই একটি বিশিষ্ট মানস-গঠনের একান্ত অনুকূল। সাধকের বিশিষ্ট সাধন-পদ্ধতি সম্পর্কেও ওই এক কথা সত্য। তাহার পর ওই বিশিষ্ট প্রতীক ও সাধন-পদ্ধতি যখন সম্প্রদায়ের সাধন-প্রতীক হইয়া উঠে, তখন উহা সকলের মানস গঠনের অনুকূল হয় না বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপলব্ধির সহায়ক না হইয়া অন্তরায় হইয়া উঠে। ইহাতে ভাবোপলব্ধির পরিবর্তে থাকে কতকগুলি যান্ত্রিক অনুশীলন বা অনুষ্ঠান। পরে এমন অবস্থা ঘটে, যখন ওই বিশিষ্ট সাধন-প্রতীক ও সাধন-পদ্ধতি একান্ত উপলব্ধি-শূন্য হইয়া যায়।

নর-নারী আপন আপন পথে অধ্যাত্মবোধের জন্য অনুসন্ধান তৎপর হইবে, এ জগতে সে হইবে সম্পূর্ণ একা। তবে একই ভূমার আদর্শ সকলের সম্মুখে থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র হইয়াও, তাহারা এক বোধের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে।

২

একমাত্র মনের ভিতর দিয়া মনকে অর্থাৎ সকল সীমার বোধকে ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। মানুষ যতই ব্যক্তিকেন্দ্রিক হোক, তাহার মন একটি বিচ্ছিন্ন, নিরলম্ব কোন সত্তা হইতে পারে না। অর্থাৎ তাহার মন একটি জাতির অতীত সকল সাধনা, সকল অধ্যাত্ম, ধর্ম, নীতি ও সংস্কারের জটিল প্রকাশ। মন যতই সমৃদ্ধ হয়, তাহার মধ্যে একটা জাতির প্রকাশ ততই সম্পূর্ণ হয়। অধ্যাত্ম-সাধনা তাই অনিবার্যরূপে অন্তর্জগৎ অর্থাৎ মনকে আশ্রয় করে। আর মনকে আশ্রয় করিবার অর্থ হইল জাতির সমগ্র অতীতকে অনিবার্য রূপে আশ্রয় করা।

জাতির বিশিষ্ট প্রকাশকে আশ্রয় করিয়া সকল জাতির সকল বিশিষ্টতার ঊর্ধ্বে উঠা সম্ভব। সকল বৈশিষ্ট্য বা সীমা একটি মূল সত্যকে কোন-না-

কোনরূপে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া সেই নির্বিশেষ উপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

এক-একটি বিশেষ যুগে এমন এক-একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহার নিকট অতীতের সকল সংস্কার, সকল প্রতীক, নিষ্প্রাণ বলিয়া অনুভূত হয়। তাঁহার নিকট পশ্চাতের সমস্ত পথ রুদ্ধ, অথচ সম্মুখের পথও অনাবিষ্কৃত। এই মানুষই সম্পূর্ণরূপে একা, এই মানুষই যথার্থরূপে আধুনিক। নির্বিশেষ তত্ত্বোপলব্ধি করিতে তাহাকে আপনার পথ সম্পূর্ণ আপনার নিয়মে উদ্ভাবন করিতে হয়। এই সাধনা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব সাধনা। গোরা পরিণামে এই সাধন-পর্যটিকে আশ্রয় করিয়াছে।

গোরা জাতির সকল সংস্কারকে সকল বিশেষ সত্যকে আশ্রয় করিয়াছিল এবং তাহারই ভিতর দিয়া সেই নির্বিশেষ ধ্রুব সত্যটিকে লাভ করিতে চাহিয়াছিল। সে ইহার জন্য প্রাণপণ করিয়াছে। আকস্মিকভাবে নিজের প্রকৃত পরিচয় না পাইলে, সে হয়ত ওই চেষ্টায় আপনাকে নিঃশেষ করিয়া দিত।

গোরা জাতির যে বিশিষ্ট পথ অবলম্বন করে, তাহার স্বরূপ কি, ওই পথে সে কেন সার্থকতা লাভ করিতে পারিল না, কোন্ ধীর সত্যোপলব্ধি তাহাকে ওই সাধনা-সম্পর্কে ধীরে ধীরে সংশয়ান্বিত করিয়া তুলে, সেই উপলব্ধির প্রত্যেকটি ক্রম, গোরার ওই পথ পরিহার, তাহার আধ্যাত্মিক শূন্যতাবোধ এবং পরিণামে তাহার সত্য পথের সন্ধানলাভ,—গোরার জীবনের এই প্রত্যেকটি পর্যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনেও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। ইহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার জীবনের প্রথম পর্যায়ের রচনার সহিত গোরার দেশাত্মবোধক উক্তির লেশমাত্র পার্থক্য নাই। এই সাধন-পথ সম্পর্কে গোরারই মতো তিনি বর্তমান হিন্দু সমাজ সম্পর্কে যতই বাস্তব জ্ঞান লাভ করিতে থাকেন, ততই তিনি গোরার মতোই উপলব্ধি করিতে থাকেন যে বর্তমান ভারতবর্ষীয় সমাজ অতীত ভারতবর্ষীয় সমাজ হইতে যেমন করিয়া হোক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার এই উপলব্ধি ঘটে সুপরিণত বয়সে। আমরা রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও সাধন-পথ সম্পর্কে পূর্ববর্তী রচনাবলীর দৃষ্টান্ত দিই, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি যে সম্পূর্ণ বিশিষ্ট পথ অবলম্বন করেন, সেই পথ ও সাধনা সম্পর্কে আমরা তেমন সচেতন নই, কেবল তাহাই নয়, তাহাকে এক প্রকার অস্বীকার করিবার নানা উপায় অবলম্বন করি। অবশ্য ইহাও সত্য যে, কতকটা বার্ধক্যের অসামর্থ্যজনিত, কতকটা যথেষ্ট সময়ের অভাব হেতু পথের সমস্ত লক্ষণ তাঁহার রচনার মধ্যে যথেষ্ট স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার ভার রহিয়াছে তাঁহার পরবর্তী কালের এমন কোন

মহামনীষীর উপর, যিনি নবযুগের সমগ্র আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রকাশ ও মূর্ত সাধনা।

জাতির সাধনা ও সাধন-পথ সম্পর্কে গোরা যে সকল মন্তব্য করিয়াছে, এবং গোরা যে সাধনাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে চায়, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ ঃ—

প্রত্যেক দেশ বা জাতির একটি নিজস্ব সাধনা বা আদর্শ আছে। জাতির সমগ্র প্রকাশ ওই সাধনা বা আদর্শকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কোন জাতি বা দেশকে বিচার করিতে হইবে ওই সাধনা বা আদর্শের দিক হইতে। এক জাতির সাধনা ও আদর্শ দিয়া অন্য জাতির সাধনা ও আদর্শ বিচার করিতে গেলে পদে পদে ভুল হইবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষকে বিচার করিতে হইবে একমাত্র তাহার নিজের সাধনা ও আদর্শের মানদণ্ডে।

ভারতবর্ষের সেই সাধনা ও আদর্শ যে কী, তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে, সর্বাগ্রে প্রয়োজন "যা কিছু স্বদেশের তারই প্রতি সংকোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ কয়া।" জাতির সামগ্রিক স্বীকৃতিই হইল, কোন জাতিকে উপলব্ধি করিবার প্রথম সোপান।

জাতির সাধনা ও আদর্শকে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজনীয়তা কি? জাতিকে যদি সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হয়, জাতির মর্মমূলে যদি প্রাণ সঞ্চার করিতে হয়, জাতির সংস্কার ও উন্নতিবিধান যদি করিতে হয়, তবে জাতিকে আপনার পথেই তাহা সাধন করিতে হইবে। কারণ একের নিয়মে যাহা কল্যাণ, অন্যের নিয়মে তাহা বৃহৎ বিনষ্ট হইতে পারে। গোরা বলিয়াছে, "একথা নিশ্চয় জানবেন-ভারতের একটি বিশেষ প্রকৃতি, বিশেষ শক্তি, বিশেষ সত্য আছে, সেইটের পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারাই ভারত সার্থক হবে, ভারত রক্ষা পাবে।"

ভারতবর্ষের জনসমাজ বিপুল ও বিচিত্র। ইহাদের প্রত্যেকের আচার, বিশ্বাস ও সংস্কার বিস্ময়কর ও বিচিত্র। কিন্তু, এই সমস্ত কিছুর পশ্চাতে ভিত্তিস্বরূপ একটি স্থির সত্যবোধ আছে, একটি মনুষ্যত্ব আছে—যাহা সাধারণ। এই সাধারণ সত্যবোধটিই ভারতবর্ষের নিজস্ব, প্রত্যেক ভারতবাসীর নিজস্ব। এই যে সাধারণ সত্যবোধ ও মনুষ্যত্ব, তাহা আজও অটুট আছে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো। ভারতের বর্তমান অতীতের সাধনা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই।

হিন্দুধর্মের এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা আর কোথাও তেমন করিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। হিন্দুধর্ম কোন দল বা সম্প্রদায় নয়, কোন একটিমাত্র ধর্ম বিশ্বাস, কোন একটিমাত্র জ্ঞান বা সত্যোপলব্ধি নয়। তাই যে-কোন

মানুষ তাহার বিশিষ্ট উপলব্ধি, ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার লইয়া হিন্দুসমাজে স্থান লাভ করিতে পারে। এই বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া মানুষের বহু বিচিত্র প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষ সকল কালে একটি ঐক্যের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছে। খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মে এবং তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া যে সমস্ত সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, সে সব ধর্মে ও সমাজে বৈচিত্র্যের কোন স্থান নাই।

স্বদেশ ও সমাজসম্পর্কে গোরার এই যে অভিমত, তাহা এককালে রবীন্দ্রনাথও পোষণ করিতেন। ইহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

গোরা এই বোধকে আশ্রয় করিয়াছে, সমগ্র জীবন দিয়া এই বোধকেই প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে। তখন বাস্তব ভারত-বর্ষের সহিত গোরার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে নাই। বাস্তব ভারতবর্ষের সহিত গোরার পরিচয় যতই সত্য ও নিবিড় হইয়াছে, ততই গোরার ভাবের ভারতবর্ষ, স্বপ্নের ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ইহা গোরার ভাবাদর্শের ধীর পরিবর্তনের অধ্যাত্ম সংগ্রামের পর্যায়।

দেশের সহিত পরিচিত হইতে গিয়া, গোরা সেই প্রথম বোধ করিয়াছে, দেশের বিপুল জনসাধারণ একদিকে যেমন নিবীর্য হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন তাহাদের উপর যথেচ্ছা অত্যাচার ও শোষণ করিয়া চলিয়াছে। একদিকে অপ্রতিকারের অসহায় মূক সহনশীলতার মনুষ্যত্বহীনতা, অন্যদিকে অত্যাচার করিবার অমানবিকতা। গোরা দেখিয়াছে, "দেশের জনসাধারণ এমন করিয়া নিজেদের সকল প্রকার অপমান ও দুর্ব্যবহারের অধীনে আনিয়াছে। তাহাদিগকে পশুর মতো লাঞ্ছিত করিলেও তাহারা তাহা স্বীকার করে এবং সকলের কাছেই তাহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইহার মূলে আছে এক দেশব্যাপী অজ্ঞানতা। দেশের এই চিরন্তন অপমান ও দুর্গতি শিক্ষিত লোক আপনার গায়ে লয় না— নিজেকে নির্মমভাবে পৃথক করিয়া লইয়া অকাতরে গৌরববোধ করিতে পারে।"

গ্রামের মাঝখানে গিয়া গোরা প্রথম তাহার দেশের যে পরিচয় পাইয়াছে, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন ঃ

"ভদ্র সমাজ শিক্ষিত সমাজ ও কলিকাতা সমাজের বাহিরে আমাদের দেশটা যে কিরূপ গোরা তাহা এই প্রথম দেখিল। এই নিভৃত প্রকাণ্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন, কত সংকীর্ণ, কত দুর্বল—সে নিজের শক্তিসম্বন্ধে যে কিরূপ নিতান্ত অচেতন এবং মঙ্গলসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন— প্রত্যেক পাঁচ-সাত ক্রোশের ব্যবধানে তাহার সামাজিক পার্থক্য যে কিরূপ একান্ত—পৃথিবীর বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে চলিবার পক্ষে সে যে কতই স্বরচিত ও কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত—তুচ্ছতাকে সে যে কত বড় করিয়া জানে এবং

সংস্কারমাত্রেই যে তাহার কাছে কিরূপ নিশ্চলভাবে কঠিন—তাহার মন যে কতই সুপ্ত, প্রাণ যে কতই স্বল্প, চেষ্টা যে কতই ক্ষীণ—তাহা গোরা গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন করিয়া বাস না করিলে কোন মতেই কল্পনা করিতে পারিত না।"

দ্বিতীয় বার দেশভ্রমণে বাহির হইয়া গোরা আরো নিকট হইতে দেশকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। গোরার সেই অভিজ্ঞতার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে দিয়াছেন।

"প্রত্যেক ঘরের খাওয়া দাওয়া শোওয়া বসা কাজকর্ম সমস্তই সমাজের নিমেষহীন চোখের উপরে দিনরাত্রি রহিয়াছে। প্রত্যেক লোকেরই লোকাচারের প্রতি অত্যন্ত একটি সহজ বিশ্বাস—সে সম্বন্ধে তাহাদের কোনো তর্ক মাত্র নাই। কিন্তু সমাজের বন্ধনে, আচারে, নিষ্ঠায় ইহাদিগকে কর্মক্ষেত্রে কিছুমাত্র বল দিতেছে না। ইহাদের মতো এমন ভীত, অসহায় আত্মহিত বিচারে অক্ষম জীব জগতে কোথাও আছে কি না সন্দেহ। আচারকে পালন করিয়া চলা ছাড়া কোনো মঙ্গলকে ইহারা সম্পূর্ণ মনের সঙ্গে চেনেও না, বুঝাইলেও বুঝে না। দণ্ডের দ্বারা নিষেধটাকেই তাহারা সব-চেয়ে বড়ো করিয়া বুঝিয়াছে। কী করিতে নাই এক কথাটাই পদে পদে নানা শাসনের দ্বারা তাহাদের প্রকৃতিকে যেন আপাদ-মস্তক জালে বাঁধিয়াছে। কিন্তু এ জাল ঋণের জাল; এ বাঁধন মহাজনের বাঁধন—রাজার বাঁধন নহে। ইহার মধ্যে এমন কোনো বড়ো ঐক্য নাই, যাহা সকলকে বিপদে সম্পদে পাশাপাশি দাঁড় করাইতে পারে। গোরা না দেখিয়া থাকিতে পারিল না যে, এই আচারের যন্ত্রে মানুষ মানুষের রক্ত শোষণ করিয়া তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে নিঃস্বত্ব করিতেছে।"

"যে ধর্ম সেবা দেয়, প্রেম দেয়, করুণারূপে আত্মত্যাগ করে এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধারূপে সকলকে শক্তি দেয়, প্রাণ দেয়, কল্যাণ দেয়, কোথাও তাহাকে দেখা যায় না। যে আচার কেবল রেখা টানে, ভাগ করে, পীড়া দেয়, যাহা বুদ্ধিকেও কোথাও আমল দিতে চায় না, যাহা প্রীতিকেও দূরে খেদাইয়া রাখে, তাহাই সকলকে চলিতে ফিরিতে উঠিতে বসিতে সকল বিষয়েই কেবল বাধা দিতে থাকে।"

বর্তমান ভারতবর্ষীয় সমাজসম্পর্কে গোরার এই অভিজ্ঞতা যে রবীন্দ্রনাথেরই অভিজ্ঞতা, তাহাতে কোন সংশয় নাই। গোরাকে অতীতের ধ্যানের ভারতবর্ষের সহিত বর্তমান বাস্তব ভারতবর্ষের যে সংঘাতের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথকেও তেমনি একটি দ্বন্দ্বের মধ্যে কিছুকাল কাটাইতে হইয়াছিল, তাহারও পরিচয় আছে।

পরেশবাবু একদিন বিনয় ও গোরাকে এই কথাটাই বুঝাইতে চাহিয়া

ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষকে যে আমি জানি, তা বলতে পারিনে এবং ভারতবর্ষ যে কী চেয়েছিলেন এবং কোনদিন তা পেয়েছিলেন কি না, তা আমি নিশ্চয় জানিনে, কিন্তু যে দিন চলে গেছে সেই দিনকে কি কখনো ফিরে পাওয়া যায়? বর্তমানে যা সম্ভব তাই আমাদের সাধনার বিষয়—অতীতের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে সময় নষ্ট করলে কি কোনো কাজ হবে?"

বিনয় ও গোরা সেদিন পরেশবাবুর এই কথা বুঝিতে চায় নাই। ইহার কারণ, বর্তমান ভারতবর্ষের সহিত তাহাদের পরিচয়ের একান্ত অভাব, দ্বিতীয় কারণ, পরেশবাবুর মতে তাহারা সমস্ত কিছু ধর্মের দিক হইতে অর্থাৎ সকলের চেয়ে বড়ো সত্যের দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিতেছে না।

এই কালে পরেশবাবুর সহিত সুচরিতার যে কথোপকথন হয়, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

পরেশ। আসল জিনিসটা কোথায় আছে জানলে বলতে পারতুম। আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের দেশে মানুষ মানুষকে অসহ্য ঘৃণা করছে এবং তাতে আমাদের সকলকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে, এমন অবস্থায় একটা কাল্পনিক আসল জিনিসের কথা চিন্তা করে মনসান্ত্বনা মানে কই।

সুচরিতা। আচ্ছা, সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখাই তো আমাদের দেশের চরম তত্ত্ব ছিল।

"পরেশ। সমদৃষ্টিতে দেখা জ্ঞানের কথা, হৃদয়ের কথা নয়। সমদৃষ্টির মধ্যে প্রেমও নেই, ঘৃণাও নেই—সমদৃষ্টি রাগদ্বেষের অতীত। মানুষের হৃদয় এমনতরো হৃদয়ধর্মবিহীন জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সেইজন্যে আমাদের দেশে এ রকম সাম্যতত্ব থাকা সত্ত্বেও নীচ জাতকে দেবালয়ে পর্যন্ত প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। যদি দেবতার ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে সাম্য না থাকে, তবে দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে সে তত্ত্ব থাকলেই কী, আর না থাকলেই কী।

পরেশবাবু সুচরিতাকে আরও বলিয়াছেন,—"রক্ষা পাবার জন্য একটি জাগতিক নিয়ম আছে—সেই স্বভাবের নিয়মকে যে পরিত্যাগ করে, স্বভাবতই সকলে তাকে পরিত্যাগ করে। হিন্দু সমাজ মানুষকে অপমান করে, বর্জন করে, এজন্য এখানকার দিনে আত্মরক্ষা করা তার পক্ষে প্রত্যহই কঠিন হয়ে উঠেছে। কেন না, এখন তো আর সে আড়ালে বসে থাকতে পারবে না—এখন পৃথিবীতে চারদিকের রাস্তা খুলে গেছে, চারদিক থেকে মানুষ তার উপরে এসে পড়ছে, এখন শাস্ত্র, সংহিতা দিয়ে বাঁধ বেঁধে প্রাচীর তুলে সে আপনাকে সকলের সংস্রব থেকে কোনো মত ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। হিন্দু সমাজ এখনো যদি নিজের মধ্যে সংগ্রহ করবার শক্তি না জাগায় ক্ষয়

রোগকেই প্রশ্রয় দেয়, তা হলে বাহিরের মানুষের এই অবাধ সংস্রব তার পক্ষে একটা সাংঘাতিক আঘাত হয়ে দাঁড়াবে।"

বিনয়ের বিবাহ লইয়া পরেশবাবুর সহিত গোরার যে তীব্র বাদানুবাদ হয়, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

"গোরা। ধর্মের দুটো দিক আছে যে। একটি নিত্য দিক, আর একটি লৌকিক দিক। ধর্ম যেখানে সমাজের নিয়মে প্রকাশ পাচ্ছেন সেখানেও তাঁকে অবহেলা করতে পারা যায় না,—তা করলে সংসার ছারখার হয়ে যায়।

"পরেশ। নিয়ম তো অসংখ্য আছে, কিন্তু সকল নিয়মেই যে ধর্ম প্রকাশ পাচ্ছেন, এটা কি নিশ্চিত ধরে নিতে হবে?

"গোরা। নিয়মের দ্বারা আমরা নিজেকে যদি সমাজের সম্পূর্ণ বাধ্য না করি, তবে সমাজের ভিতরকার গভীরতম উদ্দেশ্যকে বাধা দিই, কারণ এই উদ্দেশ্য নিগূঢ়, তাহাকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার সাধ্য প্রত্যেক লোকের নাই। এইজন্য বিচার না করিয়াও সমাজকে মানিয়া যাইবার শক্তি আমাদের থাকা চাই।

"পরেশ। একথা সত্য যে প্রত্যেক সমাজের মধ্যেই বিধাতার একটি বিশেষ অভিপ্রায় আছে। সেই অভিপ্রায় যে সকলের কাছে সুস্পষ্ট তা-ও নয়। কিন্তু তাকেই স্পষ্ট করে দেখবার চেষ্টা করাই তো মানুষের কাজ, গাছপালার মতো অচেতন ভাবে নিয়ম মেনে যাওয়া তার সার্থকতা নয়।

"গোরা। আমার কথাটা এই যে আগে সমাজকে সবদিক থেকে সম্পূর্ণ মেনে চললে তবেই সমাজের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের চেতনা নির্মল হতে পারে। তার সঙ্গে বিরোধ করলে তাকে যে কেবল বাধা দিই তা নয়, তাকে ভুল বুঝি।

"পরেশ। বিরোধ ও বাধা ছাড়া সত্যের পরীক্ষা হতেই পারে না। সত্যের পরীক্ষা যে কোন এক প্রাচীন কালে একদল মনীষীর কাছে একবার হয়ে গিয়ে চিরকালের মতো চুকে বুকে যায় তা নয়, প্রত্যেক কালের লোকের কাছেই বাধার ভিতর দিয়ে আঘাতের ভিতর দিয়ে, সত্যকে নূতন করে আবিষ্কৃত হতে হবে। ***আমি মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে মানি। ব্যক্তির স্বাধীনতার দ্বারা আঘাত করেই আমরা ঠিকমতো জানতে পারি কোনটা নিত্য সত্য আর কোনটা নশ্বর কল্পনা; সেইটে জানা এবং জানবার চেষ্টার উপরেই সমাজের হিত নির্ভর করছে।"

রবীন্দ্রনাথ ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, হিন্দু সমাজ বর্তমানে কোন নূতন চিন্তাধারা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাব-ভাবনা নূতন জীবন সাধনাকে আপনার

মধ্যে আর স্থান করিয়া দিতে পারিতেছে না। ইহার ফলে যাঁহারা নূতন কোন জীবন-সাধনা ধর্মবিশ্বাস প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা যেমন আপনাদের অ-হিন্দু বলিয়া সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে যাঁহারা প্রাচীনকে জড়াইয়া ধরিয়া উহাকেই কেবল টিকাইয়া রাখিবার পক্ষপাতী তাঁহায়াও নূতন কোন কিছুকে, প্রাণের নবীন যে-কোন প্রকাশকে হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্ম বিরুদ্ধ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন।

সমাজের এই যে ধীর বিশ্লেষ ও অবক্ষয় তাহা ইংরেজ আমল সুরু হইবার কাল হইতে একান্ত প্রত্যক্ষ গোচর হইলেও, ইহা সুরু হইয়াছে মধ্যযুগের ঠিক পরবর্তী অর্থাৎ প্রায় সপ্তম ও অষ্টম শতক (খ্রীষ্টাব্দ) হইতে। তাহার পর হইতে উহা আর কোন কিছু গ্রহণ করিতে ও আত্মসাৎ করিতে পারিতেছে না, সমাজের প্রাণ-মূলে কোথায় যেন নিদারুণ আঘাত লাগিয়া উহা ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতেছে। আট, নয় শত বৎসরের মুসলমান সভ্যতা তাহার নিকট কেবল ব্যর্থ ভার মাত্র, বিরোধ মাত্র বলিয়া বোধ হইয়াছে। তিনি এই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন,

"জীবনের পরিবর্তন বিকাশ, মৃত্যুর পরিবর্তন বিকার। আমাদের সমাজেও দ্রুতবেগে পরিবর্তন চলিয়াছে, কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে সচেতন অন্তঃকরণ নাই বলিয়া সে পরিবর্তন বিকার ও বিশ্লেষণের দিকে যাইতেছে—কেহ তাহা ঠেকাইতে পারিতেছে না।

"সজীব পদার্থ সচেষ্টভাবে বাহিরের অবস্থাকে নিজের অনুকূল করিয়া আনে—আর নির্জীব পদার্থকে বাহিরের অবস্থাই সবলে আঘাত করিয়া নিজের আয়ত্ত করিয়া লয়। আমাদের সমাজে যাহা পরিবর্তন হইতেছে, তাহাতে চেতনার কার্য নাই, তাহাতে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের সঙ্গে কোনো সামঞ্জস্য চেষ্টা নাই—বাহির হইতে পরিবর্তন ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে এবং সমাজের সমস্ত সন্ধি শিথিল করিয়া দিতেছে।"

তিনি অন্যত্র মন্তব্য করিয়াছেন—

"এ পর্যন্ত হিন্দু সমাজের ভিতরে থাকিয়া নব নব সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচার-বিচারের পরিবর্তন করিয়াছে, হিন্দু সমাজ তাহাদিগকে তিরস্কৃত করে নাই। আজ হইতেই সমস্তই ইংরেজের আইনে বাঁধিয়া গেছে—পরিবর্তন মাত্রেই আজ নিজেকে অ-হিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যেখানে আমাদের মর্মস্থান যে মর্মস্থানকে আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আসিয়াছি সেই আমাদের অন্তরতম মর্মস্থান—আজ অনাবৃত অবারিত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে আজ বিকলতা আক্রমণ করিয়াছে।"

ইংরেজ শাসনের কালে ইহা একান্ত প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া উঠে বলিয়া এ-দেশীয় এক শ্রেণীর চিন্তাশীল প্রচার করিতে সুরু করেন যে, পাশ্চত্য সভ্যতার সহিত এই দেশীয় সমাজের সংযোগই ইহার একমাত্র কারণ। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে এইরূপে একটি বিরোধের ভাব জাগাইয়া জনমতকে সংঘবদ্ধ করিবার একপ্রকার চেষ্টাও চলে এবং কতকটা সফলও হয়। এই বিরোধের বোধটি জাগাইয়া তুলিতে সমগ্র সমাজের দৃষ্টি ওই মুখীন হইয়া আত্মানুসন্ধানকে আরো কিছুকালের জন্য নিরুদ্ধ করিয়া দেয় মাত্র। অন্যদিকে সামাজিক বিক্রিয়া ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া চলিতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় সমাজ ইতিহাসের ধারা পূর্বাপর বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন, এই দেশীয় সমাজ এমন একটি তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়াছিল যাহার ফলে সে সকল বিরোধকে আপনার মধ্যে স্থান দান করিতে কোন কালে সঙ্কুচিত হয় নাই, সকলকে আত্মসাৎ করিয়া এক সজীব পদার্থের মতো ক্রমিক বিকাশ লাভ করিয়া ধীরে রূপান্তরিত হইয়াছে। আত্মশক্তির উপর এমন আশ্চর্য প্রত্যয় ছিল বলিয়া হিন্দু সমাজ যে-কোন দুরূহ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে ইতস্ততঃ করে নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাই আরো গভীরে দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সংযোগ ঘটিবার পূর্বে এই বিরাট দেশের উপর দিয়া মুসলমান সাম্রাজ্যের একের পর এক ঢেউ বহিয়া গিয়াছে প্রায় আট-নয় শত বৎসর ধরিয়া। ওইকালে সমাজে কোথাও কি কোন বিক্রিয়া ঘটিয়াছে? সমাজ যে ইতিপূর্বেই তাহার স্বীয় প্রতিভা, আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছে, তাহা তিনি স্পষ্টই উপলব্ধি করেন। দুটি ভাব-ধারার মিলন সাধনের চেষ্টার ভিতর দিয়া ওই কালে সমাজের অন্তস্থল উদ্ভিন্ন করিয়া যত প্রতিভা স্ফুরিত হইয়াছে, তাহা হিন্দু সমাজ কক্ষের একপ্রকার বাহিরে! দাদু, কবির, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ধর্ম আন্দোলনের কথা এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ তাহার পর বোধ করেন যে মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থার বিশুদ্ধ-রূপটি যদি ফিরাইয়া আনিতে পারা যায়, তাহা হইলে সমাজদেহে প্রাণ শক্তি নিঃসন্দেহে ফিরিয়া আসিবে। এই বিশ্বাস তাঁহার জীবনে খুব গভীর ছিল বলিয়া সবচেয়ে বেশীকাল স্থায়ী হয়।

এই বোধকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে তিনি যে কত দিক দিয়া কত চেষ্টা করেন, কত বিচিত্র রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তাহা লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া তাঁহার 'স্বদেশ', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি নিবন্ধ-গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু ওই বর্ণাশ্রম তত্ত্বের মধ্যেই যে সকল ত্রুটি নিহিত, ইহা উপলব্ধি করিতে এবং এই সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে তাঁহার

দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। যাঁহাকে তিনি প্রকৃত হিন্দু সমাজ বলিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মস্থিত সমাজ তত্ত্ব এবং বর্ণাশ্রম তত্ত্ব সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ এই দুটি তত্ত্বকে জোর করিয়া মিলাইবার ব্যর্থ চেষ্টা হইয়াছে মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায়।

ওই ব্যবস্থায় সমাজের গতি ও বিকাশ, আত্মসাৎ ও আত্মপ্রসার করিবার ক্ষমতা চিরকালের জন্য হারাইয়া ফেলে। ওই সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার পশ্চাতে রহিয়াছে ভয়—নূতনের প্রতি ভয়। তাহার মূলে রহিয়াছে বিরোধের বীজ।

তিনি বলিয়াছেন, "বৌদ্ধ পরবর্তী হিন্দু-সমাজ আপনার যাহা কিছু আছে ও ছিল, তাহাই আটে-ঘাটে রক্ষা করিবার জন্য, পর সংস্রব হইতে নিজেকে সর্বতোভাবে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য নিজেকে জাল দিয়া বেড়িয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষকে আপনার একটি মহৎ পদ হারাইতে হইয়াছে। এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে গুরুর আসন লাভ করিয়াছিল ; ধর্মে, বিজ্ঞানে, দর্শনে ভারতবর্ষীয় চিত্তের সাহসের সীমা ছিল না ; সেই চিত্ত সকল দিকে সুদুর্গম সুদূর প্রদেশ সকল অধিকার করিবার জন্য আপনার শক্তি অবাধে প্রয়োগ করিত। এইরূপে ভারতবর্ষ যে গুরুর সিংহাসন জয় করিয়াছিল, তাহা হইতে আজ সে ভ্রষ্ট হইয়াছে—আজ তাহাকে ছাত্রত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহার কারণ আমাদের মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়াছে। সমুদ্র আমরা সকল দিক দিয়াই ভয়ে ভয়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছি—কি জলময় সমুদ্র, কি জ্ঞানময় সমুদ্র। সঞ্চয় ও রক্ষা করিবার জন্য, সমাজে যে ভীরু স্ত্রী শক্তি আছে, সেই শক্তিই কৌতূহলপর পরীক্ষা প্রিয় সাধনশীল পুরুষ শক্তিকে পরাভূত করিয়া একাধিপত্য লাভ করিয়াছে। তাই আমরা জ্ঞান রাজ্যেও দৃঢ় সংস্কারবন্ধ স্ত্রৈণ-প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছি। জ্ঞানের বাণিজ্য ভারতবর্ষ যাহা কিছু আরম্ভ করিয়াছিল, যাহা প্রত্যহ বাড়িয়া উঠিয়া জগতের ঐশ্বর্য বিস্তার করিতেছিল, তাহা আজ অন্তঃপুরের অলংকারের বাক্সে প্রবেশ করিয়া আপনাকে অত্যন্ত নিরাপদ জ্ঞান করিতেছে ; তাহা আর বাড়িতেছে না, যাহা খোওয়া যাইতেছে তাহা খোওয়াই যাইতেছে।"

এই নিঃসংশয় উপলব্ধির পর হইতে তাঁহার রচনাবলী—নিবন্ধ, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি দুটি উভয়মুখীন প্রেরণায় একটি বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উৎসারিত হইতে থাকে। একটি দিক হইল মধ্যযুগীয় ওই সমাজ কাঠামোটিকে নির্মমভাবে ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা, যে তত্ত্বাশ্রয়ী করিয়া ওই সমাজকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছিল সেই তত্ত্বের মূল পর্যন্ত উপড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা, নানা দিক দিয়া নানা ভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া উহার চূড়ান্ত মূল্য নিরূপণের চেষ্টা ; অন্য দিকে হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রকৃত

যে সত্যাদর্শ, সেই বিশুদ্ধ বৈদান্তিক বা ঔপনিষদিক জ্ঞানকে সমাজের সর্বত্র সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া।

মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থার মূল নিরূপণ রবীন্দ্রনাথ নানা দিক দিয়া নানা ভাবে করিয়াছেন। কোন প্রকার মন্তব্য না করিয়া পরপৃষ্ঠায় তাঁহার কয়েকটি উক্তি পর পর উদ্ধৃত করিয়া নিলাম।

"যতদিন খাঁচায় ছিল ততদিন সে দৃঢ়রূপেই জানিত তাহার বাসা চির-কালের জন্যই কোনো এক বুদ্ধিমান পুরুষ বহুকাল হইল বাঁধিয়া দিয়াছে, আর কোনো প্রকার বাসা একেবারে হইতে পারে না, নিজের শক্তিতে তো নহেই; সে জানিত তাহার প্রতিদিনের খাদ্য-পানীয় কোনো একজন বুদ্ধিমান পুরুষ চিরকালের জন্য বরাদ্দ করিয়া দিয়াছে, অন্য আর কোনো প্রকার খাদ্য সম্ভবপরই নহে, বিশেষতঃ নিজের চেষ্টায় স্বাধীনভাবে অন্নপানের সন্ধানের যেটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে; তাহার বাহিরেও যে বিধাতার সৃষ্টি আছে এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয় এবং সীমাকে লঙ্ঘন করার চেষ্টা মাত্রই গুরুতর অপরাধ।" (ধর্মের নবযুগ)

সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থাকে গতানুগতিক করিয়া তুলিতে হইলে, জাতির প্রাণ-মনের সকল প্রকার অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা, সকল প্রকার জিজ্ঞাসা সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ করিয়া দিতে হয়, ওই সমাজ-ব্যবস্থায় তাহা সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করা হইয়াছিল। এমন জিজ্ঞাসাবিমুখ নিশ্চেষ্ট গতানুগতিকতার দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এমনি যুক্তিও কোথাও প্রয়োগ করা হইয়াছে দেখিতে পাই যে, মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থা বহির্জীবনকে কেবল নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে, কিন্তু অন্তর্জীবন বা অধ্যাত্মজীবনের বিকাশ বৈচিত্র্যকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করে নাই। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এক্ষেত্রে পাঠ করা যাইতে পারে।

"সংসারের দিকে, জন্ম বা যোগ্যতার প্রতি চাহিয়া মানুষের স্বত্বকে যতই খণ্ডিত কর না, ধর্মের দিকে কোনো মানুষের জন্য কোনো বাধা সৃষ্টি করিতে পারে এত বড় স্পর্ধিত অধিকার কোনো পরমজ্ঞানী পুরুষের কোনো চক্রবর্তী সম্রাটের নাই।

"ধর্মের অধিকার বিচার করিয়া তাহার সীমা নির্দেশ করিয়া দিতে পার— তুমি কে যে, তোমার সেই অলৌকিক শক্তি আছে! তুমি কি অন্তর্যামী? মানুষের মুক্তির ভার তুমি গ্রহণ করিবার অহঙ্কার রাখ? তুমি লোক সমাজ তুমি লৌকিক ব্যবহারেও আপনাকে সামলাইতে পার না, কত তোমার পরাভব, কত তোমার বিকৃতি, কত তোমার প্রলোভন তুমিই তোমার

অত্যাচারের লাঠিটাকে ধর্মের নামে গিল্টি করিয়া ধর্মরাজের স্থান জুড়িয়া বসিতে চাও! তাই করিয়া আজ শত শত বৎসর ধরিয়া এতবড়ো একটি সমগ্র জাতিকে তুমি মর্মে মর্মে শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাকে পরাধীনতার অন্ধ-কূপের মধ্যে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়া দিয়াছ—তাহার আর উদ্ধারের পথ রাখ নাই। যাহা ক্ষুদ্র, যাহা স্থূল, যাহা অসত্য, যাহা অবিশ্বাস্য তাহাকেও দেশ-কাল পাত্র অনুসারে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া কী প্রকাণ্ড, কী অসঙ্গত, কী অসংলগ্ন জঞ্জালের ভয়ঙ্কর বোঝা মানুষের মাথার উপরে আজ শত শত বৎসর ধরিয়া চাপাইয়া রাখিয়াছ! সেই ভগ্নমেরুদণ্ড নিষ্পেষিত পৌরষ নত মস্তক মানুষ প্রশ্ন করিতেও জানে না, প্রশ্ন করিলেও তাহার উত্তর কোথাও নাই—কেবল বিভীষিকার তাড়নায় এবং কাল্পনিক প্রলোভনের ব্যর্থ আশ্বাসে তাহাকে চালনা করিয়া যাইতেছে; চারিদিক হইতেই আকাশে তর্জনী উঠিতেছে এবং এই আদেশ নানা পুরুষ কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, যাহা বলিতেছি তাহাই মানিয়া যাও, কেননা তুমি মূঢ়, তুমি বুঝিবে না; যাহা পাঁচজনে করিতেছে তাহাই করিয়া যাও, কেন না তুমি অক্ষম, সহস্র বৎসরের পূর্ববর্তী কালের সহিত তোমাকে আপাদ মস্তক শত সহস্র সূত্রে একেবারে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, কেন না নুতন করিয়া নিজের কল্যাণ চিন্তা করিবার শক্তিমাত্র তোমার নাই। নিষেধজর্জরিত চির কাপুরুষ নির্মাণ করিবার এতবড়ো সর্বদেশব্যাপী ভয়ঙ্কর লৌহযন্ত্র ইতিহাসে আর কোথাও কি কেহ সৃষ্টি করিয়াছে—এবং সেই মনুষ্যত্ব চূর্ণ করিবার যন্ত্রকে আর কোনো দেশে কি ধর্মের পবিত্র উপাধিতে আখ্যাত করা হইয়াছে?" (ধর্মের নবযুগ)

"যে সমাজ জাগ্রত ও নিদ্রিত কালের সমস্ত ব্যাপারই একেবারে পাকা করিয়া বাঁধা, সেখানে মানুষের চরিত্র আপন স্বাতন্ত্রে দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে না, সকলেই এক ছাঁচে গড়া নির্জীব ভালোমানুষটি হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সে কথা খাটে। মানুষের সমস্ত চিন্তাকে কল্পনাকে পর্যন্ত যদি অবিচলিত স্থূল আকারে একেবারে বাঁধিয়া ফেলা যায়, যদি তাহাকে বলা যায়, অসীমকে তুমি কেবল এই একটিমাত্র বা কয়েকটি মাত্র বিশেষ রূপেই চিন্তা করিতে থাকো, তবে সেই উপায়েই সত্যই কি মানুষের স্বাভাবিক বৈচিত্র্যকে আশ্রয় দেওয়া হয়, তাহার চির ধাবমান পরিণতি প্রবাহকে সাহায্য করা হয়? ইহাতে তাহার আধ্যাত্মিক বিকাশকে কি বন্ধ করাই হয় না, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে মূঢ় ও পঙ্গু করিয়াই রাখা হয়?', (ধর্মের নবযুগ)

"মানব চিত্তের চির বিচিত্র অভিব্যক্তিকে কোনো কৃত্রিম সৃষ্টির মধ্যে চিরদিনের মতো আটক করা যাইতে পারে, এ কথা যিনি কল্পনাও করিতে পারেন, তিনি বিশ্বের অমিত্র।" (ধর্মের নবযুগ)

"নিজের উপস্থিত প্রয়োজন বা মূঢ়তা বশতঃ মানুষ যেখানেই মানুষের বৈচিত্র্যকে শ্রেণী বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের অধিকারকে সনাতন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে, সেইখানেই হয় মনুষ্যত্বকে বিনাশ করিয়াছে, নয়, ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ ও বিপ্লবকে আসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। কোনো মতেই কোনো বুদ্ধিমানই মানুষের প্রকৃতিকে সজীব রাখিয়া তাহাকে চিরদিনের মতো সনাতন বন্ধনে বাঁধিতে পারেই না। মানুষকে না মারিয়া গোর দেওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। মানুষের বুদ্ধিকে যদি থামাইয়া রাখিতে চাও, তবে তাহার বুদ্ধিকে বিনষ্ট করো, তাহার জীবনের চাঞ্চল্যকে যদি কোনো একটি সুদূর অতীতের সুগভীর কূপের তলদেশ নিমগ্ন করিয়া রাখিতে চাও, তবে তাহাকে নির্জীব করিয়া ফেলো। নিজের উপস্থিত প্রয়োজনে অবিবেকী হইয়া উঠিলে মানুষ তো মানুষকে এইরূপ নির্মমভাবে পঙ্গু করিতেই চায়—" (ধর্মের নবযুগ)

"যদি কেহ মনে করেন, ধর্মকেও মানুষের অন্যান্য শত শত নাগপাশ বন্ধনের মতো অন্যতম বন্ধন করিয়া তাহার দ্বারা মানুষের বুদ্ধিকে, বিশ্বাসকে, আচরণকে চিরদিনের মতো একই জায়গায় বাঁধিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকাই শ্রেয়, তবে তাঁহার কর্তব্য হইবে আহারে বিহারে নিদ্রায় জাগরণে শত সহস্র নিষেধের দ্বারা বিভীষিকার দ্বারা প্রলোভনের দ্বারা এবং অসংযত কাল্পনিকতার দ্বারা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখা। সে মানুষকে জ্ঞানে কর্মে কোথাও যেন মুক্তির স্বাদ না দেওয়া হয়; ক্ষুদ্র বিষয়েও তাহার রুচি যেন বন্দী থাকে সামান্য ব্যাপারেও তাহার ইচ্ছা যেন ছাড়া না পায়, কোনো মঙ্গল চিন্তায় সে যেন নিজের বুদ্ধি বিচারকে খাটাইতে না পারে এবং বাহ্যিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কোনো দিকেই সে যেন সমুদ্র পার হইবার কোনো সুযোগ না পায়, প্রাচীনতম শাস্ত্রের নোঙরে সে যেন কঠিনতম আচারের শৃঙ্খলে অবিচলিত হইয়া, একই পাথরে বাঁধানো ঘাটেবাঁধা পড়িয়া থাকে।" (ধর্মের নবযুগ)

"ব্রাহ্মণ এই অধিকারভেদের ব্যবস্থাটাকে আগাগোড়া পাকা করিয়া গাঁথিয়াছিল—যাহাকে বাহিরে পঙ্গু করিবে, তার মনকেও পঙ্গু করিয়াছিল। জ্ঞানের দিকে গোড়া কাটা পড়িলেই কর্মের দিকে ডালপালা আপনি

শুকাইয়া যায়। শূদ্রের সেই জ্ঞানের শিকড়টা কাটিতেই আর বেশি কিছু করিতে হয় নাই; তার পর হইতে তার মাথাটা আপনিই নুইয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণের পদরজে আসিয়া ঠেকিয়া রহিল।" (কর্তার ইচ্ছায় কর্ম)

"আমাদের সামাজিক কামার (মনু?) যে-শলাটি যেমন করিয়া বানাইয়াছে, শিশুকাল হইতে তাহারই স্তবের বুলি পড়িয়া পড়িয়া আমরা অন্য সকল গান ভুলিয়াছি, কেন-না অন্যথা করিলে বিপদের অন্ত নাই। আমাদের এখানে সকল দিকেই ঐ কামারেরই হইল জয়, আর সবচেয়ে বিড়ম্বিত হইলেন বিধাতা, যিনি আমাদিগদকে কর্মশক্তি দিয়াছেন, যিনি মানুষ বলিয়া আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন।" (বিবেচনা ও অবিবেচনা)

"আমাদের সমাজ সমাজের মানুষগুলোকে লইয়া এই প্রকারের একটা প্রকাণ্ড পুতুল বাজির কারখানা খুলিয়াছে। তারে তারে আপাদ মস্তক কেমন করিয়া বাঁধিয়াছে, কী আশ্চর্য তাহার কৌশল। ইহাকে বাহবা দিতে হয় বটে। বিধাতাকে এমন সম্পূর্ণরূপে হার মানানো, প্রাণীকে এমন কলের পুতুল করিয়া তোলা জগতে আর কোথায় ঘটিয়াছে।" (বিবেচনা ও অবিবেচনা)

"শূদ্রকে ব্রাহ্মণ এত দুর্বল করেছিল যে, তার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের না ছিল লজ্জা না ছিল ভয়। আমাদের সংহিতাগুলি আলোচনা করলে এ কথা ধরা পড়বে। দেশ জুড়ে আজ তার যে ফল ফলেছে তা বোঝবার শক্তি পর্যন্ত চলে গেছে, দুর্গতি এত গভীর।" (বাতায়নিকের পত্র)

"ক্ষমতা যতই অবাধ হয়, ক্ষমতা ততই মানুষকে নিচের দিকে নিয়ে যায়। এই জন্যে ক্ষমতাকে যথোচিত পরিমাণে বাধা দেবার শক্তি যার মধ্যে নেই, তার দুর্বলতা সমস্ত মানুষেরই শত্রু। আমাদের সমাজ মানুষের ভেতর থেকে সেই বাধা দূর করবার একটি অতি ভয়ঙ্কর এবং অতি প্রকাণ্ড যন্ত্র। এই যন্ত্র একদিকে বিধান অক্ষৌহিনী দিয়ে আমাদের চারদিকে বেড়ে ধরেছে, আর একদিকে, যে-বুদ্ধি যে-যুক্তি দ্বারা আমরা এর সঙ্গে লড়াই করে মুক্তিলাভ করতে পারতুম, সেই বুদ্ধিকে সেই যুক্তিকে একেবারে নির্মূল করে কেটে দিয়েছে! তার পরে অন্য দিকে অতি লঘু ত্রুটির জন্যে অতি গুরুদণ্ড। খাওয়া শোওয়া ওঠা বসার তুচ্ছতম স্খলন সম্বন্ধে শাস্তি অতি কঠোর। একদিকে মূঢ়তার ভারে, অন্যদিকে ভয়ের শাসনে মানুষকে অভিভূত করে জীবন যাত্রার অতি ক্ষুদ্র খুঁটিনাটি সম্বন্ধেও তার স্বাভিরুচি ও স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।" (বাতায়নিকের পত্র)

"যে প্রণালীতে চললে মানুষের মন বলে জিনিসের কোন দরকার হয় না, যা কেবলমাত্র চিন্তাহীন অভ্যাস নিষ্ঠতার কাজ, আমাদের সংসারযাত্রার পনেরো আনা কাজই সেই প্রণালীতে চালিত।" (সত্যের আহ্বান)

"যে-সকল কাজ বাহ্য অভ্যাসের নয়, যা বুদ্ধিমূলক বিশেষ ক্ষমতার দ্বারাই সাধিত হতে পারে, তা ব্যক্তিগত না হয়ে, বংশগত হতেই পারে না। যদি তাকে বংশে আবদ্ধ করা হয়, তা হলে ক্রমেই তার প্রাণ মরে গিয়ে বাইরের ঠাটটাই বড়ো হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণের যে সাধনা আন্তরিক, তার জন্যে ব্যক্তিগত শক্তি ও সাধনার দরকার; যেটা কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক, সেটা সহজ। আনুষ্ঠানিক আচার বংশানুক্রমে চলতে চলতে তার অভ্যাসটা পাকা ও দম্ভটা প্রবল হতে পারে, কিন্তু তার আসল জিনিসটি মরে যাওয়াতে আচারগুলি অর্থহীন বোঝা হয়ে ওঠে, জীবন পথের বিঘ্ন ঘটায়।" (শূদ্রধর্ম)

"এদিকে শাস্ত্রে বলেছেন, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। এ কথাটার প্রচলিত অর্থ এই দাঁড়িয়েছে যে, যে-বর্ণের শাস্ত্র বিহিত যে-ধর্ম তাকে তাই পালন করতে হবে। এ কথা বললেই তার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, ধর্ম-অনুশাসনের যে অংশটুকু অন্ধভাবে পালন করা চলে, তাই প্রাণপণে পালন করতে হবে, তার কোনো প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক্, তাতে অকারণে মানুষের স্বাধীনতার খর্বতা ঘটুক, তায় ক্ষতি হয় হোক। অন্ধ আচারের অত্যাচার অত্যন্ত বেশি, তার কাছে ভালোমন্দের আন্তরিক মূল্য-বোধ নেই।" (শূদ্রধর্ম)

"বংশানুক্রমে স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে, তার উপযুক্ত চিত্তও বাকী থাকে না, মানুষ কেবল যন্ত্র হয়ে একই কক্ষের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। * * * আজ ভারতে বিশুদ্ধভাবে স্বধর্মে টিকে আছে—কেবল শূদ্রেরা। শূদ্রত্বে তাদের অসন্তোষ নেই। * * * লাথি ঝাঁটা বর্ষণের মধ্যেও তারা স্বধর্ম রক্ষা করতে কুণ্ঠিত হয় না। তারা তো কোনোকালে সম্মানের দাবী করে নি, পায়ও নি, তারা কেবল শূদ্রধর্ম অত্যন্ত বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছে।" (শূদ্রধর্ম)

"আমাদের সমাজ জীবন্ত নহে, তাহার হ্রাসবৃদ্ধি পরিবর্তন নাই, তাহা সুসম্বদ্ধ, পরিপাটি প্রকাণ্ড জড় অট্টালিকা। তাহার প্রত্যেক কক্ষ পরিমিত, তাহার প্রত্যেক ইষ্টক যথাস্থানে বিন্যস্ত। স্বাধীনতাই এ সমাজের সর্বপ্রধান শত্রু। যে রৌদ্রবৃষ্টি বায়ুতে জীবিত পদার্থের জীবনধারণ হয়, সেই রৌদ্র-বৃষ্টি বায়ুতেই ইহার ইষ্টক জীর্ণ করে, এইজন্য সমাজ শিল্পী অদ্ভুত নৈপুণ্য

সহকারে এই কারাগারের মধ্যে সমস্ত স্বাধীন স্বাভাবিক শক্তির প্রবেশ প্রতিরোধ করিয়াছে।

"যে যেখানে আছে, সে ঠিক সেইখানেই থাকিলে তবে এই জড় সমাজ রক্ষিত হয়। তিলমাত্র নড়িলে চড়িলে সমস্তটাই সশব্দে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, এইজন্য যেখানেই জীবনচাঞ্চল্য লক্ষিত হয়, সেইখানেই তৎক্ষণাৎ চাপ দিতে হয়।" (সমুদ্র যাত্রা)

"সৈন্যগণকে যেমন মরিবার মুখে লইয়া যাইতে হইলে বহুদিনের কঠিন চর্চায় যন্ত্রবৎ বশ্যতা অভ্যাস করাইয়া লইতে হয়, তেমনই পদে পদে আমাদের জাতিকে বিনাশের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্র আমাদের আচার আমাদিগকে বিশ্বজগতের কাছে নত এবং বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে।" (অযোগ্য ভক্তি)।

"স্বাধীনতাই যে সমস্ত প্রবৃত্তির প্রধান গৌরব তাহাদিগকেই বন্ধনে বদ্ধ করা হইয়াছে।" (অযোগ্য ভক্তি)

"এইরূপে নীতি, ভক্তি ও বুদ্ধি,—স্বাধীনতাতেই যাহার বল, যাহার জীবন, স্বাধীনতাতেই যাহার যথার্থ স্বরূপ রক্ষিত ও বিকশিত হয়, তাহাদিগকে সর্বপ্রকার স্বাভাবিক আপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সযত্নে মৃত্যু ও বিকৃতির মধ্যে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইহাতে আমাদের মানসিক প্রকৃতির এমনই নিদারুণ জড়ত্ব জন্মিয়াছে যে, যাহাকে আমরা জ্ঞানে জানি ভক্তির অযোগ্য তাহাকেও প্রথার অভ্যাসে ভক্তি করিতে সঙ্কোচমাত্র অনুভব করি না।" (অযোগ্য ভক্তি)

সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার পশ্চাতে যে বোধের প্রেরণা রহিয়াছে, তাহার মূল্য নিরূপণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পরিশেষে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"অন্য জাতি যে কারণে মরে, আমাদের জাতি সেই কারণকে উপায় স্বরূপ করে দীর্ঘ জীবনের পথ আবিষ্কার করেছিলেন। আকাঙ্ক্ষার আবেগ যখন হ্রাস হয়ে যায়, শ্রান্ত উদ্যম যখন শিথিল হয়ে আসে, তখন জাতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আমরা বহুযত্নে দুরাকাঙ্ক্ষাকে ক্ষীণ ও উদ্যমকে জড়ীভূত করে দিয়ে সমভাবে পরমায়ু রক্ষা করবার উদ্‌যোগ করেছিলুম।"

(নূতন ও পুরাতন)

কিঞ্চিদধিক ১৩০০ সাল হইতে ১৩৪০ সালের কিঞ্চিৎ পরবর্তী কাল পর্যন্ত অর্থাৎ শেষ বয়সে প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ সমাজ সম্পর্কিত

যে বিচিত্র নিবন্ধ রচনা করেন, সেই নিবন্ধগুলি হইতে উক্তিগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বোধ করিতে পারা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া এই অচলায়তন সমাজের সকল প্রকার বন্ধন উন্মোচন করিয়া তাহাকে একটি গতিশীল মুক্ত সমাজে পরিণত করিতে নিরলস চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ যে পূর্ণাঙ্গ সমাজের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন সেই সমাজের রূপ কি, মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থা যে জীবন-দর্শনকে আশ্রয় করিয়া ওই সমাজ-রূপ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে সেই জীবন-দর্শনের স্বরূপ কি, সেই দার্শনিক নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া তিনি যে সামগ্রিক দার্শনিক বোধের উপর বর্তমান সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই সামগ্রিক জীবন-দর্শনেরই বা স্বরূপ কি তাহার সকল প্রকার ভাবাবেগমুক্ত বিজ্ঞান সম্মত বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।—বর্তমান নিবন্ধে সেই জাতীয় কোন আলোচনার সুযোগ আমাদের নাই।

এই সম্পূর্ণ অচলায়তন সমাজের সহিত প্রথম সংযোগ ও সংঘাত ঘটে মুসলমান সভ্যতার। ইহা একটি স্থায়ী সমাজ-রূপের সহিত আর একটি স্থায়ী সমাজ-রূপের, একটি বাঁধা ভাবের সহিত আর একটি বাঁধা ভাবের সংঘাত। তাহার ফলে প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া দুটি সভ্যতার সংযোগ ও সংঘাতে ভাবের বিনিময় প্রায় কিছুমাত্র ঘটিতে পারে নাই। ভাবের জগতে বা অধ্যাত্ম জগতে এই দুটি সমাজ-রূপই চিত্তের সৃষ্টি বৈচিত্র্যকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দান করে না।

তাহার পর ইংরেজ জাতির সংযোগের ভিতর দিয়া এদেশের সহিত সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার সংযোগ ঘটে। ইংরেজ জাতি হিসাবে এদেশ হইতে অনেক দূরে ছিল বটে, কিন্তু তাহার ভাবধারাকে ভারতীয় সমাজ এত আপনার করিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, যাহা ইতি-পূর্বে সে আর কোনো বিদেশী শাসক হইতে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ভারতীয় সমাজে এই সংযোগ ও সংঘাত যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ারূপে প্রকাশ লাভ করে, তাহার বিস্তারিত পরিচয় দান এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সকল মনীষী, সকল চিন্তাশীলদের মত রবীন্দ্রনাথও এই সংযোগকে বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায়রূপে বোধ করেন। এই সংযোগ এদেশের চিন্তা ও ভাব জগতে যে বিপ্লব সাধন করে, তাহার পরিচয় দান করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ একস্থলে লিখিতেছেন—

"এইটে দেখিয়েছে যে, জ্ঞানের রাজ্যে কোথাও ফাঁক নেই, সকল তথ্যই পরস্পর অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত, চতুরানন বা পঞ্চাননের কোনো বিশেষ

বাক্য বিশ্বের ক্ষুদ্রতম সাক্ষীর বিরুদ্ধে আপন অপ্রাকৃত প্রামাণিকতা দাবি করতে পারে না।"

"বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমনি, তেমন চরিত্র নীতি সম্বন্ধেও। নতুন শাসনে যে আইন এল, তার মধ্যে একটি বাণী আছে, সে হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না। ব্রাহ্মণই শূদ্রকে বধ করুক বা শূদ্রই ব্রাহ্মণকে বধ করুক, হত্যা অপরাধের পংক্তি একই, তার শাসনও সমান—কোন মুনিঋষির অনুশাসন ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বিশেষ সৃষ্টি প্রবর্তন করতে পারে না।" (কালান্তর)

জড় জগৎ, প্রাণী ও মনুষ্য জগতের সমস্ত কিছুই যে এক অখণ্ড নিয়মে বিধৃত হইয়া আছে, এই এক বিধানে যে সকল দেশ ও জাতি, সকল মনুষ্য সম্প্রদায় নিয়ন্ত্রিত, এই নীতি-নিয়মের ক্ষেত্রে যে কোন বিশেষ নাই, এই সত্যটিকেই আমাদের দেশ প্রথম উপলব্ধি করে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংযোগের পর হইতে।

ভারতীয় সমাজ-রূপ যে ভেদমূলক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা যে এই বোধের সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহা নিশ্চয়ই আর উল্লেখ করিতে হইবে না।

এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত এক অখণ্ড নিয়মের দ্বারা যখন সমাজ প্রচলিত অনেক বিধি-নিষেধের, অনেক আচার-আচরণের অর্থ করা আর সম্ভব হয় না, তখন এদেশে মোটামুটি দুটি বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একটি এদেশের সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করিতে চায়, আর একটি এই সকল স্থূল সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র বৃহৎ আচার-অনুষ্ঠানের তথাকথিত বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়। সে চেষ্টা স্থান বিশেষে এতদূর অসঙ্গত, অমূলক, ফলে এতদূর হাস্যোদ্দীপক যে অধুনা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক না করিয়া পারে না।

"আমাদের সমাজের দুর্ভেদ্য জড়স্তূপ হিন্দু সভ্যতার কীর্তিস্তম্ভ নহে —ইহার অনেকটাই সুদীর্ঘ কালের আত্মসঞ্চিত ধূলা মাত্র। অনেক সময় য়ুরোপীয় সভ্যতার কাছে (গোরার দেশাত্মবোধ উন্মেষের পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথ এই কারণ নির্দেশ করিয়াছেন।) ধিক্কার পাইয়া আমরা এই ধূলিস্তূপকে লইয়াই গায়ের জোরে গর্ব করি, কালের এই সমস্ত অনাহূত আবর্জনারাশিকেই আমরা আপনার বলিয়া অভিমান করি—ইহার অভ্যন্তরে যেখানে আমাদের যথার্থ গর্বের ধন হিন্দু সভ্যতার প্রাচীন আদর্শ আলোক ও বায়ুর অভাবে মূর্ছান্বিত হইয়া পড়িয়া আছে, সেখানে দৃষ্টিপাত করিবার পথ পাই না।"

রবীন্দ্রনাথকে জাতির এই উভয়মুখীন চেষ্টার সহিত সমগ্র জীবন ধরিয়া সংগ্রাম করিতে হইয়াছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সঙ্ঘাতে আর একটি প্রয়াস ধীরে ধীরে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতে থাকে, তাহা হইল ওই বিশ্ব বিধানের আলোকে জাতির সত্য পরিচয় আবিষ্কারের নিরতিশয়, নিরন্তর দুরূহ বহুমুখী সাধনা। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় চেষ্টার উল্লেখ করিয়া একস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন,

"এক্ষণে যিনি জড়ীভূত হিন্দুজাতির মধ্যে আচারে-ব্যবহারে সমাজে ধর্মে আর্যভাবের একটি বিশুদ্ধ আদর্শ স্থাপন এবং কৃত্রিম ক্ষুদ্র নিরর্থক বিচ্ছেদগুলি দূর করিয়া সমগ্র লোক-স্তূপের মধ্যে একটি সজীব ঐক্য সঞ্চার করিয়া দিবেন, তিনিই ভারতবর্ষের বর্তমান কালের মহাপুরুষ।" (প্রসঙ্গ কথা)

ভারতীয় সাধনার সেই বিশুদ্ধ আদর্শ রূপটি গড়িয়া তুলিতে রবীন্দ্রনাথও সমস্ত জীবনভোর চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় আমাদের সর্বাগ্রে উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, জাতির সাধনার ক্ষেত্রে বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে একটি নিবিড় ঐক্য আছে। সেক্ষেত্রে ভারতীয় সাধনা যে বিশ্বের অন্যান্য জাতির সাধনা হইতে পৃথক। (এইরূপ একটি চেষ্টার ধারাও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে এই জাতীয় চেষ্টা করিয়াছিলেন।) এইরূপ প্রমাণ করিবার চেষ্টা, অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতা আধ্যাত্মিকতার দিকটিকেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছে, অন্যদিকে পাশ্চাত্য দেশসমূহ ইহার বিপরীত প্রেরণাকে মুখ্যতঃ আশ্রয় করিয়াছে, ইহা মিথ্যাবোধ মাত্র। এই মিথ্যাবোধ লালন করিতে গত শতাব্দীর পাশ্চাত্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও সহায়তা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ এই ভুলটাই সর্বাগ্রে ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি মহাভারতের যুগের সমাজ-ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, যে জাতি যখন সত্যিকারের সজীব ও প্রাণবান ছিল, তখন সকল দিকে তাহার উৎসুক সমান ভাবে জাগ্রত ছিল। জাতি তখন জড় ও অধ্যাত্ম উভয় জীবনকে সমানভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। সমাজ-রূপ সম্পূর্ণ সচল ছিল বলিয়া ত্রুটি বিচ্যুতিতে কিছুমাত্র ভয় ছিল না। সমাজ মূলে তখন ভীতি আশ্রয় করে নাই, তাই তাহার নূতনকে লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কোন সংকোচ ছিল না। তাই তিনি বলিয়াছেন,—

"—যাহা কোনো সভ্য সমাজেরই চরম সত্য নহে, তাহা হিন্দু সমাজেরও নহে, ইহা কোটি কোটি বিরুদ্ধবাদীর মুখের উপরেই বলা যায়—কারণ ইহাই সত্য।" (আত্ম পরিচয়)

সেই পূর্ণাদর্শ হইতে ভারতীয় সমাজ মধ্যযুগে সম্পূর্ণরূপে স্খলিত

হইয়া যায়। তিনি তাই এই জাতীয় অভিমত প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই—

"আমাদের সেই সর্বাঙ্গসম্পন্ন প্রাচীন সভ্যতা বহুদিন হল পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছে, আমাদের বর্তমান সমাজ তারই প্রেতযোনি মাত্র।" (নূতন ও পুরাতন)

অন্যান্য দেশ সহস্র মিথ্যা, প্রাণহীন গুরুভার আচারের শৃঙ্খল হইতে যেমন করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া নব নব ক্ষেত্রে বিচিত্র সৃষ্টি কার্যে আপনাকে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে, ভারতবর্ষকে তেমনিভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন বুদ্ধির মুক্তি, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি। আর সেইজন্য প্রয়োজন সমাজের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উদার শিক্ষা-ব্যবস্থা। আর কোন পথ নাই। তাঁহারই দুই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"যদি সত্যকে ভালোবাসি, বিশ্বাস অনুসারে কাজ করি, ঘরের ছেলেদের রাশীকৃত মিথ্যার মধ্যে গোলগাল গলগ্রহের মতো না ক'রে তুলে সত্যের শিক্ষায় সরল সবল দৃঢ় ক'রে উন্নত মস্তকে দাঁড় করাতে পারি, যদি মনের মধ্যে এমন নিরভিমান উদারতার চর্চা করতে পারি যে চতুর্দিক থেকে জ্ঞান এবং মহত্বকে সানন্দে সবিনয়ে সাদর সম্ভাষণ ক'রে আনতে পারি, যদি সঙ্গীত শিল্প সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার আলোচনা ক'রে দেশে বিদেশে ভ্রমণ ক'রে পৃথিবীতে সমস্ত তন্ন তন্ন করে নিরীক্ষণ ক'রে এবং মনোযোগ সহকারে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা ক'রে আপনাকে চারিদিকে উন্মুক্ত বিকশিত ক'রে তুলতে পারি, তা হলে আমরা যাকে হিঁদুয়ানি বলে থাকি, তা সম্পূর্ণ টিকবে কি না বলতে পারি নে, কিন্তু প্রাচীন কালে যে সজীব সচেষ্ট তেজস্বী হিন্দু সভ্যতা ছিল, তার সঙ্গে অনেকটা আপনাদের ঐক্য সাধন করতে পারব।" (নূতন ও পুরাতন)

শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন ধর্মের ক্ষেত্রেও তেমনি বন্ধন মুক্তির কথা নানাভাবে বলিয়াছেন।

"আধুনিক পৃথিবীতে সেই পুরাতন ধর্মের সহিত নূতন বোধের বিরোধ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে এমন একটি ধর্মকে চাহিতেছে, যাহা কোনো একটি বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম নহে; যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতির দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই, মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক যে ধর্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ সকল দিক দিয়াই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর

হইতে আহ্বান করিবে। মানুষের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে এবং ধর্মকে না পাইলে তাহার জীবন সঙ্গীতের সুর মিলিবে না, এবং কেবলি তাল কাটিতে থাকিবে।"

(ধর্মের নবযুগ)

নবযুগের জন্য নব-ধর্মের সাধনাও সমগ্র জীবন ধরিয়া রবীন্দ্রনাথকে করিতে হইয়াছে।

এই ধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণের তাই গুরুতর প্রয়োজনীয়তা আছে। আমি এক্ষেত্রে সেই জাতীয় কোন অলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। যাঁহারা রবীন্দ্র-সাহিত্য লইয়া আলোচনা করেন, এই ধর্মের (তাহা তাঁহার ভাষায় 'ভারতীয় ধর্ম,' 'মানুষের ধর্ম,' বা 'নবধর্ম') স্বরূপ নির্ণয়ের ভার তাঁহাদের অবশ্যই লইতে হইবে। কোথাও কোথাও এই জাতীয় চেষ্টা যে হয় নাই তাহা নহে, তবে তাহা এতদূর তুচ্ছ যে উল্লেখও বাহুল্য।

ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ কোন্ দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহা সকলেই জানেন। তবে সমগ্র দেশের মধ্যে সংহতি যত দিক দিয়া যত ভাবে আসুক না কেন, তাহাকে তিনি আন্তরিক অভিনন্দন না জানাইয়া পারেন নাই। তবে রাষ্ট্রীয় মুক্তির পূর্বে সামাজিক মুক্তির অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বারংবার বলিয়াছেন।

যে অশুভ ভেদ বুদ্ধির উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত, সেই ভেদ বুদ্ধি দূর করিয়া সর্বাঙ্গে প্রাণ সঞ্চার না করিতে পারিলে রাষ্ট্রীয় মুক্তি জাতির জীবনে কোন বৃহৎ কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে না।

শিক্ষিত মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সে আন্দোলন সমাজের সকল স্তরকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। মাঝে মাঝে বৃহত্তর জনসমাজের নিকট আমরা যে আবেদন নিবেদন করি নাই তাহা নহে, তবে তাহাতে হৃদয়ের পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল না। তাই যাহাদের দ্বারে গিয়াছি, তাহারা সংশয় প্রকাশ করিয়াছে। সমাজ-ব্যবস্থায় যাহাদের সহিত আমরা হৃদয় মিলাইতে পারি নাই, যাহাদের কল্যাণ অকল্যাণ সম্পর্কে আমরা কখন কোন চিন্তা করি নাই, তাহাদের নিকট হঠাৎ রাষ্ট্রীয় মুক্তির কথা বলিতে গেলে, তাহারা সংশয় প্রকাশ না করিয়া পারে না। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ববোধ করাইতে শেষে অত্যাচার করিতেও ইতস্ততঃ করি নাই। এই আচরণকে সমর্থন করিবার জন্য আমরা স্ফীত বক্ষে বলিয়াছি, যাহারা হিতাহিত বোধশূন্য, তাহাদের তো এমনি করিয়াই সচেতন করিতে হয়। সমাজ অভ্যন্তরে ঐক্যের লেশমাত্র নাই, বাহিরে বল প্রয়োগ করিয়া কিংবা কেবলমাত্র ভাবাবেগের সহায়তায় ঐক্য সৃষ্টি করিতে গেলে যে বিষময় ফল ফলিতে পারে, তাহার ভবিষ্যদ্‌বাণী রবীন্দ্রনাথ বারংবার

করিয়াছিলেন। ঋষি কবির সে ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে, অথচ সেদিন আমরা সে কথায় কর্ণপাত করি নাই, বরং বিদ্রূপ করিয়াছি।

স্বল্পমূল্যে কোন বৃহৎ কিছু লাভ করিবার উপায় নাই। ইহা বিশ্ববিধান বহির্ভূত। জ্ঞানের পথ, ধীর প্রস্তুতির পথ, সমাজ-সংস্কারের পথ, আত্মশক্তি উদ্বোধনের পথ যে অনেক দীর্ঘ, সেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার মত ধৈর্য ও অবসর আমাদের কোথায়। গত প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া আমরা কাজ করি নাই। আমরা কাজ করিতে ভুলিয়াছি, কাজ ভালোবাসি না, কাজ করিতে চাই না, নীরবে অনবরত আত্মত্যাগের জন্য যে চরিত্রের প্রয়োজন, আমরা সে চরিত্র গঠন করিতে চাই নাই। তাই সামান্য কোন কাজের জন্যও ভাবাবেগের একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। স্বল্পকাল স্থায়ী ভাবাবেগ স্তিমিত হইয়া যাইবার পূর্বে ভাবের ঝোঁকে যাই হোক একটা কিছু করিয়া ফেলিয়া কর্মের দায়িত্ব চুকাইয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই। মানুষকে আশু সিদ্ধিলাভের এই জাতীয় প্রয়াসে প্ররোচিত করে মানুষের লোভ। তিনি একথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—

"আজও আমাদের দেশে শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে বহুলোক রাষ্ট্রীর অগৌরব দূর করবার জন্যে আত্মচেষ্টা মানে, অথচ সমাজবিধির দ্বারা অধঃকৃতদের ধর্মের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আত্মাবমাননা স্বীকার করতে বলে।"

(কালান্তর)

এই রচনার কাছাকাছি প্রায় ত্রিশ বৎসর পরেও, এ কথা নিদারুণ ভাবে সত্য যে, আমরা রাষ্ট্রীয় মুক্তির জন্য, রাষ্ট্রীয় অসম্মান দূরীকরণের জন্য তার-স্বরে দেশ প্রেমের আশ্চর্য পরাকাষ্ঠা দেখাই। সেই আমরাই মনু মিলাইয়া শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া অধঃকৃতদের আরো অধঃকৃত করিবার সকল রকম চেষ্টাই করিয়া থাকি। বিস্মিত হইবার কথা, কিন্তু এই সমাজে ইহাই একান্ত স্বাভাবিক।

মনুষ্য সত্তা সম্পূর্ণ সৎ নয় আবার সম্পূর্ণ অসৎও নয়। এই দুইয়ের বিচিত্র সমাবেশ লইয়া মানুষের জীবন। ব্যষ্টি জীবনে যেমন এ কথা সত্য, সমষ্টি জীবনেও তেমনি এ কথা সত্য। একটা সমগ্র সমাজ বা জাতি সম্পর্কে এ কথা যেমন সত্য, তেমনি সমগ্র মানব-সমাজ সম্পর্কেও এ কথা সত্য। আবার সমগ্র মানব-সমাজে সৎ বা সত্যের প্রেরণা অপেক্ষাকৃত বেশি বলিয়া পরিণামে তাহা অসত্য বা অসৎকে সম্পূর্ণ রূপে জয় করিয়া উঠিবে।

"খাঁটি কপট মানুষ হচ্ছে ক্ষণজন্মা লোক, অতি অকস্মাৎ তার আবির্ভাব ঘটে। আসল কথা, সকল মানুষের মধ্যেই কমবেশি পরিমাণে চারিত্র্যের

দ্বৈধ আছে। আমাদের বুদ্ধির মধ্যে লজিকের যে কল পাতা, তাতে দুই বিরোধী পদার্থকে ধরানো কঠিন বলেই ভালোর সঙ্গে যখন মন্দকে দেখি তখন তাড়াতাড়ি ঠিক করে নিই এর মধ্যে ভালোটাই চাতুরী। আজকের দিনে পৃথিবীতে সার্বজনীন যে সকল প্রচেষ্টা চলেছে তার মধ্যে পদে পদে মানুষের এই চারিত্র্যের দ্বৈধ দেখা যাবে। সে-অবস্থার তাকে যদি তার অতীত যুগের দিক থেকে বিচার করি, তা হলে তার স্বার্থ বুদ্ধিকে মনে করব খাঁটি, কারণ তার অতীতের নীতি ছিল ভেদ বুদ্ধির নীতি। কিন্তু তাকে যদি আমাদের আগামী কালের দিক থেকে বিচার করি তা হলে বুঝব শুভ বুদ্ধিটাই খাঁটি। কেন না ভাবী যুগের একটা প্রেরণা এসেছে মানুষকে সংযুক্ত করবার জন্যে। যে বুদ্ধি সকলকে সংযুক্ত করে সেই হচ্ছে শুভবুদ্ধি।"

(সত্যের আহ্বান)

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,

"এই ভেদের মাত্রা যে জাতির মধ্যে অন্তরের দিক থেকে যতই কমে এসেছে, সেই জাতি ততই উচ্চ শ্রেণীর মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। সে জাতি সকলের সঙ্গে যোগে চিন্তার কর্মের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করতে পেরেছে।" (সমস্যা)

"লোভ কোথাও বাধা পেতে চায় না। সেই জন্যে যে নিচে আছে, তাকে চিরকালই নিচে চেপে রাখতে হয়, এবং যে প্রবল হয়ে ওঠবার লক্ষণ দেখাচ্ছে তাকে অকল্যাণ বলেই গণ্য করে।

"যতক্ষণ এই লোভ আছে ততক্ষণ জগতে শান্তি আনে পীস্ কনফারেন্সের এমন সাধ্য নেই। * * * কর্মিক ধনিকদের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, এক রাজ্য অন্য রাজ্যের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, আবার রাজা ও প্রজার মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ। তাই শেষ কালে দাঁড়ায় লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।"

ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা ভেদমূলক অশুভ বুদ্ধির ওপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা মানুষের শুভ বুদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিতে পারে নাই। সেই শুভ বুদ্ধিটাই ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া আজ ওই বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চাহিতেছে। এ কথাও সত্য যে বর্তমান যুগে শুভ বুদ্ধিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে, সহস্র অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে প্রথম ব্রাহ্মণরাই। ইহাই নিয়তি! স্বধর্মের নাগপাশ বন্ধন হইতে ব্রাহ্মণরাই প্রথম আপনাদের মুক্ত করিতে চাহিয়াছে দেখিতে পাই। কিন্তু ব্রাহ্মণরা নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাহিলে কি হইবে, যে শূদ্রদের তাঁহারা

সহস্র আচারে বিধিনিষেধে বন্ধ করিয়াছেন, সেই আচার সেই বিধিনিষেধকে তাহারা আজ কিছুতেই ত্যাগ করিতে চায় না। এই শূদ্র ধর্ম বা স্বভাব তাহাদের প্রাণের সহিত, রক্তের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের রাজার শেষ ভাগ্যের কথা স্মরণে পড়িতেছে। রাজারই পাতা জাল দিয়া রাজারই সৃষ্ট মোড়লরা রাজাকেই বাঁধিবার জন্য শেষ বিদ্রোহ করিয়াছে। আজ ব্রাহ্মণদের এই শূদ্রদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আপনাদের মুক্তি প্রয়াসের ভিতর দিয়া তাহাদের মুক্তির পথ দেখাইতে হইবে।

(৩)

সৌভাগ্যক্রমে হোক বা অসৌভাগ্যক্রমে হোক, পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট সংস্পর্শে আসিবার পর পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ভারতবর্ষের দার্শনিক প্রতিভা, তাহার ধর্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনার সহিত প্রথম পরিচিত হয়। এই পরিচিতি বিদেশে এমন একটি পরিণাম লাভ করে যাহার ফলে ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে অধ্যাত্ম-সাধনাকেই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছে, একমাত্র অন্তর্জীবনকেই যে কাম্য করিয়াছে, এইজন্য বহির্জীবন সম্পর্কে উহা যে স্বভাবতই উদাসীন এই দিক দিয়া পাশ্চাত্য জাতি সমূহ হইতে তাহার যে একটি বিশেষ নিয়তিরূপ আছে ইহাই ক্রমে সত্য হইয়া উঠে।

গত প্রায় দেড় শত বৎসর ধরিয়া এদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ সম্পর্কে যে বিচিত্র গবেষণা চলে তাহার মূলে রহিয়াছে এই একটি মাত্র ভাব-প্রেরণা। কালে এই গবেষণা ক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হইতে থাকে ততই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে ভারতীয় প্রতিভা বহির্জীবনকে কিছুমাত্র উপেক্ষা তো করে নাই, পরন্তু ওই সকল যুগে বহির্জীবনের নানা ক্ষেত্রকে অসামান্য সমৃদ্ধি দান করিয়াছিল। তাহার সঙ্গীত, চিত্র-শিল্প, মূর্তি-শিল্প, ভবন-শিল্প, কাম-শাস্ত্র, রাষ্ট্র ও সমাজ-নীতি, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, গণিত প্রভৃতি জীবনের প্রত্যেকটি অঙ্গ জ্ঞানের সকল বিভাগ সমানভাবে অনুশীলিত হইয়াছিল।

ভারতীয় শিল্প-শাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া আনন্দ কেণ্টিশ কুমারস্বামী এক স্থলে মন্তব্য করিয়াছেন, যে ভারতীয় শিল্প প্রেরণা আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত প্রতীক আশ্রয়ী, তাহা প্রকৃতিকে কোথাও অনুসরণ করে নাই। যেখানে প্রকৃতিকে অনুসরণ করা হইয়াছে সেখানে ওই সকল চিত্র বা শিল্প-রূপের মধ্যে শিল্পীর স্মৃতি-লোকের অসতর্ক প্রকাশ ঘটিয়াছে। তিনি আরও মন্তব্য করিয়াছেন, যে চিত্র বা শিল্প যেখানে যত প্রকাশময় সেখানে প্রতীক সাক্ষাৎকার তত গভীর, তত স্পষ্ট।

প্রতীক-রূপ তো দূরের কথা, ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ববিভাগ হইতে অধুনা যে সকল চিত্র-গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, তাহাদের কোন কোনটি সম্পর্কে

এমন কি প্রকাশ্যভাবে রুচি ও শ্লীলতার প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে আজ এমন অভিযোগও সত্য হইয়াছে!

ভারতীয় সভ্যতা কেবল অধ্যাত্মবোধেরই চর্চা বা অনুশীলন করিয়াছে, এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী এককালে সম্ভব হইয়াছিল ভারতীয় সংস্কৃতির সম্যক ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় না লাভ করিবার ফলে। সে পরিচয় যতই সম্পূর্ণ হইতেছে ততই বোধ জাগিতেছে যে ভারতবর্ষ অন্যান্য যে-কোন দেশের মত বহির্জীবন ও বস্তুজ্ঞানকে যেমন স্বীকার করিয়াছে, তেমনি অধ্যাত্ম জীবন বা অন্তর্জীবনকেও স্বীকার করিয়াছে। কোন একটি দেশ ঐতিহাসিক কোন বিশেষ কারণে কোন একটি দিককে হয়ত কিছু বেশি প্রাধান্য দিয়া অন্যদিককে কতকটা কম প্রাধান্য দিয়াছে মাত্র। বিশ্বের সকল জাতির নিয়তি-রূপ হইতে ভারতের নিয়তি-রূপ বিশিষ্ট নয়।

গত শতাব্দীতে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণার একটি প্রধান ধারা ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ্বের অন্য সকল সংস্কৃতি বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য সংস্কৃতি হইতে কোথায় বিশেষ তাহা নির্দেশ করা। ইহা সম্ভব হইয়াছিল, বলিয়াছি ভারতীয় সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় না লাভ করিবার জন্য, এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অধ্যাত্ম-সাধনার দিকটির সহিত পরিচয় আদৌ না থাকিবার জন্য, অথবা একান্ত স্বল্প জ্ঞানের জন্য। তৎকালে যে কয়েকজন পাশ্চাত্য মনীষী ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় দান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ইহার ঠিক বিপরীত ভ্রমের বশবর্তী হইয়াছিলেন।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে বর্তমান গবেষণার তাই মূল ভাব প্রেরণা হইল অন্যান্য সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির মিল কোথায় তাহা নির্দেশ করা এবং সেই সঙ্গে অমিল যেখানে যাহা রহিয়াছে তাহার ঐতিহাসিক, কতকটা বা ভৌগোলিক কারণ নির্দেশ করা।

এই দিক দিয়া ভারতীয় সমাজতত্ত্বের দুই একটি দিক প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মধ্যযুগকে (খ্রীঃ ৪র্থ ৭ম শতক) ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের যুগ বলা যাইতে পারে। এই অভ্যুত্থান ঘটে প্রায় সহস্র বৎসর ব্যাপী বৌদ্ধ ধর্মের প্লাবনের পর। প্রবল রাজশক্তির ছত্রচ্ছায়ায় ওই যুগের ব্রাহ্মণগণ কয়েক শতাব্দীব্যাপী শান্ত পরিবেশ শুধু লাভ করে নাই, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রায় কোথাও তেমন গুরুতর প্রকার ছিল না বলিয়া, সমগ্র ভারতবর্ষ বিশ্বের সংযোগ হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এক সহস্র বৎসরের বিচিত্র সাংস্কৃতিক সংযোগ, বিচিত্র আন্দোলন ও আলোড়নের পর

ভারতবর্ষ সেই প্রথম এমনি একটি অভূতপূর্ব অবস্থা লাভ করিয়াছিল। শাস্ত্রবিধির দ্বারা এই সাময়িক বিচ্ছিন্নতার ঐতিহাসিক কারণকে স্থায়ী করিবার চেষ্টাও যে হইয়াছিল তাহা মনু-স্মৃতির সমুদ্র যাত্রার নিষেধ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ঐতিহাসিক বোধ বিচ্ছিন্ন ইহা এমন একটি লোক যেখানে এমন কি দেশ-কালের বোধ পর্যন্ত সাময়িক ভাবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের স্মৃতি তখনও অতি জাগ্রত। তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ব্রাহ্মণরা এমন একটি সমাজ ও সমাজ-দর্শন গড়িয়া তুলিতে চাহিলেন যাহা আর কোন কালে যেন ভাঙ্গিয়া না পড়িতে পারে। ইহা হইবে শাশ্বত কালের সমাজ ও সমাজ-দর্শন। এই সমাজ ও সমাজ-দর্শনের স্বরূপ কি?

বৌদ্ধধর্ম বিশ্বের প্রবহমানতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ইহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এমন একটি ধর্ম ও দর্শন গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হয় যাহাকে স্থিতিশীল বলা যাইতে পারে। কিন্তু পরিবর্তনকে তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। এই দর্শন তাই বলে যে পরিবর্তন আছে সত্য, কিন্তু, তাহা মূল্যের পরিবর্তন নয়, এই পরিবর্তন কেবল রূপের। সদ্-অসদ্, পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দের বোধ লইয়া সমাজের সামগ্রিক মূল্যবোধ চিরকালের জন্য নির্দিষ্টীকৃত হইয়া গিয়াছে। মানুষ পারে কেবল রূপান্তর সাধন করিতে, উহার মূল্যবোধে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। এই পর্যন্ত মানুষের সামর্থ্য সীমা। জীব ও জগতের এই শাশ্বত নিয়তি। তাই সচলতা দৃষ্ট হইলেও নানা রূপান্তরের ভিতর দিয়া এই সমাজ-রূপ একান্ত স্থির।

মধ্যযুগে এই বর্ণাশ্রমকে একটি স্থায়ী রূপদানের জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ইহার সহিত বংশানুগতি (heredity) ও জাতি (race) তত্ত্ব সংযুক্ত করিয়া ইহাকে একটি দার্শনিক বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হয়। এই বংশানুগতি ও জাতির অবিমিশ্রতা আছে কি-না সে বিচার নৃতত্ত্ব-বিদ্‌গণ করিবেন। আমার উদ্দেশ্য ওই তত্ত্বদৃষ্টির সহিত আপনাদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া। এমন একটি মানব-সম্প্রদায় আছে যাদের ঈশ্বর মানস বা বুদ্ধি প্রধান করিয়া গড়িয়াছেন, অনুরূপভাবে তিনি অন্যান্য এক একটি বিশিষ্ট জন সম্প্রদায়কে এক একটি বিশিষ্ট বৃত্তি প্রধান করিয়া গড়িয়াছেন। সুতরাং বংশানুগতি ও জাতি-তত্ত্বকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ইহাই শাশ্বত কালের সমাজ-রূপ ও দর্শন।

শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও তাঁহারা চিরকালের জন্য কতকগুলি শিল্পরূপ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাই দেব-দেবীর ধ্যান-মন্ত্র শুধু নয়, তাঁহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাপ পর্যন্ত তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া

দিলেন। ভবন-শিল্পের ক্ষেত্রেও এই একই প্রয়াস-রূপ লক্ষ্য করিতে পারা যায়। অলংকার শাস্ত্রের ভিতর দিয়া সাহিত্যের রীতি-প্রকৃতি ও ধর্মকেও তাঁহারা চিরকালের জন্য স্থির নির্দিষ্ট করিয়া দিতে চাহিলেন। চিরকালের এই সমাজ-দর্শন ও সমাজ-রূপটিকে (ইহার সকল অঙ্গ সমেত) তাঁহারা এই দেশের সীমা ছাড়াইয়া অন্যদেশেও প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। ইহাই 'Aggressive Hinduism'-র স্বরূপ। সমগ্র বিশ্বকে এই সমাজ-রূপ ও সমাজ-দর্শন দান করিবার আকাঙ্ক্ষাকে 'Aggressive Hinduism' আখ্যা দান করা যাইতে পারে।

অন্যদিকে অভিব্যক্তি তত্ত্ব একথা বলে যে জড় হইতে ক্রমিক উন্নত পরিণামে বৃক্ষ লতাদি ও জীব-জন্তু প্রভৃতির ভিতর দিয়া আজ মন ও বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে। বেদান্তে একথা জানা যায় যে, এক পূর্ণচেতনাই আপনাকে নানা ক্রমে সংবৃত করিয়া নানা স্বরূপ লাভ করিয়াছেন। জড়ে তাঁহার সংবৃততম প্রকাশ, জীবের মধ্যে মনুষ্যে তাঁহার বর্তমান প্রকাশ সর্বাধিক। এ-অবস্থায় আসিয়া তাঁহার প্রকাশ সম্পূর্ণ হয় নাই। মানুষ আরও উন্নত চেতনা, উন্নত পরিণাম লাভ করিয়া চলিবে, যে পর্যন্ত না সে আপনার অন্তরস্থিত চেতনার পূর্ণ প্রকাশ ঘটাইতেছে।

এই অভিব্যক্তি তত্ত্ব সত্য বলিয়া এ কথা বলা চলে না যে সমাজ কেবল রূপান্তরিত হইতেছে তাহার মূল্যের কোন পরিবর্তন ঘটিতেছে না। বস্তুতঃ সমগ্র সমাজ-রূপটাই ক্রমিক পরিণাম লাভ করিয়া চলিয়াছে। মূল্যবোধের দিক হইতেও সমগ্র সমাজ তাই স্থির বা নিশ্চল নয়, সম্পূর্ণ গতিশীল।

প্রাণীবিদ্যাবিদ্‌দের মতে প্রাণীর দৈহিক বিকাশ মনুষ্যদেহ লাভে সম্পূর্ণ হইয়াছে। অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে মনুষ্য আকারের আর কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। বেদান্তও এই সত্য স্বীকার করেন। এখন যে অভিব্যক্তি ঘটিবে, তাহা একমাত্র মন ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে, বোধির বিকাশের ক্ষেত্রে। ব্যক্তি ও সমাজ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত বলিয়া ব্যক্তির এই বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমাজ-রূপেরও পরিবর্তন ঘটিবে। ব্যক্তির এই বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক যে রূপ সর্বাধিক সহায়তা করে সেই সমাজ সেই যুগের সর্বোৎকৃষ্ট সমাজ-রূপ। সেই যুগের সর্বোৎকৃষ্ট সমাজ বলিলাম এই জন্য যে সমাজ-রূপ আপেক্ষিক। বিশিষ্ট মানস পরিণতির জন্য এক একটি যুগে এক একটি বিশেষ ধরণের সমাজ ও সমাজ-তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। মানসিক পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-রূপেরও অনিবার্য পরিণতি ঘটে। এই পরিণতিকে দ্রুততর করিয়া তোলা সম্ভব যদি জীব ও সমাজের এই নিয়তি সম্পর্কে মানুষ সচেতন হয়। প্রত্যেক যুগে তাই মানুষকে সচেতন হইয়া সৃষ্টি-প্রেরণা ও বিকাশের ধারাগুলিকে

বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হয়, সেই সঙ্গে যে সকল শক্তি ওই সৃষ্টি-প্রেরণা ও বিকাশের প্রতিকূল তাহার দূরীকরণ প্রয়োজন। কোন্ বিশিষ্ট ভাবাদর্শ, কোন্ বিশিষ্ট জীবনাদর্শ, কোন্ বিশিষ্ট সাধন-রূপ বর্তমান সমাজে জাতির চিত্তক্ষেত্রকে উর্বর করিতেছে, বিচিত্র সৃষ্টিকার্যে প্রেরণা দান করিতেছে, একটি মহত্তম আশা আকাঙ্ক্ষার সূত্রে সমস্ত কিছুকে বাঁধিতেছে তাহা যেমন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, তেমনি কোন্ চিন্তাধারা সমাজের সকল অঙ্গের মধ্যে বিরোধ জাগাইয়া তুলিতে ব্যাপৃত, হৃদয়, মন ও মনীষার সকল প্রকার ক্ষুধাকে নিরুদ্ধ করিয়া দিতে চায়, বিশ্ব-জ্ঞান ও ভাব-ভাবনাকে আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতার এক নাম জাতির প্রতিভা,—কোন্ প্রেরণা সেই প্রতিভাকে আদৌ অস্বীকার করতে চায় তাহাও বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। ঐতিহাসিক জ্ঞান অভিব্যক্তির জ্ঞান। নহিলে ইতিহাস নিরর্থক। ঐতিহাসিক এই বিবর্তন ধারায় এই সমস্ত কিছু বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

অভিব্যক্তি তত্ত্ব সত্য বলিয়া একথা তাই অলীক কল্পনা মাত্র যে ঈশ্বর কোন একটি জনসম্প্রদায়কে মানস বা বুদ্ধিপ্রধান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, অনুরূপভাবে এক একটি বিশিষ্ট বৃত্তি প্রধান করিয়া এক একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছেন। বংশানুগতি ও জাতি-তত্ত্ব তাই সেই সঙ্গে অস্বীকৃত হইয়া যায়। একটি বিশিষ্ট সামাজিক কাঠামো সৃষ্টি করিয়া বৃত্তিকে বাহির হইতে কঠোর দণ্ডনীতি প্রয়োগ করিয়া বিশিষ্ট অবস্থা দান করা হইয়াছে মাত্র। বৃত্তি বংশানুগতি লব্ধ নয়। মানুষ কেন যে এক একটি বিশিষ্ট স্বভাব বা স্বধর্ম লইয়া জন্ম গ্রহণ করে তাহার রহস্য উদ্ঘাটন আজ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞান করিতে সমর্থ হয় নাই। হিন্দু জন্মান্তর বাদ এইদিক দিয়া একটা চেষ্টা মাত্র।

এক একটি মানুষ অপরিমিত প্রাণ শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই প্রাণ শক্তির সহায়তায় একই জন্মে সে জীব বিকাশের অতি নিম্ন পর্যায় হইতে একের পর এক চেতনা পর্যায় অতিক্রম করিয়া শ্রেষ্ঠ জীব পরিণাম লাভ করে। একটি মানুষ প্রাণের সম্পদে একান্ত দীন। সমাজের সকল বিশিষ্ট অবস্থা প্রাণ-পণ চেষ্টা করিয়া তাহাকে তাহার জীব বিকাশের উচ্চ অবস্থায় ধারণ করিতে পারিতেছে না। ধীর পশ্চাদ্গতি তাহাকে একের পর এক নিম্ন পর্যায়ে আকর্ষণ করিয়া অতি নিকৃষ্ট অবস্থা দান করিতেছে। ইহাই জীবের চিরন্তন নিয়তি রূপ। কেহ স্বাভাবিক জন্মলব্ধ অবস্থাকে ছাড়িয়া ক্রমিক উন্নততর পরিণাম লাভ করিয়া চলে। এই উর্ধ্ব ও নিম্নগতির নিয়ত চলাচলের ভিতর দিয়া সামগ্রিক ভাবে সমগ্র সমাজ ধীর বিকাশ লাভ করিয়া চলিয়াছে।

একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে কোন একটি বিশেষ বৃত্তির অনিবার্য স্ফুরণ ঘটে না বলিয়া, স্বভাব বা স্বধর্ম বিরুদ্ধ চেষ্টায় তাহার সম্পূর্ণ সত্তা বিকৃত হইতে বাধ্য। অন্যদিকে আপনার স্বভাব অনুকূল চেষ্টা করিয়া সে যে অসামান্য সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিত তাহা হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। বংশানুগত জাতি বিভাগ এইরূপে মনুষ্য-সমাজের দ্রুত বিকাশকে যে নিরুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল তাহাতে সংশয় নাই।

মধ্যযুগীয় এই সমাজ-রূপায়ণের পর হইতে প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া এমন তমসাচ্ছন্ন, তামসিকতা নিমগ্ন, সকল প্রকার সৃষ্টি প্রেরণা নিরুদ্ধ, সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট গতানুগতিকতা জাতির ইতিহাসে ইতিপূর্বে কোথাও দৃষ্ট হয় নাই।

বৃত্তি বংশানুগত, সামর্থ বংশানুগত, গুণাবলী বংশানুগত বর্ণাশ্রম তত্ত্বে এই সত্য স্বীস্কৃত হইবার ফলে স্বাভাবিক ভাবে মনুষ্যত্ব অর্জনের প্রয়াস নিরুদ্ধ হইয়া যায়। অগ্রগতি (অবশ্য এই তত্ত্বে অগ্রগতি অজ্ঞানতা !) তো দূরের কথা স্থিতিও সম্ভব হয় নাই, (মনুষ্যত্ব ধারণ করিয়া রাখিতেও বিপরীত প্রেরণার সহিত নিয়ত সংগ্রাম করিতে হয়) ক্রমাগত অধোগতি ঘটিতে থাকে। পরিণামে একটি সম্প্রদায় সাধারণ ভাবে সকল সৃষ্টি প্রেরণা নিরুদ্ধ হইয়া যায়। মনস্তাত্ত্বিক ভাবে সীমিত হওয়ার দরুণ অন্য সম্প্রদায়ের চেষ্টা তো নিরুদ্ধ ছিলই। ফলে সমগ্র সমাজ সম্পূর্ণ স্থিতিশীল অবস্থা লাভ করে। তাহার ফল দেখিতে পাই প্রাচীন ভাবের, আদর্শ-রূপের, আকারের পুনরাবৃত্তি প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া।

মধ্যযুগের আয়ুষ্কালকে যথেষ্ট বিস্তৃত করিলেও তিন শত (৪র্থ-৭ম শতক) বৎসরের অধিক হইবে না। ইহার মধ্যে একটি ভাব সুপরিণত হইতে অন্ততঃ একশত বৎসর লাগিয়াছে। তাহারপর সমাজে প্রয়োগ করা, অর্থাৎ ওই বোধকে সমাজে সত্য করিয়া তোলা। স্মৃতি-সংহিতার বর্ণাশ্রম তত্ত্ব সমাজে কতদূর কার্যকরী হইয়াছিল এবং আদৌ কার্যকরী হইয়াছিল কি না সে সম্পর্কে এখনও আমরা নিঃসংশয় হইতে পারি নাই। কারণ গ্রন্থে লিখিত তত্ত্ব এবং সমাজের বাস্তব অবস্থার মধ্যেও ব্যবধান আকাশ পাতাল।

পূর্ণতাভিমুখীন যে চেতনা জড় হইতে শ্রেষ্ঠ মানব সমাজ পর্যন্ত প্রসারিত, এবং মানব-সমাজকে ক্রমিক উন্নত পরিণাম দান করিয়া চলিয়াছে, সেই চেতনার লীলা একান্ত দুর্জ্ঞেয়। মানুষ আপনার বুদ্ধির সহায়তায় তাহাকে এক একটি যুগে এক একটি স্বরূপে ব্যাখ্যা করে মাত্র। মধ্যযুগীয় সমাজ-তত্ত্ব তেমনি একটি ব্যাখ্যা মাত্র। উহা একটি বিশেষ যুগের, বিশেষ মানব সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মানব-রূপ,—উহারই বহিঃক্ষেপ। সমাজ আপনার

নিয়মে বিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে, তাই কোন একটি ব্যাখ্যার দ্বারা সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। অবশ্য মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিতে পারে না। ব্যাখ্যা করিবার এই জাতীয় চেষ্টার ভিতর দিয়া মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিও ক্রমিক উন্নত পরিণাম লাভ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ইহার সামর্থ সীমা সম্পর্কে মানুষ যখন সচেতনতা হারায়, তখন মানুষ আপনার বুদ্ধির দ্বারা আপনাকে যেমন সমাজকে তেমনি আবদ্ধ করে। ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে তখন ঘোর দুর্দিন দেখা দেয়।

যে মনস্তত্ত্বের সহায়তায় তাঁহারা কার্যসিদ্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা এই যে, এক একটি বিশেষ মানব-রূপ, বিশেষ এক একটি মনোবৃত্তি, জগৎও জীবন সম্পর্কে এক একটি বিশিষ্ট বোধ গড়িয়া তোলা। মানুষ যাহা শ্রদ্ধা করে, আপনার সম্পর্কে মানুষ যাহা বিশ্বাস করে মানুষ পরিশেষে তাহাই হইয়া পড়ে। বর্ণাশ্রম প্রথার পশ্চাতে এই রকম একটি মনস্তত্ত্ব আছে বলিয়া একমাত্র ওই মনস্তাত্ত্বিক কারণটিকে দূর করিতে পারিলে তবে ওই প্রথার বিলোপ সাধন সম্ভব। মূলে এই মনস্তাত্ত্বিক কারণটিকে দূর করিতে না পারিলে বিরোধের মনোবৃত্তি, বাহিরের কোন সুযোগ সুবিধা কোন ফলই দান করিতে পারিবে না, পরন্তু সমগ্র সমাজকে অধোগামী করিয়া তুলিবে। এই জাতীয় বিরোধে কেবল অধ্যাত্ম শূন্যতা জাগে, যাহা সকল সৃষ্টি প্রেরণা শূন্য।

পরেশবাবুর একটি উক্তি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"সমাজের ক্ষয় বুঝতে সময় লাগে। ইতিপূর্বে হিন্দু সমাজের খিড়কির দরজা খোলা ছিল। তখন এদেশের অনার্য জাতি হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রবেশ করে একটা গৌরব বোধ করত। এ দিকে মুসলমানের আমলে দেশের প্রায় সর্বত্রই হিন্দু রাজা ও জমিদারের প্রভাব যথেষ্ট ছিল, এই জন্যে সমাজ থেকে কারও সহজে বেরিয়ে যাবার বিরুদ্ধে শাসন ও বাধার সীমা ছিল না। এখন ইংরেজ অধিকারে সকলকেই আইনের দ্বারা রক্ষা করছে, সে-রকম কৃত্রিম উপায়ে সমাজের দ্বার আগলে থাকবার জো এখন আর তেমন নাই। সেই-জন্য কিছুকাল থেকে কেবলই দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে হিন্দু কমছে আর মুসলমান বাড়ছে। এরকম ভাবে চললে ক্রমে এদেশ মুসলমান প্রধান হয়ে উঠবে, তখন একে হিন্দুস্থান বলাই অন্যায় হবে।

"রক্ষা পাবার জন্য একটি জাগতিক নিয়ম আছে—সেই স্বভাবের নিয়মকে যে পরিত্যাগ করে সকলেই তাকে স্বভাবতই পরিত্যাগ করে। হিন্দু সমাজ মানুষকে অপমান করে, বর্জন করে, এই জন্যে এখনকার দিনে আত্মরক্ষা করা তার পক্ষে প্রত্যহই কঠিন হয়ে উঠছে। কেন না, এখন তো আর সে আড়ালে

বসে থাকতে পারবে না—এখন পৃথিবীর চারদিকের রাস্তা খুলে গেছে, চারদিক থেকে মানুষ তার উপরে এসে পড়ছে, এখন শাস্ত্র সংহিতা দিয়ে বাঁধ বেঁধে প্রাচীর তুলে সে আপনাকে সকলের সংশ্রব থেকে কোনো মতে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। হিন্দু সমাজ এখনো যদি নিজের মধ্যে সংগ্রহ করবার শক্তি না জাগায়, ক্ষয়রোগকেই প্রশ্রয় দেয় তা হলে বাহিরের মানুষের এই অবাধ সংস্রব তারপক্ষে একটি সাংঘাতিক আঘাত হয়ে দাঁড়াবে।”

বর্ণ বিভাগ স্থায়ী শ্রেণী (class) বিভাগ সৃষ্টি করিবার যে একটি কৌশল মাত্র তাহা অস্বীকার করিতে যে সকল দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগ করা হয় তাহাদের মধ্যে বিশেষকরণের (specialization) যুক্তি একটি।

ঈশ্বর নির্দিষ্ট স্বভাব বা স্বধর্মের সহিত এই যুক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বংশানুগতির সহিত স্বভাব বা স্বধর্ম যখন চিরকালের জন্য নির্দিষ্টীকৃত তখন মানুষের উচিত একমাত্র স্বভাব বা স্বধর্ম অনুকূল আচরণ করা। এই স্বভাব বা স্বধর্ম অনুকূল আচরণে মানুষ এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অসামান্য সামর্থ লাভ করে, নানা সৃষ্টি প্রতিভার পরিচয় দেয়।

বিশেষকরণ তত্ত্বে মানুষের সমগ্র সত্তাকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া তাহা জীবনকে সমগ্র সমাজকে একটা পরিণামে আর ফলপ্রসূ করিতে পারে না। বৃক্ষ যেমন অঙ্কুরোদ্গম হইতে সম্পূর্ণ বৃক্ষই, তাহার বিকাশ যেমন সমগ্রতারই বিকাশ, তেমনি মনুষ্যত্বের বিকাশও সমগ্রতার বিকাশ, তাহার আংশিক বিকাশ নয়।

মানুষকে সমগ্র মানুষ হইয়া উঠিবার সাধনা করিতে হইবে। মনুষ্যত্ব বিকাশের ক্রম অনিবার্যরূপে থাকিবে, কিন্তু সে ক্রম, সামগ্রিতার ক্রম। সমাজ ও মানুষ অবিচ্ছেদ্য। বিশিষ্ট বৃত্তি বিকশিত আংশিক বিশিষ্ট এক একটি সম্প্রদায়ের মানুষ লইয়া পূর্ণ সমাজ-রূপ কোন প্রকারেই গঠিত হইতে পারে না। মানুষ ঈশ্বরীয় সত্তার কোন অংশ বিশেষের প্রকাশ নয়, মানুষ মাত্রেই তাঁহার সমগ্র সত্তার প্রকাশ। মানুষকে তাই তাহার সকল বৃত্তির পূর্ণ অনুশীলন দ্বারা ঈশ্বরীয় সত্তা লাভ করিতে হয়।

শিল্প-রূপ যদি জাতির অবচেতন মন এবং অধ্যাত্ম-মনের অনিবার্য প্রকাশ যদি এইরূপে হয়, ইহাই যদি জাতির অধ্যাত্ম-সাধনার বিশিষ্ট একমাত্র পথ হয়, তবে সেই শিল্প-রূপকে আর কোন জাতির উপর কেমন করিয়া আরোপ করিতে পারা যাইবে? কারণ আর কোন জাতির অন্তস্তল এই জাতির অন্তস্তলের অনুরূপ হইতে পারে না। অথচ ‘Aggressive Hinduism’- র ক্ষেত্রে এই জাতীয় চেষ্টার রূপও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

তাহার পর শিল্প-রূপগুলিকে চিরকালের অধ্যাত্ম-সাধনার আধার করিয়া

তুলিবার যে চেষ্টা,—অর্থাৎ দেব-দেবীর ধ্যান-মন্ত্রই শুধু নয় তাঁহাদের সর্বাঙ্গের যথাযথ পরিমাপ পর্যন্ত দান !

এমতি যুক্তিও কোথাও কোথাও প্রয়োগ করা হইয়াছে দেখিতে পাই যে ভাষা শিক্ষার জন্য যেমন অক্ষর জ্ঞানের অনিবার্য প্রয়োজন, আবার অক্ষর জ্ঞান সম্পূর্ণ হইয়া গেলে মানুষ যেমন পরিণামে ভাষার বিচিত্র ঐশ্বর্য্য শিক্ষা করিতে, প্রয়োগ ও সৃষ্টি করিতে পারে, দেব-দেবীর এই প্রতীক-রূপগুলি তাঁহাদের ওই যথাযথ পরিমাপগুলিও তেমনি শিল্পের ক্ষেত্রে অক্ষর জ্ঞান। এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া শিল্পী যেকোন বৈচিত্র্য সাধন করিতে পারে। ভারতীয় শিল্পে তাই দেখিতে পাই একই প্রতীকরূপ, প্রতীকরূপের একই পরিমাপ সত্ত্বেও কোন দুটি মূর্ত্তি এক-রূপ হইয়া পড়ে নাই,—একই আধারে প্রকাশ বৈচিত্র্য ও রস-বৈচিত্র্য অন্তহীন হইয়া পড়িয়াছে। মনের অন্তহীন বৈচিত্র্য প্রবণতা ও বহির্মুখীনতাকে ধারণ করিবার ইহা একটি প্রয়াস।

এই জাতীয় যুক্তি প্রয়োগ যে মূল শিল্প-প্রেরণা ও অধ্যাত্ম প্রেরণাকে আদৌ না বুঝিবার ফল তাহাতে কোন সংশয় নাই। কোন বন্ধনে যে শিল্পীর সৃষ্টি-প্রেরণাকে নিরুদ্ধ করিতে পারা যায় না, এই রস-বৈচিত্র্য তাহারই প্রমাণ।

ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে আমি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছি তাহা সমর্থন করিবার জন্য নিম্নে দুই-একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"But the priests stepped in, and that direct experience of nature which was being illumined more and more by the experience of the spirit was arrested at a certain point and held fast. The priests set a fixed pattern for art all must conform to. Art can work in chains for a long time as the mind can not, and it was centuries before the full effect appeared of the control of the artists' spirit by the priests dogma, but by the time it was apparent, Egyptian art was ended. Plato's comment is to all intents and purposes its funeral oration :

In Egypt the forms of excellence were long since fixed and patterns of them displayed in the temples. No painter or artist is allowed to innovate on the traditional forms or invent new ones. To this day, no alteration is allowed-none at all, Their works of art painted or molded in the same forms which they had 10,000 years ago."

এই প্রসঙ্গে হিন্দু-শিল্প সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,

"—the Hindoo was unhampered by anything outside of himself except the material he worked in, and even there he often refused to recognize a limitation. The art of India and of all the nations of the East she influenced shows again and

again sculpture that seems to struggle to be free of the marble. No artists have ever made bronze and stone move as they did. There was nothing fixed and rigid for them; nothing in the world of the spirit is fixed and rigid. Hindoo art is the result of unchecked spiritual force, a flood held back by no restraints save those the artist chose to impose upon himself."

"The Great Age of Greek Literature"
(*Edith Hamilton.*)

নিত্য-নূতন চিন্তাধারার সংস্পর্শে ব্যক্তির অন্তস্তল যেমন, জাতির অন্তস্তলও তেমনি ধীরে পরিবর্তিত হয়। ব্যক্তি বা জাতির অন্তস্তল পরিবর্তিত হইলে তাহার প্রতীক-রূপেরও অনিবার্য ভাবে পরিবর্তন ঘটিতে বাধ্য (তাহা যে ক্রমিক উন্নত পরিণাম লাভ তাহা সকল সময় না হইতেও পারে, কোথাও কেবল রূপান্তর মাত্র)। নির্বিশেষ চেতনা যে বিশিষ্ট মানস গঠনাশ্রয়ী হইয়া আপনাকে প্রত্যক্ষ গোচর করায় সেই মানস-গঠন পরিবর্তিত হইলে প্রতীক-রূপও পরিবর্তিত হয়। ব্যক্তির এবং এইরূপে সমগ্র জাতির অন্তস্তলের এই যে পরিবর্তনের কথা বলিলাম তাহা গভীরতম সত্তা বলিয়া অতি ধীরে সংঘটিত হইতে থাকে। বিশেষ করিয়া নিত্য-নূতন চিন্তার সংঘাত যেখানে অত্যন্ত ক্ষীণ সেখানে এই পরিবর্তন সহস্র বৎসরেও বিশেষ অনুভূত হয় না। কিন্তু এই ক্ষীণ পরিবর্তনকে অপরিবর্তন বলা যায় না। অধ্যাত্মসত্তা আচ্ছন্ন না থাকিলে ব্যক্তি বা জাতি নিত্য-নূতন অধ্যাত্ম-প্রতীকরূপ গড়িয়া তুলে (এই প্রতীক-রূপগুলির মধ্যে সমসাময়িক যুগের জাতির সকল বিরুদ্ধ বা বিপরীত প্রেরণা ও ভাবাদর্শ একটি অপূর্ব উপায়ে সামঞ্জস্য লাভ করিয়া জাতিকে শান্ত ও আত্মস্থ করায়। জাতি আবার নানা সৃষ্টি প্রেরণার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম হয়)। যেখানে তাহা সম্ভব হয় না, সেখানে একটি পরিণাম পর্যন্ত আসিয়া জাতি সম্পূর্ণ অধ্যাত্মবোধ শূন্য হইয়া পড়ে।

৪

মানুষের মধ্যে সদ্-অসদ্ পাপ-পুণ্য উভয় বোধের মিশ্রণ আছে। এই মিশ্রিত বোধ, উহার বিচিত্র লীলা এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত বিশিষ্ট বোধ লইয়া এক-একটি বিশিষ্ট মানব সম্প্রদায় চিরকালের জন্য বিশিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই বিশিষ্টতা ঈশ্বর নির্দিষ্ট। ইহার ব্যত্যয় নাই। অর্থাৎ ওই বিশিষ্ট বোধের বাহিরে আসা ওই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের পক্ষে অসম্ভব। বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে এমনি একটি তত্ত্ব-উপলব্ধি আছে।

এই তত্ত্বের পশ্চাতে আর একটি যে তত্ত্ব আছে, তাহা এই যে এমনি

এক-একটি বিশিষ্ট মূল্যবোধ লইয়া এক-একটি জনসম্প্রদায় কেবল রূপান্তরিত হইতেছে। ইহা কোন অগ্রগতি নয়। এইরূপে সমগ্র সমাজবিশিষ্ট এক-একটি সম্প্রদায়ের সীমিতবোধের সামগ্রিক প্রকাশরূপে আপনার সীমিতবোধ লইয়া আবর্তিত হইতেছে। সীমাবোধগুলির সমষ্টিও সীমিতবোধ। কোন মানব সম্প্রদায় এইরূপে আপনার সীমা লঙ্ঘন করিতেছে না, সীমা লঙ্ঘনের প্রয়াস অসাধ্য এবং আত্মঘাতী।

মূল্যের বিকাশ যখন মানি না, এক-একটি মানবগোষ্ঠীর এক-এক প্রকার নিয়তিরূপ যখন চিরস্থির, তখন মানুষের ধর্ম কি, না ওই বিশিষ্ট সীমাবোধকে (ওই বিশিষ্ট সীমাবোধের চক্রই তাহার বারংবার জন্ম-মৃত্যুর চক্র) কোন একটি উপায়ে ছাড়াইয়া উঠা ;—এই উপায় বহুবিধ।

সম্প্রদায় বিশেষের সীমিতবোধের মধ্যে যদি মূল্যের আপেক্ষিকতা থাকে (ইহা ওই তত্ত্বেই স্বীকৃত), তবে সকল সীমার অতীত মুক্তি তত্ত্বও যে আপেক্ষিক, তাহা স্বীকার করিতে হয়। সকল সীমার অতীত যে মুক্তি, তাহাকে এইরূপে আপেক্ষিক করিয়া তুলিবার পশ্চাতে যুক্তির প্রমাদ রহিয়া যায়, কারণ অসীমের বোধ আপেক্ষিক হইতে পারে না। তত্ত্বটিকে কিছু বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন।

পরম পুরুষ আপন সৃষ্ট মহৎ প্রকৃতির গর্ভে সৃষ্টিবীজ নিক্ষেপ করিয়াছেন। মহৎ প্রকৃতির গর্ভে সেই বীজ-রূপ বিসৃষ্টিরূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে! বিসৃষ্টির পর্যায়ক্রমে বারংবার অনাদ্যন্ত কাল ধরিয়া সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় ঘটিতেছে। পরম পুরুষ এই সকল সৃষ্টিও বিনষ্টির ঊর্ধ্বতর তত্ত্ব। তিনি অব্যয়, অব্যাকৃত, আপন মহিমায় আপনি চিরসমাসীন। বিসৃষ্টি ত্রিগুণাত্মক—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময়। এই ত্রিগুণের হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই—মনুষ্য-মধ্যে এই তিনগুণের বিচিত্র সমাবেশ। কোথাও একটির প্রাধান্য কোথাও অন্যটির। গুণ প্রাধান্যের উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বর চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণময়, ক্ষত্রিয় সত্ত্ব প্রধান রজঃগুণময়, বৈশ্য তমোপ্রধান রজঃগুণময় এবং শূদ্র তমোময়। গুণাবলীর চলাচলতা যতই হোক, সেই সঙ্গে বর্ণের সচলতা যতই স্বীকৃত হোক সত্ত্ব, রজ ও তমের সামগ্রিক প্রকাশ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একই রূপ। ত্রিগুণাত্মক বিশ্বে গুণ বা মূল্যের কোন তারতম্য ঘটিতেছে না। এই ত্রিগুণাত্মক করিয়া জীবনের সকল বিভাগকে (ত্যাগ, জ্ঞান, কর্ম, বুদ্ধি, ধৃতি, সুখ, তপ, দান, শ্রদ্ধা, আহার, যজ্ঞ প্রভৃতি) প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশ্বের নর-নারী এই তিন গুণে বিমোহিত হইয়া পরম তত্ত্ব (নিস্ত্রৈগুণ্যাবস্থা) বিস্মৃত হইয়া আছে।

স্বভাব বা স্বধর্ম বিহিত (বংশানুগতি বিহিত ?) কর্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই সেই পরম তত্ত্বকে লাভ করিতে হয়। অন্য ধর্ম বা অন্য স্বভাব আশ্রয় করিবার চেষ্টা মানুষ নানা কারণে—লোভে, মোহে বা নানা দুর্বলতায় করে। তবে অমোঘ নিয়মে অনিবার্যভাবে পরিণামে স্বভাব বা স্বধর্মই জয়ী হইয়া থাকে। স্বধর্ম বিহিত কর্মানুষ্ঠান করিতে হয় কর্মের ফল কামনা শূন্য হইয়া অর্থাৎ নিষ্কামভাবে। পরম তত্ত্ব লাভের যত পথ আছে, তাহার মধ্যে কামনাশূন্য হইয়া কর্মানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ। গীতা হইতে সংকলিত করিয়া নিম্নে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি ! আমি উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা এই শ্লোক কয়েকটিরই ভাবানুবাদ মাত্র।

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ১৪।৩
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নতি মহাবাহো। দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ১৪।৫
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্য কর্তারমব্যয়ম্ ॥ ৪।১৩
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ১৮।৪০
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রাবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ১৮।৪১
ন কর্তত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফল সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥৫।১৪
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ৭।১৩
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মনা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ১৮।৪৬
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বান্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ১৮।৪৭
সহজং কর্ম কৌন্তেয় ! সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ১৮।৪৮
যদ্যহঙ্কারমাশ্রিত্য না যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ১৮।৫৯

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানাং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২।১২

বিভাগ যদি গুণকর্মাশ্রয়ী হয়, তাহা হইলে বর্ণাশ্রম নিত্য সচল হইয়া পড়ে। গীতা ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকার এই মত সমর্থন করেন। এই মত সমর্থন করিবার জন্য তাঁহারা স্মৃতি-সংহিতা পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে বহুল উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। গুণকর্ম যে বংশানুগত নয়, ইহাই শাস্ত্র-বচনের সহায়তায় সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা। আবার যাঁহারা গুণকর্মকে বংশানুগত বলিয়া বোধ করেন, তাঁহারাও আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য ওই স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতি হইতে শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শাস্ত্র-প্রমাণের সহায়তায় কেহ বর্ণাশ্রমকে সচল প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, কেহ বর্ণাশ্রমকে বংশানুগত বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু, এই উভয় পক্ষেরই মূল দার্শনিক উপলব্ধি একই, অর্থাৎ মনুষ্যলোকে এই তিন গুণের আধিপত্য ও পরিমাপ একই রহিয়াছে।

জগৎ ও জীবনের মূল্যের যখন পরিবর্তন অসম্ভব, তখন স্বভাব অনুযায়ী —বংশানুগত বা সাধারণ জন্মলব্ধ যাহাই হোক—নিষ্কাম কর্ম করিয়া মানুষকে এই ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ, মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করিতে হয়। গুণাশ্রয়ী হইলে– সত্ত্ব, রজ ও তম যাহাই হোক—বারংবার মর্তে জন্মগ্রহণ করিয়া গুণাশ্রয়ী সুখ, দুঃখ বা সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত ফল ভোগ করিতে হয়। জগৎ ও জীবনের এই চিরন্তন নিয়তরূপ।

জগৎ ও জীবনের মূল এই স্বরূপ বা নিয়তি-রূপ সম্পর্কেই সংশয় জন্মিয়াছে। সে সংশয়ে বর্ণ গুণ কর্ম অনুসারে নির্ণীত হইবে, না বংশানুগত-ভাবে নির্ণীত হইবে, এই সমস্যাই আদৌ লুপ্ত হইয়া, উহার মীমাংসা প্রয়াসকে পর্যন্ত নিরর্থক করিয়া দিয়াছে।

গীতাকারের বর্ণাশ্রম ধর্ম সচল হইলেও—বর্তমান দার্শনিক জগতে এ সম্পর্কে কোন মতদ্বৈধ নাই—, উহা যে মনুষ্য, সমাজের অভিব্যক্তির একটি পর্যায়ে মাত্র সত্য, তাহাতে কোন সংশয় নাই। গীতাকার স্বয়ং এই সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ধীর অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া এমন একটি অবস্থা আসিবে, যখন মনুষ্য-সমাজে আধ্যাত্মিক এই ক্রমের আর লেশমাত্র থাকিবে না। তখন মানুষ কোন্ ধর্ম পালন করিবে? গীতাকার সে কথাও বলিয়াছেন— "সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"—ইত্যাদি ১৮।৬৬।

বর্ণাশ্রমের সকল ধর্ম অর্থহীন হইয়া তখন একটিমাত্র ধর্ম থাকিবে। তাহা হইল, দিব্য-চেতনার সহিত মানবাত্মার নীরব নিয়ত যোগ। মানুষের

নৈতিক স্বভাবকে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য, বাহিরের সকল আচার-অনুষ্ঠান তখন নিরর্থক হইয়া যাইবে।

গীতায় একটি শ্লোক আছে ঃ—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।

কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ ১৩।২২

অর্থ ঃ পুরুষ দেহে অধিষ্ঠান করিয়া তজ্জনিত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। ইন্দ্রিয়-গণের সহিত তাঁহার সম্পর্কই সৎ অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের একমাত্র কারণ।

ইহার নিহিত তাৎপর্য এই যে, দেহ বা ইন্দ্রিয়কে যাহারা যতখানি নিগৃহীত ও জয় করিয়া উঠিতে পারে, তাহারা তত উচ্চ বংশানুগতি লাভ করে। এই তত্ত্ব স্বীকার করিলে ইহা স্বাভাবিকভাবে স্বীকৃত হইয়া পড়ে যে, সমাজের নিম্নতম পর্যায়ের নর-নারীর ইন্দ্রিয় সর্বস্বতা সর্বাধিক এবং উচ্চতম পর্যায়ের নর-নারীর ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ সর্বাধিক। কিংবা বলা যায়, সমাজের নিম্নতম পর্যায়ের মানসিক এবং এইরূপে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ ন্যূনতম এবং উচ্চতম পর্যায়ের নর-নারীর মানসিক এবং এইরূপে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সর্বাধিক।

এক প্রান্তে ইন্দ্রিয় এবং অপর প্রান্তে আত্মা। এই দুইয়ের ক্রমিক মিলনে সমাজস্থ নর-নারীর বংশানুগতির তারতম্য। ক্রমিক মূল্যবোধ বংশানুগতির সহিত শাশ্বতকালের জন্য নির্দিষ্টীকৃত। উপকরণের পরিবর্তন বহির্জগতে কেবল রূপান্তর সাধন করিয়া চলিবে, কিন্তু মূল্যের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান দ্বারা এই মূল্যবোধকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করা হয় মাত্র। বিধি প্রবর্তিত না থাকিলেও, এই মূল্যবোধ অচিহ্নিত হইয়া কোন-না-কোন রূপে থাকিত।

ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ও সমাজ-বিজ্ঞানীগণ যে বিস্ময়কর তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহাতে মূল এই তত্ত্ব কতদূর স্বীকৃত, সামাজিক যে-কোন পর্যায়ের লোক যে-কোন ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে কি না, ইহা সামাজিক অবস্থাকে বাহিরের দিক হইতে ছলে বলে অথবা কৌশলে বিচিত্র উপায়ে সীমিত করিবার চেষ্টা কি না, সে বিচার আমি এক্ষেত্রে তুলিতেছি না। আমি এক্ষেত্রে কেবল এই দার্শনিক বোধকেই বিচার করিয়া দেখিতেছি।

যে-ধর্ম ও দর্শন মানবিক বোধকে ছাড়াইয়া উঠিবার সাধনাকে একমাত্র সাধনা বলিয়া বোধ করে, তাহার পক্ষে তত্ত্বের দিক হইতে সামাজিক মূল্যবোধের এই ক্রম নির্ধারণ করা স্বাভাবিক। ইহার সহিত অন্বিত হইয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ আর সকল তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু যে ধর্ম ও দর্শন দেহ ও আত্মার পূর্ণ স্বীকৃতি ও মিলনে পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনাকে স্বীকার করে, তাহা অনিবার্যভাবে মূল্যবোধের এই ক্রমকে স্বীকার করিবে না এবং উহার সহিত বিজড়িত হইয়া আর সকল তত্ত্ব অস্বীকৃত হইয়া যাইবে। এই তত্ত্ব সর্বোচ্চের সহিত সর্বনিম্নের, আত্মার সহিত দেহের, চেতনার সহিত জড়ের, অসীমের সহিত সীমার, অরূপের সহিত রূপের মিলন সাধন করিতে চাহিয়াছে।

আত্মতত্ত্ব এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশতত্ত্ব একপ্রকার বিপরীত ও বিরুদ্ধ বলা চলে। আত্মতত্ত্বে মনুষ্যত্ব বিকাশের কোন যোগ নাই বলিয়া, মানুষের পক্ষে সামাজিক যে-কোন অবস্থা এবং সেই অবস্থা অনুযায়ী সামাজিক বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া কেবল একটি বিশিষ্ট মানসিক অবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারিলেই শ্রেষ্ঠ সাধনার ফল লাভ করা সম্ভব। মনুষ্যত্ব বিকাশের ক্রম এই তত্ত্বে ফললাভের ক্রম স্বীকার করে না বলিয়াই মনুষ্যত্বের (মানবিক বোধের পূর্ণ বিকাশ), সাধনা যে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত, তাহা বলা যাইতে পারে।

দৃষ্টিভঙ্গীর এই আমূল রূপান্তরের জন্য ব্যক্তিগত জীবনে মূল্য আরোপ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সাধন সাপেক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের সকল নর-নারীর জীবনে এই সাধনাকে সত্য করিয়া তুলিতে আরোপিত সকল বিধিনিষেধ যেখানে যতটা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, সেখানে সেই সমাজ তত বিচিত্র সৃষ্টির কার্যে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, তত উন্নতি লাভ করিতেছে।

একথা সত্য যে, আমরা প্রতিভার যে বিচিত্র প্রকাশ দেখিতে পাই, তাহার প্রায় সমস্তই সমাজ-রূপের বিশিষ্ট একটি স্তর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, আর অন্যান্য পর্যায় হইতে যে সামান্য প্রতিভার স্ফুরণ দেখিতে পাই, তাহা একক, একান্ত বিচ্ছিন্ন, পূর্বাপর সকল সম্পর্কশূন্য। নৃ-তত্ত্বের একটি অঙ্গ তাই রক্ত সম্পর্কের মধ্যে প্রতিভার একটি অনিবার্য যোগসূত্র আবিষ্কার করিতে চাহিতেছে।

এইরূপ হওয়াই স্বভাবিক। কিন্তু, যে বিশিষ্ট সমাজ-কাঠামোর মধ্যে এই জাতীয় গবেষণা করা হয়, সেখানে ওই সমাজ-রূপটির মূল্যায়নও প্রয়োজন। সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমগ্র সমাজ-রূপটি এমন একটি মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহার ফলে সমাজের সকল স্তরের মধ্যে সৃষ্টি-ক্ষম, উন্নত বা গভীর, বহুবিচিত্র প্রতিভার প্রকাশ একপ্রকার অসম্ভব। সে মনস্তত্ত্বে মানুষকে পশু করিয়া ফেলিতে পারা যায়।

মনস্তাত্ত্বিক কারণ যে মানবিক সমগ্র সত্ত্বার তাহার জড় আধারের পর্যন্ত রূপান্তর সাধন করিতে সক্ষম বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবেও একথা আজ সর্বজন-স্বীকৃত। সুতরাং, আধারের পরিমাপ যেমন করিয়া বা যে-ভাবেই লওয়া

হোক-না-কেন, তাহার মধ্যে প্রতিভার কোন রহস্য কোন কালেই লাভ করিতে পারা যাইবে না।

প্রতিভার রহস্য কোন রক্ত-সম্পর্ক বা 'জীন'-তত্ত্বের মধ্যে নাই। নানা সীমিত বোধ সৃষ্টি করিয়া (এই সীমিত বোধ মুখ্যতঃ মনস্তাত্ত্বিক), একটি সমগ্র সমাজের প্রতিভা-বিকাশকে একমুখীন ও সম্প্রদায়গত করিয়া তোলা হইয়াছে। প্রতিভার রহস্য একমাত্র মনস্তাত্ত্বিক কারণের মধ্যে নিহিত। মনস্তাত্ত্বিক কারণ প্রয়োগ করিয়া মানুষকে মুহূর্তে যেমন পশু করিতে পারা যায়, তেমনি দেবত্বের স্তরেও উন্নীত করা সম্ভব। কারণ, একমাত্র এই আধার আশ্রয় করিয়া মানুষ অসীমের স্পর্শ লাভ করে। কোন একটি উন্নত বোধকে আশ্রয় করিয়া মানব-জীবনে যখন অসীমের স্পর্শ লাভ ঘটে, তখন তাহাকে আমরা বলি প্রতিভা।

একমাত্র স্বার্থ বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্ট এই মনস্তাত্ত্বিক জালকে সম্পূর্ণরূপে গুটাইয়া ফেলিতে পারিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সমাজের তথাকথিত সকল পর্যায় হইতে অনন্য সাধারণ প্রতিভার বিকাশ ঘটিতেছে। এই মনস্তাত্ত্বিক কারণ (রাজনৈতিক নানা কারণে ইহা সম্ভব হইয়াছে) গত মাত্র কয়েক শত বৎসর কিছুমাত্র শিথিল হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, সমাজের যে-কোন স্তরের নর-নারী যে-কোন ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দান করিতেছে।

ব্যষ্টির দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, ব্যক্তির সদ্ অসদ্ বোধ বাহিরে কোন একটি মাধ্যম আশ্রয় করিয়া প্রকাশ লাভ করে। গত বিশ্বযুদ্ধে নাজি ইহুদিগকে সকল অপরাধের মূল বিবেচনা করিয়া, তাহাদের সহিত সকল প্রকার পাশবিক আচরণকে নৈতিক বোধ দ্বারা সমর্থন করিয়াছিল। নাজি তাহাদের অন্তরস্থিত পাশব বৃত্তিকে এইরূপে ইহুদিদের উপর প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিল মাত্র। সে প্রবৃত্তি ইহুদিদের মধ্যে কোথাও নাই। এইরূপে সমগ্র বিশ্বে এক-একটি জাতি আপনার স্বভাবনিহিত দুর্বলতাকে অপরের উপর প্রক্ষিপ্ত করিয়া আত্মগৌরবে স্ফীত হইতেছে, যথেষ্ট শক্তি ও সুযোগলাভ ঘটিলে তাহাকে লাঞ্ছিত করাকে নৈতিক দায়িত্ব বলিয়া বোধ করিতেছে। এই প্রক্ষেপকরণ এক একটি জাতিতে যেমন সম্ভব, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়েও তেমনি সম্ভব। এই প্রক্ষেপকরণ-প্রক্রিয়া সমগ্র সমাজ-রূপের মধ্যে যেমন তাহার সকল স্মৃতি-সংহিতার মত পুরাণ, সাহিত্যেও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। এই বোধের মধ্যে শিশুরা জন্ম লাভ করে, তাহাদের মন সমৃদ্ধ হয়।

কোন সম্প্রদায়ই সামগ্রিক বোধ লইয়া আপনাদের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা

করে নাই। এই চেষ্টাই তো মায়া। পরন্তু, আপনাদের সকল অপরাধ-বৃত্তিকে আর কাহারো উপর প্রক্ষেপ করিয়া তাহাদের নিয়ন্ত্রণ, শাসন, প্রয়োজনবশত সকল প্রকার অত্যাচার করিবার নৈতিক দায় আপনারাই গ্রহণ করিয়াছে। যাহার উপর এই অত্যাচার ও অসম্মান আসিয়া পড়ে, তাহারা মূল এই ধর্মবোধের জন্য এই অত্যাচারকে অসম্ভব না করিয়া উহাকে আবার আর কোন জন সম্প্রদায়ের উপর প্রক্ষিপ্ত করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছে। হয় অত্যাচারকে অসম্ভব করিতে হয়, নতুবা আর কাহারও উপর প্রক্ষেপ করিতে হয়, নহিলে মনকে শান্ত করা অসম্ভব। ইহাই স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব। এইরূপে সমাজের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটি ধারা চলিয়াছে—ইহা অপরাধ প্রবৃত্তি প্রক্ষেপের ধারা।

সমগ্র সমাজ-রূপের পশ্চাতে এই অশ্রদ্ধার বীজ আছে বলিয়া, গোরা প্রথমে সহস্র চেষ্টা করিয়াও সমাজের সকলের সহিত এক হইয়া মিলিত হইতে পারে নাই। জ্ঞানের মিলন আর মানবিক বোধে সমগ্র সত্তায় মিলন এক নয়, উভয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, উভয়ের ফললাভের মধ্যেও এমনি পার্থক্য রহিয়াছে। আমি এক্ষেত্রে গোরার তথা রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তিটির কিয়ংদংশ উদ্ধৃত করিতেছে।

"এতদিন আমি ভারতবর্ষকে পাবার জন্যে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সাধনা করেছি—একটি-না-একটি জায়গায় বেধেছে—সেই সব বাধার সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার মিল করবার জন্য আমি সমস্ত জীবন দিন-রাত কেবলই চেষ্টা করে এসেছি—এই শ্রদ্ধার ভিত্তিকেই খুব পাকা করে তোলবার চেষ্টায় আমি আর কোনো কাজই করতে পারি নি—সেই আমার একটিমাত্র সাধনা ছিল। সেই জন্যেই বাস্তব ভারতবর্ষের প্রতি সত্য দৃষ্টি মেলে তার সেবা করতে গিয়ে আমি বারবার ভয়ে ফিরে এসেছি—আমি একটি নিষ্কণ্টক নির্বিকার ভাবের ভারতবর্ষ গড়ে তুলে সেই অভেদ্য দুর্গের মধ্যে আমার ভক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করার জন্যে, এতদিন আমার চারিদিকের সঙ্গে কী লড়াই না করেছি! আজ এক মুহূর্তেই আমার সেই ভাবের দুর্গ স্বপ্নের মতো উড়ে গেছে। আমি একেবারে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ একটি বৃহৎ সত্যের মধ্যে এসে পড়েছি। সমস্ত ভারতবর্ষের ভালোমন্দ সুখ দুঃখ জ্ঞান অজ্ঞান একেবারেই আমার বুকের কাছে এসে পৌঁচেছে—আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি—সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে—সে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র নয়—সে এই বাহিরের পঞ্চবিংশ কোটি লোকের যথার্থ কল্যাণ ক্ষেত্র।"

গত প্রায় এক সহস্র বৎসর ধরিয়া আমরা এই এক বর্ণবিচার করিয়া

কাটাইয়াছি, আর উহার পশ্চাতে ওই এক দার্শনিক বোধকে পুষ্ট করিয়াছি। ইহা উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন,

"অনন্যসহায় ব্রাহ্মণেরা যে বিদ্যার আলোচনা একাধিকার করিলেন, তাহাও বর্ণ-বৈষম্য দোষে কুফলপ্রদ হইয়া উঠিল। সকল বর্ণের প্রভু হইয়া তাঁহারা বিদ্যাকে প্রভুত্বরক্ষণীরূপে নিযুক্ত করিলেন। বিদ্যার যেরূপ আলোচনায় সেই প্রভুত্ব বজায় থাকে, যাহাতে তাহার আরও বৃদ্ধি হয়, যাহাতে অন্য বর্ণ আরও প্রণত হইয়া ব্রাহ্মণ-পদরজ ইহজন্মের সারভুত করে, সেইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। আরও যাগ-যজ্ঞের পুষ্টি কর, আরও মন্ত্র, দান, দক্ষিণা, প্রায়শ্চিত্ত বাড়াও, আরও দেবতার মাহিমাপূর্ণ মিথ্যা ইতিহাস কল্পনা বন্ধন করিয়া, এই অপ্সরা নূপুর-নিক্কনসিঞ্জিত মধুর আর্য ভাষায় গ্রথিত কর, ভারতবাসীদিগের মূর্খতার বন্ধন আরও আঁটিয়া বাঁধ। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য সে সবে কাজ কি? সে দিকে মন দিও না। অমুক ব্রাহ্মণখানির কলেবর বাড়াও, অমুক উপনিষদখানি প্রচার কর, ব্রাহ্মণের উপর ব্রাহ্মণ, উপনিষদের উপর উপনিষদ, আরণ্যকের উপর আরণ্যক, সূত্রের উপর সূত্র, তার উপর ভাষ্য, তার উপর টীকা; তার ভাষ্য অনন্ত শ্রেণী—। বিদ্যা?—তাহার নাম ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হউক।"

বর্ণাশ্রম ধর্মসম্পর্কে তাই তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,—"পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্বকালিক বর্ণ-বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই।"

সমাজ-জীবনের বিভিন্ন অঙ্গে বিকাশ যতটুকু ঘটিয়াছে, তাহা চিরন্তন প্রাণ-মনের অনিবার্য প্রেরণায়। এই জাতীয় দার্শনিকবোধের সহিত তাহার কোন যোগ নাই, বরং ওই দার্শনিকবোধ এই বিকাশে আনুকূল্য না করিয়া, নানাভাবে প্রতিকূলতা করিয়াছে।

প্রাচীন বিশ্বের সমাজ-ব্যবস্থার সাধারণ কয়েকটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়া এক দার্শনিক সমালোচক লিখিতেছেন ঃ—

"The ancient world, in so far as we can reconstruct it, bears everywhere the same stamp. In Egypt, in Crete, in Mesopotamia, wherever we can read bits of story, we find the same conditions : a despot enthroned, whose whims and passions are the determining factor in the State ; a wretched, subjugated populace ; a great priestly organisation to which is handed over the domain of the intellect. This is what we know as the Oriental State to-doy. It has persisted down from the ancient world through thousands of years, never

changing in any essential. Only in the last hundred years—less than that—it has shown a semblance of change, made a gesture of outward conformity with the demands of the modean worlds.'

তিনি এই তন্ত্র-সম্পর্কে অন্যত্র মন্তব্য করিয়াছেন ঃ—

"To teach the people so that they would begin to think for themselves, would be to destroy the surest prop of their power. No one except themselves must have knowledge, for to be ignorant is to be afraid, and in the dark mystery of the unknown a man can not find his way alone. He must have guides to speak to him with authority. Ignorance was the foundation upon which the priest power rested. In truth, the two, the mystery and those who dealt in it, reinforced each other in such sort that each appears both the cause and the effect of the other. The power of the priest depended upon the darkness of the mystery ; his effort must ever be directed toward increasing it and opposing any attempt to throw light upon it. The humble role played by the reason in the ancient world was assigned by an authority there was no appeal against. It determined the scope of thought and the scope of art as well, with an absolutism never questioned."

—"The Great Age of Greek Literature"—*Edith Hamiltion.*

মহাভারতের সত্যযুগের যে স্বরূপ নির্দেশ আছে, তাহাতে প্রথমেই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, মানুষমাত্রেই স্বভাবত অসৎ বৃত্তিপরায়ণ, তাহার মনোবৃত্তি স্বভাবতই জলের মত নিম্নাভিমুখী।

ব্রহ্মা যখন মনুকে মর্ত্যলোকের শাসনভার গ্রহণ করিয়া ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন, তখন মনু তাহার উত্তরে বলেন,

"আমি পাপ কার্যের ভয় করি। কারণ রাজত্ব করা অতি দুষ্কর। বিশেষতঃ, মানুষ সর্বদাই মিথ্যা ব্যবহার করে। সুতরাং, তাহাদের রাজত্ব করা আরও দুষ্কর।" ॥ ২২ ॥ (ভীষ্মপর্ব ঃ পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ)

সত্যযুগের এই লক্ষণ অনুসারে রাজা কোন একজন প্রধান দেবতা ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া মর্ত্যে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি চাতুর্বর্ণ্য নির্ণয় করিয়া দণ্ডনীতি (প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্তৃক রচিত)-অনুসারে প্রত্যেক বর্ণকে এক একটি বিশিষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়া শাসন করেন। রাজা যখন দণ্ডনীতির সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন, তখন সত্যযুগ ফিরিয়া আসে।

রাজা যখন দণ্ডনীতির এক চতুর্থাংশ লঙ্ঘন করেন, তখন ত্রেতা যুগ, যখন দণ্ডনীতির অর্দ্ধাংশ লঙ্ঘন করেন, তখন দাপর যুগ, যখন দণ্ডনীতির তৃতীয় ভাগ লঙ্ঘন করিয়া মাত্র এক চতুর্থাংশ ভাগ অনুসরণ করেন, তখন কলিযুগের আবির্ভাব হয়। সেই জন্য বলা হইয়াছে,

"সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই সমস্ত যুগ এক রাজা হইতে উৎপন্ন হয়; সুতরাং রাজাকেই যুগের কারণ বলা হইয়া থাকে।"

(ভীষ্মপর্ব ঃ ঊননবতিতমোঽধ্যায়ঃ)।

রাজার ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে এই দণ্ডনীতি প্রয়োগের হ্রাস-বৃদ্ধি কেন ঘটে, তাহার স্পষ্ট নির্দেশ কোথাও নাই।

বর্ণাশ্রম যে চিরন্তন তত্ত্ব, ধর্মরাজ্যের ক্রমিক উৎকর্ষ যে বর্ণাশ্রমের ক্রমিক কঠোর বিধি নিষেধপ্রয়োগের উপর নির্ভর করে এবং তাহা যে ঈশ্বর কর্তৃক রচিত, এই তত্ত্বটি এক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

এই বর্ণাশ্রম তত্ত্বাশ্রিত মানব-সমাজকে একটি সংহতি দানের জন্য এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়াশ্রিত করিবার জন্য আদর্শ রাজার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। প্রথম ধর্ম শপথ হইল, বেদ ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে (নিয়মিত যজ্ঞ, দান ও দক্ষিণা ইত্যাদির সহায়তায়) সর্ব-প্রযত্নে রক্ষা করা, এমনকি সর্ব-প্রকার পাপ-নিমগ্ন ও অধর্মাচারী হইলেও,—এবং বর্ণ সাংকর্য কোন প্রকারে ঘটিতে না দেওয়া।

রঘুবংশে মহাকবি কালিদাস তাঁহার আদর্শ রাজা দিলীপের সম্পর্কে লিখিয়াছেন,

রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনোর্বর্ত্মনঃ পরম্
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তু র্নেমিবৃত্তয়ঃ।

অর্থাৎ, মনুর অনুশাসনের কাল হইতে সুরু করিয়া রথের চাকায় চাকায় যে পথ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার শাসনে প্রজাকুল সেই পথ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হইত না। (মহাভারতে সত্যযুগের যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহা সেই সত্যযুগ।)

আদর্শ প্রজার কর্তব্য যেমন 'নেমিবৃত্তি' অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিধি-বিধান নির্দিষ্ট আচার, আচরণ পালন করা, বরাদ্দ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক খাদ্যে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি বোধ করা, তেমনি আদর্শ রাজার কর্তব্য হইল, প্রজাদের ওই 'নেমিবৃত্তি'-তে বলে বা কৌশলে বাধ্য করা।

বর্ণাশ্রম মূলক ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির দার্শনিক ব্যাখ্যা যাহাই হোক-না-কেন, এই জাতীয় সামাজিক কাঠামো বিশ্ব-সভ্যতার ক্রম অভিব্যক্তির একটি পর্যায়ে বিশ্বের সর্বত্রই গড়িয়া উঠে এবং অভিব্যক্তির একটি পর্যায়ে সর্বত্রই এই কাঠামো ভাঙিয়া পড়ে।

সচল বর্ণাশ্রম কোন বিশেষ কারণে স্থায়ী বংশানুগত বর্ণাশ্রমে পরিণত হয়। তাহা উল্লেখ করিয়া এক চিন্তাশীল ঐতিহাসিক লিখিতেছেন :—

"The watch-word was "every one at his post" or Roman civilization would perish. It was a state of sieze, for life or perpetuity. A man's station in society, his profession, came to be made hereditary. We are watching the setting up of a real caste system, a phenomenon which in this case is not primitive or spontaneous, but an experiment imposed as a measure of policy from above."

The End of the Ancient World and the Beginning of the Middle Ages—*Ferdinand Lot.*

উদ্ধৃত অংশটির শেষ দুইটি পংক্তি সবিশেষ লক্ষণীয়। ভারতের বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা লইয়া অনুরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে ঠিক একই সময়ে অর্থাৎ ৩য়-৪র্থ খৃষ্টাব্দে। এই অচল সমাজ ব্যবস্থার পর গ্রীক সাম্রাজ্যের যেমন ভারতেরও তেমনি সকল দিকে অধঃপতন ঘনাইয়া উঠে। একটি নূতন সংঘাতে বিশ্বের সর্বত্র আবার নূতন সমাজ-রূপ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে।

পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান—জ্ঞানের এই সকল ধারা একত্র মিলিত হইয়া, অভিব্যক্তি তত্ত্বকে নিঃসংশয়িত করিয়া তুলিয়াছে। মানুষ আজ জীব-জগৎ, প্রকৃতি ও জড়-জগতের সহিত অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে। সমস্ত কিছুর মধ্যে রহিয়াছে এক 'প্রাণ-প্রীতি'। আবরণের পর আবরণ উন্মুক্ত করিয়া চলিয়াছে জড় হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে চেতনা পর্যায়-মনে, বুদ্ধিতে ও বোধিতে। বেদান্ত এই অভিব্যক্তি তত্ত্বকে স্বীকার করেন। তবে জড়বাদীগণের অভিব্যক্তি তত্ত্ব হইতে বৈদান্তিক অভিব্যক্তি তত্ত্বের পার্থক্য এই যে, বেদান্ত বলেন, একটি পূর্ণতার ধ্যান-রূপ রহিয়াছে ; অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া সেই ধ্যান-রূপের বীজ-কোষটি একটির পর একটি দল উন্মোচন করিতেছে। জড়বাদীরা এই পূর্ণতার ধ্যান-রূপকে স্বীকার করেন না। কিন্তু, মূল এই বিকাশতত্ত্ব-সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর।

জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় প্রভৃতির মধ্যে যে কৃত্রিম ও অকৃত্রিম বিভাগ লক্ষিত হয়, তাহার মধ্যে রহিয়াছে কেবল বিকাশের বৈচিত্র্য ও ক্রম, জীবের আদি ধাতু-বিষয়ে কোন পার্থক্য নাই।—এক উত্তরায়ণের পথে সকলের যাত্রা।

ব্যষ্টির সংগ্রাম প্রবণতাকে যেমন নিম্নতর প্রবৃত্তি দমন কার্যে নিয়োজিত করিতে হয়, তেমনি সমষ্টির জীবনেও একথা সত্য। অর্থাৎ একটি জন-

সম্প্রদায়কে অন্য জন-সম্প্রদায়ের অপরাধ-প্রবণতা প্রকাশের মাধ্যম স্বরূপ না করিয়া, তাহাকে অন্তর্মুখীন করিয়া তুলিতে হয়। এই অন্তর্মুখীনতার ভিতর দিয়া এক একটি সম্প্রদায়ের চিত্তশুদ্ধি ঘটে। তাহাতে যেমন একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় তেমনি অন্যান্য সম্প্রদায়ও একের পর এক অপরাধ প্রক্ষেপ হইতে মুক্ত হইয়া অতি দ্রুত বিকাশলাভ করে। এই মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা হইতে মুক্ত হওয়া বড় কথা। তাহার পর, ওই বিকাশ রহস্যকে যে যতখানি উদ্ঘাটন করিবে, সেই তত্ত্বকে সত্য করিয়া তুলিতে জীবনে যে যতখানি সচেষ্ট হইবে, তাহার সর্বাঙ্গীন বিকাশ ততখানি হইবে। এই মনস্তত্ত্ব সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। মানুষের সমগ্র প্রয়াস তখন সম্প্রদায়গত না হইয়া তাহা অসৎ প্রবৃত্তি, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, ব্যাধি প্রভৃতির উপর ক্রমিক উন্নততর ক্ষমতা-লাভের কার্যে নিয়োজিত হইবে।

এই সম্পর্কে প্রকাশ্য বিচার ও বিতর্ক দেখা দেয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যেকটি ধর্ম আন্দোলনের সঙ্গে।

বাংলা দেশের সেই সকল ধর্ম, আন্দোলনকে মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি ধারা, রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত। তাঁহার ধর্ম-আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল বেদান্ত। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির ভিতর দিয়া এই আন্দোলনের ধারা উত্তরোত্তর শুধু পুষ্টই হয় নাই, বহু বিচিত্রতা লাভ করিয়াছে। এই আন্দোলন কোথাও বেদের অপৌরুষেয়তাকে স্বীকার করিয়াছে, কোথাও করে নাই, কোথাও ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে একমাত্র প্রামাণ্য করিয়াছে, কোথাও বা একমাত্র যুক্তিতে, কিন্তু এই আন্দোলনের কোন ধারাই বংশানুগত বর্ণাশ্রম তত্ত্বকে কোন স্বরূপে কিছুমাত্র স্বীকৃতি দান করে নাই।

আর একটি ধর্ম-আন্দোলনের জন্ম ঠিক বাংলা দেশে হয় নাই। তবে তাহা বাংলা দেশকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সে ধর্ম আন্দোলনের প্রবর্তক স্বামী দয়ানন্দ। তিনি হিন্দু সমাজ-রূপের আদর্শ স্বরূপ বেদ, বিশেষ করিয়া, ঋগ্বেদকে আশ্রয় করেন। তাঁহার আন্দোলনের স্বরূপ বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। তবে তিনি ওই সমাজ-রচনায় একমাত্র গুণকর্মের বিভাগকে স্বীকার করেন।

বাংলা দেশে আর একটি ধর্ম-আন্দোলন গড়িয়া ওঠে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে আশ্রয় করিয়া। এই ধর্ম-আন্দোলন বিদেশে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সকল প্রতীকমুক্ত শুদ্ধ বৈদান্তিক জ্ঞানকে আশ্রয় করিলেও ইহার মূল প্রেরণা পৌরাণিক। পৌরাণিক এই অর্থে বলিয়াছি যে, ইহা ভারতীয় ধর্ম-সাধনার সকল প্রতীকের সত্যতা কোন-না-কোন স্বরূপে স্বীকার

করিয়াছে। সে ধর্ম ভারতীয় ধর্ম সাধনার সকল প্রতীককে স্বীকৃতি দান করিলেও, বংশানুগত বর্ণাশ্রমকে কিছুমাত্র স্বীকৃতি দান করে নাই। ইহা স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রমান করা যাইতে পারে।

"—the conviction is daily gaining on my mind that the idea of cast is the greatest dividing factor and the root of Maya, ..."—*Complete Works of Swami Vivekananda, Part VI.*

"It is in the books written by priests that madness like that of cast is to be found, and not in the books revealed from God." —*Ibid, Part VI, p. 355.*

"Buadha was the only great Indian philosopher, who would not recognize cast......

"All the other philosophers pandered more or less to social prejudices." —*Ibid Part VII, p. 37.*

এই প্রসঙ্গে তাঁহার সাধ্য ও সাধনার স্বরূপসম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

বিবেকানন্দের ধর্ম ও অধ্যাত্ম জীবনে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রেরণা লক্ষ্য করা যায়। একটি মধ্যযুগীয় এবং অপরটি আধুনিক। তিনি তত্ত্বের দিক হইতে অনগ্রসর মানেন অথচ সমাজের আমূল সংস্কারের কথাও বলিয়াছেন। সমসাময়িক বিশ্বের ভাব-প্রেরণা বারংবার এমনি করিয়া মধ্যযুগীয় সকল ভাব-প্রেরণাকে উদ্ভিন্ন করিয়া জয়যুক্ত হইতে চাহিয়াছে—দেখিতে পাই। তাঁহার সমগ্র রচনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া এই বৈপরীত্য নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই জাতীয় আলোচনারও একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান নিবন্ধে সেই জাতীয় কোন আলোচনার অবকাশ নাই। আমি বিবেকানন্দের জীবনের এই দিকটি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে চাই এইজন্য যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনেও এমনি একটি বিপরীতমুখী প্রেরনার অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। পরিনত বয়সে এই দ্বন্দ্বকে তিনি সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে এই সংঘাত যে ক্রমাগত গভীর হইয়াছে, কেবল তাহাই নয়, মধ্যযুগীয় ওই চিন্তাধারাকে তিনি যে ধীরে ধীরে জয় করিয়া উঠিতেছিলেন, তাহা স্পষ্টই লক্ষ্য করিতে পারা যায়। তাঁহার অকাল বিয়োগ না হইলে, এই দ্বন্দ্বকে তিনি যে এক সময় সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া উঠিতে পারিতেন, এইরূপ অনুমান আমরা নিঃসন্দেহে করিতে পারি।

স্বামী বিবেকানন্দ দার্শনিকবোধের দিক হইতে কি বিশ্বাস করিতেন, তাহা তাঁহার দুই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিলে স্পষ্টই বোধ করিতে পারা যাইবে।

এই বিশ্বে, এই মানব-সমাজে সদ্-অসদ্ পাপ-পুণ্যের বোধ শাশ্বত কালের জন্য ওতপ্রোত হইয়া আছে। এই দুইয়ের পরিমাণ আবার সকল সময় সমান। ইহাদের একটিকে বর্ধিত করিবার চেষ্টা করিলে, অনিবার্যরূপে আর একটি সেই সঙ্গে বর্ধিত হইয়া যাইবে।

"It admits that this world is a mixture of good and evil, happiness and misery, and that to increase the one must necessity increase the other." —*Jnana-Yoga.*

"The history of the world shows that evil is a continuously increasing quantity, as well as good." —*Jnana-Yoga.*

"Evil is everywhere, it is like chronic rheumatism. Drive it from the foot, it goes to the head ; drive it from there, it goes somewhere else. It is a question of chasing it from place to place ; that is all." —*My Plan of Campaign.*

যাঁহারা এই তত্ত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের সমালোচনা করিয়া তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"Again, we often hear that it is one of the features of evolution that it eliminates evil, and this evil being continually eliminated from the world, at last only good will remain. That is very nice to hear, and it panders to the vanity of those, who have enough of this world's goods, who have not a hard struggle to face every day, and are not being crushed under the wheel of this so-called evolution. It is very good and comforting indeed to such fortunate ones. The common herd may suffer, but they do not care ; let them die, they are of no consequence. Very good, yet this argument is fallacious from beginning to end. It takes for granted, in the first place, that manifested good and evil in this world are two absolute realities. In the second place, it makes a still worse assumption. that the amount of good is an increasing quantity, and the amount of evil is a decreasing quantity. so if evil is being eliminated in this way, by what they call evolutions, there will come a time when all this evil will be eliminated and what remains will be all good. Very easy to say, but can it be proved that evil is a lessening quantity."

ইংরেজ ও জার্মান দার্শনিকগণের এই জাতীয় প্রচেষ্টার উল্লেখ করিয়া তিনি উক্ত নিবন্ধে অন্যত্র মন্তব্য করিয়াছেন,

"Attempts have been made in Germany to build a system of philosophy on the basis that the Infinite has become Finite. Such attempts are also made in England, and the analysis of the position of these philosophers is this, that the Infinite is trying to express itself in this universe, and that there will come a time when the Infinite will succeed in doing so,"

—*Maya and Illusion.*

সমাজের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এই কারণে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যায়ন চিরস্থির রহিয়াছে। এই তত্ত্ব আবার বংশানুগতির সহিত বিজড়িত। সমাজে বংশানুগতির ভিতর দিয়া মানুষকে অনিবার্যরূপে ধর্ম ও অধ্যাত্ম সাধনা করিতে হইবে। ইহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'কর্মযোগে'র মধ্যে তিনি কৌশিকের উপাখ্যান বিবৃত করিয়াছেন। এই কাহিনী উল্লেখ করিয়া পরিশেষে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,

"Thus, in the story, the Vyadha and the woman did their duty with cheerfulness and whole heartedness ; and the result was that they became illumined, clearly showing that the right performance of the duties of any station in life, without attachment to result, leads us to the highest realisation of the perfection of the soul."

ইহা বাস্তব-জীবনে সাধ্য কি অসাধ্য, সে তর্ক আমি তুলিতেছি না। এই জাতীয় সাধনা ও মনুষ্যত্বের সাধনা যে এক নয়, তাহাই কেবল উল্লেখ করিতে চাই। মনুষ্যত্বের সাধনা জীবনের সকল বিভাগের, সকল অঙ্গের পূর্ণ বিকাশ ও সামঞ্জস্য সাধন করিতে চায়। এই সাধনায় মনুষ্যত্ব বিকাশের তারতম্যের উপর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির তারতম্য স্বীকৃত। ব্যক্তিগত প্রবণতাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া একটি বিশেষ মনোবৃদ্ধি (নিষ্কাম বোধ) গড়িয়া তুলিয়া, বংশানুগতির অনুশীলনের মধ্যে আধ্যাত্মিক ফললাভের ক্ষেত্রে তাঁহার মতে তারতম্য কিছু নাই। এইরূপে মানবিক সকল বোধের অনুশীলন ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মধ্যে সকল যোগ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইয়া গিয়াছে—দেখিতে পাই।

যাঁহারা মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ মানেন, সমগ্র মানব সমাজের ধীর অগ্রগতি মানেন, তাঁহারা নিষ্কাম কর্ম বলিতে কি বুঝেন, তাহা বুঝাইবার জন্য আমি অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি।

ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই। আমি এই সমগ্র দার্শনিক বোধটিকে মধ্যযুগীয় জীবন দর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

তাঁহার দার্শনিকবোধ যাহাই হোক, তিনি কি চাহিয়াছিলেন, তাহার একটি দিক উল্লেখ করিয়া আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত এবং যাঁহারা অগ্রগতি মানেন, তাঁহাদের প্রচেষ্টার কোন বিশেষ নাই।

তিনি, পরা (আধ্যাত্মিক) ও অপরা (জাগতিক) সর্ববিধ জ্ঞানকে সমাজের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন।

"The first work that demands our attention is that the most wonderful truths confined in our Upanishads, in our Scriptures, in our Puranas must be brought out from the books, brought out from the monasteries, brought out from the forests, brought out from the possession of selected bodies of people, and scattered broadcast all over the land, so that these truths may run like fire all over the country……"

তিনি এই প্রসঙ্গে অন্যত্র বলিয়াছেন,

"Therefore, even for social reform, the first duty is to educate the people, and you will have to wait till that time comes."

এই জ্ঞান লাভ করিলে মানুষ তাহার সকল দুর্বলতা মুহূর্তে দূর করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। সে মস্তক নত করিবার ক্ষমতা কোন চক্রবর্তী সম্রাট, কোন জগৎগুরু অথবা কোনও ধর্মগুরুর নাই।

তত্ত্বের দিক হইতে বিবেকানন্দ অগ্রগতি মানুন, বা না মানুন, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। সমাজের নর-নারী মাত্রেই পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইলে যে সমাজ গড়িয়া উঠিবে, তাহার আপেক্ষিক মূল্য একই থাক্ অথবা যাই হোক, তাহা বিতর্কের বিষয়। উপায় সকলের এক তাহাই বুঝিলে আমাদের চলিবে।

বস্তুতঃ সেই দিব্য সমাজরূপ তাঁহার ধ্যাননেত্রে যে উদ্ভাসিত হইয়া যায় নাই তাহা নহে। ইহাকেই আধুনিক দার্শনিক চিন্তাধারার অনিবার্য প্রকাশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম।

"Society did not exist ages ago, possibly will not exist ages hence. Most probably it is one of the passing stages through which we are going towards a higher evolution, and any law that is derived from society alone can not be eternal, can not cover the whole ground of man's nature."

"To me it seems that they have just begun to grow. The power of religion, broadened and purified, is going to penetrate every part of human life. So long as religion was in the hands of a chosen few, or of a body of priests, it was in temples,

churches, books, dogmas, ceremonials, forms and rituals. But when we come to the real, spiritual, universal concept, then, and then alone, religion will become real and living ; it will come into our very nature, live in our very movement, penetrate every pore of our society, and be infinitely more a power for good that it has ever been before."

সে সমাজে ইউরোপীয় বস্তুজ্ঞান ও ভারতীয় অধ্যাত্মজ্ঞানের পূর্ণ সমন্বয় সাধিত হইবে।

"Can you not make a European society with Indian religion ? I believe it is possible and it must be."

—*Complete Works of Swami Vivekananda, Part IV, p. 313.*

সকল সম্প্রদায়মুক্ত পরিব্যাপ্ত সেই অখণ্ড ধর্ম বলিতে এই বোঝায় না যে, অধ্যাত্মক্ষেত্রে মনুষ্য-জগতে কেবল একটি মাত্র চিন্তা পদ্ধতি ও উপাসনা পদ্ধতি থাকিবে ! তখন নর-নারী মাত্রেই আপন আপন স্বভাবের ভিতর দিয়া আপন নিয়মে দিব্য-চেতনা লাভের জন্য সচেষ্ট হইবে। তাই তিনি এক স্থলে মন্তব্য করিয়াছেন,

"I pray that they may multiply so that at last there will be as many sects as human beings, and each one will have his own method, his individual method of thought in religion."

মনুষ্য-জগতে নিম্নতম চেতনালোক হইতে উচ্চতম চেতনালোক পর্যন্ত আপনার অতীত সত্তাকে লাভ করিবার নানা চেষ্টা, তজ্জাত নানা প্রতীকরূপ লক্ষ্য করা যায়। জন্ম পরিবেশ ও চেতনাবিকাশের ক্রমঅনুসারে এই সকল চেষ্টার মূল্য আছে। ধর্মের বিশ্ব-রূপ এই সকল প্রয়াস-রূপকে আশ্রয় করিয়া, তাহা নির্বিশেষ কোন একাকারত্বের চেষ্টা নয়। তিনি বলিয়াছেন,

"To him all the religions, from the lowest fetichism to the highest absolutism, mean so many attempts of the human soul to grasp and realise the Infinite, each determined by the conditions of its birth and association. and each of these marks a stage of progress ; and every Soul is a young eagle soaring higher and higher, gathering more and more strength till it reaches the glorious sun."

ইহা যে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একথাও সত্য যে, মানবিক বোধের বিকাশের ক্রমিক উন্নত পরিণামে তাহার ঠিক নিম্নতর পর্যায়ের প্রতীক-রূপ ক্রমাগত নিরর্থক হইয়া কালে লুপ্ত হইয়া যায়। ক্রমিক উন্নত দার্শনিক ব্যাখ্যা আরোপ যতই করা হোক-না-কেন, পরিণামে তাহা একান্ত ভারস্বরূপ হইয়া পড়ে।

মানব প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া যে অভিব্যক্তি কাজ করিতেছে, সেই অভিব্যক্তির নিয়মে তথাকথিত স্থূলতার দিক আপনা হইতে ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। মনুষ্য-স্বভাবের উপর অত্যাচার পাশবিকতা সন্দেহ নাই, কিন্তু ওই স্বভাবটাই যে ধীরে উন্নত পরিণাম লাভ করিতেছে। এই পরিবর্তন ক্রিয়া তো কেবল মনুষ্য-স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া ঘটিতেছে না। সমগ্র জড় জগৎ, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎকে আশ্রয় করিয়া এই রূপান্তর ঘটিতেছে। এই রূপান্তরের ক্ষেত্রে কত অতিকায়ের, কত স্থূলের, কত বীভৎসের, কত অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যের ধীর বিলুপ্তি ঘটিয়াছে, তাহার অন্ত নাই। এই রূপান্তরের জন্য একদিনের জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড, আজ শ্যামল তৃণসমাচ্ছন্ন সুন্দরী বসুন্ধরা।

ধর্ম আন্দোলন ছাড়া আন্দোলনের আরো কয়েকটি ধারা আছে। ইহার মধ্যের সাহিত্যের ধারা একটি। এই ধারা বহিয়া আসিয়াছে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। বলাবাহুল্য, তাঁহারা কেহই মধ্যযুগীয় সমাজ কাঠামোকে স্বীকার করেন নাই।

আর একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা। এই সম্পর্কে কেবল ইহাই মাত্র নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে, ওই আন্দোলন জনসাধারণের সম্মুখে যে সমাজ-রূপের আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছিল, তাহার মধ্যে একমাত্র গুণ-কর্মের বিভাগকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্র আন্দোলন একদিকে যতই গভীরতা ও ব্যাপ্তি লাভ করিতেছিল, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর চিন্তাশীলদের মধ্যে ততই সংশয় গভীর হইয়া উঠিতেছিল যে, এই দেশে সকল জাতি ও সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া যে সমাজ-কাঠামো বিদ্যমান, তাহাতে রাষ্ট্রাধিকার স্বাভাবিকভাবে যাহাদের হাতে গিয়া পড়িবে, তাহারা কতদূর প্রতিশ্রুতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে। সেইজন্য উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন চিন্তাশীল দেশনায়কের আবির্ভাব ঘটে, যাঁহারা বিদেশী শাসনের অবসানের পূর্বে সম্পূর্ণ সমাজ-বিপ্লবের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। এই সম্পর্কে যাঁহারা বিস্তারিত পরিচয় লাভ করিতে চান, তাঁহারা ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম চিন্তানায়ক বিপিনচন্দ্র পালের 'Memories of My Life and Times' নামক আত্মজীবন চরিত পাঠ করিতে পারেন।

কারণ সে যুগের সমাজ সংস্কারকমাত্রেই একথা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন যে, ইংরেজ সরকারের সহায়তা বা আনুকূল্য না পাইলে তাঁহাদের সকল প্রয়াস অংকুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইত। যে-কোন দেশের বিপ্লবীদের দমন করিতে তৎকাল প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা যে রূপ ভয়ংকর নির্মমতার পরিচয়

দিয়াছে, সে যুগে হিন্দু-সমাজও ঠিক ততখানি নির্মমতার পরিচয় দিয়াছে। সরকারী আইন ও দণ্ডনীতির দ্বারা রক্ষিত না হইলে অন্য কাহারো কথা দূরে থাক রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্রের মত ব্যক্তিত্বের পক্ষেও কোন সংস্কার কার্যে কিছুমাত্র কৃতকার্যতা লাভ যে সম্ভব হইত না, তাহা সে যুগের সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

৫

বাহিরের আঘাত হইতে সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিবার দুটি উপায় আছে। এক উপায় হইল, এমন একটি তত্ত্ব আশ্রয় করা, যাহার সহায়তায় আপনাকে ক্রমাগত সংকুচিত করা সম্ভব। আর একটি উপায় হইল, আপনাকে ক্রমাগত প্রসারিত করা। বর্ণাশ্রম তত্ত্ব হিন্দু-সমাজের ক্রমিক সংকুচিত হইয়া বাঁচার তত্ত্ব। উহা হয় স্থির থাকে, নতুবা সংকুচিত হয়। প্রতিকূল বা অনুকূল বাহিরের কোন শক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া ক্রমাগত প্রসারিত করার যে তত্ত্ব, তাহা বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে নাই।

মুসলমান রাজশক্তিকে সাধ্যমত প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা যে হিন্দু-সমাজ কোথাও করে নাই তাহা নয়, তবে ওই শক্তি যখন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, তখন আবরণের পর আবরণ, নিষেধের পর নিষেধ, সংস্কারের পর সংস্কার, আচারের পর আচার টানিয়া আপনাকে ক্রমাগত সংকীর্ণ করিয়া চলিয়াছে। তাহা যে কতদূর বিকৃত, কতদূর অন্ধ হইতে পারে, প্রাণ-ধর্মের, মনোধর্মের বুদ্ধি-বৃত্তির কতদূর বিরুদ্ধ ও বিপরীত হইতে পারে, তাহা ওই যুগের সমাজ-ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সমাজ' নামে যে রচনা-সংকলন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, একমাত্র সেই সংকলন গ্রন্থখানি পাঠ করিলে আপনারা সেই সমাজ-রূপটির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১ম খণ্ড পাঠ করা যাইতে পারে। সামাজিক স্খলনের গভীরতা পরিমাপ করিতে এই দুটি গ্রন্থই যথেষ্ট।

দেখিতে পাই, ধর্ম ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মধ্যযুগে যেখানে যতটুকু আন্দোলন দেখা দিয়াছে, সেখানে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম ধর্মকে নির্মমভাবে পরিহার করা হইয়াছে। কারণ, ওই তত্ত্ব ও জীবন-বিকাশের তত্ত্ব সম্পূর্ণ বিপরীত প্রেরণা। একটির সঙ্গে আর একটিকে তাই মিলাইবার কোন উপায় নাই। রাষ্ট্র সাধনার ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া রাজপুত ও শিখদের কথা এবং ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে কবির, দাদু ও নানকের কথা এবং বিশেষ করিয়া ষোড়শ শতকের শ্রীচৈতন্যদেবের কথা স্মরণে পড়িতে পারে।

সমগ্র হিন্দুসমাজের প্রথম জাগরণ ঘটে ইংরেজ শাসন সুরু হইবার সময় হইতে। ওই সময় হইতে হিন্দু সমাজ পুনরায় বাহিরের বিচিত্র ভাব-ভাবনার ঘাত প্রতিঘাতকে আত্মসাৎ করিয়া ক্রমিক প্রসারিত হইতে সুরু করিয়াছে। ইহা সম্ভব হইয়াছে বর্ণাশ্রমের এই কাঠামোকে ধীরে বিসর্জন দিয়া।

মধ্যযুগে বংশানুগত বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রয়োজনীয়তা যদি কোথাও কোনরূপে থাকেও, বর্তমান যুগে তাহা যে একান্ত অর্থহীন, তাহা উল্লেখ করিয়া রাধাকৃষ্ণন একস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন,

'The truth underlying the system is the conception of right action as a rightly ordered expression of the nature of the individual being. Nature assigns to each of us our line and scope in life according to inborn quality and self-expressive function. Nowhere it is suggested that one should follow one's hereditary occupation without regard to one's personal bent and capacities. *** The right of every human soul to enter into the full spiritual heritage of the race must be recognized. Caste is a source of discord and mischief and if it persists in its present form, it will affect with weakness and falsehood the people that cling to it:"

—*Eastern Religion and Western Thought.*

এ সম্পর্কে বিনয়কুমার সরকারের একটি উক্তিও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"The 'Communal award' of Manu, Yajnavalkya, Raghunandana and others had sanctioned the disfranchisement of the teeming millions of the population. The culture-bearing stocks and strains of the hydra-headed multitude were generally overlooked by those lawgivers. But under the regime of new legal institutions and economic transformation in recent times certain individuals belonging to those disfranchised classes of centuries have succeeded in demonstrating to the world that they are capable of being at a par with individuals of the privileged classes in brain, character and self-sacrifice. The eugenic postulates, hypotheses, axioms and foundations of the new social 'order may' therefore not turn out to be less fruitful and creative than those of the old."

—"*The Sociology of Population*".

রামমোহন রায়কে যে নবযুগের প্রবর্তক বলা হয়, সেই নবযুগের প্রধান লক্ষণ কি? না শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমাজের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত

পর্যন্ত সকলের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া। মানুষমাত্রেই শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-সাধনার শ্রেষ্ঠ অধ্যায় জ্ঞানলাভের অধিকারী। এই যে দৃষ্টিভঙ্গী এবং বর্ণাশ্রমের মূল যে তত্ত্ব-দৃষ্টি তাহার মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। এই শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভের জন্য তাহার সমাজ-বহির্ভূত হইবার কোন প্রয়োজন নাই।

সর্বসাধারণের জন্য এই সাধন-ভূমির সন্ধান তিনি যেমন করেন (ইহার স্বরূপ বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে নিষ্প্রোজন), তেমনি সর্বসাধারণের সাধনার জন্য তিনি গায়ত্রীমন্ত্র ও তন্ত্রের বীজমন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া তাহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। মানুষমাত্রেরই শ্রেষ্ঠ সাধ্য ও সাধনা আছে, এ কথা তাঁহার পূর্বে হিন্দুসমাজে থাকিয়া কেহ উচ্চারণ করেন নাই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেও সমাজ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইতে হইয়াছিল।

এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ বা সারভাগকে সকলের দৃষ্টিসমক্ষে তিনিই প্রথম উদ্ঘাটিত করিয়া দেন। তাঁহার ব্যাখ্যার মূল্য যাহাই হোক, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁহার প্রয়াস-রূপটিই এক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে তাঁহাকে স্বাভাবিকভাবে বাঙ্গালা ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই ভাষাকে মার্জিত করিয়া, একটি আদর্শরূপ প্রদানের জন্য তাঁহার ত্রুটি ও যত্নের অন্ত ছিল না।

কিন্তু শুধুমাত্র অধ্যাত্ম সাধনার উপর পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না, তাহার সকল চেতনা পর্যায়ের অনুশীলনের সঙ্গে জাগতিক জ্ঞানের সকল বিভাগের অনুশীলনও প্রয়োজন। এই পরা ও অপরা, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার জ্ঞানের পূর্ণ অনুশীলন ও সামঞ্জস্য সাধনের উপর ব্যক্তির পূর্ণতা যেমন নির্ভর করে, জাতির পূর্ণতাও তেমনি নির্ভর করে। ভারতবর্ষ মধ্যযুগে এবং তাহারও পূর্বে বৌদ্ধযুগে একটিমাত্র দিককে একান্ত করিয়া আশ্রয় করিয়া, যে বিভিন্ন জীবন-দর্শন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারই জন্য যে তাহাকে বারংবার পরাধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা এই যুগে তিনিই প্রথম স্পষ্ট করিয়া বোধ করেন। তাই অধ্যাত্ম-সাধনার সঙ্গে ইউরোপীয় বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন যাহাতে হয়, তাহার জন্য তাঁহাকে সমগ্র প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-সাধনায় যে মানুষমাত্রেরই অধিকার—এই কথা বলিবার জন্য তিনি একদিকে যেমন গোঁড়া হিন্দুদের অপ্রিয়ভাজন হন, তেমনি অন্যদিকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান-সাধনাকে দেশীয় শিক্ষার সহিত সংযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ইংরেজ শাসকদের বিদ্বেষের পাত্র হইয়া পড়েন। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা এবং হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সহায়তার ভিতর দিয়া

তাঁহার সেই অতি দূরপ্রসারী দৃষ্টির পরিচয় লাভ করিয়া আজ বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়।

কেবল শাস্ত্র অনুশীলনের জন্যই নয়, পরিণত বয়সে তিনি যে বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে অন্যান্য জ্ঞানচর্চার জন্যও বাঙ্গালা ভাষাকে মাধ্যম স্বরূপ আশ্রয় করেন। ইহাতে কি আশ্চর্য দূরদর্শিতার পরিচয়ই না আমরা লাভ করি। তাঁহার সেই স্বপ্ন আজ প্রায় দেড় শত বৎসর পরেও কতদূর সার্থক হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। ইংরেজি যখন শিক্ষার মাধ্যমরূপে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে, সেই কালে একা রবীন্দ্রনাথ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এই সম্পর্কে যে বিচিত্র প্রবন্ধ লেখেন, তাহার মূল ভাব হইল, উচ্চ জ্ঞানলাভের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা যে রীতি অনুসরণ করুক, বিপুল জনসাধারণকে এই সকল বিষয় সাধারণভাবে শিক্ষা দান করিবার জন্য সম্পূর্ণ বাংলা ভাষার মাধ্যমে আর একটি শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা প্রয়োজন। তাহাতে সমাজের সর্বত্র দ্রুত জ্ঞান সঞ্চারিত হইয়া যাইবে। কোন ভাষাকে শ্রেষ্ঠ ভাষা সমূহের মর্যাদাভুক্ত করা এক কথা এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া সমাজের সকল স্তরে দ্রুত জ্ঞান-সঞ্চার করিয়া দেওয়া, অন্য কথা।

বর্ণাশ্রম ধর্ম স্বীকার না করিয়া কেমন করিয়া শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-সাধনা সম্ভব ? ইহাতে সর্বত্র তিনি যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করেন, তাহার সার মর্ম এই যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন না করিয়াও, মানুষ শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যের উক্তি, বিশেষ করিয়া গীতার 'সর্ব ধর্ম পরিত্যাজ্য-ইত্যাদি' উক্তি আশ্রয় করিয়া, তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। তাঁহার একটি বিচার এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ইহা সর্বদা অমান্য হয়, যে বর্ণাশ্রম কর্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, যেহেতুক ভগবান্ বেদব্যাস বর্ণাশ্রম কর্ম্মহীন ব্যক্তিরদেরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা সূত্রে লিখিয়াছেন, সে এই দুই সূত্র।

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ
অপিচ স্মর্য্যতে।

এবং এই দুই সূত্রের বিবরণ ভগবান্ ভাষ্যকার করিয়াছেন, "অগ্নিহীন ব্যক্তিসকল, এবং দ্রব্যাদি সম্পত্তি-রহিত ব্যক্তিসকল, যাহাদের কোন বর্ণাশ্রম কর্মের অনুষ্ঠান নাই, এমত রূপ অনাশ্রমি ব্যক্তিরদের বিদ্যাতে অধিকার আছে, কিম্বা নাই। এই সংশয়ে আপাতত জ্ঞান এই হয়, যে আশ্রম কর্ম-

হীন ব্যক্তিরদের বিদ্যাতে অধিকার নাই, যেহেতুক বিদ্যার প্রতি আশ্রম-বিহিত কর্মকারণ হয় ; আর ঐ সকল ব্যক্তিরদের আশ্রম কর্মের সম্ভবনা নাই, এই পূর্বপক্ষে বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অনাশ্রমি ব্যক্তিরাও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারী হয়, যেহেতুক রৈক্ক, বাচক্নবী প্রভৃতি আশ্রম কর্মহীন ব্যক্তি সকলের ও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাপ্তি হইয়াছে, ইহা বেদে দেখিতেছি ; আর সর্বদা বিবস্ত্র থাকিতেন, এ প্রযুক্ত বর্ণাশ্রম কর্মহীন যে সম্বর্ত প্রভৃতি, তাঁহাদেরও সহযোগিত্ব ইতিহাসে দেখিতেছি।" এবং ব্রহ্মবাদিনী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রী সকল, যাঁহাদের বেদাধ্যয়নের অধিকার কদাপি সম্ভব নহে, তাঁহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে। ইহা—

তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব।

এবং আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ।

ইত্যাদি শ্রুতিতে বুঝাইয়াছে ; আর সুলভাদি স্ত্রীসকল ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, ইহা স্মৃতিতে এবং ভাষ্যেতে দেখিতেছি এবং শূদ্র যোনিতে জন্মিয়াছিলেন এ প্রযুক্ত বেদাধ্যয়নহীন যে বিদুর ধর্মব্যাধ, প্রভৃতি তাঁহারাও জ্ঞানী ছিলেন, ইহা ইতিহাসে দেখিতেছি, * * * আর শ্রবণাধ্যয়ন ইত্যাদি এই সূত্রের বিবরণের শূদ্রাদির ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে কি-না, এই সংশয় দূর করিবার নিমিত্তে ভগবান ভাষ্যকার লিখেন, যে "ইতিহাস পুরাণ আগমেতে চারিবর্ণের অধিকার আছে, ইহা স্মৃতিতে লিখেন।" অতএব ইতিহাস পুরাণ আগম সামান্যত চারি বর্ণেতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রধান করিতে পারেন, ইহা ভগবান্ ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মযজ্ঞাদি বর্ণাশ্রমকর্মহীন ব্যক্তিরদের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা ভগবান বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত দ্বারা, আর বেদাধ্যয়নহীন ব্যক্তিরদের বিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা শ্রুতি স্মৃতিতে প্রাপ্তি হইবার দ্বারা এবং ভগবান্ ভাষ্যকারেরও এই প্রকার নির্ণয় করিবার দ্বারা, নিশ্চয় হইল।"

এইরূপে সেই সময়ে তাঁহাকে কৌশলে উভয় কূল রক্ষা করিতে হয়। বস্তুতঃ, তাঁহার রচনাবলী আদ্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বর্ণাশ্রম ধর্মে তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু প্রকাশ্যে অতদূর যাইতে তিনি তৎকালে প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কারণ, ইহা তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে, ইহার পর হইতে ওই মুখীন হইয়া সমাজের ধীর পরিবর্তন ঘটিয়া চলিবে।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন বিদ্যাসাগর মহাশয় সকল প্রকার

সংস্কৃত জ্ঞানলাভের সুযোগকে যেদিন সকলের নিকট আনিয়া দেন, তাহা সমগ্র ভারতবর্ষের আর এক পুণ্য দিন। তাঁহার পূর্বে কেবল বাঙ্গালা দেশে নয়, ভারতবর্ষের সর্বত্র সংস্কৃত পঠন ও পাঠনের সুযোগ একমাত্র একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ই লাভ করিত। আশ্চর্য এই যে, এই কার্যে রাজা রামমোহন রায়ের মত তাঁহাকেও ইংরেজ শাসকদের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই জাতিকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে পূর্ণ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইংরেজ কোন কালেই চায় নাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের ধর্ম-সাধনার মূলভাবটিকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে আরো গভীর ও দূর প্রসারী করেন। সর্বসাধারণের সাধনার জন্য গায়ত্রী মন্ত্র এবং তন্ত্রের বীজমন্ত্রও আয়াসসাধ্য হইবে বোধ করিয়া, তিনি উপনিষদ্ হইতে আরো সহজ কয়েকটি মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া প্রচার করেন।

তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার কথা তিনি তাঁহার আত্মজীবনীর মধ্যে স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"আমি চাই যে, আপামর সাধারণ সকলে ব্রহ্মোপাসনা করিবে।" কারণ তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল—

"যদি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্নভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে, এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও মুখ্যতঃ বেদান্তকে আশ্রয় করেন, কিন্তু শংকরাচার্যের ব্যাখ্যাকে তিনি প্রথম হইতে স্বীকার করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মসাধনার শ্রেষ্ঠ উপলব্ধির কথা তিনি এইভাবে বলিয়াছেন।

"সাধকদের এই তিন স্থানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে,-অন্তরে তাঁহাকে দেখিবেন, বাহিরে তাঁহাকে দেখিবেন, এবং আপনাতে আপনি যে আছেন, সেই ব্রহ্মপুরে তাঁহাকে দেখিবেন।***

"যে যোগী সেই একই সময়ে তাঁহার এই ত্রিত্ব দেখিতে পান, দেখিতে পান যে, তিনি আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের অন্তরে আছেন, আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের বাহিরে আছেন, এবং আপনাতে আপনি থাকিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন, তিনি পরমযোগী। তিনি তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করিয়া আপনার প্রাণ, মন, প্রীতি, ভক্তি, সকলি তাঁহাতে অর্পণ করেন, এবং অপরাজিতচিত্তে তাঁহার শাসন বহন করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করেন। তিনি ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অধ্যাত্ম-সাধনার এই মূলভাবটিই পরবর্তীকালে ক্রমিক গভীরতা ও ব্যাপ্তি-লাভ করিয়াছে। তাহার ধারাবাহিক পরিচয় প্রদানের সুযোগ এক্ষেত্রে নাই। তবে তাঁহারা প্রত্যেকেই বোধ করেন যে, সমাজকে নূতন করিয়া এমন একটি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যাহাতে সমাজ হইবে—নিত্যপ্রসারী, নিত্যগতিশীল।

৬

দেখিতে পাই, উনবিংশ শতাব্দীর এই সকল চিন্তাধারা শ্রীঅরবিন্দের জীবন-সাধনায় পূর্ণ পরিণাম লাভ করিয়াছে। তাঁহার সাধনার স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়োজন এক্ষেত্রে নাই। কেবল বর্তমান প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাঁহার সাধন বৈশিষ্ট্যের একটিমাত্র দিক এক্ষেত্রে উল্লেখ করিব।

ঈশ্বর মনুষ্য-হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া মনুষ্য-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তাহার অন্তর্জীবনকে শুধু নয়, বহির্জীবনের সকল প্রয়াসকেও। আমাদের সীমিতবোধের জন্য তাহা আমরা বোধ করিতে পারি না। সীমিত বোধ হইল—আমাদের মন ও বুদ্ধি এবং মন ও বুদ্ধি-প্রসূত প্রচলিত নৈতিক ও সামাজিক নানা আদর্শ প্রেরণা। কিন্তু, এই সকল প্রেরণায় অগ্রসর হইতে গিয়া মানুষকে এক সময়ে অসমর্থ বোধ করিতে হয়। বোধ করিতে হয়, তাহার সীমিতবোধের জগতের বাহিরে একটি সীমাহীন চেতনা-লোক রহিয়াছে, যাহার দ্বারা এই জীবন ও জগতের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত। এই বোধের ভিতর দিয়াই মনুষ্যের জীবনে প্রকৃত অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা জাগে। ঈশ্বরীয় বোধের জগৎ তাই জীবন ও জগৎ-বহির্ভূত কোন লোক নয়, সমগ্র মনুষ্য-সমাজ ওই বোধমুখীন হইয়া চলিয়াছে, ওই বোধকেই সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে জীবনে ও জগতে সার্থক করিয়া তুলিতেছে।

সাংখ্য দর্শন বলেন যে, পরম পুরুষ চিরস্থির, অব্যাকৃত ও অব্যয়, আর পরম প্রকৃতি এই বিসৃষ্টিরূপে লীলায়িত। এই দুই শাশ্বত যুগ্ম তত্ত্ব। যে বিশিষ্ট নিয়মাধীন হইয়া প্রকৃতি আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে, সেই বিধানের সহিত পুরুষের কোন সম্পর্ক নাই। পুরুষ কেবল সাক্ষীমাত্র। তাঁহার স্থির নেত্রপাতে প্রকৃতি চঞ্চল। তাই মুক্তি—এই প্রকৃতির নিয়মাধীনতাকে ছাড়াইয়া উঠা।

বেদান্তের মায়া ভাষ্যও কতকটা এই পথ অবলম্বন করিয়াছে। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে সীমার তত্ত্বের সহিত অসীমের তত্ত্বের কোন যোগ নাই। সীমা ও অসীমের যোগের ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না। সীমা তাই অনির্বচনীয়, দৈবী-মায়া। ত্রিগুণাত্মক এই সৃষ্টি-রূপ বা সীমা-রূপকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়াইয়া উঠিলে, তবেই অসীমকে লাভ করিতে পারা যায়।

এইরূপে লক্ষ্য করিতে পারা যায়, ভারতীয় প্রায় সকল ধর্ম ও দর্শনে জীবন ও জগৎ পরিণামে কোন-না-কোন রূপে অস্বীকৃত হইয়া গিয়াছে।

এক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঈশ্বরীয় সত্ত্বা সীমা ও অসীম উভয়কে আশ্রয় করিয়া লীলায়িত। তিনি অসীমরূপে অনন্ত ব্যাপ্ত রহিয়া সীমা-রূপে স্পন্দিত হইয়াছেন। তিনি তাই বলিয়াছেন,

"Not by denying all relations, but through all relations is the Divine Infinite naturally approachable to man and most easily, widely, intimately seizable. This seeing is not after all the largest or the truest truth that supreme is without any relations with the mental, vital, physical existence of man is the universe, *avyavaharyam*, nor that what is described as the empirical truth of things, the truth of relations, *vyavahare*, is altogether the opposite of the highest spiritual truth Paramartha. On the contrary, there are a thousand relations by which the Supreme Eternal is secretly in contact and union with our human existence and by essential ways of our nature and of the world's nature, sarva-bhavena, can that contact be made sensible and that union made real to our soul, heart, will, intelligence, spirit." —*Essays on the Gita*

তবে মুক্তি কি এমন একটি তত্ত্বের সহিত চির স্থির যোগযুক্ত অবস্থা লাভ, যে তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া পরমব্রহ্ম অসীমে নৈষ্কর্মরূপে রূপের জগতে অন্তহীন কর্মধারায় আপনাকে নিয়ত উৎসারিত করিতেছেন। এই তত্ত্বের যোগে মানুষ অসীমে আপনাকে কেবল সীমাহীন সত্ত্বারূপে প্রত্যক্ষ করে না, অন্তহীন রূপের জগতেও স্পন্দিত হইতে দেখে। মুক্তির অর্থ তাই জগৎ ও জীবনকে ছাড়াইয়া ওঠা নয়, তাহাকে তাহার পূর্ণ ও যথার্থ স্বরূপে প্রত্যক্ষ করা।

ইহাতে কর্ম কোন পরিণামে নিরর্থক বা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে না, কারণ জগৎ ও জীবন কোন পরিণামে মায়া বা মিথ্যা নয়, মরীচিকার মত তাহা শূন্যে অন্তর্হিত হইয়া যায় না। এই পরিণাম লাভ করিলে, মনুষ্য-কর্ম ঈশ্বরীয় কর্মের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া অভ্রান্ত হয়।

সমগ্র মনুষ্য-সমাজ ওই দিব্য ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজে পরিণাম লাভ করিবার জন্য চলিয়াছে। এই যোগযুক্ত মানুষগুলি ওই ধীর গতিকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য মনুষ্য-সমাজকে সচেষ্ট করিয়া তুলেন।

নিষ্কাম কর্ম বলিতে মায়াবাদীরা কি বুঝেন তাহার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করিয়াছি। বস্তুতঃ, নিষ্কাম কর্ম সম্ভব হয় না, যদি না মানুষ

এইরূপে সম্পূর্ণ যোগযুক্ত অবস্থা লাভ করে। মানবিক বোধের মধ্যে থাকিয়া অভিপ্রেত কর্মের ফলাফল সম্পর্কে ঔদাসীন্যকে নিষ্কাম কর্ম বলে না। এই যোগযুক্ত অবস্থা লাভ করিলে ঈশ্বরই মানুষকে তাহার বিশিষ্ট আধার-অনুযায়ী বিশেষ এক একটি কর্মে নিয়োজিত করেন, ইহাই মানুষের স্বধর্ম। ইহার সহিত জন্ম-নিয়ন্ত্রিত কর্মের সুদূর কোন সম্পর্ক নাই। নিষ্কাম কর্ম বলিতে আপন আপন জন্মলব্ধ জীবন-পর্যায়কে মানিয়া লইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট জীবন-যাত্রা বুঝায় না। ইহা সুলভতম পথ হইতে পারে কিন্তু উত্তম পথ নয়। সুলভতম পথ এইজন্য যে, মানুষের মনের একটা ধর্ম হইল তাহার গতানুগতিকতাকে স্বীকার করা। মনকে এবং সেইসঙ্গে সমগ্র সত্ত্বাকে সচেষ্ট ও জাগ্রত করিবার প্রয়োজন ইহাতে হয় না। বলিয়াছি, ইহার পশ্চাদ্-প্রেরণা হইল, সমগ্র সমাজ জীবনকে নিশ্চেষ্ট ও গতানুগতিক করিয়া তোলে। উত্তম পথ এই জন্যই নয় যে, এই জাতীয় জীবনবোধ মানব-সমাজের বিকাশকে সহায়তা না করিয়া তাহাকে প্রাণপণে নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করিয়াছেন,

"The Gita does not teach the disinterested performance of duties but the following of the divine life, the abandonment of all Dharmas, *Sarvadharman* to take refuge in the Supreme alone...... ." —*Essays on the Gita.*

একমাত্র এই দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়তায় দিব্য-সমাজ রচনা সম্ভব। একমাত্র এই বোধের উপর সমগ্র সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

"In the spiritual life all the external distinctions of which men make so much, because they appeal with an oppressive force to the outward mind, cease before the equality to the divine Light and the wide omnipotence of an impartial Power ......love of world the mask, must change into the love of God, the Truth. Once this secret and inner God head is known and is embraced, the whole being and the whole life will undergo a sovereign uplifting and a marvellous transmutation. In place of the ignorance of the lower nature absorbed in its outword works and appearances the eye will open to the vision of God everywhere, to the unity and universality of the spirit. The world's sorrow and pain will disappear in the bliss of the All-blissful ; our weakness and error and sin will be changed into the all-embracing and all-transforming strength, truth and purity of the Eternal, —*Essays on the Gita.*

কোন এক পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণ তাঁহার ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস নামক ইংরেজি গ্রন্থে বাংলা দেশের কায়স্থদের জাতি সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া শাস্ত্র হইতে একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্তিটি উদ্ধৃত করিবার পূর্বে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দকে স্মরণ করিয়া লইয়াছেন।

উক্তিটি এইরূপ ঃ কায়স্থাঃ চামারাঃ চ। কায়স্থরা যে চামার অথবা চামারের পর্যায়ভুক্ত জাতি, ইহাই তিনি সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন।

অধ্যাপক নির্মল বসু তাঁহার 'হিন্দু সমাজের গড়ন'-গ্রন্থে কায়স্থদের জাতিগত বৃত্তি নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন "হিসাব নিকাশ ও নকল"। ইহার নির্দেশ তিনি কোন্ শাস্ত্র হইতে পাইয়াছেন তাহা আমাদের জানা নাই। যদি অধ্যাপক বসুর কথা স্বীকার করিয়া লইতে হয় এবং তিনি যখন জাতির বিশিষ্ট বৃত্তি মানেন, তখন তিনি স্বয়ং হিসাব নিকাশ ও নকলের কার্য গ্রহণ করিলে যুক্তি যুক্ত হইত। তিনি স্বয়ং সমস্ত জীবন অনধিকার চর্চা করিয়া জাতিচ্যুতির পাপানুষ্ঠান করিয়াছেন। 'হিন্দু সমাজের গড়ন' লেখা তাঁহার অনধিকার কার্য ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি জাতি মানেন বলিয়া এই কথা বলিতেছি। তিনি যাহা পারিতেন তাহা হইল, আপনার স্বজাতি ও সম্প্রদায়কে বৃত্তিনিষ্ট করিবার জন্য আন্দোলন করা। তিনি তাহা করিতে সাহস পান নাই। বোধ হয়, শারীরিক উৎপীড়ন লাভ করিবার আশংকায়। তাঁহার সম্প্রদায় সকল প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিবেন অথচ তিনি শূদ্রকের পরিণামের কথা তুলিয়া বৃথা আস্ফালন করিবেন, ইহা চলিতে পারে না।

তাঁহার সহিত এই বিষয়ে কথাবার্তা বলিবার আমার সুযোগ হয়। তাঁহার সেই দম্ভোক্তি স্মরণে পড়িতেছে। "আমরা সমাজে এমন condition সৃষ্টি করেছি, যাতে শূদ্ররা কোন কালেই সমাজের উপরের স্তরে উঠতে পারবে না। আমরা বরং খৃষ্টান ও মুসলমানকে সুযোগ দেব, কিন্তু শূদ্রদের দেব না।"

এটা অধ্যাপক বসুর একার উক্তি নয়। উক্ত সম্প্রদায়ের মনের কথা অন্ততঃ অধিকাংশের। আজ ইহা লিপিবন্ধ করিয়া রাখিয়া গেলাম, যদি শূদ্ররা কোন দিন এই চ্যালেঞ্জের সমুচিত উত্তর দেয়।

আমাদের বিশ্বাসের কথা নানা গ্রন্থে নানা ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সমাজের সকল স্তরের মানুষের পূর্ণ মনুষ্যত্ব চর্চা করার অধিকার আছে এবং স্বভাব ও স্বধর্ম অনুযায়ী সকল প্রকার বৃত্তি - গ্রহণের। তাহার জন্য সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সকল মানুষের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং তাহাকে সর্বান্তকরণে স্বীকার করিতে হইবে।

হিন্দু-সমাজে স্তরবিন্যস্ত জাতি-তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া, ব্রাহ্মণ্য-সমাজ যে culture complex গাড়িয়া তুলিয়াছে, এ-দেশের সমাজে তাহাকে কার্যকরী

করিয়াছে ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থ ও বৈদ্যসমাজ। ব্রাহ্মণদের সহিত এই দুটি শূদ্র জাতিও একই সাংস্কৃতিক ঐক্য সৃষ্টি করিয়াছে। এই তিনটি জাতি সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতায় সর্বোচ্চ স্তর বাছিয়া লইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সামাজিক শক্তি ও প্রতিপত্তি লাভ করিবার ক্ষেত্রে অন্তর্ঘাত যতই থাক, অন্যান্য জাতিদের সম্পর্কে তাহারা অত্যন্ত ঐক্যবদ্ধ। তাহাদের মনোভাব একই রূপ।— অর্থাৎ, যে-কোন উপায়ে নীতি-ধর্ম বিবেক নষ্ট করিয়াও ভিন্নতর জাতিদের শক্তি ও প্রতিপত্তি হইতে বঞ্চিত করা।

কিন্তু ইহা কোন সমস্যা নয়। এই culture complex অর্থাৎ কেবল-মাত্র জন্মের উপর সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা এতদূর ঘৃণ্য যে, স্বামী বিবেকানন্দও রবীন্দ্রনাথের মত এই সমাজকে 'গলিত মৃতদেহ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বিবেকানন্দ বলিয়াছেনঃ এই গলিত মৃতদেহে কিছু মূল্যবান অলংকার আছে। সেইগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, ইহার সৎকার করিয়া দাও। যে ব্রাহ্মণ্য-সমাজ এই culture complex গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাদের মত যে, কোন কারণেই পরিবর্তিত হইবে না। বিবেকানন্দ তাঁহার কথাও বলিয়াছেন। তিনি ইহাদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া সমুদ্র পার করিয়া দিতে বলিয়াছেন। শরৎচন্দ্র পথের দাবীর মধ্যে সব্যসাচীর মুখ দিয়া বলিয়াছেন, নূতন সমাজ গঠন করিতে সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে ব্রাহ্মণ্য-সমাজ। তিনি ইহাদের সম্পর্কে তাই সতর্ক থাকিতে বলিয়াছেন। আমাদেরও অভিজ্ঞতা তাই। তবে ব্রাহ্মণদের সংগে সংগ্রামে দুটি মোড়ল জাতও যে চরম সংঘাতে যোগ দিবে—তাহাতে কোন সংশয় নাই। ইহারা অনুগ্রহ স্বরূপ সমাজে যে অধিকার পাইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে ঘৃণা করিবার, তাহা তাহারা সহজে হারাইতে চাহিবে না। শেষ চরম আঘাত তাহারও হানিবে। অবশিষ্ট সমাজকে ইহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইহাদের নেতৃত্ব লইবে সেই শ্রেণীর একদল মানুষ, যাহারা জাতিতত্ত্বের বাহিরে আসিয়া এক নূতন সমাজ গঠনের জন্য আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত।

গোরা, বিনয় ও ললিতা

দুটি প্রেমের আখ্যায়িকা গোরা উপন্যাসের মধ্যে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই দুটি প্রেমের মধ্যে চারটি নর-নারীর অন্তর্দ্বন্দ্বকে আশ্রয় করিয়া হিন্দু ও ব্রাহ্ম-সমাজের সমগ্র ধর্মীয় বোধের সকল দিকের এমন বিস্ময়কর আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে এবং তাহাতে দুটি প্রেমের আখ্যায়িকা এমন একটি মহাকাব্যিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, যাহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, এমন কোনও একখানি বাংলা উপন্যাস খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

বিনয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। কলিকাতায় একাকী একটি বাসায়

থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। এখন বন্ধু গৌরমোহনের সহিত স্বদেশসেবায় ব্রতী হইয়াছে। বিনয় অল্প বয়সেই পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া কাকার অর্থানুকূল্যে কলকাতায় কালাতিপাত করে। কলিকাতায় তাহার পরিচয় একমাত্র গোরার বাড়ীর সহিত। সেখানে গোরার মা তাহার মাতৃস্নেহের ক্ষুধা সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করিয়া দিয়াছেন। সৌন্দর্য-স্বপ্নে ভরা তাহার মন। কোন্ অনির্দেশ্যকে লাভ করিবার জন্য তাহার এই ব্যাকুলতা, তাহা সে নিজেই ঠিক করিয়া বোধ করিতে পারে না।

এমনি এক উন্মনা প্রভাতে আকস্মিকভাবে ব্রাহ্ম-পরিবারের পরেশবাবু ও তাঁহার পালিতা কন্যা সুচরিতার সহিত তাহার পরিচয় হইয়া গেল। সুচরিতা সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী তরুনী। সুচরিতার সহিত প্রথম পরিচয়েই বিনয় মুগ্ধ হইয়াছে। তাহার অন্তর-বীণায় এক অনির্বচনীয় সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। সে সুরের সহিত তাহার কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে পরিচয়ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। বিনয় সকলের সহিত অতি সহজেই মিশিতে পারিত। পরেশবাবুর পরিবারের সকলের সহিত লাবণ্য-ললিতা, শীলা, সুচরিতা, বরদাসুন্দরী, এমন কি বালক সতীশের সহিত অবাধে মেলামেশা করিয়া বিনয় একটি নূতন আস্বাদ পাইল। তাহা এমন একটি মুক্তির আস্বাদ—যাহার কোন সন্ধান সে হিন্দু-সমাজে পায় নাই।

বিশেষ করিয়া পরেশবাবু ও সুচরিতার সহিত সে হিন্দুধর্মের, গোরার ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়া যাহা সত্য হইয়া উঠিতে চাহিয়াছে, তাহার কথা বলিত। গোরার কথা বলিতে তাহার ক্লান্তি ছিল না। বিনয় সুন্দর করিয়া গুছাইয়া কথা বলিতে পারিত। বিতর্কের বিষয় হইলেও, পরেশবাবু ও সুচরিতা তাহা মুগ্ধ হইয়া শুনিত। এমনি করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই বিনয়ের একটি অন্তরবাসী ক্ষুধা মুখ ব্যাদন করিয়া জাগিয়া উঠিল। গোরাকে দিয়া তাহার যে ব্যক্তিত্ব আপাদমস্তক ঢাকা পড়িয়া ছিল, তাহা যেন বিদীর্ণ হইয়া বিনয়ের সাধনার সত্ত্বাটিকে পরিস্ফুট করিতে চাহিল! গোরার সহিত তাহার ব্যক্তিত্বের সংঘাত দেখা দিল। গোরা হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-সমাজের দিক হইতে বিনয়ের ব্রাহ্ম-পরিবারের সহিত মেলামেশাকে ভাল চক্ষে দেখিত না। অন্যদিকে বিনয় ব্রাহ্ম-সমাজের, বিশেষ করিয়া পরেশবাবুর পরিবারের মধ্যে এমন একটা কিছু পাইয়াছে, যাহাকে পরিহার করাও তাহার পক্ষে আত্মবঞ্চনা। গোরার হিন্দুধর্মের কথাগুলি এখন আর তেমন করিয়া বিয়নকে স্পর্শ করিতে পারে না। গোরার কাছ হইতে সে অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছে বোধ করিয়া, মাঝে মাঝে বিনয়ের আত্মগ্লানি জাগে, কিন্তু নূতন বোধের নিকট সে পর-মুহূর্তে পরাভব স্বীকার করিয়া লয়।

ললিতা বিনয়কে আপনার মাধুর্যলোকে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে। মানুষহিসাবে তাহার যে একটি আশ্চর্য মূল্য আছে, সে যে গোরার উপগ্রহমাত্র নহে, তাহাই তাহাকে দিয়া বোধ করাইতে চাহিয়াছে। ললিতা সুচরিতাকে সে কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছে—"ওঁর বন্ধু ওঁকে এমনি ঢেকে ফেলেছেন যে, উনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারছেন না। যেন কাঁচপোকা তেলা পোকাকে ধরেছে—ও রকম অবস্থায় কাঁচপোকার উপর আমার রাগ ধরে, তেলাপোকার উপরেও আমার শ্রদ্ধা হয় না।—" ললিতার সৌন্দর্য-স্বপ্নে বিভোর হইয়া, বিনয় গোরার নিকট হইতে ক্রমশঃ অলক্ষ্যে অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছে। মানুষ এমনি করিয়া ধীরে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রেমের সেই নিঃসংশয়িত পথে বিনয় পা বাড়াইয়াছে। আমরা পরে লক্ষ্য করিতে পারিব, বিনয় গোরার প্রবল ব্যক্তিত্বে আবির্ভূত হইয়া বারংবার জাগিয়া উঠিয়া ফিরিবার পথ অন্বেষণ করিয়াছে, বারংবার সে প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া ললিতার মাধুর্য ও প্রেমের বন্যায় তাহার প্রবল ব্যক্তিত্বের টানে ভাসিয়া গিয়াছে। বিনয় আপনার সেই প্রথম উপলব্ধিকে কী মাধুরী মিশাইয়া না প্রকাশ করিয়াছে! বিনয়ের সেই উক্তি বিস্তারিত উদ্ধৃত করিতেছি।

"সে কী মুখ! প্রাণের আভা তাহার কপোলের কোমলতার মধ্যে কী সুকুমারভাবে প্রকাশ পাইতেছে। হাসিতে তাহার অন্তঃকরণ কী আশ্চর্য আলোর মত ফুটিয়া পড়ে! ললাটে কী বুদ্ধি! ঘন পল্লবের ছায়াতলে দুই চক্ষুর মধ্যে কী নিবিড় অনির্বচনীয়তা! আর সেই দুটি হাত—সেবা এবং স্নেহকে সৌন্দর্যে সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, সে যেন কথা কহিতেছে! বিনয় নিজের জীবনকে যৌবনকে ধন্য জ্ঞান করিতেছে, এই আনন্দে তাহার বুকের মধ্যে যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই যাহা না দেখিয়াই জীবন সাঙ্গ করে, বিনয় যে তাহাকে এমন করিয়া চোখের সামনে মূর্তিমান দেখিতে পাইবে, ইহার চেয়ে আশ্চর্য কিছু নাই।"

বিনয়ের জীবনে ইহা যত বড় প্রকাশ হোক-না-কেন, গোরার জীবনে ইহা সত্য ছিল না বলিয়া যে আদর্শবোধ ও ভাবাবেগের মধ্যে সে নিমগ্ন হইয়া থাকিত, সেই বোধে বিনয়কে বাঁধিবার চেষ্টা করিল। বিনয় তাহার প্রেমের প্রথম অনুভূতিকে একটা স্বপ্নমাত্র বোধ করিয়া, গোরার বন্ধু-প্রেমে আপনাকে ধরা দিবার জন্য আগ্রহী হইল। শশীমুখীকে বিবাহ করা হিন্দুধর্মের দিক হইতে তাহার নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল না। গোরাও এই সুযোগ গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না। বিনয়কে সে এইভাবে কোন রকমে

বাঁধিতে চায়। শশীমুখীকে দৃঢ় বন্ধন রজ্জু স্থির করিয়া, দুই বন্ধু পরেশ বাবুর পরিবারে ঘন ঘন যাতায়াত সুরু করিল। মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে উভয়েই কত অনভিজ্ঞ! এমনি করিয়া বিনয় ও গোরার জীবনে নিয়তি লীলা করিয়াছে। গোরার প্রসঙ্গ আমরা অন্যত্র পৃথকভাবে আলোচনা করিব। ব্রাউনলো সাহেবের গৃহে অভিনয়ের প্রসঙ্গে বিনয় ও ললিতা পরস্পরের আরো নিকটে আসিয়াছে। হৃদয়বোধের সেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিনম্র লীলার পরিচয়-দানের বিশেষ সুযোগ এক্ষেত্রে নাই। রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য নিপুণতার সহিত তাহা চিত্রিত করিয়াছেন। আমরা কেবল এইমাত্র বলিতে পারি, এই সুধা-স্রোতে শশীমুখীর ক্ষীণ রজ্জু কখন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, বিনয়ও তাহা বোধ করিতে পারে নাই। প্রেমের সে আস্বাদ বিনয়ের জীবনে সম্পূর্ণ বাস্তব ও সত্য। প্রেমের সে উত্তাপে তাহার হৃদয় শতদল মেলিয়া পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে। বিনয় আপনার ব্যক্তিত্ববোধে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। সে আপনার জীবনে সার্থকতা কোথায় তাহা নিঃসংশয়ে বোধ করিতে পারিয়াছে। তাই যত রূঢ়ভাবেই হোক শশীমুখীর বিবাহের প্রস্তাব ফিরাইয়া লইতে দ্বিধাবোধ করিল না। এখন বিনয় গোরার গ্রহমাত্র নয়। এখন বিনয়ের সজীব সত্তার সহিত গোরার ব্যক্তিত্বের নয়, গোরার আদর্শবোধের সংঘাত অনিবার্য হইয়া উঠিল।

চরঘোষপুরে মেজিস্ট্রেট ব্রাউনলোর অতিথি হইয়া পরেশবাবুর পরিবারের সকলে এবং বিনয় ও পানুবাবু উপস্থিত হইয়াছেন। সেদিন সন্ধ্যায় গীতি আলেখ্য অনুষ্ঠিত হইবে। এমন সময় সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল যে, গোরা ব্রাউনলো সাহেবের হাজতে আটকা পড়িয়াছে। এই সংবাদে বিনয় ও ললিতা অন্যদিকে সুচরিতা ব্যথায় ও বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িল। বিনয়ের নিকট সমস্ত সংবাদ শুনিয়া গোরা সম্পর্কে ললিতা ও সুচরিতার হৃদয় গৌরবে ও শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। অনুষ্ঠানে বিনয়ের যোগদান করা সম্ভব নয়। বিনয় সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সেইদিন স্টিমারে কলকাতা যাত্রা করিল। ললিতা তেজস্বিনী নারী। সেও কাহাকে কিছু না জানাইয়া যখন একাকী বিনয়ের সহযাত্রী হইল, তখন ফিরিবার কোন উপায় নাই। স্টিমার তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। ললিতা বাড়ীতে একটি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। এই ব্যাপার লইয়া সমাজে কতদূর কি গড়াইতে পারে, তাহারা উভয়ে কেহ চিন্তা করিল না। চিন্তা করিয়া উপায়ই বা কি। বিপদ যত বড়ই হোক, তাহার সম্মুখীন হইবার মত চরিত্রবল উভয়েরই ছিল। বিনয়ের সংযম ও চরিত্রবল অসাধারণ। ললিতাকে একাকী পাইয়া সে আপনার দীনতার কোন পরিচয় দিল না। যে নারী নিঃসংশয়ে তাহার নিকট আশ্রয়

লইয়াছে, তাহার পূর্ণ মর্যাদা বিনয় দান করিল। বিনয়ের সে পৌরুষে, সে মহত্ত্বে ললিতাও বিস্মিত!

স্টীমার যাত্রার পথে ললিতাকে ঘিরিয়া যে মাধুর্য ও স্বপ্নের জাল সে বুনিয়াছে, তাহার পরিচায়ক অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"রাত্রি গভীর অন্ধকারময়, মেঘশূন্য নভস্তল তারায় আচ্ছন্ন, তীরে তরুশ্রেণী নিশীথ আকাশের কালিমাঘন নিবিড় ভিত্তির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, নিম্নে প্রশস্ত নদীর প্রবল ধারা নিঃশব্দে চলিয়াছে, ইহার মাঝখানে ললিতা নিদ্রিত। আর কিছু নয়, এই সুন্দর, এই বিশ্বাসপূর্ণ নিদ্রাটুকুকে ললিতা আজ বিনয়ের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে। এই নিদ্রাটুকুকে বিনয় মহামূল্য রত্নটির মতো রক্ষা করিবার ভার লইয়াছে। পিতামাতা ভাই-ভগিনী কেহই নাই, একটি অপরিচিত শয্যার উপর ললিতা আপন সুন্দর দেহখানি রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে—নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন এই নিদ্রাকাব্য-টুকুর ছন্দ পরিমাপ করিয়া অতি শান্তভাবে যাতায়াত করিতেছে, সেই নিপুণ কবরীর একটি বেণীও বিস্রস্ত হয় নাই, সেই নারী হৃদয়ের কল্যাণ কোমলতায় মণ্ডিত হাত দুইখানি পরিপূর্ণ বিরামে বিছানায় উপর পড়িয়া আছে, কুসুম সুকুমার দুইটি পদতল তাহার সমস্ত রমণীয় গতি চেষ্টাকে উৎসব অবসানের সঙ্গীতের মত স্তব্ধ করিয়া বিছানার উপর মেলিয়া রাখিয়াছে, বিশ্রব্ধ বিশ্রামের এই ছবিখানি বিনয়ের কল্পনাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। শুক্তির মধ্যে মুক্তাটুকু যেমন, গ্রহতারা মণ্ডিত নিস্তব্ধ এই আকাশমণ্ডলের মাঝখানটিতে ললিতার এই নিদ্রাটুকু, এই সুডোল সুন্দর সম্পূর্ণ বিশ্রামটুকু জগতে তেমনি একটিমাত্র ঐশ্বর্য বলিয়া আজ বিনয়ের কাছে প্রতিভাত হইল। 'আমি জাগিয়া আছি' 'আমি জাগিয়া আছি'—এই বাক্য বিনয়ের বিস্ফারিত বক্ষঃ-কুহর হইতে অভয় শঙ্খধ্বনির মতো উঠিয়া মহাকাশের অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের নিঃশব্দ বাণীর সহিত মিলিত হইল।"

বিনয় ও ললিতার প্রেম এইখানে আসিয়া পূর্ণতালাভ করিয়াছে। তাহার পর বিবাহের ভিতর দিয়া পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করা। বিনয় ও ললিতারপ্রেম কেবল স্বপ্ন সঞ্চরণ করিয়া ফিরে নাই। সে প্রেম মহৎ কর্মের ভিতর দিয়া চরিতার্থতা লাভ করিতে চাহিয়াছে। তাহা পরস্পর পরস্পরের জন্য আত্মত্যাগ করিতে চায়। একদিকে ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যদিকে হিন্দু সমাজের দিক হইতে ধর্ম ও আচারগত যে সকল বাধা ছিল বাহিরের ও অন্তরের দিক হইতে সেই সকল বাধাকে বিনয় ও ললিতা একের পর এক উদ্ভিন্ন করিয়াছে। তাহারা যে সত্যকে অন্তরের মধ্যে লাভ করিয়াছে সে সত্যকে ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দুসমাজ আপনাদের চিরাচরিত সংস্কারের মধ্যে স্থান দান করিতে পারে না। তাহারা

উভয় সমাজকে ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া প্রসারিত করিয়াছে। এই প্রসারতা দান করিতে একদিকে আনন্দময়ী ও অন্যদিকে পরেশবাবু যে শক্তি ও সাহস যোগাইয়াছেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। আনন্দময়ী গোরাকে ভালবাসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া এমন একটি সত্যবোধ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার আজন্মের সমস্ত সংস্কার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কোথাও কোন বাধা ছিল না। কোন কিছুর জন্য তাঁহাকে অন্তরের মধ্যে সংগ্রাম করিতে হয় নাই। এই একই পরিণাম পরেশবাবু লাভ করিয়াছেন একের পর এক অন্তর্দ্বন্দ্বকে জয় করিয়া। পরেশবাবুর এই অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় আমরা অন্যত্র দান করিব।

প্রত্যেকটি সমাজ আপন আপন গণ্ডীর মধ্যে যে সত্যকে পাইয়াছে, তাহা যত উন্নত হোক, তাহা সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া খণ্ডিত। ভাবী যুগে যে সমাজ আসিবে, তাহাতে বিশ্বের সকল সম্প্রদায় মিলিয়া মিশিয়া একটি মহান সত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিবে। ইহাকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'ধর্মের নব যুগ'। তখন মানুষে মানুষে মিলনের পথে কোন বাধা থাকিবে না। তখন প্রত্যেকটি নর-নারীর চেতনার সহিত ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ-যোগের লীলা চলিবে। এই 'নব ধর্মে' উত্তীর্ণ হইয়াছেন পরেশবাবু। তাঁহার স্থান লাভ তাই কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটিল না! তিনি এই পরিণাম লাভ করিয়াছেন মুখ্যতঃ জ্ঞানের ভিতর দিয়া। আনন্দময়ী এই একই পরিণাম লাভ করিয়াছেন গোরাকে ভালবাসিয়া।

গোরা ও সুচরিতা

গোরা আশৈশব যে ভারতবর্ষকে ভালবাসে, যে ভারতবর্ষের বাণী সে প্রচার করিতে চায়, জীবনে যাহাকে সত্য করিয়া উপলব্ধি করিতে চায়, তাহা তাহার ধ্যানের, স্বপ্নের ভারতবর্ষ। তাহার ফলে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় তাহার বিচিত্র সংস্কার, আচার-বিচারের মধ্যে, তাহার ধর্মব্যবস্থার মধ্যে তাহার পূজা-পদ্ধতি ও মোক্ষ সাধনার মধ্যে সে কোন ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা দেখিতে পায় নাই।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাহার তীব্র ঘৃণার মূল কারণ এই যে, ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সমাজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাহার ক্ষতি সাধন কবিবার চেষ্টা করিয়াছে। এমনি করিয়া বাহির হইতে হিন্দু সমাজের কোন সংস্কার করিতে পারা যায় না। ব্রাহ্মসমাজও ছিন্ন মূল হইয়া ভাসিয়া যাইবে।

বিনয়ের সহিত তাহার সংঘাত সেইদিন হইতে বাধিয়াছে, যে দিন হইতে বিনয় ব্রাহ্মসমাজের পরেশবাবুর বাড়ীতে যাতায়াত সুরু করিয়াছে। ব্রাহ্ম-

সমাজের প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করিতে গোরা সকল শালীনতাবোধ পরিহার করিয়াছে।

কৃষ্ণদয়ালবাবুর আদেশ পালন করিতে গোরা পরেশবাবুদের বাড়ীতে প্রথম উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু পরেশবাবুর পরিবারের কাহারো সহিত সে সৌজন্য-মূলক আচরণ করিতে পারিল না। পানুবাবুর সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহাকে নির্মম আঘাতের পর আঘাত হানিয়াছে।

গোরার পোষাক-পরিচ্ছদ, তাহার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, তাহার বিতর্ক পরিবারের সকলের মনের উপর ঝড় বহাইয়া দিয়াছে। নানাভাবে আঘাত পাইলেও সুচরিতা কিন্তু পানুবাবুর সহিত তুলনা করিয়া গোরার মহত্ত্ব বোধ না করিয়া পারিল না। তাহার গভীর দেশাত্মবোধ, দেশের অগণিত জনসাধারণের জন্য তাহার গভীর মমত্ব বোধ সুচরিতাকে মুগ্ধ করিল। সেদিন রাত্রে ভাল করিয়া তাহার ঘুম আসিল না। ঘুমের ঘোরে গোরার নানা কথা, তাহার সেই তেজোদৃপ্ত দেশ-প্রেমের নানা কথা ভাঙিয়া চুরিয়া তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সেই একদিনের সাক্ষাৎকারে সুচরিতা গোরা সম্পর্কে কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে। দুই একদিন পরে বিনয় আসিতে সুচরিতা তাহাকে নানা প্রশ্ন করিয়া গোরার নানা কথা, তাহার সংস্কার, আশা বিশ্বাসের কথা জানিয়া লইতে লাগিল। উপযুক্ত শ্রোতা পাইয়া বন্ধু গোরার কথা বলিতে বিনয়ও কোন ক্লান্তি মানিল না।

সেদিন নির্জন ছাদে জ্যোৎস্না রাত্রে দুই বন্ধু মিলিয়া কত কথা বলিয়াছে। বিশেষ করিয়া বিনয় তাহার প্রথম প্রেমের উপলব্ধির কথা নিঃসঙ্কোচে গোরার নিকট ব্যক্ত করিয়াছে। গোরার জীবনে ইহা এক অভাবিত ব্যাপার। মানব জীবনে এই উপলব্ধির মূল্য কোথায়, এই বোধ লইয়া কী করিতে হয় তাহা গোরা বুঝিয়া পাইল না। অথচ ইহাকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। বিনয়ের জীবনে ইহার প্রকাশ কত নিবিড়, কত নিঃসংশয়িত। বিনয়ের উপলব্ধির আনন্দ তাহার অন্তরের মধ্যে এক প্রকার আবেগ সঞ্চার করিল, জ্যোৎস্না রাত্রির সহিত সে আবেগ বিজড়িত হইয়া তাহার মনের মধ্যে মায়া বিস্তার করিল।

গোরা এই উপলব্ধিকে অস্বীকার করিয়া তাহার ত্যাগের, তাহার তপস্যার, তাহার আদর্শময় জীবনকে জড়াইয়া ধরিতে চাহিল। সেই সঙ্গে বিনয়কে বুকে জড়াইয়া তাহাকেও সেই উপলব্ধিকে অস্বীকার করিতে বলিল। জীবনে মরণে তাহাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকিবে।

গোরা বলিল এই মাধুর্যের স্বপ্ন পুরুষের জন্য নয়। পুরুষকে সত্য

উপলব্ধি করিতে হইবে দারিদ্র্যের মধ্যে, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের মধ্যে, কাঠিন্য ও নির্মমতার মধ্যে। সে ক্ষেত্রে মৃত্যুর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জীবনে অমৃত আহরণ করিতে হয়।

বিনয়ের মধ্যে প্রেম এখনও নিঃসংশয়িত ভাবে জাগে নাই তাই সাময়িক ভাবে গোরার ভাবাবেগে ভাসিয়া গেল। গোরা আপনার আদর্শের মত করিয়া বিনয়কে গড়িয়া তুলিবে। বিনয় আর কোন চিন্তা করিবে না।

সুচরিতার সহিত পানুবাবুর বিবাহ ইতিপূর্বেই এক প্রকার স্থির হইয়াছিল। কিন্তু গোরার সহিত পরিচিত হইবার পর হইতে তাহার এই সংকল্প অনেকটা শিথিল হইয়া গেল। মানুষ পানুবাবু গোরার সহিত তুলনায় অনেকটা ছোট হইয়া গেল।

বিনয় ও গোরা শশীমুখীকে চিরন্তন জামিন স্বরূপ রাখিয়া পরেশবাবুর গৃহে ঘন ঘন যাতায়াত সুরু করিল।

গোরা তখনও যাতায়াত সুরু করে নাই। বিনয় উপস্থিত হইলে সুচরিতা তাহার মুখ দিয়া গোরার কথাই ফিরিয়া ফিরিয়া শুনিতেন। শুনিয়া শুনিয়া তাহার আশা মিটিত না। এমনি করিয়া অজ্ঞাতে গোরার প্রতি তাহার অন্তরে অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধার সহিত অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়া দিনে দিনে তাহা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। গোরা এখন হইতে সুচরিতার জীবনে একটি অনন্য সাধারণ মানুষ বলিয়া বোধ হইল।

আজ সুচরিতা তাহার মুখের দিকে একমনে চাহিতে চাহিতে সমস্ত দল, সমস্ত মত সমস্ত উদ্দেশ্য হইতে পৃথক করিয়া গোরাকে কেবল গোরা বলিয়াই যেন দেখিতে লাগিল। চাঁদকে সমুদ্র যেমন সমস্ত প্রয়োজন সমস্ত ব্যবহারের অতীত করিয়া দেখিয়াই অকারণে উদ্বেল হইয়া উঠিতে থাকে, সুচরিতার অন্তঃকরণ আজ তেমনি সমস্ত ভুলিয়া, তাহার সমস্ত বুদ্ধি ও সংস্কার, তাহার সমস্ত জীবনকে অতিক্রম করিয়া যেন চতুর্দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মানুষ কী, মানুষের আত্মা কী, সুচরিতা এই তাহা প্রথম দেখিতে পাইল এবং এই অপূর্ব অনুভূতিতে সে নিজের অস্তিত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল।"

অন্যদিকে সুচরিতাকে ঘিরিয়া গোরার অন্তরে যে মাধুর্যলোক গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার এক অপরূপ ছবি ঔপন্যাসিক তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেই অংশটিও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"গোরা শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য, যে প্রগল্‌ভতা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, সুচরিতার মুখশ্রীতে তাহার আভাস মাত্র কোথায়! তাহার মুখে বুদ্ধির একটি উজ্জ্বলতা নিঃসন্দেহে প্রকাশ পাইতেছিল, কিন্তু নম্রতা ও লজ্জার দ্বারা তাহা কী সুন্দর কোমল হইয়া আজ দেখা দিয়েছে! মুখের

ডৌলটি কী সুকুমার! ভ্রূযুগলের উপরে ললাটটি যেন শরতের আকাশ খণ্ডের মতো নির্মল ও স্বচ্ছ। ঠোঁট দুটি চুপ করিয়া আছে, কিন্তু অনুচ্চারিত কথার মাধুর্য সেই দুটি ঠোঁটের মাঝখানে যেন কোমল একটি কুঁড়ির মতো রহিয়াছে। সুচরিতার একটি হাত টেবিলের উপর ছিল। তাহার জামার আস্তিনের কুঞ্চিত প্রান্ত হইতে সেই হাতখানি আজ গোরার চোখে কোমল হৃদয়ের একটি কল্যাণপূর্ণবাণীর মতো বোধ হইল। দীপালোকিত শান্ত সন্ধ্যায় সুচরিতাকে বেষ্টন করিয়া সমস্ত ঘরটি তাহার আলো, তাহার দেয়ালের ছবি, তাহার গৃহ সজ্জা তাহার পারিপাট্য লইয়া একটি যেন বিশেষ অখণ্ড রূপ ধারণ করিয়া দেখা দিল।* গোরা আপনার চতুর্দিকের আকাশের মধ্যে একটি সজীব সত্তা অনুভব করিল—তাহার হৃদয়কে চারিদিক হইতেই একটা হৃদয়ের হিল্লোল আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল, একটা কিসের নিবিড়তা তাহাকে যেন বেষ্টন করিয়া ধরিল। এরূপ অপূর্ব উপলব্ধি তাহার জীবনে কোনদিন ঘটে নাই। দেখিতে দেখিতে ক্রমশই সুচরিতার কপালের ভ্রষ্ট কেশ হইতে তাহার পায়ের কাছে শাড়ির পাড়টুকু পর্যন্ত অত্যন্ত সত্য এবং অত্যন্ত বিশেষ হইয়া উঠিল। একই কালে সমগ্রভাবে সুচরিতা এবং সুচরিতার প্রত্যেক অংশ স্বতন্ত্রভাবে গোরার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।" সেদিন গোরা সুচরিতাকে ভারতবর্ষের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের প্রকৃত সত্যকে, বাহির হইতে নয়, অন্তর হইতে আহবান করিল। গোরার প্রাণ এমনি করিয়া সুচরিতাকে প্রাণের মধ্যে আহবান করিয়া লইয়াছে।

গোরাকে তাহার নবলব্ধ এই বোধ লইয়া বোঝাপড়া করিতে হইবে। ইহাকে একপাশের্ব ঠেলিয়া দিয়া নিত্য দিনের কর্মস্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়া চলিবে না।

পরেশবাবুর বাটী হইতে বাহির হইয়া গোরা কিন্তু সোজা আপনার গৃহের দিকে গেলনা। একটু ঘুরিয়া গঙ্গার তীরে গভীর রাত্রি পর্যন্ত একাকী বসিয়া রহিল। গোরার এই সময়কার মনের অবস্থা বুঝাইতে ঔপন্যাসিক অনুরাগের সমস্ত রঙ্গ উজাড় করিয়া দিয়াছেন। সেই আশ্চর্য কবিত্বমণ্ডিত অংশটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আজ কিন্তু নদীর উপরকার ঐ আকাশ আপনার নক্ষত্রলোকে অভিষিক্ত অন্ধকার দ্বারা গোরার হৃদয়কে বারংবার নিঃশব্দে স্পর্শ করিতে লাগিল। নদী নিস্তরঙ্গ। কলিকাতার তীরের ঘাটে কতকগুলি নৌকায় আলো জ্বলিতেছে আর কতকগুলি দীপহীন নিস্তব্ধ। ও পারের নিবিড় গাছগুলির মধ্যে কালিমা ঘনীভূত। তাহারই ঊর্ধ্বে বৃহস্পতি গ্রহ অন্ধকারের অন্তর্যামীর মতো তিমিরভেদী অনিমেষ দৃষ্টিতে স্থির হইয়া আছে।

আজ এই বৃহৎ নিস্তব্ধ প্রকৃতি গোরার ধীর-মনকে যেন অভিভূত করিয়া দিল। গোরার হৃৎপিণ্ডের সমান তালে আকাশের বিরাট অন্ধকার স্পন্দিত হইতে লাগিল। প্রকৃতি এতকাল ধৈর্য ধরিয়া স্থির হইয়াছিল—আজ গোরার অন্তঃকরণের কোন্ দ্বারটা খোলা পাইয়া সে মুহূর্তের মধ্যে এই অসতর্ক দুর্গটিকে আপনার করিয়া লইল। এতদিন নিজের বিদ্যাবুদ্ধি চিন্তা ও কর্ম লইয়া গোরা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ছিল-আজ কী হইল! আজ কোন্‌খানে সে প্রকৃতিকে স্বীকার করিল এবং করিবামাত্রই এই গভীর কালো জল, এই নিবিড় কালো তট, ঐ উদার কালো আকাশ তাহাকে বরণ করিয়া লইল। আজ প্রকৃতির কাছে কেমন করিয়া গোরা ধরা পড়িয়া গেছে।

পথের ধারে সদাগরের আফিসের বাগানে কোন্ বিলাতি লতা হইতে একটি অপরিচিত ফুলের মৃদু কোমল গন্ধ গোরার ব্যাকুল হৃদয়ের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। নদী তাহাকে লোকালয়ের অশ্রান্ত কর্মক্ষেত্র হইতে কোন্ অনির্দেশ্য সুদূরের দিকে আঙুল দেখাইয়া দিল; সেখানে নির্জন জলের ধারে গাছগুলি শাখা মিলাইয়া কী ফুল ফুটাইয়াছে। কী ছায়া ফেলিয়াছে! সেখানে নির্মল নীলাকাশের নীচে দিনগুলি যেন কাহার চোখের উন্মীলিত দৃষ্টি এবং রাতগুলি যেন কাহার চোখের আনত পল্লবের লজ্জাজড়িত ছায়া! চারিদিক হইতে মাধুর্যের আবর্ত আসিয়া হঠাৎ গোরাকে একটা অতল স্পর্শ অনাদি শক্তির আকর্ষণে টানিয়া লইয়া চলিল। পূর্বে কোনদিন সে তাহার কোনো পরিচয় জানিত না। ইহা একই কালে বেদনায় এবং আনন্দে তাহার সমস্ত মনকে এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে অভিহত করিতে লাগিল। আজ এই হেমন্তের রাত্রে, নদীর তীরে, নগরের অব্যক্ত কোলাহলে এবং নক্ষত্রের অপরিস্ফুট আলোকে গোরা বিশ্বব্যাপিনী কোন্ অবগুণ্ঠিতা মায়াবিনীর সম্মুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া দণ্ডায়মান হইল! এই মহারাণীকে সে এতদিন নত মস্তকে স্বীকার করে নাই বলিয়াই আজ অকস্মাৎ তাহার শাসনের ইন্দ্রজাল আপন সহস্রবর্ণের সূত্রে গোরাকে জলস্থল আকাশের সঙ্গে চারিদিক হইতে বাঁধিয়া ফেলিল। গোরা নিজের সম্বন্ধে নিজেই বিস্মিত হইয়া নদীর জনশূন্য ঘাটের একটা পৈঠায় বসিয়া পড়িল। বার বার সে নিজেকে প্রশ্ন করিতে লাগিল যে, তাহার জীবনে এ কিসের আবির্ভাব এবং ইহার কী প্রয়োজন। যে সংকল্প দ্বারা সে আপনার জীবনকে আগাগোড়া বিধিবদ্ধ করিয়া মনে মনে সাজাইয়া লইয়াছিল, তাহার মধ্যে ইহার স্থান কোথায়? ইহা কি তাহার বিরুদ্ধ? সংগ্রাম করিয়া ইহাকে কি পরাস্ত করিতে হইবে? এই বলিয়া গোরা মুষ্টি দৃঢ় করিয়া যখনই বদ্ধ করিল অমনি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, নম্রতায় কোমল, কোন দুইটি স্নিগ্ধ চক্ষুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাহার মনের মধ্যে

জাগিয়া উঠিল—কোন্ অনিন্দ্যসুন্দর হাতখানির আঙুলগুলির স্পর্শ সৌভাগ্যের অনাস্বাদিত অমৃত তাহার ধ্যানের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল, গোরার সমস্ত শরীরে পুলকের বিদ্যুৎ চকিত হইয়া উঠিল। একাকী অন্ধকারের মধ্যে এই গভীর অনুভূতি তাহার সমস্ত প্রশ্নকে, সমস্ত দ্বিধাকে একেবারে নিরস্ত করিয়া দিল। সে তাহার এই নূতন অনুভূতিকে সমস্ত দেহ মন দিয়া উপভোগ করিতে লাগিল—ইহাকে ছাড়িয়া সে উঠিতে ইচ্ছা করিল না।"

এখন হইতে গোরার মধ্যে দুটি শক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া প্রবল আকার ধারণ করিল। —একটি তাহার নবলব্ধ প্রেম-চেতনা, অন্যটি তাহার স্বদেশ হিতৈষণা। গোরা তাহার প্রেমের বোধকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিবে না। তাই প্রাণপণ বলে সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িল।—ইচ্ছা দেশকে জানা, দেশের ধর্ম, সমাজ ও দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে জানা।

এদিকে সুচরিতা দিনের পর দিন গোরার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে বিনয়ের নিকট শুনিল গোরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার অন্তরে গোরাকে আশ্রয় করিয়া যে একটি অপূর্বতার জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে, সে বোধ করিতে পারিয়াছে এইখানেই তাহার জীবন চরিতার্থতা লাভ করিবে। কিন্তু তাহাকে একাকী ফেলিয়া গোরা দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িয়াছে শুনিয়া সুচরিতার অন্তর ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল। এই শূন্যময় জীবনের ভার সে একাকী কেমন করিয়া বহন করিবে। সুচরিতা গোরাকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই পারিল না। তাহার শূন্যময় জীবনের ভার সে কেমন করিয়া বহন করিবে এই ভাবিয়া সে কোথাও কূল পাইল না। সে আপনাকে নিঃশেষে কোথাও সমর্পণ করিলে বাঁচিয়া যায়। তাই পানুবাবুর বিবাহ প্রস্তাবে সে নিঃসংশয়ে আপনার সম্মতি দান করিল।

চর ঘোষপুরের ব্যাপার লইয়া গোরার এক মাসের জেল হইয়া গেল। গোরার এই কারাবাসের ভিতর দিয়া সুচরিতার নিকট গোরা আবার একটি মহিমা লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

গোরা নবলব্ধ ও মাধুর্য বোধকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কারাগারের মধ্যে ফল ফলিল বিপরীত। নির্জন কারাগারে গোরার মনের মধ্যে দুইটি মূর্তি নানা ভাবে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, একটি তাহার মাতা আনন্দময়ীর, অন্যটি সুচরিতার। সুচরিতার ধ্যান-মূর্তির নিকট সে আপনাকে সমর্পণ করিয়া সেই মাধুর্যের স্রোতে পুনরায় ভাসিয়া গেল। আজ সুচরিতা তাহার নিকট কেবল একটি ভাব-মূর্তি নহে, একটি জীবন্ত সত্তা।

জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া গোরা সুচরিতার গৃহে ঘন ঘন

যাতায়াত সুরু করিল। গোরার প্রাণ এমনি করিয়া তাহার মনকে ভুলাইয়াছে। তাহার প্রেম যে এমনি ভাবে তাহাকে সুচরিতার প্রতি আকর্ষণ করিয়াছে তাহা সে আত্মবিস্মৃত হইয়া বুঝিতে পারে নাই।

গোরা সুচরিতার নিকট হিন্দুধর্মের মহিমা সম্পর্কে কত কথা বলিয়াছে; সেই সঙ্গে একথাও বলিয়াছে, তাহার দেশ সেবা সার্থক হইবে না, যদি না সুচরিতা তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়। গোরা দেশের মূর্ত সাধক, দেশের দিক হইতে সে তাই সুচরিতাকে আহবান করিয়াছে।

গোরা সেদিন সুচরিতাকে বলিয়াছে, "তোমাকে দেখে অবধি একটি নূতন কথা দিনরাত্রি আমার মাথায় ঘুরছে। এতদিন সে কথা আমি ভাবিনি। কেবলই আমার মনে হচ্ছে—কেবল পুরুষের দৃষ্টিতেই তো ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ হবেন না। আমাদের মেয়েদের চোখের সামনে যেদিন আবির্ভূত হবেন সেই দিনই তার প্রকাশ পূর্ণ হবে। তোমার সঙ্গে এক সঙ্গে একদৃষ্টিতে আমি আমার দেশকে সম্মুখে দেখব এই একটি আকাঙ্ক্ষা যেন আমাকে দগ্ধ করছে। আমার ভারতবর্ষের জন্য আমি পুরুষ তো কেবলমাত্র খেটে মরতে পারি—কিন্তু তুমি না হলে প্রদীপ জেবলে তাকে বরণ করবে কে? ভারতবর্ষের সেবা সুন্দর হবে না, তুমি যদি তাঁর কাছ থেকে দূরে থাক।"

ঔপন্যাসিক লিখিতেছেন—"গোরা সুচরিতার মুখের দিকে চাহিল। সেই দৃষ্টির সম্মুখে সুচরিতা তাহার অশ্রু বিগলিত দুই চক্ষু নত করিল না। চিন্তাবিহীন শিশির মণ্ডিত ফুলের মতো তাহা নিতান্ত আত্মবিস্মৃত ভাবে গোরার মুখের দিকে ফুটিয়া রহিল।

সুচরিতার এই সঙ্কোচবিহীন সংশয়বিহীন অশ্রুধারা প্লাবিত দুই চক্ষুর সম্মুখে, ভূমিকম্পে পাথরের রাজপ্রাসাদ যেমন টলে তেমনি করিয়া গোরার সমস্ত প্রকৃতি যেন টলিতে লাগিল। গোরা প্রাণপণ বলে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইবার জন্য মুখ ফিরাইয়া জানলার বাহিরের দিকে চাহিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। গলির রেখা সংকীর্ণ হইয়া যেখানে বড়ো রাস্তায় পড়িয়াছে সেখানে খোলা আকাশে কালো পাথরের মতো অন্ধকারের উপর তারা দেখা যাইতেছে। সেই আকাশ খণ্ড, সেই ক'টি তারা গোরার মনকে আজ কোথায় বহন করিয়া লইয়া গেল—সংসারের সমস্ত দাবি হইতে, এই অভ্যস্ত পৃথিবীর প্রতিদিনের সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি হইতে কত দূরে!**কর্মরত কলিকাতার পথে গাড়িঘোড়া ও পথিকের চলাচল এই মুহূর্তে গোরার চক্ষে ছায়াছবির মত বস্তুহীন হইয়া গেল—নগরের কোলাহল কিছুই তাহার কাছে আর পৌঁছিল না। নিজের হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল—সেও ওই আকাশের মতো নিস্তব্ধ, নিভৃত, অন্ধকার এবং সেখানে জলে-ভরা দুইটি সরল

সকরুণ চক্ষু নিমেষ হারাইয়া যেন অনাদি কাল হইতে অনন্ত কালের দিকে তাকাইয়া আছে।"

এই মোহের ঘোরে গোরা পরপরই কয়েকদিন সুচরিতার বাসায় গেল। হরিমোহিনীর কথায় সে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। না এ পথ তাহার জন্য নয়। এই বন্ধন তাহাকে ছিন্ন করিতেই হইবে। অন্যদিকে গোরার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আয়োজন চলিতেছে। নির্ধারিত দিনে পণ্ডিত মণ্ডলীর মাঝখানে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গোরা সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিবে। সেদিন হইতে সে হইবে ভারতবর্ষের তাপস। গোরা ভারতবর্ষের প্রকৃত পরিচয় লাভের জন্য প্রতিদিন সহরের বাহিরে নিকটবর্তী গ্রামে চলিয়া যাইত। সেখানে সে ভারতবর্ষের যে পরিচয় পাইল তাহা তাহার স্বপ্নের ভারতবর্ষ হইতে কত দূরে! সেখানে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বিচিত্র কুসংস্কার জাতিভেদের ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত শিথিল সমস্ত সমাজ—সেখানে আশা ও আশ্রয় করিবার মত সে কিছুই দেখিতে পাইল না। তবুও গোরা আপনার ভাবমূর্তিকে জড়াইয়া ধরিল। অজ্ঞানতা ঘুচিয়াও ঘুচিতে চায় না। গোরার মনের বল ছিল অসাধারণ। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সে তরুণ তাপস হইতে চাহিল। গোরার যে মনোবল এমনি করিয়া সে প্রেমকে নিঃসংশয়ে দলিত করিয়া আপনার জীবনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দিতে পারিত। প্রায়শ্চিত্ত সুরু হইবে এমন সময় সংবাদ আসিল যে কৃষ্ণদয়াল বাবু অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। মৃত্যুপথ যাত্রী কৃষ্ণদয়াল বাবুর নিকট শুনিল যে গোরা তাহার সন্তান নহে। সে একজন আইরিশ ম্যানের পুত্র। আনন্দময়ী তাহাকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছে।

এই আঘাতে গোরার মন হইতে সমস্ত বাধা দূরীভূত হইয়া গেল। আজ সে হিন্দু নহে, ভারতবর্ষীয় হইয়া সকলের সহিত একত্রে মিলিত হইতে পারিয়াছে।

পরেশ বাবু পরিণামে যে ধর্মে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা হিন্দুর ধর্ম নহে, ব্রাহ্মধর্মও নহে। সকল সীমিত ও খণ্ডিত ধর্মের বাহিরে আসিয়া তিনি এক 'নব ধর্মে' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। গোরা পরেশবাবুর নিকটে সেই ধর্মে দীক্ষিত হইতে চাহিয়াছে। সুচরিতার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে এখন আর তাহার কোন বাধা নাই।

কৃষ্ণদয়াল ও পরেশ

কৃষ্ণদয়াল ও পরেশ শৈশব হইতেই উভয়ে ছিলেন সহপাঠী। যৌবনে উভয়েই হিন্দু আচার ও সংস্কার প্রভৃতি কিছুই মানিতেন না। ধর্ম সম্পর্কে উভয়েরই মনে কোন জিজ্ঞাসা ছিল না।

যৌবনের কৃষ্ণদয়াল বাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাই তাঁহার স্ত্রী আনন্দময়ীর মুখে। তাহা হইতে জানিতে পারা যায় সাহেবী অফিসে তিনি চাকরি করিতেন। সেই সূত্রে সাহেবদের সহিত মেলামেশা তাঁহাকে করিতে হইত। সেই সূত্রে তিনি স্ত্রীকেও মেলামেশায় যোগ দিতে উৎসাহিত করিতেন। তাহাতে সাহেবদের সমাজে তাঁহার একটু বিশেষ খাতির ছিল। স্ত্রীর প্রত্যেকটি সংস্কার একটি একটি করিয়া নির্মূল করিয়াছিলেন। তাহার ফলে গোরাকে আপন পরিবারে গ্রহণ করিতে কৃষ্ণদয়াল বাবুর কোন আপত্তি হয় নাই। গোরাকে আপনার পুত্র বলিয়া তিনি সমাজে পরিচয় দেন। গোরা কিছুটা বড় হইলে তিনি তাহার গলায় উপবীত পরাইয়া দেন। কৃষ্ণদয়াল বাবুর পুত্র বলিয়া গোরার এই পরিচয় হয়ত স্থায়ী হইয়া যাইত। কেউ কিছু জানিতে পারিত না।

বৃদ্ধবয়সে তাঁহার এই মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্তন হয়। তাঁহার ইতিপূর্বের জীবনকে যে ত্যাগ করেন তাহার পশ্চাতে কোন গভীরতর জীবন জিজ্ঞাসা, কোন গভীর অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা যে ছিল না তাহা নিশ্চিত। তিনি হিন্দু শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতে সুরু করেন। মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া তিনি এই পন্থা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পূর্ব জীবনের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দ্বিগুণ উৎসাহে হিন্দু সংস্কার ও আচার পালন করিতে সুরু করেন। এই সমস্ত কিছুর পশ্চাতে তাঁহার জীবনে গভীর কোন মননশীলতা ও আত্ম-বিশ্লেষণ ছিল না। সংস্কার ভাঙ্গেন যেমন অন্ধভাবে, সংস্কার গ্রহণও করেন তেমনি অন্ধভাবে। তিনি সকল শ্রেণীর হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন! যে-কোন সম্প্রদায়ের যোগী দেখিলে তাঁহার নিকট হইতে যোগাভ্যাস শিক্ষা করিতেন।

তাঁহার জীবনে স্ত্রী ও পুত্রদের লইয়া সংসার একদিকে ছিল, অন্যদিকে তাঁহার ছিল সাধনাশ্রম। মুক্তির উপায় বলিয়া যে কেহ ধর্মের নামে তাঁহাকে যাহা কিছু শিক্ষা দিত—তিনি নির্বিচারে তাহা গ্রহণ করিতেন। অনশনে অর্ধাসনে, কৃচ্ছ্রসাধনার ভিতর দিয়া এবং অতিরিক্ত ভাবে আচার পালনের ফলে শরীর জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল; এবং যোগাভ্যাসের ফলে মাঝে মাঝে রক্ত বমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম তাঁহার জীবন ও সংসারকে সুন্দর করিতে পারে নাই। তাঁহার ধর্ম ছিল জীবন ও জগৎ ছাড়া একটি বিশেষ অনুভূতি।

ধর্মের অপর একদিকের প্রকাশ ঘটিয়াছে পরেশবাবুর মধ্যে। বস্তুতঃ ধর্ম বলিতে রবীন্দ্রনাথ যাহা বুঝিতেন, যাহা তাঁহার জীবনে সত্য ছিল তাহাকেই তিনি জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন পরেশবাবুর ভিতর দিয়া।

যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচার ত্যাগ করিয়া তিনি যখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ

করেন তখন তাঁহার মধ্যে কোন খামখেয়ালি ভাব ছিল না। তাঁহার মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের যে স্থির বোধ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকেই তিনি প্রত্যক্ষ করেন ব্রাহ্ম সমাজ ও ধর্মের মধ্যে। তিনি বোধ করিয়াছিলেন জীবনে ধর্মের প্রকাশ ঘটে সত্য ও ন্যায়বোধের ভিতর দিয়া। তিনি তাঁহার সমগ্র চেতনাকে অন্তরাবৃত্ত করিয়া নিয়ত ভুমার সহিত যোগমুক্ত হইয়া থাকিতেন। তাহার ভিতর দিয়া তিনি যে নির্দেশ পাইতেন সেই নির্দেশকে সাংসারিক জীবনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল কাজে প্রয়োগ করিয়া জীবন ও সংসারকে ফুলের মত সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন।

ন্যায় ও সত্যের জন্য তিনি সমাজের সহিত বিরোধিতাকে স্বীকার করিয়া লইতে দ্বিধা করিতেন না। এই জাতীয় সংঘাতের ভিতর দিয়া সমাজ ক্রমে উদারতা ও প্রসারতা লাভ করিয়া চলে। এই সত্যের আলোকে তিনি হিন্দু সমাজকে আঘাত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নি। তাঁহার এই ন্যায় ও সত্যের সহিত যখন ব্রাহ্ম সমাজের বিরোধিতা জাগিল তখন তিনি ব্রাহ্ম সমাজকেও ত্যাগ করিতে দ্বিধা করিলেন না। এইরূপে একের পর এক সীমিত বোধকে, অসামর্থ্যকে ছাড়াইয়া উঠিয়া তিনি পরম সত্য ও ন্যায়ের এক নির্বিশেষ সত্যকে গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ আপনার জীবনেও এই পথ পরিক্রমা করিয়াছেন। পরিণামে যে সত্যে তিনি অধিষ্ঠিত হইয়াছেন তাহাকেই তিনি বলিয়াছেন 'নব-ধর্ম'। সকল সম্প্রদায়ের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া একদিন বিশ্বের সকল মানুষ এই নবধর্মকে আশ্রয় করিতে সমর্থ হইবে। গোরা তাই তাহার গুরু খুঁজিয়া পাইয়াছেন পরেশবাবুর মধ্যে।

চতুরঙ্গ

১

চতুরঙ্গের মধ্যে কয়েকটি নারী ও পুরুষের অধ্যাত্ম সংগ্রামের যে আশ্চর্য প্রকাশ আছে তাহাতে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়। সাহিত্য পাঠে এই বিস্ময়বোধ ও মুগ্ধতাই সবচেয়ে বড় কথা। এই ব্যথা বিহ্বলতা মনুষ্য-চেতনাকে জাগ্রত করিয়া কোন্ দূর জ্যোতি-সমুদ্র তীরে লইয়া যায়,—যেখানে অন্তহীন রূপ-লোক বুদ্বুদের মত ভাসিয়া উঠিয়া আবার মিলিয়া যাইতেছে। —সেখানে অপার বেদনা ও অনন্ত করুণা। এক মিনতি মাখান অতি করুণ আহ্বান ধ্বনি বিসৃষ্টির চিত্র-কুহর হইতে উত্থিত হইয়া ঊর্ধ্বে মহাশূন্যে মিলিয়া যাইতেছে। এক অপার্থিব আলোক রেখা হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া সমস্ত কিছুকে ইঙ্গিতময়, আভাসময়, রূপময় করিয়া তুলে।

সর্বাগ্রে শ্রীবিলাসের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে ঔপন্যাসিকের জীবন সাক্ষাৎকারের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীটিই তাঁহার জীবন-দর্শন। এই দার্শনিক ভিত্তি-ভূমির উপর দাঁড়াইয়া তিনি জীবনের সকল লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

"জীবনের পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হাতে বেদনার যে জাল বোনা হইতে থাকে তার নক্‌শা কোনো শাস্ত্রের নয়, ফর্মাশের নয়—তাই তো ভিতরে বাহিরে বেমানান হইয়া এত ঘা খাইতে হয়, এত কান্না ফাটিয়া পড়ে।"

দুটি শক্তির পারস্পরিক সংযোগ ও সংঘাতের ভিতর দিয়া আমাদের জীবনের ধীর বিকাশ ঘটিতেছে। একটি শক্তি নিগূঢ়, আমাদের বুদ্ধি ও বোধ বহির্ভূত। আমাদের সচেতন মনের অতীত কোন সত্তায় ইহার মূল নিহিত। মনুষ্য অজ্ঞাত কোন এক নিয়মে সে তাহার এই জীবন গড়িয়া তুলিবার কার্যে ব্যাপৃত। জীবন রচনার আর একটি শক্তি বাহিরের, তাহা প্রত্যক্ষ গোচর। ইহার সকল গতিবিধি কার্য-কারণ শৃঙ্খলা আমরা পর্যালোচনা করিতে পারি। ইহা আমাদের সেই ইচ্ছা শক্তি যাহা ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও নীতিবোধ দিয়া গড়িয়া তোলা। সামাজিক ও শাস্ত্রীয় নানা সংস্কারও জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে এই বোধ গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করে।

জগমোহন কেমন করিয়া নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছিল তাহার কোন পূর্ব পরিচয় আমরা উপন্যাস কাহিনীর মধ্যে লাভ করি না। ইহা সেই চিরন্তন মহাপ্রাণের রহস্য যে প্রাণ সকল যুগে চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া

বসে, যে আপনার নিয়তি আপনি সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়। বাহিরের একটি প্রেরণা অবশ্য থাকে কিন্তু তাহা গৌণ, মুখ্য প্রেরণা আসে প্রাণের গভীরতম রহস্য লোক হইতে।

সামাজিক সহস্র বন্ধন, বিচিত্র অর্থহীন সংস্কার, কেবল বাধা, বিধি-নিষেধ ও মিথ্যাচার যে জগমোহনের মুক্ত মনকে নিপীড়িত করিত তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। মন যত উদার, ব্যাপ্ত ও গভীর হয় সামাজিক মিথ্যাচার তত তীব্রভাবে অনুভূত হয়। জগমোহনের মুক্ত আত্মা পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গমের মত সামাজিক মিথ্যাচারের লৌহ গরাদে ডানা ঝাপটাইয়া আপনাকে আপনি ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে।

প্রকৃত ধর্ম বলিতে যাহা বুঝায় এ সমাজে জগমোহন তাহার কোন পরিচয়ই লাভ করে নাই। ধর্মের নামে মানুষ কতকগুলি প্রথা, আচার ও আচরণকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে। এই সমস্ত প্রথা, আচার ও আচরণের সহিত তাহাদের প্রাণেরও যোগ নাই। তাহাদের জীবন একদিকে এক নিয়মে বহিয়া চলিয়াছে; অন্যদিকে এই সমস্ত সংস্কার, আচার-আচরণ, ধর্ম-বিশ্বাস কেবল ভার স্বরূপ হইয়া জীবনের সহিত সংলগ্ন হইয়া আছে। এই ভার লাঘব করিতে তাহারা আবার নানা মিথ্যাচারের আশ্রয় লইতেছে।

জগমোহন তাই চেষ্টা করিয়াছে মানুষের অন্তর হইতে ধর্মের 'জড়'-টাকে পর্যন্ত উপড়াইয়া দিতে। জগমোহন লক্ষ্য করিয়াছে কেবল এই বোধটিকে আশ্রয় করিয়া মানুষের মনের মধ্যে যত মিথ্যাচার বাসা বাঁধিবার সুযোগ পায় অন্যত্র ততখানি পায় না। জগমোহন নিজের জীবনে যেমন অন্য সকলের জীবনেও তেমনি এই বাসা ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে।

জগমোহনের জীবন-দর্শনের মূল কথা হইল অন্তর ও বাহিরের সর্ববিধ বাধা দূর করিয়া দেওয়া, লৌকিক ও অলৌকিক কোন শক্তির নিকট মাথা না নত করা, কেবল আপন চিত্তের পরিশুদ্ধতা ও মনোবলের উপর নির্ভর করা, সামাজিক সকল সুযোগ সুবিধা সকল মানুষের নিকট আনিয়া দেওয়া।

জগমোহন মানুষকে সম্পূর্ণ রূপে যুক্তি ও বিচার বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। মন ও বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত মানবীয় আর কোন সত্তায় জগমোহনের বিশ্বাস ছিল না।

এখন জগমোহনের ধর্মবোধ বলিব না, নৈতিক বোধের (যাহাকে ইংরেজিতে বলে Character) সামান্য পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। নৈতিক বোধ বলিতে এক্ষেত্রে মোটামুটি সেই বোধটির কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছি যে বোধ আশ্রয় করিয়া মানুষ তাহার জাগতিক সকল কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে।

জগমোহন মুসলমান চামারদের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া

আহারের আয়োজন করিতেছে এই সংবাদ পাইয়া হরিমোহন জাতি, কুল নাশের ভয়ে, সামাজিক মর্যাদা হারাইবার আশঙ্কায়, সর্বোপরি ধর্ম ভ্রষ্টতার ভয়ে জগমোহনকে এই কার্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। উত্তরে জগমোহন শুধু বলিয়াছে, ''দেবতাকে দেখিবার চোখ যদি তোমার অন্ধ না হইত তবে তুমি খুশি হইতে।''

নাস্তিক বলিয়া জগমোহনের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করিয়া হরিমোহন সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করিয়া লইলে জগমোহনের বন্ধুরা অনেকে তাহাকে উচ্চ আদালতে নালিশ করিবার পরামর্শ দিল। পরামর্শ শুনিয়া জগমোহন বলিল,

"যে ঠাকুরকে আমি মানি না তাহাকেও আমি ফাঁকি দিতে পারিব না। দেবতাকে মানিবার মতো বুদ্ধি যাহাদের, দেবতাকে বঞ্চনা করিবার মত ধর্ম্মবুদ্ধিও তাহাদেরই।"

শচীশের সহিত ননীবালার বিবাহ না দিবার জন্য হরিমোহন জগমোহনকে কাতর অনুরোধ করিয়াছে। হরিমোহনের স্থির বিশ্বাস যে জগমোহন মোকর্দমায় হারিয়া এইরূপে প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিতেছে। অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়া তাই সে পরিশেষে দেবোত্তর সম্পত্তির অর্দ্ধেক ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। প্রস্তাব শুনিয়া ধিক্কারের সহিত জগমোহন বলিয়াছে, ''আমি রাগের শোধও লই না, অনুগ্রহের ভিক্ষাও লই না।''

চিরাচরিত সংস্কার, নীতি ও ধর্মবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে কোন ক্ষতি হয় না যদি সত্য লাভের সুগভীর আকাঙ্ক্ষা থাকে। এই জাতীয় নাস্তিক্য বস্তুতঃ গভীরতর সত্য লাভে মানুষকে সহায়তা করে। এই জাতীয় সর্ব সংস্কার মুক্ত অন্তরে ঊর্ধ্বতর বোধের প্রকাশ কোথাও প্রচলিত বোধের এতদূর বিরুদ্ধ হয় যে আপাত দৃষ্টিতে তাহা নীতিহীন বলিয়া বোধ হয়। প্রচলিত নীতিবোধকে আশ্রয় করিয়া তাহা গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া বস্তুতঃ তাহা নীতিহীন হয় না। তাহা আমাদের জীবন-জিজ্ঞাসার দ্বারকে আরও উন্মুক্ত আরও উদার করিয়া দেয়, আমাদের উপলব্ধির জগৎকে বিরাটতর করিয়া তুলে।

প্রচলিত নৈতিক বোধকে আশ্রয় করিয়া ঊর্ধ্বতর বোধের প্রকাশ কোথাও অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে বিপদও অনেক। কারণ নিম্নতর চেতন জগতে এই উপলব্ধির দোহাই দিয়া নানা মিথ্যাচার এমনকি অতি হীন আচার আচরণও সত্যের স্থান অধিকার করিয়া বসে। উপলব্ধি ব্যক্তির নিজস্ব সাধন ফল। উপলব্ধি বঞ্চিত হইয়া এই সমস্ত আচার আচরণ পরবর্তীকালের মানুষের জীবনে কেবল পাষাণভার চাপাইয়া দেয়।

যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম তাহা এই যে জগমোহনের যে নৈতিক বোধ তাহা গভীরতর এক ধর্মবোধ ও সত্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ; তাহা প্রচলিত ধর্মবোধ ও নীতিবোধ না হইতে পারে। হরিমোহনের জীবনে ইহার ক্ষীণতম আভাসও ছিল না বলিয়া সে জগমোহনের কোন যুক্তি তর্ক বুঝিতে পারে না। তাহার নিকট এই সমস্ত কিছু অনাসৃষ্টি অনাচার বলিয়া বোধ হয়।

জগমোহন তথাকথিত ধর্ম ও ঈশ্বর মানে না, কিন্তু যে বোধাশ্রয়ী হইয়া সে তাহার সমগ্র নৈতিক জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে ঈশ্বরীয় বোধ তাহা ব্যতিরিক্ত আর কিছু নহে।

তিনটি প্রসঙ্গে তাহার যে তিনটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই উক্তি তিনটির মধ্যে ইহার পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে। যে বোধে মুসলমান চামার দেবতা হইয়া উঠে, যে বোধে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক যে-কোন ফল লাভের প্রত্যাশা না করিয়া দরিদ্র মানুষের সেবায় মানুষ আপনার প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেয়, মরিয়া পশ্চাতে কোন ক্ষোভ রাখিয়া যায় না, যে বোধে মানুষ পতিতাকে মাতৃ সম্বোধন করিতে পারে, তাহাকে মাতার ও কন্যার পূর্ণ মর্যাদা দান করিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করে না, যে বোধে পুত্রাধিক প্রিয় শচীশকে একজন পতিতার সহিত বিবাহ দিতে প্রস্তুত হয়, যে বোধে মানুষ সকল প্রলোভন সকল ভয় জয় করিয়া উঠে আমাদের সেই বোধটিকে কেবল উপলব্ধি করিতে হইবে। যথার্থ ঈশ্বরীয় বোধ এই বোধেরই আরও উন্নত আরও ব্যাপ্ত পরিণাম হইতে পারে কিন্তু বিপ্রকৃতিক নহে।

সামাজিক ত্রুটি দুর্বলতা ও মিথ্যাচারের একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে। এই সমস্ত মিথ্যাচার মুক্ত করিয়া সমাজকে পূর্ণ জ্ঞান ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সেই কারণটিকে অনুসন্ধান করিয়া তাহার নিরাকরণ করা প্রয়োজন। বাহির হইতে সংস্কারের চেষ্টা না করিয়া বাহির হইতে আঘাত না করিয়া জাতির হৃদয়ের সেই বোধটিকে আশ্রয় করিতে হইবে, যাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারিলে জাতির জীবনে সমগ্র উন্নততর বোধের বিকাশ ঘটে। ইহার জন্য সুদীর্ঘ কালের নিরলস ত্যাগ ও সেবার প্রয়োজন। জগমোহন জাতির সেই হৃদয়-লোকটির সন্ধান পায় নাই, কিংবা সন্ধান করিতে চায় নাই। তাহার এই অসামর্থ্য কিংবা উপলব্ধির অসম্পূর্ণতার কারণ কিন্তু তাহার জীবন-বোধ ও উপলব্ধির অগভীরতা নয়।

এই শ্রেণীর মানুষের হৃদয়বোধ অত্যন্ত গভীর বলিয়া সামাজিক ব্যভিচার তাহাদের এতদূর বিচলিত করে যে তাহারা এই সমস্ত ব্যথা বেদনার উপর একেবারে ঝাঁপাইয়া না পড়িয়া পারে না। তাহাদের জীবনে তাই গভীরতর

চিন্তা ও ধ্যান তন্ময়তার অবসর থাকে না। তাহাদের সামর্থ্যের মূলে যেমন তাহাদের অসামর্থ্যের মূলেও তেমনি এই একই হৃদয়বোধ।

জগমোহন জীবনের সকল সমস্যার বিচার করিয়া দেখিত কেবল বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়া। সে বিচারের মানদণ্ড হইল "প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখ সাধন"। ন্যায় ও অন্যায়, কর্তব্য ও অকর্তব্য সমস্ত কিছু সে এই একমাত্র মানদণ্ড দিয়া বিচার করিত। কিন্তু হৃদয়বোধে একজন মানুষ যে বিশ্বের সকল মানুষ অপেক্ষা বড় হইতে পারে জগমোহন তাহা জানিত না, কিংবা জানিলেও অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিত।

আপন সন্তান অপেক্ষাও প্রিয় শচীশকে বিদায় দিয়া সেদিন জগমোহন শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার কত দীর্ঘকালের সঙ্গী, তাহার কত সুখ দুঃখের আনন্দ বেদনার অংশভাগী, তাহার সকল সাধনার সহচর ছিল শচীশ। শচীশ চলিয়া যাইতে জগমোহনের হৃদয় তাই মুহূর্তে শূন্য হইয়া গেল। নির্জন গৃহে শূন্য হৃদয়ে জগমোহন দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল। ঔপন্যাসিক জগমোহনের এই মানসিক অবস্থার উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন,

"হায় রে, প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখ সাধন। মানুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের পরিমাপ যে খাটে না। মাথা গণনায় যে মানুষটি কেবল এক, হৃদয়ের মধ্যে সে যে সকল গণনার অতীত। শচীশকে কি এক দুই তিনের কোঠায় ফেলা যায়? সে যে জগমোহনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সমস্ত জগৎকে অসীমতায় ছাইয়া ফেলিল।"

মনুষ্য সত্তা মন ও বুদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মন ও বুদ্ধির সীমা ছাড়াইয়া তাহা অনন্ত বিস্তৃত। কেবল মন ও বুদ্ধি দিয়া আমরা তাই সমগ্র সত্তার বিচার করিতে পারি না। সেই সীমাহীন লোকটিকে অস্বীকার করিতে চাহিলে কি হইবে, মাঝে মাঝে জীবনে তাহার এমন প্রকাশ ঘটে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ আপনি বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া যায়, কারণ মন ও বুদ্ধি দিয়া তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না। এই ঘটনাগুলি যেন এক একটি ছিদ্রপথ যাহার ভিতর দিয়া মন ও বুদ্ধির অতীত সীমাহীন লোকের আভাস মুহূর্তের জন্য ফুটিয়া উঠে।

জগমোহনের জীবনে এমন কত মুহূর্ত আসিয়াছে যখন তাহার মানবিক বোধটাই অনুভূতির তীব্রতায় মুহূর্তে সীমার সকল বোধ ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই সকল মুহূর্তে যুক্তি বিচার স্তম্ভিত হইয়া যায়। জগমোহন স্বয়ং এই উপলব্ধি সম্পর্কে সচেতন। তবে এই উপলব্ধির জগৎ সম্পর্কে তাহার কোন কৌতূহল নাই। আবার এই জগৎকে অস্বীকার করিবার প্রাণপণ চেষ্টাও তাহার নাই।

শচীশ জগমোহনের নিকট ননীবালাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিতে জগমোহন তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। ধারায় ধারায় তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ঔপন্যাসিক লিখিতেছেন,—"এমন অশ্রুপাত তাঁহার বয়সে আর কখনো তিনি করেন নাই।"

জগমোহন শচীশের মধ্যে সেই অতি দুর্লভ একটি মহাপ্রাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাহার আত্মার ফলকে জগমোহন আপনার আত্মাকেও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। আপনার আত্মাকেই জগমোহন শচীশের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া অমন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। এমন এক একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা মুহূর্তে মানুষ আপন আত্মাকে আপনি প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়া যায়।

ননীবালার আশীর্বাদ প্রার্থনার উত্তরে জগমোহন বলিয়াছে,

"—আমি আশীর্ব্বাদে সিকি পয়সা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমার ওই মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।"

জগমোহন ননীবালার মধ্যে সেই নিয়ত নীরব ত্যাগ, করুণা ও সেবা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, যাহার মধ্য দিয়া মানুষ বিশ্বের অনন্ত প্রেম ও করুণা, অনন্ত ত্যাগ ও সেবার আভাস লাভ করিয়া ধন্য হইয়া যায়। ইহা কোন যুক্তি বিচার নয়, সম্পূর্ণ উপলব্ধির সামগ্রী। ইহা তাই অনিবার্যভাবে মানুষের স্বীকৃতি আদায় করিয়া লয়। প্রেম ও করুণা, সেবা ও ত্যাগের এই আনন্ত্যের বোধটাই চূড়ান্ত আস্তিক্য বোধ। জগমোহন এই বোধের নিকট মাথা নত না করিয়া পারে নাই।

২

এক একটি মানুষ সম্পূর্ণ মুক্ত মন লইয়া জন্মগ্রহণ করে। বাহিরের কোন বাধা, কোন বন্ধন, কোন যুক্তি, কোন তর্ক তাহাদের মনকে মুহূর্তের জন্যও আচ্ছন্ন করিতে পারে না। মুক্ত প্রাণের এই স্বরূপ যে কী তাহা যাহার নাই, সে তো বুঝিবেই না, যাহার আছে সেও ইহার স্বরূপ বোঝে না। সে কেবল বোধ করে এক অজ্ঞাত কোন শক্তি তাহার সকল প্রয়াস নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, তাহারই কোন গূঢ় ইচ্ছা তাহার জীবনে চরিতার্থ হইয়া উঠিতে চায়। সেই অমোঘ ইচ্ছার বিরুদ্ধে অঙ্গুলিমাত্র উত্থাপনেরও শক্তি তাহার নাই।

শচীশ যেমন তাহার জ্যাঠামশায়ের নিকট হইতে, তেমনি কলেজের ইংরেজ অধ্যাপকদের নিকট হইতে পাঠ গ্রহণ করিয়া অল্প বয়সেই পাশ্চাত্ত্য দর্শন-বিজ্ঞানে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করে। বিশেষ করিয়া বেন্থাম-মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের মানবহিতৈষণামূলক বিচিত্র নাস্তিক্য দর্শন তাহার মনের উপর গভীর ছাপ রাখিয়া যায়।

শচীশ অন্তরের মধ্যে এই বয়সে যতটুকু ক্ষুধা বোধ করিয়াছে, জীবন ও জগৎসম্পর্কে ইতিমধ্যে সে যে সমস্ত জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইয়াছে, এই জীবন-দর্শন তাহা সম্পূর্ণ রূপে পরিতৃপ্ত করিয়া দিতে পারিয়াছে, তাহার সকল সমস্যার সমাধান-লাভ ইহার মধ্যে ঘটিয়াছে।

দার্শনিক উপলব্ধির মধ্যে বৈচিত্র্য যতই থাক-না-কেন, সাধনামাত্রেরই একটি সামান্য ধর্ম হইল শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা শচীশের মধ্যে ছিল। এই জাতীয় জীবন-দর্শনে যখন সে বিশ্বাস করিয়াছে, তখন সে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস করিয়াছে, তাহার মধ্যে সংশয়ের লেশমাত্র রাখে নাই। কোন জীবন-বোধকে মানুষ যখন এমনি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস করে, তখন সে তাহাকে তাহার জীবনের চতুর্দিকে নানা সৃষ্টি-কর্মে রূপায়িত না করিয়া পারে না। আইডিয়ার সহিত শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের যোগে সৃষ্টি-প্রেরণার জন্ম।

জ্যাঠামশায়ের সহিত শচীশ এতদিন তাহাই করিয়াছে। এই বোধে তাহার নিকট যাহা অন্যায় বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহাকে সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, যাহা ন্যায় বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহার জন্য সে যে-কোন দুঃখ স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করে নাই।—পার্থিব ও অপার্থিব কোন প্রলোভনে সে প্রলুব্ধ হয় নাই, কোন ভয়ে ভীত হয় নাই। শচীশ চূড়ান্ত মানসিক বলের পরিচয় দিয়াছে ননীবালাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া। একটি নিরপরাধিনী নারী সমাজে সর্বত্র লাঞ্ছিত, অপমানিত, ধিক্কৃত অথচ যে তাহাকে পথের ধুলায় নামাইয়াছে, সে সমাজের উচ্চ মর্যাদায় আসীন। সমাজ তাহার জন্য কিছুমাত্র শাস্তির ব্যবস্থা করে নাই। তাহার সকল শাস্তি উদ্যত বিভীষিকার মত, এই এক অবলা নারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাইয়া বেড়াইতেছে। ইহ-সংসারে তাহার কোথাও কোন আশ্রয় নাই। এই নারীর নিপীড়িত ভাগ্যের জন্য তাহার নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দায়ী। তাহার পিতা তাহার এই পাপ কার্যে প্রশ্রয় দিয়াছে। ননীবালাকে বিবাহ করিলে যে কতদূর সামাজিক দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইবে, সে সম্পর্কে শচীশ সচেতন। ননীবালার এই লাঞ্ছনাকে আত্ম-অপরাধ বোধ করিয়া শচীশ তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। পিতার অভিযোগ ও অভিশাপের উত্তরে শচীশ স্থির কণ্ঠে শুধু বলিয়াছে, "কুলের কলঙ্ক মুছিবার জন্যই আমার এই চেষ্টা, নহিলে বিবাহ করিবার শখ আমার নাই।"

পুরন্দর ও হরিমোহন ভাবিয়া লইয়াছিল যে, মোহে পড়িয়া প্রবৃত্তির তাড়নায় এবং বিশেষ করিয়া জগমোহনের চক্রান্তে শচীশ এই পাপকর্মে লিপ্ত হইতে চলিয়াছে। মানুষমাত্রেই আপন স্বভাবের অনুকূল করিয়া অন্যের ক্রিয়া-কলাপ বিচার করে। পুরন্দর ও হরিমোহনের ক্ষেত্রে তাহার ব্যত্যয়

হয় নাই। যে হৃদয়বোধ, যে করুণা, যে আদর্শ প্রেরণায় শচীশ ননীবালাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা পুরন্দর-হরিমোহনের উপলব্ধি বহির্ভূত সামগ্রী। তাহা এক ভিন্নতর বোধের জগৎ।

জগমোহন আকস্মিক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। জগমোহনের মৃত্যুতে শচীশের হৃদয় শূন্য হইয়া গেল। একমাত্র জ্যাঠামশায়কে আশ্রয় করিয়া শচীশের ভাব-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। শচীশ তাহার জীবনে যাহা কিছু পাইয়াছিল, তাহা জ্যাঠামশায়ের ভিতর দিয়া, যাহা কিছু দিয়াছিল, তাহাও জ্যাঠামশায়ের ভিতর দিয়া।

যে জ্যাঠামশায় তাহার জীবনে এতদূর সত্য ছিল, মৃত্যুতে তাহা এমনি মিথ্যা হইয়া গেল? জীবনে যাহা এমন সত্য, এত গভীর, এত প্রত্যক্ষ মৃত্যুতে তাহা কি এমনি শূন্য হইয়া যায়? তবে তো এই জীবন ও জগৎ নিরতিশয় নিষ্ঠুর, বৃহৎ বঞ্চনা।

"সেই অসহ্য যন্ত্রনার দায়ে শচীশ কেবলই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, শূন্য এত শূন্য কখনোই হইতে পারে না; সত্য নাই এমন ভয়ঙ্কর ফাঁকা কোথাও নাই; একভাবে যাহা 'না' আর একভাবে তাহা যদি 'হাঁ' না হয়, তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।"

এমনি করিয়া মানুষের জীবনে অধ্যাত্মবোধের প্রথম প্রকাশ ঘটে। জীবনের একটা পরিণাম পর্যন্ত না পৌঁছাইলে এই বোধের বিকাশ ঘটে না। শচীশের জীবনের প্রথম পর্যায়ের যে অনুভূতি তাহাকে মানুষের নৈতিক বোধের বিকাশ বলা যাইতে পারে। জীবনকে কেবলমাত্র জীবনের স্বরূপে গ্রহণ করিলে, জীবনাতীত আর যে-কোন বোধকে অস্বীকার করিলে, জীবনকে অদৃষ্ট কোন মহাসত্তার আংশিক প্রকাশ বলিয়া বোধ না হইলে, এই জাতীয় নৈতিক বোধ মানুষের সকল ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিতে পারে, সকল জিজ্ঞাসার উত্তর দান করিতে পারে। মন ও বুদ্ধি দিয়া গড়িয়া তোলা দর্শন জীবনের সমগ্রতা যতদূর বোধ করিতে পারে, শচীশ ততদূরই বোধ করিয়াছে।

জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর ভিতর দিয়া শচীশ গভীরতর জীবন-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইয়াছে। সে ওই জীবন-দর্শনের মধ্যে ইহার কোন উত্তর খুঁজিয়া পায় নাই। অধ্যাত্মবোধ আদৌ জীবনাতীত এক প্রেরণার অনুভূতি, অ-দৃষ্ট এক জগতের আভাস।

শচীশ তাহার এই সাধনার অসম্পূর্ণতা বোধ করিয়া মুহূর্তে উহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এই সমস্ত পুরুষ ভালোবাসে একমাত্র সত্যকে। মিথ্যা বা অপূর্ণতা বোধ করিলে তাহারা তাই যে-কোন ভাব-জীবনকে

নির্মমভাবে পরিহার করে। তাহাদের অন্তরে নিত্য যে আগুন জ্বলিতেছে তাহাতে আর সকল বোধ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়।

লীলানন্দ স্বামীর পরিচয় লাভের পূর্বে শচীশ তাহার অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার উত্তর লাভের জন্য আস্তিক্য ও নাস্তিক্য নানা দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিয়া একাকী যে বহু দীর্ঘ বিনিদ্র রাত্রি কাটাইয়াছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু পরিশেষে শচীশ এই চেষ্টা পরিহার করিয়াছে। সে তাহার চূড়ান্ত জ্ঞান যুক্তি ও বিচার প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছে যে, মানুষ কেবল বুদ্ধির সহায়তায় এই জীবনের সম্পূর্ণ অর্থ লাভ করিতে পারে না। বুদ্ধির সীমা ছাড়াইয়া এই জীবনের সীমাহীন প্রসার।

এইকালে লীলানন্দ স্বামীর সহিত তাহার সাক্ষাৎকার। এখানে আর এক ভিন্নতর জগতের সহিত তাহার পরিচয়। এ জগতে পথ চলিতে জ্ঞান ও বুদ্ধির দীপটিকে সম্পূর্ণরূপে নিভাইয়া দিতে হয়। ইহা যে ঊর্ধ্বতর চেতনালাভের জন্য মানবিক বোধকে ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা, তাহাও নহে। জ্ঞান ও বুদ্ধি ছাড়া মানুষের আর একটি যে প্রধান বৃত্তি, একটি প্রবল প্রেরণা, অর্থাৎ তাহার ইমোশন বা ভাবের দিক, একমাত্র তাহারই অনুশীলন ও চর্চা।

এই সাধনার স্বরূপ ঔপন্যাসিক যেমন বুঝিয়াছেন এবং বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন (ইহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনরূপ যুক্তি উপস্থাপিত করা নিষ্প্রয়োজন) আমি তাহারই পরিচায়ক কয়েকটি অংশ কেবল উদ্ধৃত করিতেছি।

শচীশ শ্রীবিলাসকে বলিয়াছে, "জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়াছিলেন, তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে। দিনের বেলাকার সে মুক্তি তো ভোগ করিয়াছি, এমন রাতের বেলাকার এ মুক্তিই বা ছাড়ি কেন?***

"সে ছিল ডাঙার উপরকার মুক্তি, তখন কাজের ক্ষেত্রে জ্যাঠামশায় হাত পা'-কে সচল করিয়া দিয়াছিলেন। আর এ যে রসের সমুদ্র, এখানে নৌকার বাঁধনই যে মুক্তির রাস্তা। তাই তো গুরু আমাকে এমন করিয়া চারিদিক হইতে সেবার মধ্যে আটকাইয়া ধরিয়াছেন।"

শ্রীবিলাস শচীশের এই সাধনা-সম্পর্কে অন্যত্র মন্তব্য করিয়াছে কতকটা পরিহাসের ছলে।

"শচীশ যে মুল্লুকে বাস করে সেখানে ঘটনা বলিয়া কোনো উপসর্গই নাই; সেখানে হ্লাদিনী ও সন্ধিনী ও যোগমায়া যাহা ঘটাইতেছে সে একটা নিত্য

লীলা, সুতরাং তাহা ঐতিহাসিক নহে—সেখানকার চির যমুনাতীরের চির ধীর সমীরের বাঁশি যারা শুনিতেছে তারা যে. আশ-পাশের অনিত্য ব্যাপার চোখে কিছু দেখে বা কানে শোনে হঠাৎ তাহা মনে হয় না।"

শচীশ জগৎ ও জীবনের যে পূর্ণ সত্য লাভ করিতে চায়, তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি, এবং সেইসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি, যে, শচীশ তাহার চূড়ান্ত জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সেই সত্যলাভে অসমর্থ হইয়াই এই পথ পরিহার করিয়াছে। শচীশ বুঝিয়াছে একমাত্র জ্ঞান ও বুদ্ধির সহায়তায় এ জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্থ লাভ অসম্ভব। শচীশ লীলানন্দ স্বামীর সাধনার মধ্যে একটি ভিন্নতর পথের ইঙ্গিত লাভ করিয়াছে। এই সাধনায় ওই জ্ঞান ও বুদ্ধিটাকেই মূলে অস্বীকার করা হইয়াছে।

এ সাধনা মানুষকে এক রস-লোকে মুক্তি দেয়! এ সাধনা মানুষকে বহির্জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন করিয়া জগৎ ও জীবনের ঘটনাবলীর ঊর্ধ্বে একটি ভাব-জগতে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। এখানে দেশ নাই, তাই ঐতিহাসিক কোন বোধও নাই, তাহা এক শাশ্বত লীলাস্থল। সেখানে পরম পুরুষ আপনারই হলাদিনী শক্তি পরমা নারীর সহিত মাধুর্যের নিত্য লীলা করিয়া চলিয়াছেন। সেখানে প্রেম-তরঙ্গে যমুনা উজান হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। সেখানকার ধীর সমীরণে নিত্যকাল ধরিয়া তাঁহারই বাঁশরীর সুর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সেখানে চির বসন্ত। সেখানে মানুষের শোক নাই, দুঃখ নাই, দুর্দশা ও দৈন্য নাই। তাহা পার্থিব সকল মালিন্যমুক্ত।

এই সাধনা জগৎ ও জীবনের বিচিত্র সমস্যাকে স্বীকার করিয়া নয়, তাহাদের অস্বীকার করিয়া এমন একটি ভাব-লোক লাভ করিতে চাহিয়াছে, যাহাতে ওই জাতীয় কোন সমস্যাই আর থাকে না।

এই সাধনার অসামর্থ্যও ঔপন্যাসিক যেভাবে বুঝাইয়াছেন, আমরা কেবল সেই ভাবেই বুঝিতে পারি। এই সাধনার অসম্পূর্ণতা ও অসামর্থ্য বোধ করিয়া শচীশ পরিণামে এই পথ পরিহার করিয়াছে। শচীশ শ্রীবিলাসকে একদিন এই কথাই বলিয়াছে,

"একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম। দেখিলাম, সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর একদিন রসের উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই। বুদ্ধিও আমার নিজের, রসও যে তাই। নিজের উপরে নিজে দাঁড়ানো চলে না।"

লীলানন্দ স্বামীর নিকট শচীশ যে সাধনার মন্ত্র লইয়াছিল, তাহা বস্তুতঃ মানুষের আর সমস্ত দিককে উপেক্ষা করিয়া কেবল তাহার ভাব-বৃত্তিকে ক্রমাগত স্ফীত করিয়া তাহাকেই নিয়ত উত্তেজিত করিয়া তাহারই মধ্যে ডুবিয়া

থাকা। এই সাধনায় 'তলা' অর্থাৎ উপলব্ধির জগৎ বলিয়া কিছু নাই। মানুষের অন্যান্য সমস্ত বৃত্তিকে অস্বীকার করিয়া কেবলমাত্র ভাব-বৃত্তি চর্চায় মানুষ অস্বভাবী হইয়া পড়ে। এই অস্বভাবী মানুষ পারে না, এমন কাজ নাই। এই বিকৃতি যে কতদূর যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ নবীনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাহার একটি মাত্র পরিচয় দিয়াছেন।

এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া দামিনী শচীশকে বলিয়াছে,

"তোমরা দিন-রাত রস রস করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। সে যে কী সে তো আজ দেখিলে, তার না আছে ধর্ম্ম, না আছে কর্ম্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান, তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই। এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্ব্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ?......তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চালাইতেছেন, সে পথে ধৈর্য্য নাই, বীর্য্য নাই, শান্তি নাই।"

জীবন ও জগতের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ইহা নয়, ইহা এই সমস্যাকেই একটা উপায় লুপ্ত করিয়া দিতে চাহিয়াছে। ইহা তাই আদৌ কোন সমাধান নহে। শচীশ এমন একটি সত্যের সন্ধান লাভ করিতে চাহিয়াছে, যাহা লাভ করিলে এই জগৎও জীবনের সকল সমস্যার সমাধান লাভ ঘটে। তাহা এই জগৎ ও জীবনকেই সম্পূর্ণ ও সুন্দর করিয়া তুলিবার সাধনা। জগৎ ও জীবনের সেই সম্পূর্ণতা সাধনের মধ্যে মানুষের পূর্ণতা। এই পূর্ণতাই মানুষের মুক্তি।

শচীশ পরিশেষে এমন একটি চেতনা লাভ করিতে চাহিয়াছে, যাহা লাভ করিতে মানুষকে মানবিক বোধের সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। জীবনের প্রসার যদি মানবিক বোধকে ছাড়াইয়া অনন্ত বিস্তৃত হয়, তবে সেই সামগ্রিক জীবনের উপলব্ধি মানবিক বোধের ঊর্ধ্বে উঠিয়াই লাভ করা সম্ভব। শচীশ তাই লীলানন্দ স্বামীর সাধন পথ পরিহার করিয়াছে।

শচীশ তাহার এই সাধনার অসম্পূর্ণতা বোধ করিয়াছে একদিন নবীনের একটি মাত্র ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া নয়। তাহার এই সাধনার সামর্থ্য সম্পর্কে সংশয় দামিনীই ধীরে ধীরে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। সর্বশেষ মোহটুকু নবীনের নিষ্ঠুর আচরণের রূঢ় আঘাতে নিঃশেষে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শচীশের জীবনের এই পর্যায়ের ধীর পরিণতি তাই লক্ষণীয়।

শচীশ তাহার জীবনকে সত্য লাভের দ্বারা মূল্যবান করিয়া তুলিতে চায়। শচীশ জানে কোন সাধনাকে শ্রদ্ধার সহিত সম্পূর্ণরূপে স্বীকার না করিয়া লইলে, জীবনে তাহার ফললাভ অসম্ভব। লীলানন্দ স্বামীর সাধনাকে তাই

সে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। লীলানন্দ স্বামীর সাধনায় যুক্তি, বিচার, চিন্তা, পর্যন্তকে সে দলিত করিয়াছে। তাহার ফলে ওই সাধনার বিশিষ্ট ফল শচীশ অত্যল্পকালের মধ্যেই লাভ করিয়াছে। বাহিরে কত ঘটনার আবর্ত তুলিয়া জীবনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাহা শচীশের ধ্যান-তন্ময়তায় কিছুমাত্র বিঘ্ন সৃষ্টি করে নাই। তাহার নিকট নির্জন পল্লী এবং জনবহুল নগরী এক হইয়া গিয়াছে।

এমন ধ্যান-তন্ময়তায় শচীশের দিনরাত্রি কাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু বিপরীতমুখী একটা প্রেরণা আসিয়া তাহার ওই ধ্যান-তন্ময়তাকে মাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে লাগিল। সে প্রেরণা আসিয়াছে দামিনীর দিক হইতে।

দামিনীর প্রকৃতি বা স্বভাব লীলানন্দ স্বামীর সাধন-পন্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সাধনার মধ্যে সে কিছুমাত্র সান্ত্বনা তো পায়ই নাই, বরং ইহাকে সে মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু বলিয়া বোধ করিতে পারে নাই। ইহার বিরুদ্ধে সে তাহার সামান্য নারী শক্তি দিয়া যত রকম ভাবে পারিয়াছে বিদ্রোহ করিয়াছে। এই মানসিক অবস্থার কালে দামিনীর সহিত শচীশের প্রথম পরিচয়।

দামিনী প্রথম দিন হইতেই শচীশকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। গতানুগতিক বিপুল জীবন-প্রবাহের মাঝখানে ক্বচিৎ এমন দুই একটি পুরুষের সাক্ষাৎ মেলে। তাহারা যেন মর্তের কেহ নহে, কোন্ দূর গ্রহলোক হইতে খসিয়া পড়া একটি দুর্লভ সত্তা। তাহাদের স্থির দৃষ্টিতে তাহারই আভাস, হৃদয়ে তাহারই স্মৃতির সঞ্চয়। এই অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়া যাইতে দামিনীর বিদ্রোহী, বিশুষ্ক, বিক্ষুব্ধ মন অত্যন্ত দ্রুত শান্ত হইয়া গেল। দামিনীর অন্তরের মাধুর্য ও কল্যাণ, সেবা ও ত্যাগ সমগ্র সাধন সংঘটির উপর মাধুর্য বিকীর্ণ করিয়া দিল। দামিনীর এই পরিবর্তন সকলে দেখিল, দেখিয়া মুগ্ধ হইল, কিন্তু কেহ ইহার কারণ উপলব্ধি করিতে পারিল না, কিংবা করিতে চাহিল না। সাধন সঙ্ঘের মধ্যে একমাত্র শ্রীবিলাসের চোখ কান খোলা ছিল। তাই তাহার নিকট ইহার প্রকৃত কারণ অগোচর ছিল না। শ্রীবিলাস বুঝিয়াছিল ইহা নারী-চিত্তের সেই অনুভূতি, যাহার স্পর্শে নারীর সমগ্র সত্তা আমূল পরিবর্তিত হইয়া যায়, নারী ত্যাগে ও সেবায় আপনাকে একেবারে নিঃশেষ করিয়া দিতে চায়। শচীশকে ভালবাসিয়া দামিনী আজ শান্ত মধুর। শ্রীবিলাশ দামিনীর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছে,

"বিদ্রোহের কর্কশ আবরণটা কোন্ ভোরের আলোতে নিঃশব্দে একেবারে চৌচির হইয়া ফাটিয়া গেল, আত্মোৎসর্গের ফুলটি উপরের দিকে শিশিরভরা মুখটি তুলিয়া ধরিল। দামিনীর সেবা এখন এমন সহজে এমন সুন্দর হইয়া

উঠিল যে, তার মাধুর্যে ভক্তদের সাধনার উপরে ভক্ত-বৎসলের যেন বিশেষ একটি বর আসিয়া পৌঁছাইল।" কিন্তু "শচীশ কেবল শোভাই দেখিল, দামিনীকে দেখিল না।"

অন্তরের সকল মাধুর্যকে কুসুমের মত ফুটাইয়া তুলিয়া দামিনী যাহার পূজায় অর্ঘ সাজাইয়া দিয়াছে, তাহার নিকট ইহার কোন মূল্য নাই। দামিনীর প্রেম আপনাকে আপনি সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতে পারে না। সে প্রেম প্রেমাস্পদের স্বীকৃতি চায়। দামিনী তাই আপনাকে নিঃশেষ করিয়া ত্যাগ করিবার আকাঙ্ক্ষার ভারে কিছুদিনের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই অসহনীয় বেদনাভার সে আর কতদিন কেমন করিয়া বহন করিবে। দামিনীর অন্তরে এই নিঃসহায়তা বোধ যে কী রূপ তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল, ঔপন্যাসিক তাহার সামান্য একটি ইঙ্গিত দিয়াছেন মাত্র। যে মানসিক অবস্থায় দামিনীর পক্ষে নিশীথ অভিসার সম্ভব হইয়াছিল, ইহা তাহারই পূর্বাবস্থা।

"একদিন দুপুরে কী একটা প্রয়োজনে শচীশ দামিনীর ঘরে ঢুকিতে গিয়া দ্বারের বাহিরে বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শচীশ দেখিল, "দামিনী তার চুল এলাইয়া দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেঝের উপর মাথা ঠুকিতেছে এবং বলিতেছে, পাথর, ওগো পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, দয়া করো, আমাকে মারিয়া ফেলো।"

নারী চিত্তের এই ব্যাকুলতা যে কী, কোন বোধে মৃত্যুও এমন আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠে, শচীশ তাহা বোঝে না। শচীশ নারীর এই জগৎ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ শুধু নয়, তাহার প্রকৃতি, তাহার মানস-গঠন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই আত্মপীড়নে শচীশ তাই ভীত হইয়া নিঃশব্দে সরিয়া আসিয়াছে। ইহা তাহার নিকট অতিশয় নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হইয়াছে।

দামিনীর প্রেম স্বাভাবিক উপায়ে চরিতার্থতা লাভের সুযোগ না পাইয়া শেষে বিকৃত পথ অবলম্বন করিয়াছে। ইহাতে পুরুষ ও নারী উভয়েই ধর্ম-ভ্রষ্ট হয়। যে মানসিক অবস্থায় নারী এই স্খলিত জীবনকে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হয়, সেই অবস্থায় সে উন্নততর যে-কোন জীবন-বোধ সম্পর্কে সাময়িক ভাবে সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু দামিনীর অভিসার কেবল নিন্দিত ও ধিকৃত হইয়াছে। সে রাত্রে দামিনী কেবল অসম্মান ও লজ্জার বোঝা মাথায় করিয়া গোপনে ফিরিয়া আসিয়াছে।

দামিনীর মত নারীর ত্যাগ ও সেবা সুন্দর হইয়া উঠে—একমাত্র প্রেমে। ওই প্রেম চারতার্থ হইবার পথ না পাওয়ায় দামিনীর সেবা-সুন্দর মূর্তিও অন্তর্হিত হইয়াছে। ওই সাধনাকে দামিনী আবার পূর্বের ন্যায় নানাভাবে

উপেক্ষা করিতে সুরু করিয়া দিল। দামিনী আশ্রমের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে লাগিল, তাহা আর যাইহোক—লীলানন্দ স্বামীর ভাব-সাধনা ও রস-চর্চার অনুকূল নয়।

দামিনীর এই বিদ্রোহী মনোভাব সম্পর্কে আবার সকলে সচেতন হইয়াছে,—লীলানন্দ স্বামী, শ্রীবিলাস, এমন কি শচীশও। বহির্জীবন সম্পর্কে শচীশ ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। গুহা হইতে ফিরিবার পর হইতে শ্রীবিলাস শচীশের মধ্যে স্পষ্ট একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছে। আজকাল শচীশ বহির্জীবন সম্পর্কে চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া থাকিতে পারে না। শচীশের জীবনে একটা কিছু যে ঘটিয়াছে, তাহা শ্রীবিলাস বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহা যে কী, তাহা সে জানে না।

শচীশের মধ্যে এই পরিবর্তনের কারণ, দুটি। প্রথমতঃ, দামিনীর সাহচর্যে তাহাদের সাধনার উপর মাধুর্যের যে বর আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা এত সত্য যে, দামিনী সরিয়া যাইতে শচীশ তাহার অভাব বোধ না করিয়া পারে নাই। হঠাৎ শচীশ একটা শূন্যতা বোধ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় কারণ, তাহার গুহাবাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সেইদিন হইতে কী জানি কি এক বেদনা তাহার হৃদয়কে নিয়ত চাপিয়া ধরিয়াছে। সেই বেদনা তাহাকে আর সম্পূর্ণরূপে ধ্যান-তন্ময় হইতে দেয় না।

শচীশ ভাবিয়াছে দামিনীকে হয় তাহাদের সাধনার অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, নতুবা তাহাকে কোথাও দূরে পাঠাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই বিরুদ্ধ মন লইয়া দামিনী এখানে শান্তি পাইবে না; অথচ ইহাতে তাহাদের সাধনা দিনে দিনে দুরূহ হইয়া উঠিবে। শচীশ তাই প্রথমে দামিনীকে তাহাদের ভক্তমণ্ডলীর মাঝখানে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহা লইয়া শচীশ ও দামিনীর মধ্যে যে বাদানুবাদ হইয়া গেল, সেই অংশটি এ ক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

দামিনীকে সেদিন নির্জনে পাইয়া সুযোগ বুঝিয়া শচীশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,

"আজকাল তুমি ওখানে যাওয়া একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছ কেন?

*　　*　　*

"কেন আমাকে তোমাদের কিসের প্রয়োজন?

"প্রয়োজন আমাদের কিছুই নাই, কিন্তু তোমার তো প্রয়োজন আছে?

"দামিনী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, কিছু না, কিছু না।

"শচীশ স্তম্ভিত হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—দেখো, তোমার মন অশান্ত হইয়াছে, যদি শান্তি পাইতে চাও তবে—

"তোমরা আমাকে শান্তি দিবে? দিনরাত্রি মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলিয়া তুলিয়া পাগল হইয়া আছ, তোমাদের শান্তি কোথায়? জোড় হাত করি তোমাদের, রক্ষা করো আমাকে—আমি শান্তিতেই ছিলাম। আমি শান্তিতেই থাকিব।

"শচীশ বলিল, উপরে ঢেউ দেখিতেছ বটে, কিন্তু ধৈর্য ধরিয়া ভিতরে তলাইতে পারিলে দেখিবে, সেখানে সমস্ত শান্ত।

"দামিনী দুই হাত জোড় করিয়া বলিল, ওগো দোহাই তোমাদের, আর আমাকে তলাইতে বলিয়ো না। আমার আশা তোমরা ছাড়িয়া দিলে তবে আমি বাঁচিব।"

এই বাদানুবাদের ভিতর দিয়া দামিনীর বিদ্রোহী মনের পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি এই বিশিষ্ট সাধনা সম্পর্কে শচীশের নিষ্ঠা যে এখনও পর্যন্ত অটুট আছে, তাহাও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। শচীশ বহির্জীবন সম্পর্কে এখন কতকটা সচেতন, জীব-জীবনের বিচিত্র লীলা আজ তাহাকে যত ক্ষীণ-ভাবেই হোক-না-কেন আকর্ষণ করে, কিন্তু লীলানন্দ স্বামীর সাধনাসম্পর্কে আজও তাহার মধ্যে সংশয় জাগে নাই।

ইহার পর হইতে দামিনী শচীশকে সাধনভ্রষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই সাধনায় তাহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না, কিংবা ইহাকে সে এক প্রকার মিথ্যাচার বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়া, সে কিন্তু এই পথ বাছিয়া লয় নাই। পরবর্তী জীবনে দামিনীর মধ্যে এক উন্নততর বোধের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী জীবনে দামিনীর প্রেম সেই অত্যুচ্চ পরিণাম লাভ করিয়াছে; যে প্রেম স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া উঠে, প্রেমাস্পদকে মুক্তি দিয়া মুক্তি লাভ করে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দামিনী সেই পরিণাম লাভ করে নাই।

দামিনী শচীশকে সাধনচ্যুত করিতে চাহিয়াছে ব্যর্থ প্রেমের প্রতিশোধ লইবার জন্য। কাম প্রতিহত হইয়া এইরূপ ক্রোধে পরিণত হয়। যে সম্পদ লাভের আশায় শচীশ তাহার অমন প্রেমকে লাঞ্ছিত করিয়াছে, সে সম্পদ হইতে দামিনী তাহাকে বঞ্চিত করিবে!

দামিনী শচীশের অন্তরে ঈর্ষাবোধ জাগাইয়া তুলিতে শ্রীবিলাসকে প্রকাশ্যে তাহার নারীত্বের লোকে, তাহার তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রয়োজনের লোকে টানিয়া আনিয়াছে। দামিনীর দিক হইতে ইহা যে নিছক অভিনয় তাহা

শ্রীবিলাসও বোঝে। শ্রীবিলাস বোঝে তাহার এই সমস্ত স্নেহ-যত্ন আদর-আব্দারের উপলক্ষ্য একমাত্র শচীশ। ইহা তাহার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

দামিনীর এই সমস্ত চেষ্টার ফল শীঘ্রই ফলিয়াছে। জীবনের এই লীলাটিকে শচীশ কোন উপায়ে উপেক্ষা করিতে পারিল না। ইহার অনিবার্য আকর্ষণে শচীশ মাঝে মাঝে ধ্যানাসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিতে লাগিল। সেই লীলারূপটিকে শচীশ আপনার দুই চক্ষুর সম্মুখে একান্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পায়। ইহা এমনি সত্য যে, কোন তত্ত্ব দিয়া অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

শচীশের এই ধীর পরিবর্ত্তন দামিনী অনায়াসেই লক্ষ্য করিয়াছে; লক্ষ্য করিয়া বিজয়ের গৌরববোধ করিয়াছে। শ্রীবিলাস একদিন লক্ষ্য করিয়াছে, "শচীশ যে দিকে চলিয়া গেল, সেই দিকে তাকাইয়া তার চোখ দিয়া বিদ্যুৎ ঠিকরাইয়া পড়িল—সে মনে মনে কঠিন হাসি হাসিল।"

হায় পুরুষের দম্ভ! প্রকৃতি প্রতিকূল হইলে তাহার সকল দম্ভ কোথায় ভাসিয়া যায়। প্রকৃতিকে জয় করিতে হয় অনুকূল করিয়া, নহিলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া পুরুষের জয় লাভ অসম্ভব।

শচীশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে দামিনী তাহার এই প্রতিকূল মনোভাব লইয়া আশ্রমে থাকিলে তাহার পক্ষে মনঃসংযোগ অসম্ভব। তাহার পর সে কোন্ সর্বনাশের অতলে তলাইয়া যাইবে কে জানে।

এই সময় পুরুষের চিত্ত জয় এবং নারী সম্পর্কে শচীশ ও শ্রীবিলাসের মধ্যে যে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে শচীশের আশঙ্কা ও দম্ভ উভয়েরই প্রকাশ ঘটিয়াছে। তাহার আশঙ্কা দামিনীকে লইয়া, তাহার দম্ভ ওই নারীকে সে জয় করিয়া উঠিবেই। এই সংগ্রামে তাহার গুরু লীলানন্দ স্বামী তাহার সহায়।

দামিনীকে আশ্রম হইতে দূরে সরাইয়া দিবার যুক্তি শ্রীবিলাস কিন্তু মন দিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। এদিকে শচীশের আশঙ্কা দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। আজকাল সাধনায় তাহার মনঃসংযোগ হয় না; কীর্তনে নর্তনে ডুবিয়া থাকিয়াও তাহার অন্তরের মধ্যে কিসের যেন অভাববোধ জাগে।

উপায়ান্তর না দেখিয়া শচীশ স্বয়ং দামিনীকে আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছে। পরবর্তী জীবনে নবীনের মধ্যে যে মানবিক বোধের অভাব লক্ষ্য করিয়া দামিনী শিহরিয়া উঠিয়াছিল, যে নিষ্ঠুরতায় শচীশের মোহ পর্যন্ত ঘুচিয়া গিয়াছে, শচীশের এই অনুরোধ তাহারই একটা ভিন্ন প্রকার। মানুষ এমনি নির্দয়, এতদূর স্বার্থপর হইতে পারে! তাহাকে লইয়া

হৃদয়হীন, মানবিক বোধ পর্যন্ত শূন্য কতকগুলি পুরুষ আপনার ইচ্ছামত জীবন ভোর এমনি খেলা করিয়া চলিবে ? এই অসহায়তা বোধ করিয়া দামিনী অশ্রুবেগ নিরুদ্ধ করিতে পারে নাই, কান্নার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দামিনী কি সত্যই অসহায় বোধ করিয়া অমন করিয়া কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, না অমন করিয়া শচীশকে নারীর মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে। দামিনীর ক্ষেত্রে এই দুইই সত্য।

এই মানবিক বোধের কথাই আমাদের বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। যে সাধনায় এই মানবিক বোধকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে হয়, সে সাধনায় মানুষের কী প্রয়োজন। শচীশ স্বয়ং তাহার এই হৃদয়হীনতা সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে ; অথচ দামিনীকে এই আশ্রমের মধ্যে কেমন করিয়া যে স্থান দেওয়া যায় তাহাও শচীশ ভাবিয়া পায় না। দামিনীর বুক ফাটা কান্না তাহার অসহায়তা বোধ মানুষের প্রেম ও প্রীতি সম্পর্কে তাহাকে আজ এতটা সচেতন করিয়াছে, যাহার ফলে লীলানন্দ স্বামীর সাধনার মধ্যে সে আর আশ্রয় লাভ করিতে পারে নাই। তাহার ভাবের জগৎ এইরূপে সম্পূর্ণ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শ্রীবিলাস শচীশের এই মানসিক অবস্থার পরিচয় দিয়াছে।

"শচীশ আজকাল কেমন এক রকম হইয়া গেছে। যে ঘুড়ির লখ ছিঁড়িয়া গেছে, তারই মতো এখনও হাওয়ায় ভাসিতেছে বটে কিন্তু পাক খাইয়া পড়িল বলিয়া—আর দেরি নাই। জপে তপে অর্চ্চনায় আলোচনায় বাহিরের দিকে শচীশের কামাই নাই, কিন্তু চোখ দেখিলে বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে তাহার পা টলিতেছে।"

দামিনী যদি আশ্রম ত্যাগ করিয়া না যায়, তবে শচীশকেই আশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র কোথাও চলিয়া যাইতে হইবে। তাহার পূর্বে শচীশ একবার লীলানন্দ স্বামীকে অনুরোধ করিয়া দেখিতে চায়। দামিনী যদি তাহার কথায় সম্মত হয়। লীলানন্দ স্বামীও এই রকম একটা আশঙ্কা কয়েকদিন হইতে করিতেছিল। কিন্তু লীলানন্দ স্বামীর অনুরোধেও কোন ফল ফলিল না। দামিনীর সমস্যা সমস্যাই রহিয়া গেল। এমনি অবস্থায় আরও কিছুদিন কাটিল।

শচীশের সাধনায় শৈথিল্য দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। শচীশের এক এক সময় মনে হয় আর বুঝি সে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিবে না। এমন এক একটি মুহূর্ত আসিয়াছে, যখন সে দামিনীর প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করিয়াছে, আবার প্রাণপণ বলে আপনাকে সংযত করিয়াছে। ঔপন্যাসিক এমন দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার ভিতর দিয়া শচীশের হৃদয়লোকের অনেক দূর পর্যন্ত আমরা দৃষ্টিপাত

করিতে পারি। একদিন শ্রীবিলাস ও দামিনী কী একটা বিষয় লইয়া পরস্পর হাস্যালাপ করিতেছে, হঠাৎ শচীশ কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে বসিয়া গেল। শচীশের এই আচরণের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না। তিন জনেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর "শচীশ যেমন হঠাৎ আসিয়া বসিয়াছিল, তেমনি হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল।" ঘটনা অতি তুচ্ছ, কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া শচীশের অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা পরিমাপ করিতে পারা যায়।

একদিন শচীশ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইবার জন্য দম্ভ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই, আজ সেই প্রকৃতির চরণতলে তাহার সকল দম্ভ লুটাইয়া পড়িয়াছে। দামিনীও বুঝিয়াছে, তাহার প্রয়াস ব্যর্থ হয় নাই।

এই অসহনীয় মানসিক অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার জন্য শচীশ কিছুদিনের জন্য আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কোন নির্জন পরিবেশে সে তাহার মনটিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চায়।

শচীশ স্থির বুঝিয়াছে দামিনীর প্রতিকূল মনোভাব দূর না করিতে পারিলে, তাহার পক্ষে দামিনীকে জয় করিয়া উঠিবার কোন সম্ভাবনা নাই। শচীশ তাই আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া তাহার পূর্ব আচরণের জন্য দামিনীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে, দামিনীকে আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে বলিবার কোন অধিকার তাহার নাই, আর তাহাকে প্রসন্ন মন লইয়া তাহাদের সাধনার মাঝখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছে। দামিনীর মন আবার গলিয়াছে। কিন্তু দামিনী কেন যে তাহার মন হইতে সকল গ্লানি মুছিয়া দিয়া পুনরায় সাধন সঙ্গে যোগ দিল, তাহা বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন।

বিরোধিতা করিয়া শচীশের মনকে যতদূর নাড়া দেওয়া সম্ভব দামিনী এতদিন ধরিয়া তাহাই করিয়াছে। সাময়িক উত্তেজনায় দামিনী যে বিকৃত পথ অবলম্বন করুক না কেন, সে বস্তুতঃ শচীশকে তুচ্ছতার লোকে টানিয়া আনিতে চায় নাই। তাহার অন্তরের অন্তরে সে আকাঙ্ক্ষা ছিল না। সে শচীশকে কেবল লীলানন্দ স্বামীর সাধনা ও তাহার প্রভাব হইতে দূরে সরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল মাত্র।

শচীশের সহিত দীর্ঘকালের আচরণের ভিতর দিয়া দামিনী নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে যে, শচীশের নিকট নারী প্রেমের কোন মূল্য নাই। মর্তের কোন নারীকেই তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। সে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের মানুষ। তাহার সাধনা ও সাধনপথও সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে তাহার জীবনে কেবল দুঃখের বোঝা বাড়াইয়া লাভ কি, কী হইবে তাহার অন্তরের দাহ বাড়াইয়া।

দামিনী শচীশের মত পুরুষকে সাময়িক ধর্মভ্রষ্ট করিতে পারে, কিন্তু নারী প্রেমকে শচীশ কোন কালে স্বীকার করিয়া লইবে না।

লীলানন্দ স্বামীর সাধনার অসামর্থ্য শচীশ স্বয়ং বোধ করিতে সুরু করিয়াছে, একদিন তাহার এই মোহ সম্পূর্ণ রূপে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সেখানে দামিনীর পক্ষে অনুকূল মন লইয়া প্রতীক্ষায় থাকা ভাল। দামিনী তাহার আপন ভাগ্যকে মানিয়া লইয়াছে। শ্রীবিলাস দামিনীর এই অবস্থার পরিচয় দিয়া লিখিয়াছে,

"আর একবার দামিনী যখন এমনি করিয়াই নত হইয়াছিল, তখন শচীশ তার মধ্যে কেবল মাধুর্য্যকেই দেখিয়াছিল, মধুরকে দেখে নাই। এবারে স্বয়ং দামিনী তার কাছে এমনি সত্য হইয়া উঠিয়াছে যে গানের পদ, তত্ত্বের উপদেশ সমস্তকে ঠেলিয়া সে দেখা দেয়, কিছুতেই তাকে চাপা দেওয়া চলে না। শচীশ তাকে এতই স্পষ্ট দেখিতে পায় যে, তার ভাবের ঘোর ভাঙ্গিয়া যায়। এখন সে কোনোমতেই একটা ভাব-রসের রূপক মাত্র বলিয়া মনে করিতে পারে না। এখন দামিনী গানগুলিকে সাজায় না, গানগুলিই দামিনীকে সাজায়।"

দামিনী সম্পর্কে সচেতনতা তো বড়ো কথা নয়, এই সচেতনতার ভিতর দিয়া শচীশ বুঝিয়াছে, এই জীবন ও জগৎ কত সত্য। ইহাকে তাই কোন একটা উপায়ে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। পূর্ণতার সাধনায় এই জগৎ ও জীবন সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত। সে বোধ জগৎ ও জীবনকে আশ্রয় করিয়া জগৎ ও জীবনকে পূর্ণ করিয়া অসীমে উপচাইয়া পড়িতেছে। সে সাধনায় সীমা ও অসীম, রূপ ও অরূপ এক পূর্ণ সামছন্দে বিধৃত হইয়া আছে। সে সাধনা মানবিক বোধকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহারও ঊর্ধ্বতর চেতনা লাভ করিতে চায়।

শচীশের মধ্যে মোহের ক্ষীণ যতটুকু আবরণ ছিল, তাহা নবীনের হৃদয়হীন আচরণে সম্পূর্ণ রূপে উদ্ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

এমনি করিয়া মানবিক বোধের তল পর্যন্ত আলোড়ন করিয়া শচীশ দেখিয়াছে যে, এখানে মানুষ তাহার পূর্ণ সমাধান লাভ করিতে পারে না। এমনি করিয়া তল পর্যন্ত আলোড়ন করিয়া না দেখিলে পূর্ণ সংশয় মুক্তি ঘটে না। শচীশ তাহার জ্যাঠামশায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বুদ্ধি-বৃত্তি ও চিন্তাশীলতার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেখিয়াছে মানুষের ইহা শেষ আশ্রয়স্থল নয়। লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ভাব ও রসের গভীরতম তল পর্যন্ত লাভ করিয়া শচীশ দেখিয়াছে যে, এখানে জীবনের

সমাধান নাই। জীবনকে সামগ্রিক রূপে তাহার চরম অর্থে দেখিতে হইলে, জীবনের সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে হয়।

নৈতিক জীবন সম্পূর্ণ করিয়া, এতদিন পরে শচীশ যথার্থ অধ্যাত্ম-জীবন লাভ করিয়াছে। নৈতিক জীবনের সম্পূর্ণতা বলিতে আমি মানবিক বোধেরই পূর্ণ বিকাশ বুঝাইতে চাহিয়াছি। মানুষের জীবনে বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাব উভয়েরই স্থান আছে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন প্রয়োজন। এই সামঞ্জস্যসাধন করিয়াছে দামিনী। দামিনীর জন্য শচীশকে যে অধ্যাত্ম-সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, তাহারই ভিতর দিয়া তাহার প্রাণ, মন ও বুদ্ধি পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। মনুষ্য জীবনের এই পর্যায় পর্যন্ত নৈতিক পর্যায়। এই পর্যায় সম্পূর্ণ না হইলে, প্রকৃত অধ্যাত্ম পিপাসা জাগে না। কোথাও অধ্যাত্মবোধের সামান্য প্রকাশ দেখা গেলেও, নৈতিক বোধের অসম্পূর্ণতার জন্য জীবনে তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না। নৈতিকবোধের ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে, উন্নততর চেতনার অধ্যাত্ম অনুভূতি নিম্নতর চেতনা-লোকে নানা বিকৃত রূপ লইয়া প্রকাশ লাভ করে। তাহাতে জীবনে সুফল অপেক্ষা কুফল ফলে বেশি।

গুরুর প্রয়োজন কেবল এই নৈতিকবোধ গড়িয়া তুলিবার জন্য। যথার্থ গুরু ইহার ঊর্ধ্বতর চেতনালাভের সাধনায় শিষ্যকে পথ ছাড়িয়া দেন। এই পথে গুরু যদি তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব হইতে শিষ্যকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি না দেন, তবে শিষ্য যাহা পায় তাহা গুরুর বিশিষ্ট উপলব্ধিমাত্র। সে ধর্ম তাহার স্ব-ধর্মের ভিতর দিয়া আপনার ভাবে উপলব্ধ নয় বলিয়া, শিষ্যের জীবনে তাহা সত্য নয়, অর্থাৎ তাহা শিষ্যের জীবনকে বিচিত্র পথে সার্থক ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। শচীশ এই কথাই শ্রীবিলাসকে বুঝাইতে চাহিয়াছে।

"ওগো, এ তোমার ভূগোল বিবরণের সত্য নয়, আমার অন্তর্য্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন—গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ।

"........আজ আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ' কথাটার অর্থ কী। আর সব জিনিষকে পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম্ম যদি নিজের না হয়, তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টি ভিক্ষা নহেন ; যদি তাঁকে পাই তো, আমিই তাঁকে পাইব, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।"

যে সাধনা মানবিক বোধকেও ছাড়াইয়া উঠিতে চায়, তাহার পরিচয়দানের চেষ্টার কোন প্রশ্ন উঠে না। ঔপন্যাসিক স্বয়ং এই চেষ্টা পরিহার করিয়াছেন।

শ্রীবিলাস শচীশের এই সংগ্রামকে আপনার দুই চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাই তাহার দুই একটি উক্তি কেবল এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বাহিরের সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তা, কর্ম বা অ-কর্মের ভিতর দিয়া অন্তরের যতটুকু আভাস লাভ করা যায়, আমরা শচীশের অন্তর্জীবনের কেবল ততটুকু আভাস লাভ করিতে পারি। ইহা ছাড়া তাহার অন্তররাজ্যের, তাহার সমগ্র সত্তার আমূল রূপান্তরের কোন পরিচয় লাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব; কারণ, তাহার সমগ্র রীতি প্রকৃতিটাই অতি মানবিক।

"স্পষ্ট দেখিতেছি শচীশ জ্বলিতেছে, তার জীবনটা একদিক হইতে আর একদিক পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।"

"আর ভাব সম্ভোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।"

শচীশের বুদ্ধি স্থির, অন্তরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। অমর্ত্য-চেতনা লাভের জন্য তাহার সমগ্র সত্তা দীপ্ত হুতাশনের মত শিখা বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। যদি এই দেহ-প্রাণ-মন ভরিয়া মাটির এই পাত্র পূর্ণ করিয়া সেই অমৃত পান করিতে পারা যায় ভালই, তাহার জন্য এই আধার যদি জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

এই সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া শচীশ যে সত্যের আভাস লাভ করিয়াছে, তাহার পরিচয় লাভের জন্য শচীশের একটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"তিনি রূপ ভালোবাসেন, তাই কেবল রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে; আমরা বদ্ধ, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।

"………গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিণীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিণীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়। একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবে তো দুই পক্ষের মিল হয়। তিনি যে গাহিতেছেন, আর আমরা যে শুনিতেছি। তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।……এতদিন আমি তাঁকে আপনার মতো করিয়া বানাইতে গিয়া কেবল ঠকিলাম। ওগো আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চুরমার করিতে থাকিব চিরকাল ধরিয়া। বন্ধন আমার নয় বলিয়াই কোন বন্ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারি না, আর বন্ধন তোমারই বলিয়াই অনন্তকাল তুমি সৃষ্টির বাঁধন

ছাড়াইতে পারিলে না। থাকো আমার রূপ, লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম।"

দামিনী পরিণামে আপনার স্বার্থকে একান্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই বলিয়া এবং সেই সঙ্গে শচীশকেও কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়া, তাহাকে তুচ্ছতার মাঝখানে টানিয়া আনিতে পারে নাই। আবার আঘাতের ভিতর দিয়া বৃহত্তর জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল বলিয়া, দামিনী অমন করিয়া শচীশের মোহ ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে, কখন বিদ্রোহ করিয়া, কখন শুশ্রূষার মন লইয়া, কখন শ্রদ্ধায় আত্মসমর্পণ করিয়া, কখন প্রকাশ্য উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া। কিন্তু, তখনও পর্যন্ত দামিনীর বন্ধন-মুক্তি সম্পূর্ণরূপে ঘটে নাই। দামিনী বুঝিয়াছে, শচীশের জীবনে নারীর প্রেম ও মাধুর্যের কোন মূল্য নাই। মন বুঝিলে কী হইবে, দামিনীর প্রাণ তো ভোলে না। দামিনী শচীশের সঙ্গে থাকিতে চাহিয়াছে, তাহাকে সেবা ও যত্ন করিতে পারিবে বলিয়া। কিন্তু, তাহার এই আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে যে আরও এক আকাঙ্ক্ষা ছিল, সে সম্পর্কে দামিনীও সচেতন ছিল না।

প্রকৃতির মধ্যে এমন এক একটি মুহূর্ত ঘনাইয়া আসে, যখন মনের সমস্ত দ্বার খুলিয়া যায়, যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির অগোচর, তাহা তখন প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া পড়ে। অমনি এক ঝটিকাক্ষুব্ধ রজনীতে দামিনীর অন্তরের সেই গুহাশায়ী বাসনা বাহির হইয়া আসিয়া, তাহাকে শচীশের গৃহে একাকী ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। শচীশের সংশয় বেদনার আলোকে দামিনী সেদিন রাত্রে আপনার হৃদয় আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, প্রত্যক্ষ করিয়া হয়ত আপনি বিস্মিত হইয়াছে। দামিনীকে তাহার শয়নকক্ষে একাকী দেখিয়া শচীশ মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া, সেই দুর্যোগময়ী রজনীতে ঝড়জল, বজ্রপাত উপেক্ষা করিয়া, গৃহের বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে। দামিনী সেদিন রাত্রে অনেক খোঁজ করিয়া অনেক অনুরোধ করিয়া শচীশকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছে বটে, সেই সঙ্গে ইহাও নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে যে, শচীশ তাহার এই দুর্বলতাকে ক্ষমা করিবে না। গৃহে ফিরিয়া শচীশ দামিনীকে বলিয়াছে,

"যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার। আর কিছুতেই আমার দরকার নাই।—দামিনী তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।"

আসক্তির সর্বশেষ বন্ধন ছিন্ন করিয়া দামিনী ইহার পর হইতে বিচ্ছেদকে মানিয়া লইয়াছে।

উপন্যাসের মধ্যে দামিনীর যে সামান্য পূর্ব পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, দামিনীর স্বামীর কুল ছিল কিন্তু অর্থ ছিল না। দামিনীর ধনী পিতা কন্যাকে সুখী করিবার জন্য জামাতাকে একটি সুবৃহৎ গৃহ, প্রচুর অর্থ এবং সেই সঙ্গে কন্যাকে যথেষ্ট অলংকার দিয়াছিলেন। বিবাহের দুই এক বৎসরের মধ্যে দামিনীর স্বামী এক জ্যোতিষীর পরামর্শ লাভ করিয়া মুক্তি-লাভের আশায় সাধুসঙ্গ করিতে সুরু করিয়া দিল। সংসার কর্মে তাহার কিছুমাত্র মতি রহিল না। সাধু ও ভক্তদের সেবায় দামিনীর স্বামী সঞ্চিত অর্থসম্পদ যাহা কিছু ছিল, জলের মতো ব্যয় করিতে লাগিল। দামিনীর স্বামী মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও বিষয়-বৈরাগ্যকে কেবল আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিল না, দামিনীকেও দলে টানিতে লাগিল।

দামিনীর তখন ভরা যৌবন, ইহ সংসারের কোন আকাঙ্ক্ষাই তাহার মেটে নাই। তাহা ছাড়া দামিনীর প্রকৃতি এই জাতীয় সাধনপন্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার দেহ-প্রাণ-মন অত্যন্ত সুস্থ ও সমৃদ্ধ। এই জাতীয় মত্ত আবেগের মধ্যে তাই সে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিল না। দামিনী স্বামীর এই সাধনার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিয়াছে। অনুরোধে যখন ফল ফলিল না, তখন তাহার স্বামী তাহার উপর নানা অত্যাচার সুরু করিয়া দিল। সে তাহার পথ ও মতকেই একমাত্র সত্য বলিয়া জানে, জীবনের আর সমস্ত দিক, আর যে-কোন প্রেরণা, তাই তাহার নিকট মিথ্যাচার। দামিনীকে এই মায়া বা মোহ বন্ধন, এই বিষয়াসক্তি হইতে সে মুক্ত করিতে চায়। দামিনীর উপর যে কোন অত্যাচারকে তাই সে অত্যাচার বলিয়া বোধ করিতে পারে নাই।

দামিনীর প্রকৃতি, তাহার বয়স, তাহার অপরিতৃপ্ত সাধ এই সাধনার অনুকূল তো ছিলই না, ইহার উপর তাহার স্বামীর এই হৃদয়হীন আচরণ তাহার অন্তরের মধ্যে কোথাও এতটুকু লজ্জা ও সংকোচের স্থান পর্যন্ত রাখে নাই। তাহাকে নির্লজ্জের মত সকলের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে।

দামিনীর এই বিরুদ্ধ মনোভাব আরও বিরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, আরও একটি কারণে। তাহার স্বামী তাহারই পিতার দেওয়া ঐশ্বর্য, সম্পদ সাধু ও ভক্তদের সেবায় যখন অকাতরে ব্যয় করিতেছে, তখন তাহার বাবা, মা, ভাইরা অনাহারে দিনযাপন করিতেছে। যখন তাহাদের দিনান্তেও একবার অন্ন জুটিতেছে না, তখন তাহাকে নিজের হাতে প্রত্যহ ষাট সত্তর জন ভক্তের রান্না করিয়া দিতে হইয়াছে। পাছে দামিনী তাহাদের কিছুমাত্র আর্থিক সহায়তা করে, সেই জন্য তাহার স্বামী তাহার গহনার বাক্স জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়াছে।

দামিনীর অন্তরের সকল মাধুর্য এইরূপে কণ্টকে পরিণত হইয়াছে। দামিনী বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছে, ইহা কোন্ ধর্ম, যাহা মানুষকে এমন হৃদয়হীন করিয়া তোলে? যে ধর্মে মানুষের হৃদয়-বৃত্তি, তাহার স্নেহ, মায়া, মমতা, এমন কি সাধারণ মানবিকবোধ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়, সে ধর্মে মানুষের কী প্রয়োজন।

দামিনীর স্বামী দামিনীর এই বিদ্রোহী মনের পরিচয় পাইয়াছিল, তাই মৃত্যুর পূর্বে দামিনীকে শেষ মার দিয়া গেল। কলিকাতার বসতবাটী এবং অন্যান্য বিষয়-সম্পত্তির সঙ্গে দামিনীকে সে তাহার গুরুর হস্তে সমর্পণ করিয়া গেল। এমনি করিয়া দামিনীর স্বামী যতদিন বাঁচিয়াছে, ততদিন দামিনীকে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, উদয়াস্ত কর্মের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া, তাহার শরীর ও মনকে এতটুকু বিশ্রাম দেয় নাই। তাহার প্রাণ-মনের শক্তিকে এমনি করিয়া অকালে নিঃশেষিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে।

এত অত্যাচারেও দামিনীর প্রাণ মরে নাই, বসন্তের মত পরিপূর্ণ অফুরন্ত তাহার প্রাণ-সম্পদ। কিন্তু দামিনীকে বাধ্য হইয়া সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের মধ্যেই থাকিতে হইল, সন্ন্যাসীর সম্পূর্ণ বিপরীত মন লইয়া। তাহার ভাল লাগে এই জীবন ও জগতের সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্য, তাহার ভালো লাগে সুখ-দুঃখ, প্রেম-প্রীতি পরিপূর্ণ মানব সংসারের মাঝখানে থাকিতে। সংসারের সহস্র তুচ্ছতার মধ্যে সে কেবল মুক্তির আস্বাদ পায়। ইহাদের ত্যাগ করিয়া মানুষ যে কী পায়, তাহা দামিনী জানে না, বোঝেও না। এই জগতের মধ্যেই তাহার প্রাণ-মনের সকল ক্ষুধা মিটিয়া যায়। এই জগতের জন্য তাহার অন্তর নিয়ত অশ্রুমুখীন হইয়া থাকে।

দামিনী সম্পর্কে শচীশের এই মন্তব্য বড় যথার্থ ঃ—"সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবন রসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে।"

বস্তুতঃ, সন্ন্যাসী দলের মধ্যে দামিনীকে দেখিলে মনে হয়, কে যেন কৌতুক করিয়া বিশুষ্ক বিল্বপত্রের সহিত প্রস্ফুটিত রক্তগোলাপ বাঁধিয়া গিয়াছে। তাহা এমনি বিপরীতের মিলন।

এই মানসিক অবস্থার কালে দামিনীর সহিত শচীশের সাক্ষাৎ হইয়াছে। শচীশকে দেখিয়া দামিনীর প্রসুপ্ত বাসনা ধীরে মুকুলিত হইয়াছে। ইহা নারীর অন্তরের চিরন্তন সেই প্রেমের বোধ, যে বোধে নারী পুরুষের চরণতলে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া দিতে চায়। দামিনীর প্রেম আত্মগোপন করিতে জানে না, তাহা নিঃসংকোচ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিতে চায়। তাহার সমর্পণের মধ্যে কোথাও অগোচরতা ও কুণ্ঠা থাকিবে কেন?

দামিনীর মত নারী ত্যাগ করে প্রেমে। প্রেমের এই আস্বাদ না থাকিলে তাহার ত্যাগ মুহূর্তে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। ইহাই প্রবৃত্তি বা রূপের সাধনা। তাহার মধ্যে এই প্রেম ছিল না বলিয়া, দামিনীর স্বামী দামিনীর অন্তরে ভোগে নিস্পৃহতাবোধ জাগাইতে পারে নাই। দামিনী তাহার স্বামীকে কোনদিন ভালবাসিতে পারে নাই।

দামিনীর বিনম্র মাধুর্যে সকলে মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু কোন রহস্যে এই অসম্ভব সম্ভব হইল, কোন রহস্যে তাহার অন্তরের সকল কণ্টক মধু-পরিপূর্ণ পুষ্প-কোষে রূপান্তরিত হইয়া গেল, তাহা একমাত্র শ্রীবিলাস ছাড়া আর কেহ বুঝিতে পারে নাই।

দামিনীর প্রেমসম্পর্কে শচীশ সম্পূর্ণ উদাসীন, বস্তুতঃ ইহার কোন বোধ শচীশের ছিল না। দামিনী প্রতীক্ষার দীপ জ্বালাইয়া রহিল। বিশ্বাস, একদিন হয়ত তাহার ভাগ্য প্রসন্ন হইবে।

লীলানন্দ স্বামী পূর্বের ন্যায় এ বৎসরও ভজন-সাধন-আরাধনার জন্য নির্জন কোন স্থানে যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল, সঙ্গে শচীশ ও শ্রীবিলাসও যাইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। দামিনী ইহা শুনিয়া সঙ্গে যাইবার জন্য লীলানন্দ স্বামীকে অনুরোধ করিতে লাগিল। দামিনীর এই আচরণ লীলানন্দ স্বামীর নিকট সম্পূর্ণ অভাবিত। লীলানন্দ স্বামী পথের ক্লেশ এবং অনিশ্চিৎ জীবনযাপনের কথা তুলিয়া নানাভাবে দামিনীকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দামিনী কিছুতেই ছাড়িল না। দামিনী তাহাদের সঙ্গে যাইবেই, পথে যতই দুঃখ কষ্ট স্বীকার করিতে হোক-না-কেন। দামিনীর এই নিষ্ঠায় লীলানন্দ স্বামী মনে মনে খুশি হইল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে বিস্মিতও হইল। লীলানন্দ স্বামী ভাবিল,

"এ কী অলৌকিক কাণ্ড! ভগবানের রসের রসায়ণে পাথরকে নবনী করিয়া তোলে কেমন করিয়া।"

সন্ন্যাসী জানিত না যে, দামিনী একমাত্র শচীশের সঙ্গলাভের আশায়, এই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার প্রেমই তাহাকে ভোগবিমুখ, ঐহিক সুখবিমুখ করিয়াছে। ভক্তি ও ধর্মের অন্য যে কোন উন্নতবোধ হোক-না-কেন, দামিনীর জীবনে তাহা একমাত্র প্রেম আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হয়। ভক্তি তাহার প্রেমেরই একটি বিশিষ্ট পরিণাম। তাহা রূপকে আশ্রয় করিয়াই অরূপকে লাভ করিতে চায়। ওই রূপ না থাকিলে তাহার অরূপটাও মিথ্যা হইয়া যায়।

প্রতীক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া দামিনী শেষে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সে বুঝি আর তাহার হৃদয়ের ভার বহন করিতে পারে না।

একদিন শচীশ কী কারণে দামিনীর ঘরে ঢুকিতে গিয়া দেখিল, দামিনী মেঝেতে উপুড় হইয়া পড়িয়া সজোরে মাথা ঠুকিতেছে এবং কোন এক পাষাণ দেবতার নিকট অধীর হইয়া বারংবার মৃত্যু কামনা করিতেছে। আত্মনিপীড়নের এই দৃশ্যে শচীশ ভয় পাইয়া দ্রুত অন্যত্র চলিয়া গেল।

প্রেমে প্রাণের জাগরণ ঘটে। যে নারীর মধ্যে প্রাণের প্রকাশ যত বেশি, তাহার নিপীড়নও তাহাকে তত বেশি সহ্য করিতে হয়। প্রেম প্রতিহত হইলে অনিয়ন্ত্রিত প্রাণ-শক্তি নানা বিকৃত পথ অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

নারী অসামান্য মানসিক শক্তির অধিকারিণী না হইলে, প্রাণের এই আবেগকে ঊর্ধ্বায়িত করিতে পারে না। একটি শান্ত পরিণামের ভিতর গিয়া ধ্যান-লোকে প্রেম স্থির মহিমা লাভ করে। সেই অচঞ্চল ধ্যান-মূর্তির সহিত নারীর তখন নিত্য মিলন সাধিত হয়।

দামিনীর মধ্যে প্রাণ-শক্তি ছিল অফুরন্ত। প্রথম প্রেমের সঞ্চার তাহাকে তাই অমন অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। সে প্রেম স্বাভাবিক উপায়ে চরিতার্থ হইবার সুযোগ না পাইয়া, অমন অস্বাভাবিক পথ অবলম্বন করিয়াছে।

দামিনীর সে অভিসার কেবল পদাহত হইয়াছে। দামিনীর মানসিক বলের অভাব ছিল না। তাই, সে তাহার এই প্রাণের পীড়াকে সহনীয় করিয়া তুলিতে পারিয়াছে। দামিনী সেই দিন হইতে আপনাকে সংযত করিয়াছে। দামিনীর জীবনের একটা পর্যায় এইখানে সমাপ্ত হইয়াছে।

এই লাঞ্ছনায় দামিনীর স্বভাবের স্থূলতা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। দামিনীর প্রেম ইহাতে আরও পরিশুদ্ধ হইয়াছে। ইহার পর দামিনী বিরোধিতাই করুক অথবা আনুকূল্যই করুক, তাহা অনেকটা উন্নততর জগতের ক্রিয়াকলাপ। দামিনীর জীবনে আর একটি পর্যায়ে এই পরিশুদ্ধ প্রেম আরও উন্নত পরিণাম লাভ করিয়া শুদ্ধ ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহার প্রেমাস্পদ এইরূপে তাহার গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

দামিনী এখন শচীশকে লীলানন্দ স্বামীর মোহ পাশ হইতে মুক্ত করিতে চায়। দামিনী জানে, শচীশের অন্তরের আগুনকে বাহিরের কোন শক্তি নির্বাপিত করিতে পারিবে না। এই জাতীয় প্রেরণা নারীর স্বধর্মের কতকটা প্রতিকূল বলিয়া নারী তাহার স্বাভাবিক বোধশক্তির সহায়তায় সহজেই চিনিয়া লইতে পারে। লীলানন্দ স্বামীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব এ আগুনকে তাই অধিক কাল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারিবে না। তবে যত শীঘ্র এই মোহ ভাঙিয়া যায়, শচীশের পক্ষে ততই মঙ্গল। দামিনী সেই চেষ্টাই করিয়াছে।

প্রথমে, সে লীলানন্দ স্বামীর সাধকগোষ্ঠী হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে। ইহার জন্য আর কাহারও না-হোক শচীশের অন্তরে

কি কোন অভাবই জাগিবে না ? অযাচিতভাবে দামিনীর যে সেবা ও যে যত্ন তাহার যে ভক্তি, সে প্রাচুর্যের সহিত লাভ করিত, তাহার জন্য তাহার অন্তর কি কিছুমাত্র তৃষিতবোধ করিবে না ?

ভক্তমণ্ডলী হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া, দামিনী শ্রীবিলাসকে সঙ্গী করিয়া শচীশের সম্মুখেই নিত্য দিন এক একটি সৌন্দর্য ও মাধুর্যলোক উদ্ঘাটিত করিয়াছে,—যেন এক একটা সুগন্ধি পুষ্পের অর্ঘের থালি !

নন্দীদের বাড়ীর বিবাহে নাড়ু কুটিবার ফরমাস লওয়া, ভগ্নপক্ষ চিলের শুশ্রূষা করা, কুকুরের বাচ্চা পোষা, ফুলগাছ পরিচর্যা করা অথবা পোষা বেজীর তত্ত্বাবধান করা ইত্যাদি যাহাই হোক না কেন, এই সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়া প্রতিমুহূর্তে দামিনীর হৃদয় ফাটিয়া যে বোধের প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহারই নাম প্রেম। সংসারে মধ্যবর্তিনী হইয়া বধূর, গৃহিনীর, জননীর যে প্রেম গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া, তাহার চতুস্পার্শের সমস্ত কিছু—পশুপক্ষী বৃক্ষলতাদি পর্যন্ত, অভিসিক্ত করিয়া দিতে চায়। যে প্রেম স্বপ্নে সকল সমাজ-বন্ধন, নীতি-বন্ধনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া এক অতীন্দ্রিয় মাধুয-লোকের অনুসন্ধানে অনন্ত শূন্যে বিহার করিয়া ফিরে, ইহা সে প্রেম নহে। যে প্রেম সকল বন্ধনের মধ্যে আপনাকে বাঁধিয়া ওই বিচিত্র বন্ধনকেই অমৃতময় করিয়া তোলে দামিনীর মধ্যে নারীর সেই প্রেমেরই প্রকাশ। বধূর হস্তের শঙ্খ, বলয়, কঙ্কন, বন্ধনের সেই মুক্তি-রূপ।

পুরুষ যতই শক্তিমান হোক না কেন, এই মাধুর্যের প্রতি আকর্ষণ বোধ না করিয়া পারে না। শচীশও তাই এই জগৎসম্পর্কে উদাসীন থাকিতে পারে নাই। ইহার অনিবার্য আকর্ষণে শচীশকে মাঝে মাঝে ধ্যানের আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিতে হইয়াছে। ইহা সেই প্রাণ-শক্তির প্রেরণা, যে প্রেরণায় চিতার ভস্ম আবৃত করিয়া শ্যামল তৃণাস্তরণ বিকীর্ণ হইয়া যায়। যেখানে দামিনী ও শ্রীবিলাস নিভৃত আলাপ-আলোচনা বা সাংসারিক তুচ্ছ কোন কাজকর্মে ব্যাপৃত, ভাবতন্ময়তার মাঝখানেও শচীশের মন আজকাল সেখানে পড়িয়া থাকে।

এই জাতীয় রস-চর্চায় দামিনীর প্রাণের ক্ষুধা মেটে না বলিয়া কীর্তন-গানের আসর হইতে দামিনী উঠিয়া আসিয়াছিল। এই ভাব-চর্চা অপেক্ষা কোন প্রিয়জনের সঙ্গে সুখ দুঃখের, অতীত কত ব্যথা, মধুর স্মৃতিবিজড়িত আলাপ আলোচনা অনেক ভাল। দামিনীকে অনুসরণ করিয়া শ্রীবিলাসও আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছিল। নির্জন আশ্রমে শ্রীবিলাসকে একাকী সঙ্গী পাইয়া দামিনী তাহার অতীত কত দিনের কত কথাই না বলিয়া চলিতেছিল। হৃদয়বান

শ্রোতা পাইয়া দামিনী আপনার হৃদয় সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল। এই রূপে মানুষ মাঝে মাঝে তাহার হৃদয়ের বোঝা নামাইয়া দিয়া ভারমুক্ত বোধ করে।

এই মানসিক অবস্থার কালে দামিনীকে আশ্রয় ত্যাগ করিয়া দূরে কোথাও গিয়া থাকিবার জন্য শচীশের অনুরোধ তাহার সম্পূর্ণ হৃদয়ের উপর আকস্মিক দারুণ আঘাতের মত বাজিল। শচীশের এ আঘাত, এ অসম্মান দামিনীর একেবারে মর্মস্থল পর্যন্ত বিদ্ধ করিয়াছে।. দামিনীর সমস্ত রাত্রির অসহায় বুকফাটা কান্না যেন বিশ্বের মর্মস্থল হইতে উত্থিত হইয়া মহাশূন্যে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

দামিনী কিন্তু ভাঙিয়া পড়িল না। পুরুষের ব্যর্থ দম্ভকে পরাভূত করিবার জন্য প্রকৃতির হাতে যত প্রকার অস্ত্র আছে, দামিনী সেই সব অস্ত্র হয় গোপনে, নয় প্রকাশ্যে প্রয়োগ করিতে লাগিল। সমস্ত আশ্রম ভাঙিয়া পড়িবার মুখে। লীলানন্দ স্বামীর গাম্ভীর্যের আবরণ পর্যন্ত ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সকল শক্তি, অনুরোধ, আদেশ—সমস্ত কিছু ওই বালিকার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

শচীশ বুঝিয়াছে, এই অবস্থায় দীর্ঘকাল চলা অসম্ভব। শচীশ বুঝিয়াছে, দামিনীকে এমন করিয়া দূরে রাখিলে চলিবে না, তাহাকে যেমন করিয়া হোক, তাহাদের মাঝখানে টানিয়া লইতে হইবে। এমনি করিয়া, তাহার অশান্ত মনকে শান্ত করা প্রয়োজন। বৈরাগ্য সাধনার সঙ্গে শচীশ এমনি করিয়া মানবিকবোধের সামঞ্জস্য সাধন করিতে চাহিয়াছে। শচীশের কাতর অনুরোধ, দামিনী উপেক্ষা করিতে পারিল না। দামিনী আবার তাহাদের সাধনায় যোগ দিল।

শচীশের সহিত এতদিনের আচরণে দামিনী নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে যে, শচীশের সার্থকতার জগৎ নারীর মাধুর্যলোক নয়। সে ইহার অনেক উন্নত, মহত্তর জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য বিধিনির্দিষ্ট। তাহার মাধুর্য-লোকে শচীশের স্থান সঙ্কুলান হইবে না।

দামিনী ইহা জানে এবং বোঝে। তাই শচীশকে তাহার তুচ্ছতার লোকে টানিয়া আনিতে তাহার হৃদয় বেদনায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে। শচীশকে আপনার সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াও, দামিনী আপনাকে সংযত করিয়াছে।

দামিনী যতদিন পারে শচীশের সাধনায় সহযোগিতা করিবে, তাহার সেবা ও যত্ন করিবে। শচীশের নিকট হইতে সে ইহার অধিক কিছু প্রত্যাশা করে না। উন্নততর জীবনের বোধ দামিনীর ছিল বলিয়া, লীলানন্দ স্বামীর সাধনার উপর তাহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। দামিনী আর বিদ্রোহী মন লইয়া নয়,

অনুকূল প্রসন্ন অন্তর লইয়া অপেক্ষায় রহিল, যে পর্যন্ত না, শচীশের মোহ ভঙ্গ হয়।

দামিনী সমস্ত জীবন যেমন তাহার নিম্নতর বোধ দিয়া, তেমনি উন্নততর বোধ দিয়াও শচীশকে মুক্ত করিয়া উন্নততর জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সে চেষ্টা কোথাও প্রত্যক্ষ, কোথাও বা পরোক্ষ। দামিনী নবীনের হৃদয়হীন আচরণের উল্লেখ করিয়া শচীশের মোহ চিরকালের জন্য ভাঙিয়া দিয়াছে। দামিনীই শচীশের অন্তরের সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র এবং ইহার সাধনরূপকে সকল মোহমুক্ত, স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে।

শচীশের সেবা ও যত্ন করিবার জন্য দামিনীও শচীশের সঙ্গে লীলানন্দ স্বামীর আশ্রম ত্যাগ করিয়া আসিল। কিন্তু, তাহার এই সেবার পশ্চাতে আরও যে এক আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত ছিল, তাহা দামিনীও জানিত না। দামিনী বুঝিয়াছিল, শচীশকে লইয়া আর যাহাই করা যাক না কেন, সংসার রচনা করিতে পারা যায় না। শচীশের রচনালোক, কর্মলোক, সংসার নয়।

মন দিয়া দামিনী ইহা বুঝিলে কী হইবে, প্রাণের প্রেরণাকে অত সহজে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারা যায় না। তাহার গতি-প্রকৃতি অতি বিচিত্র, তাহা মনের অনেক গভীরে আত্মগোপন করিয়া নর-নারীর প্রয়াস নিয়ন্ত্রণ করে। এক একটি মুহূর্ত আসে, যখন অজ্ঞাত, অস্পষ্ট এই বাসনা মনের অনেক গভীর-তল হইতে স্পষ্ট রূপ লইয়া বাহির হইয়া আসে। সে রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ আপনি আপনি বিস্মিত হইয়া যায়।

সেদিন রাত্রে বৃষ্টি ও ঝড়ের বেগে সমস্ত প্রকৃতি উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। প্রচ্ছন্ন কী এক বেদনাকে প্রকাশ করিবার জন্য, সমগ্র প্রকৃতি আর্তস্বরে লুটাইয়া পড়িয়াছে। দামিনীর হৃদয়ের অতি প্রচ্ছন্ন সেই বাসনা, সেই অসংযমের রাত্রে জাগিয়া উঠিয়া, দামিনীকে তাহার অজ্ঞাতে শচীশের গৃহে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

কী একটা শব্দে শচীশ চমকাইয়া ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া, দামিনীকে তাহার ঘরের মধ্যে দেখিতে পাইল। দামিনীর এই আগমনের উদ্দেশ্য শচীশ মুহূর্তের মধ্যে বুঝিতে পারিল। দামিনীও আপনার হৃদয় প্রত্যক্ষ করিয়াছে। অনেক অনুরোধ করিয়া সেই দুর্যোগ পরিপূর্ণ রাত্রে দামিনী তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছে বটে, কিন্তু শচীশের অভিযোগের কোন উত্তর দিতে পারে নাই। শচীশের নির্দেশ দামিনী নীরবে মাথা পাতিয়া লইয়াছে। দামিনীও বুঝিয়াছে নারীর মনের উপর বিশ্বাস নাই। আর ইহার জন্য শচীশের দুঃখ বাড়াইয়া লাভ কী। দামিনী তাই আসক্তির সর্বশেষ বন্ধন ছিন্ন করিয়া, শচীশকে সেই নির্জন স্থানে একাকী রাখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

৪

শ্রীবিলাস শচীশের সঙ্গে জ্যাঠামশায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ছিল সত্য, কিন্তু ইহার সহিত তাহার প্রাণের গভীরতর কোন আধ্যাত্মিক পিপাসা বিজড়িত ছিল না।

শ্রীবিলাস জগমোহনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল কতকটা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় চিন্তাধারায় প্রভাবিত হইয়া, কতকটা শচীশকে ভালোবাসিয়া। শ্রীবিলাস শচীশকে ভালোবাসিয়াছিল কতকটা মতবাদের মিলের জন্য, কতকটা তাহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্য। জীবনের এমন আশ্চর্য প্রকাশ, সে ইতিপূর্বে আর কাহারও মধ্যে প্রত্যক্ষ করে নাই। গতানুগতিক জীবনধারার মাঝখানে সে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি যে, শচীশের প্রতি গভীর ভালোবাসা সত্ত্বেও শ্রীবিলাস, তাহা তাহার স্বধর্মের অনুকূল ছিল না বলিয়া, পরবর্তী জীবনে লীলানন্দ স্বামীর সাধনাকে যেমন স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই, তেমনি জ্যাঠামশায় ও শচীশের কর্মযোগ তাহাকে অধিককাল ধরিয়া রাখিতে পারিত না, কিছুকালের মধ্যেই তাহাকে ক্লান্ত করিয়া তুলিত।

কিছুকালের মধ্যেই জ্যাঠামশায় ও শচীশের কাজের হাট ভাঙিয়া গেল। জ্যাঠামশাই আকস্মিক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ইহার পর একদিন শচীশও কোথায় অন্তর্ধান করিল। ভাঙা হাট জড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে শ্রীবিলাসের আর মন লাগিল না।

শচীশের সন্ধানে ফিরিয়া ফিরিয়া সুদূরে পূর্ববঙ্গের এক অখ্যাত গ্রামে এক সন্ন্যাসীর আখড়ায় শ্রীবিলাস শেষে তাহার সাক্ষাৎ পাইল। লীলানন্দ স্বামীর সাধনা ও সাধনপদ্ধতির উপর শ্রীবিলাসের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু, তবু সে সেই আশ্রমেই রহিয়া গেল কেবল শচীশের জন্য। এই ভালোবাসার জন্য শ্রীবিলাস শচীশকে সেই পরিবেশে একাকী ফেলিয়া যাইতে পারে নাই। এই স্নেহ ও প্রীতিই শ্রীবিলাসের চরিত্রের আদি ও অন্ত কথা। শচীশকে ভালবাসিয়া তাহার সঙ্গলাভের জন্য সে তাহার সাধনাকেও স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু, কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীবিলাস ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

তাহার নিকট এই জগৎ ও জীবন অনেক বেশী সত্য, অনেক বেশী সত্য সংখ্যাতীত নর-নারীর সংসারের লীলা, মায়া ও মমতার বিচিত্র বন্ধন। অমনি একটি স্নেহের নীড় রচনা করিয়া সকলকে বুক ভরিয়া ভালোবাসা। জীবনে ইহার অধিক ফললাভ আর কী আছে। এই প্রেমে মানব-জীবনের আদি ও অন্ত, স্বর্গ ও মর্ত্য, ইহকাল ও পরকাল বিধৃত হইয়া আছে।

গ্রাম হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া, শ্রীবিলাস দামিনীর মধ্যে ইহারই প্রকাশ

লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। ওই তো সেই চিরন্তন নারী, যে পুরুষের হৃদয় সুধা পাত্রে পরিপূর্ণ করিয়া দিবার জন্য প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। ওই তো পুরুষের মুক্তিলোক। তাহার প্রাণের মধ্যে এতকাল যে আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত হইয়াছিল, দামিনীকে দেখিবার পর হইতে তাহার স্বরূপ সে বুঝিতে পারিয়াছে। শ্রীবিলাসের এই মানসিকঅবস্থার পরিচয় নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে কতকটা লাভ করিতে পারা যাইবে।

"কখনো কখনো শুনিতে পাইতাম, একটি উচ্চ সুরের ডাক—"বামী"। আমরা ভাবের যে আসমানে মনটাকে বুঁদ করিয়া দিয়াছিলাম, তার কাছে এগুলি অতি তুচ্ছ—কিন্তু হঠাৎ মনে হইত অনাবৃষ্টির মধ্যে যেন ঝর্ ঝর্ করিয়া এক পস্‌লা বৃষ্টি হইয়া গেল। আমাদের দেয়ালের পাশের অদৃশ্য লোক হইতে ফুলের ছিন্ন পাপড়ির মতো জীবনের ছোট ছোট পরিচয় যখন আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া যাইত, তখন আমি মুহূর্তের জন্য বুঝিতাম, রসের লোক তো ঐখানেই—যেখান সেই বামীর আঁচলে ঘরকন্নার চাবির গোছা বাজিয়া উঠে—যেখানে রান্নাঘর হইতে রান্নার গন্ধ উঠিতে থাকে—যেখানে ঘর ঝাঁট দিবার শব্দ শুনিতে পাই—যেখানে সব তুচ্ছ কিন্তু সব সত্য, সব মধুরে তীব্রে, স্থূলে সূক্ষ্মে মাখামাখি, সেখানেই রসের স্বর্গ।"

এই প্রেম ও মাধুর্যলোকের জন্য শচীশের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা যত গভীর হইয়াছে, লীলানন্দ স্বামীর সাধনপন্থার উপর, ততই সে বীত-শ্রদ্ধ হইয়াছে, ততই সে ইহার অন্তঃসারশূন্যতা বোধ করিয়াছে।

শচীশ জ্যাঠামশায়ের সাধনার মধ্যে যেমন, তেমনি লীলানন্দ স্বামীর সাধনার অসম্পূর্ণতা বোধ করিয়াছে, এমন একটি চেতনালাভের পিপাসায় যাহা বুদ্ধি ও ভাবের, মনীষা ও হৃদয়ের ঊর্ধ্বতর চেতনার সামগ্রী, যাহাকে অরূপের পিপাসা বলা যাইতে পারে।

শ্রীবিলাসের সাধনাকে এইদিক হইতে রূপের সাধনা বলা যাইতে পারে। প্রেমে মানুষ রূপের মধ্যেই রূপের সীমা ছাড়াইয়া যায়। এ-সাধনার স্বরূপ বুঝাইতে এমন বিপরীত শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। কারণ, আর কোন উপায়ে ইহার স্বরূপ বুঝাইতে পারা যায় না। ইহার স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা শ্রীবিলাস যেভাবে করিয়াছে, আমি সেই অংশ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার ভিতর দিয়া একদিকে শ্রীবিলাসের উপলব্ধির গভীরতা, অন্যদিকে শচীশের অজ্ঞানতা ও দম্ভের প্রকাশ ঘটিয়াছে। শচীশের এই দম্ভের কারণ আর কিছু নয়, এই জগৎকে উপলব্ধি করিবার মত অনুকূল মানস-গঠন তাহার ছিল না। আদৌ তাহার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি ছিল ইহার বিপরীত।

"শচীশ। প্রকৃতির সংসর্গ আমাদের একেবারে ছাড়িতে হইবে।

"শ্রীবিলাস। তা যদি হয়, তবে আমাদের সাধনার মধ্যে মস্ত একটি ভুল আছে।......তুমি যাহাকে প্রকৃতি বলিতেছ, সেটা তো একটা প্রকৃত জিনিস; তুমি তাকে বাদ দিতে গেলেও সংসার হইতে সে তো বাদ পড়ে না। অতএব সে যেন নাই, এমনভাবে যদি সাধনা করিতে থাকে, তবে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হইবে, একদিন সে ফাঁকি এমন ধরা পড়িবে যে, তখন আর পলাইবার পথ পাইবে না।

"শচীশ কহিল, ন্যায়ের তর্ক রাখো। আমি বলিতেছি কাজের কথা। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে মেয়েরা প্রকৃতির চর, প্রকৃতির হুকুম তামিল করিবার জন্যই নানা সাজে সাজিয়া তারা মনকে ভোলাইতে চেষ্টা করিতেছে। চৈতন্যকে আবিষ্ট করিতে না পারিলে, তারা মনিবের কাজ হাসিল করিতে পারে না। সেইজন্য চৈতন্যকে খোলস রাখিতে হইলে, প্রকৃতির এই সমস্ত দূতীগুলিকে যেমন করিয়া পারি এড়াইয়া চলা চাই।.........ভাই বিশ্রী প্রকৃতির মায়া দেখিতে পাইতেছ না, কেন না, সেই মায়ার ফাঁদে আপনাকে জড়াইয়াছ। যে সুন্দর রূপ দেখাইয়া আজ তোমাকে সে ভুলাইতেছে, প্রয়োজনের দিন ফুরাইয়া গেলেই সেই রূপের মুখোশ সে সরাইয়া ফেলিবে; যে তৃষ্ণার চশমায় ওই রূপকে তুমি বিশ্বের সমস্তের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতেছ, সময় পেলেই সে তৃষ্ণাকে সুদ্ধ একেবারে লোপ করিয়া দিবে। যেখানে মিথ্যার ফাঁদ এমন স্পষ্ট করিয়া পাতা, দরকার কী সেখানে বাহাদুরি করিতে যাওয়া?

"আমি বলিলাম, তোমার কথা সবাই মানিতেছি ভাই, কিন্তু আমি এই বলি, প্রকৃতির বিশ্বজোড়া ফাঁদ আমি নিজের হাতে পাতি নাই এবং সেটাকে সম্পূর্ণ বাধা কাটাইয়া চলি এমন জায়গা আমি জানি না। ইহাকে বেকবুল করা যখন আমাদের হাতে নাই, তখন সাধনা তাহাকেই বলি, যাহাতে প্রকৃতিকে মানিয়া প্রকৃতির উপরে উঠিতে পারা যায়। আমরা সে রাস্তায় চলিতেছি না, তাই সত্যকে আধখানা ছাটিয়া ফেলিবার জন্য এত বেশি ছটফট করিয়া মরি।.........প্রকৃতির স্রোতের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে জীবনতরী বাহিয়া চলিতে হইবে। আমাদের সমস্যা এ নয় যে, স্রোতটাকে কী করিয়া বাদ দিব, সমস্যা এই যে, তরী কী হইলে ডুবিবে না, চলিবে। সেইজন্য হালের দরকার।" গোরা ও বিনয়ের ঠিক এই জাতীয় একটি কথোপকথন এক্ষেত্রে স্মরণে পড়িতে পারে। উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন।

লীলানন্দ স্বামী এবং তাহার সাধনার উপর এমনি করিয়া শ্রীবিলাস ধীরে ধীরে বীতশ্রদ্ধ হইয়া হইয়া পড়িয়াছে। এই সাধনপদ্ধতির উপর এখন তাহার লেশমাত্র মোহ নাই। তবু শ্রীবিলাস লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে রহিয়া গেল দুটি কারণে। প্রথমতঃ, দামিনীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসা এখন তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ, শচীকে এই পরিবেশে একাকী ফেলিয়া যাইতেও তাহার মন সরিতেছে না।

শ্রীবিলাসের জীবনে সর্বাধিক বাধা আসিল, দামিনীর দিক হইতে। তাহার এই হৃদয়বোধ সম্পর্কে দামিনী সম্পূর্ণ অন্ধ। তাহার সমস্ত মন শচীশের উপর পড়িয়া আছে। তাহার সমগ্র প্রচেষ্টা একমাত্র শচীশকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার মান-অভিমান, আনন্দ-বেদনা সমস্ত কিছুই শচীশকে আবেষ্টন করিয়া গুঞ্জন তুলিয়াছে। কখন সে প্রসন্ন মনে মুগ্ধা পূজারিণীর মত শচীশের পাষাণহৃদয় বেদীর উপর অশ্রুপ্রদীপ জ্বালাইয়া ধরিয়াছে, কখন ব্যর্থ অভিমানে ওই পাষাণদেবীর উপর মাথা কুটিয়া আপনাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে, যেমন করিয়া সমুদ্রের ঢেউ ক্ষুব্ধ অভিমানে তটের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া শতধা হইয়া যায়। কখন ও তাহার সেবায় দুঃসহ কৃচ্ছ্রতা বরণ করিয়া লইয়াছে, যেমন করিয়া মাতা সন্তানের জন্য অশেষ ক্লেশ ভোগ করে।

শচীশকে ঘিরিয়া দামিনীর দেহ-আত্মার বিচিত্র লীলার প্রকাশ শ্রীবিলাস বিস্ময় বিস্ফারিত আঁখি মেলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছে, আর এই হতভাগ্য নারীর জন্য করুণায় বিগলিত হইয়াছে।

দামিনী যখন শচীশের জন্য সর্বস্ব পণ করিয়া বসিয়া আছে, যখন তাহার এতটুকু অনুকম্পালাভের জন্য কাঙাল হইয়া ফিরিয়াছে, ইহার জন্য যখন তাহার কান্নার অন্ত নাই, তখন শ্রীবিলাস তাহার হৃদয়ের সকল ঐশ্বর্য লইয়া তাহারই দ্বারপ্রান্তে তাহার ইহকাল-পরকাল, তাহার জন্ম-জন্মান্তর ধন্য করিয়া দিবার জন্য নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। বুক ফাটিয়া গেলেও শ্রীবিলাস আপন হৃদয় উদ্ঘাটন করিয়া কাঁদিতে পারে নাই।—হৃদয় ব্যক্ত করিবে সে কাহার নিকট? সে নারী তো উদাসীন নয়, সে আর একজন পুরুষের জন্য অধীর শোকতপ্ত ও ব্যাকুল।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস চরমে উঠিয়াছে, যখন দামিনী তাহার প্রেম-লীলায় শ্রীবিলাসকে সঙ্গ করিয়াছে। শচীশকে তাহার প্রেম ও মাধুর্যলোকে আকর্ষণ করিয়া আনিবার জন্য দামিনী শ্রীবিলাসকে আশ্রয় করিয়াছে। শ্রীবিলাস দামিনীর এই সাহচর্যটুকুকেও অস্বীকার করিতে পারে নাই, তখন ওইটুকুই তাহার পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীবিলাস এমনি বঞ্চিত!

শ্রীবিলাসের এই প্রেমের সহিত পরিশেষে করুণা আসিয়া মিশিয়াছে। তাহার নিজের বেদনা অপেক্ষা, তাহার নিকট দামিনীর বেদনা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। সত্য প্রেমের স্বরূপই এই। ওই নারীর দেহ-প্রাণ-মন স্রোতের মুখে বাঁধা তীরের নৌকার মত শচীশের পাষাণ হৃদয়-তটে বারংবার আছাড় খাইয়া খাইয়া যে জীর্ণ হইয়া গেল! যে হৃদয়বোধে শ্রীবিলাসের চিত্ত বিমুখ না হইয়া, করুণা বিগলিত হইয়াছে, আমাদের সেই হৃদয়বোধের গভীরতা পরিমাপ করিতে হইবে।

সে প্রেমে মোহ নাই, অবাস্তব কল্পনা বিলাস নাই, সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা নাই; শ্রীবিলাস আপন হৃদয়ের সকল প্রীতি ও প্রেম ঢালিয়া ওই জীর্ণ দেহটাকে বুকে তুলিয়া শুধু সেবা করিতে চাহিয়াছে। কলিকাতায় দামিনী যখন ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন তাহার দেহ জীর্ণ, প্রাণে এবং মনে উৎসাহ ও আশা বলিয়া কিছু নাই। নিদারুণ ভাগ্যকে মানিয়া লইয়া এখন কেবল মৃত্যুর প্রতীক্ষায় জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি দিন গুনিয়া চলা।

এমন সময়ে দেবতার করুণা লইয়া শ্রীবিলাস তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়াছে। তাহার জীবনে ঈশ্বরের এত প্রসন্নতা!—এ কী সত্য! এই পাপিষ্ঠার জন্য শ্রীবিলাস এত বড় ত্যাগ করিতে চাহিয়াছে, অথচ তাহার নিকট হইতে শ্রীবিলাস কীই বা পাইবে!

আর শচীশের জন্য তাহার ব্যাকুলতার কোন পরিচয়ই তো তাহার অগোচর নাই। সব জানিয়া একজন পুরুষ এত বড় ক্ষমা করিতে পারে! এক অসহনীয় আনন্দ বেদনায় দামিনীর অন্তর মথিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীবিলাসের এই প্রেমের পরিচয় পাইয়া, দামিনীর কত কথাই না মনে পড়িতে লাগিল। যখন সে শচীশের জন্য সর্বস্ব পণ করিয়া, তাহার পাশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া বেড়াইয়াছে, তখন শ্রীবিলাস তাহার একান্ত পার্শ্বে তাহার হৃদয়ের অপার প্রেম ও করুণা লইয়া প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন কাটাইয়াছে।

দামিনীর দুঃখভোগের জন্য শচীশের অপরাধ কিছুমাত্র তো ছিলই না, বরং তাহার জন্য তাহাকেও অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। পরস্পর এই হৃদয়-সংঘাতে উভয়ে উভয়কে উন্নততর জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—কতকটা প্রত্যক্ষে, কতকটা পরোক্ষে। শচীশ পরিণামে যে সত্য পথ লাভ করিয়াছে, তাহাতে দামিনীর সহযোগিতার মূল্য কম নয়। অন্যদিকে গভীর দুঃখ ভোগের ভিতর দিয়া দামিনীর স্বভাবের সকল স্থূলতা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। দামিনীর দুঃখভোগ তাই অকারণ নয়। ইহার ভিতর দিয়া সে জীবনকে সম্পূর্ণ করিয়া পাইয়াছে, পূর্ণতার আস্বাদ লাভ করিয়াছে। দেহ ও আত্মার ওই সংগ্রাম ব্যতীত দামিনীর জীবনে ওই পূর্ণতা লাভ ঘটিত না।

দামিনী শ্রীবিলাসকে এ কথা বলিয়াছে,—"আমি একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম, কেবল এই একটা ধাক্কার অপেক্ষায় ছিল। আমার সেই তুমি আর এই তুমির মাঝখানে একটা ঘোর আসিয়াছিল। আমার গুরুকে আমি বার বার প্রণাম করি, তিনি আমার এই ঘোর ভাঙ্গাইয়া দিয়াছেন।"

দামিনী অন্যত্র শ্রীবিলাসকে বলিয়াছে—"এগুলো আমার গোপন ঐশ্বর্য্য, এ আমার পরশমণি। এই যৌতুকটুকু লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি, নইলে আমি কি তোমার যোগ্য।"

দামিনী ও শ্রীবিলাস আবার নূতন করিয়া সংসার রচনা করিয়াছে। প্রেমে দুজনে দুজনের অতীত দাহ নিঃশেষে মুছিয়া দিয়াছে। দামিনী তাহার জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে। সে যেন শ্রীবিলাসের সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি হয়। শ্রীবিলাস যেন তাহার প্রেম দিয়া, স্বপ্ন দিয়া, সৌন্দর্য দিয়া দামিনীকে তাহার হৃদয়ের মত করিয়া গড়িয়া তোলে। দামিনী তাই শ্রীবিলাসকে বলিয়াছে,

"সেই ঘরের গৃহিণীকে একেবারে গোড়া হইতে বানাইয়া লইতে হইবে। সেও তোমারই হাতের সৃষ্টি হোক, পুরানো কালের ভাঙাচোরা তার কোথাও কিছু না থাক্।"

দামিনী কত বেদনার সমুদ্র পার হইয়া তবে শ্রীবিলাসকে লাভ করিতে পারিয়াছে, শ্রীবিলাসও দামিনীর জন্য যে দুঃখভোগ করিয়াছে, তাহারও বুঝি সীমা নাই।

এমনি করিয়া উভয়ে উভয়কে গভীর দুঃখভোগের ভিতর দিয়া লাভ করিয়াছিল বলিয়া, তাহাদের মিলনও অত সত্য এবং অত সম্পূর্ণ। এমনি করিয়া গভীর দুঃখভোগের ভিতর দিয়া কিছু না পাইলে, সে পাওয়া সত্য হয় না। অপরিসীম দুঃখভোগের ভিতর দিয়া দামিনী ও শ্রীবিলাস পরস্পরকে লাভ করিয়াছিল বলিয়া, মিলনে তাহাদের আনন্দও অপার হইয়া উঠিয়াছিল। জীবনে সে প্রাপ্তির গভীরতা যে কতখানি সে উপলব্ধি জীবনে কোন্ আনন্দ-লোকের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, অর্থাৎ দামিনী ও শ্রীবিলাসের প্রেম সাধনার ফল-লাভ কী, তাহা বুঝিতে শ্রীবিলাসের একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"কলিকাতার এই শহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে বাঁশির তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি, এমন কবিত্ব শক্তি আমার নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল।"

এই আনন্দকে তাহারা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বিচিত্র কর্মে ত্যাগে ও

সেবায় পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। যে আনন্দ বোধ হইতে আত্মত্যাগের এমন প্রেরণা আসে, সেই আনন্দ তত্ত্বের রহস্যভেদ করিতে পারিলে, প্রেম সাধনারও রহস্যভেদ হইয়া যাইবে।

এই প্রেম জীবনকে আকাঙ্ক্ষিত করিয়া তোলে। একমাত্র এই জীবনের পাত্র ভরিয়া নর-নারী সেই অমৃত পান করিতে পায়। লক্ষ-কোটি জন্ম জন্মান্তর কাটিয়া গেলেও, মানুষের এই অমৃত পিপাসা মেটে না। এই জগৎ হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়া যাইবার পূর্বে দামিনী শ্রীবিলাসের পদধূলি মস্তকে তুলিয়া লইয়া বলিয়াছে, "সাধ মিটিল না—জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।"

জীবনকে এমনি দুঃখভোগে আমরা সত্য করিয়া পাই না বলিয়া জীবনের ঐশ্বর্য আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া যায়, জীবন হারাইয়া গেলে আমরা তাই বৈরাগ্যের কত না তত্ত্বের কথা বলি। জীবনকে যাহারা সত্য করিয়া পাইয়াছে, অশ্রুজলে জীবন-বৃক্ষে যাহারা অমৃত ফল ফলাইয়াছে, তাহাদের নিকট জীবনের মূল্য সকল তত্ত্বের মূল্যকে ছাড়াইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে গোরা উপন্যাস হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই বোধের একটি ধারা যে, তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে পূর্বাপর প্রবাহিত—তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

"বিনয় যে অনির্ব্বাচনীয় পদার্থটিকে হৃদয় পূর্ণ করিয়া পাইয়াছে, একি সকলে পায়। ইহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি কি সকলের আছে? সংসারে সচরাচর স্ত্রী পুরুষের যে মিলন দেখা যায়, ***তাহার মধ্যে এই উচ্চতম সুরটি তো বাজিতে শুনা যায় না। বিনয় গোরাকে বারবার করিয়া কহিল, অন্য সকলের সঙ্গে সে যেন তাহাদের তুলনা না করে। বিনয়ের মনে হইতেছে, ঠিক এমনটি আর কখনো ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। এমন যদি সচারাচর ঘটিতে পারিত, তবে বসন্তের এক হাওয়াতেই যেমন সমস্ত বন নব নব পুষ্প-পল্লবে পুলকিত হইয়া ওঠে, সমস্ত সমাজ তেমনি প্রণের হিল্লোলে চারিদিকে চঞ্চল হইয়া উঠিত। তাহা হইলে লোকে এমন করিয়া খাইয়া দাইয়া ঘুমাইয়া দিব্য তৈল চিক্কন হইয়া কাটাইতে পারিত না। তাহা হইলে যাহার মধ্যে যত সৌন্দর্য্য যত শক্তি আছে, স্বভাবতই নানা বর্ণে নানা আকারে দিকে দিকে উন্মীলিত হইয়া উঠিত। এ-যে সোনার কাঠি। ইহার স্পর্শকে উপেক্ষা করিয়া অসাড় হইয়া কে পড়িয়া থাকিতে পারে। ইহাতে সামান্য লোককেও যে অসামান্য করিয়া তোলে। সেই প্রবল অসামান্যতার স্বাদ যদি মানুষ জীবনে একবারও পায়, তবে জীবনের সত্য পরিচয় সে লাভ করে।

"*** মানুষের সমস্ত প্রকৃতিকে এক মুহূর্তে জাগ্রত করিবার উপায় এই প্রেম—যে কারণেই হউক, আমাদের মধ্যে এই প্রেমের অবির্ভাব দুর্ব্বল সেই জন্যই আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত—আমাদের কী আছে, তাহা আমরা জানি না, যাহা গোপনে আছে তাহাকে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, যাহা সঞ্চিত আছে, তাহাকে ব্যয় করা—আমাদের অসাধ্য। সেইজন্যই চারিদিকে এমন নিরানন্দ,......সেই জন্যই আমাদের নিজের মধ্যে যে কোন মাহাত্ম্য আছে, তাহা কেবল তোমাদের মতো দুই এক জনেই বোঝে—সাধারণের চিত্তে তাহার চেতনা কোন নাই।"

৫

ননীবালার পরিচয় দিতে গিয়া শচীশ তাহার ডায়েরীর মধ্যে এক জায়গায় লিখিয়াছে,

"ননীবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি, অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছ, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল।"

শচীশ তাহার চতুষ্পার্শ্বের সমাজে জীবনের কোন প্রকাশ দেখিতে পায় নাই, ওই সমাজের মানুষগুলো যেন আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে, নৈতিকবোধ কোন্ নিম্নে নামিয়া গিয়াছে, হৃদয় নাই, বিচার নাই, চিন্তা নাই, আছে কেবল কতকগুলি মিথ্যা সংস্কার এবং তাহাকে জড়াইয়া গগনভেদী মিথ্যা আস্ফালন।

এই সমাজ সাধনার একটি অমৃতময় রূপের প্রকাশ, শচীশ ননীবালার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। একটি গভীরতর সত্যবোধের উপর এই সমাজ যে একদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল, একদিন উহা যে এই সমাজকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা নারীর এই রূপের প্রকাশ লক্ষ্য করিলে কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়। সে সাধনার অবশেষ যদি কোথাও একটুকু থাকে, তাহা এই সমাজের নারী জাতির মধ্যে। তাহাদের মধ্যে বিশ্বের সেই কল্যাণ শক্তির আশ্চর্য প্রকাশ। মৃত সমাজকে বুকে তুলিয়া মৃতপাতি ক্রোড়ে সাবিত্রীর ন্যায় সে নারী নীরবে শুধু অশ্রুবিসর্জন করিতেছে। আপনার হৃদয়-রক্তকে অমৃতে রূপান্তরিত করিয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিতেছে। সে অমৃত পান করিয়া ওই সমাজের পুরুষরা বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় তাহারই বক্ষে পাদাঘাত করিতেছে। নারীর বেদনাবিকৃত মুখে শুধু করুণা, শুধু ক্ষমার অভাস ফুটিয়া উঠে। তাহার জন্য মৃত্যু বরণ করিয়াও কোন ক্ষোভ রাখিয়া যায় না। ননীবালার মধ্যে নারীর সেই অমৃত রূপের প্রকাশ।

ননীবালা, শচীশকে বিবাহ করিতে পারে নাই, আত্মহত্যা করিয়াছে শচীশের কথা চিন্তা করিয়া নয়। ননীবালা এত করুণা, এত স্নেহ, এত যত্ন, এত সম্মান, এত সুখ, এত সৌভাগ্য যাহা তাহার মত নারীর কল্পনারও অতীত, এই সমস্ত কিছু ত্যাগ করিয়া কোন ক্ষোভ না রাখিয়াই তাহার অত্যাজ্য সতীধর্মের জন্য আত্মহত্যা করিয়াছে। ননীবালা পত্রে জগমোহনকে সে কথা জানাইয়াছে।

"তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু তাকে যে আমি আজও ভুলিতে পারি নাই।"

তাহার এই অত্যাজ্য সতীধর্ম পুরন্দরের পাপাচার হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। জীবনে তাহার সতীধর্ম শুধু সত্য নয়, একমাত্র সত্য। পুরন্দরের সহিত তাহার সম্পর্ককে সে মুহূর্তের দুর্বলতা, তাহার পাপাচার ছাড়া আর কিছু বলিয়া বোধ করিতে পারে নাই। সমাজ তাহাকে তাহার এই অপরাধের জন্য কতটুকু শাস্তি দিয়াছে, আত্মগ্লানিতে ভুগিয়া আপনার উপর আপনি সে যে অত্যাচার করিয়াছে, তাহা অতি নিষ্ঠুর—অতিশয় ভয়াবহ। সে আপনাকে আপনিই ক্ষমা করে নাই। পুরন্দরের উপর তাই কিছুমাত্র ক্ষোভ ছিল না। এমনি করিয়া অনুশোচনা ও আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া সে যেখানে আপনাকে পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে, সেখানে আর কাহাকেও পুনরায় বিবাহ করিবার প্রশ্ন ওঠে না। জগমোহন ও শচীশ যে দিক হইতে ননীবালাকে দেখিয়াছে, তাহা ননীবালা বুঝেনা, অন্যদিকে যে বোধের জগৎ হইতে ননীবালা আপনার জীবনে অমন ভয়ংকর পরিণাম চিহ্নিত করিয়াছে, তাহা জগমোহন শচীশের উপলব্ধি বহির্ভূত।

৬

গোরা আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে সামগ্রিক জীবন-দর্শনের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, এখন তাহারই আলোকে তাঁহার প্রত্যেকটি উপন্যাস পাঠ করা যাইতে পারে।

কোন একটি উপায়ে মানবিক বোধের সীমাকে ছাড়াইয়া ওঠা বা সেই ঊর্ধ্বতর চেতনার আভাসমাত্র লাভ করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা নয়। তাহাতে পরিণামে জীবন ও জগৎটাই অস্বীকৃত হইয়া যায়।

প্রাণ মন-বুদ্ধি সমেত মানবিক সমগ্র বোধের ধীর অনুশীলন ও সম্পূর্ণতা-সাধনের চেষ্টার ভিতর দিয়া যেখানে স্বাভাবিকভাবে উন্নততর চেতনালাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং জীবনে তাহার প্রাপ্তি ঘটে, সেখানে এই দুটি সত্তার

পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত হয় এবং জীবন ওই বোধাশ্রয়ী হইয়া সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে, আশ্চর্য গুণসমৃদ্ধ হয়, জীবন এক নূতন অর্থ লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল লাভটিকে শচীশের পরিণত অধ্যাত্ম উপলব্ধির ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। সেখানে রূপ ও অরূপ, সীমা ও অসীমের পূর্ণ স্বীকৃতি আছে। কোন একটির মধ্যে মূল্যের ন্যূনতা কিছুমাত্র নাই। এই সত্য উপলব্ধি করিয়া এবং এই সম্পর্কে নিঃসংশয় হইয়া উভয়ের যোগের রহস্য অনুসন্ধানে শচীশের মত রবীন্দ্রনাথও ধ্যাননিমগ্ন হইয়াছেন।

এই সাধনারই একটি দিক শ্রীবিলাস-দামিনীর মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

যে প্রেমে অসীম সীমা-রূপ লাভ করিয়াছেন, সেই এক প্রেম নর-নারীর মধ্যে। এই প্রেমের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিলে, তাই সীমা অসীমের যোগের রহস্যও উদ্ঘাটন করা সম্ভব।

এই প্রেম যখন জাগে তখনই বোধ করিতে পারা যায় জীবন ও জগৎ কত সত্য, কত দুর্লভ। ইহাকে তাই 'মায়া' বলিয়া কোন স্বরূপে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই।

ইহা প্রবৃত্তি নয়। প্রবৃত্তি সমগ্র সত্তার একটি অংশ মাত্র। ইহা emotion বা ভাবমাত্র নয়। ভাবও জীবনের একটি অংশমাত্র—বুদ্ধিবৃত্তিও তাই। যে বোধে মানবিক সকল বিচ্ছিন্ন সত্তার আদি ও অন্ত এক অলৌকিক উপায়ে সামঞ্জস্য লাভ করে, তাহাই প্রেম।

লীলানন্দ স্বামীর সাধনার অসামর্থ্য নির্দেশ করিয়া তিনি ভারতীয় সমগ্র ভাব-সাধনার অসামর্থ্যও স্পষ্ট করিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। কেবল ভাব-সাধনাই নয়, যে অধ্যাত্ম-সাধনা জীবনের আশ্রয়কে কোন না কোন উপায়ে নষ্ট করিয়া দিতে চাহিয়াছে, সেই সাধনাকে তিনি জীবনে স্বীকার করিতে পারেন নাই।

শচীশ যে পথে শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম পরিণাম লাভ করিয়াছে তাহা যেমন ভারতীয় ধারানুগত কোন সাধন পথ নয় (উন্নততর চেতনা লাভের জন্য শচীশ ভারতীয় কোন সাধন প্রতীকও আশ্রয় করে নাই), তাহার ফললাভও তেমনি ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার সম্পূর্ণ নূতন এক দিক। গুরুবাদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক গুচ্ছ (culture-complex) এবং ওই বোধ দ্বারা গড়িয়া তোলা মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে মনকে বাঁধিবার যে চেষ্টা আছে, তাহার মধ্যে মানব চিত্তের সৃষ্টি বৈচিত্র্যকে নষ্ট করিবার সুকৌশল প্রয়াস নিহিত ; রবীন্দ্রনাথ সেই প্রয়াসের মুখোশটিকে খুলিয়া দিয়াছেন। এইরূপে চিত্তের বৈচিত্র্যকে নষ্ট করিবার চেষ্টা ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা এবং সমাজ-সাধনায় কেন করা হইয়াছে

তাহার কিছু পরিচয় দানের চেষ্টা 'গোরা'-আলোচনা প্রসঙ্গে করিয়াছি। শচীশকে তাই তিনি যে-কোন গুরুর আশ্রয় হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন।

*

দামিনীর প্রেমে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাহা তাহার সামাজিক সংস্কার-বোধের সহিত নয়। সে নারী এতদূর সুস্থ ও স্বাভাবিক, তাহার প্রাণ-মন এতদূর সমৃদ্ধ যে ওই সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাই তাহার প্রেম-জীবনে এবং পরবর্তী বিবাহ-জীবনে জাগে নাই। ওই বোধকে মুহূর্তের জন্য যদি তিনি তাঁহার অন্তরে জাগ্রত করিতেন, তাহা হইলে তাহার ওই প্রেমটাই তো অসত্য হইয়া যাইত। উহা তাহাকে অসতীত্বের লোকে টানিয়া আনিত। এই বোধের-আলোকের শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্রগুলি ফিরিয়া পাঠ করা যাইতে পারে।

*

শচীশের জাতি উল্লেখের স্পষ্ট কোন কারণ ছিল না, (চার অধ্যায়ে অতীন ও এলা একসময় কেবল তাহাদের অসবর্ণের কথা বলিয়াছে।) কেবল এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে সমাজের যে-কেন পর্যায়ের নর-নারী শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম পরিণাম লাভ করিতে পারে। শ্রীবিলাস ও দামিনীর বিবাহে পৌরোহিত্য করিয়াছে শচীশ।

পর পর এই যে তিনটি দিকের উল্লেখ করিলাম, তাহাদের কোনটাই ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা এবং তদাশ্রয়ী সমাজ-সাধনাকে কিছুমাত্র স্বীকৃতিদান করে নাই! এই সমগ্র সৃষ্টি-কর্মের পশ্চাতে যে মন, বুদ্ধি ও বোধ এককথায় যে মনস্তত্ত্ব ক্রিয়া করিয়াছে, তাহা ভারতীয় সমগ্র সাংস্কৃতিক গূঢ়ৈষা (culture-complex)-বহির্ভূত। তাই বলিতে চাহিয়াছিলাম, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টি-প্রেরণার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে আমাদের সমগ্র বোধের রূপান্তর প্রয়োজন। সে রূপান্তর পৌরাণিক যুগ হইতে আধুনিক যুগে।

ঘরে-বাইরে

১

সাহিত্য সৃষ্টি কোন নৈতিক প্রেরণা-প্রসূত নয়, অর্থাৎ তাহার মধ্যে মানুষের পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ ভোগের কোন কার্য-কারণ তত্ত্বের অনিবার্য সংযোগ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা থাকে না। সাহিত্য মানুষের বহির্মুখী সত্তাকে ধীরে ধীরে অন্তর্মুখীন করিয়া জীবনের এক অপার রহস্যের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দেয়।

বিমলা অপরাধ করিয়াছে, তাহার জন্য দুঃসহ দুঃখভোগও করিয়াছে, ইহাই তাহার নারী জীবনের আদি ও অন্ত কথা? দুঃখ ও নিপীড়নকে ছাপাইয়া গিয়া তাহার জীবনে কি মুহূর্তে মুহূর্তে সীমাহীন কোন রহস্যালোক উদ্ঘাটিত হইয়া যায় নাই, যাহা মানুষের সকল নীতি ও বিচার বোধের ঊর্ধ্বে? মানুষের সকল উদ্যত অহঙ্কার যেখান হইতে আহত হইয়া ফিরিয়া আসে? তাহার নির্বাক চিত্ত আনত হইয়া সেই চির রহস্যের চরণ-তল স্পর্শ করে। বক্ষ নিঙড়াইয়া নিখিলেশকে একদিন জীবনের এই রহস্যময়তা উপলব্ধি করিতে হইয়াছে।

"আমরা এই সব সুখ-দুঃখকে সংসারের সঙ্গে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ভালোমন্দ একটা কিছু নাম দিয়ে চুকিয়ে ফেলে দিই। কিন্তু অন্ধকারের বক্ষ ভাসিয়ে দিয়ে এই যে ব্যথার উৎস উঠছে, এর কি কোন নাম আছে? * * * আমি একে বিচার করবার কে। হে প্রাণ, হে মৃত্যু, হে অসীম বিশ্বের ঈশ্বর, তোমাদের মধ্যে যে রহস্য রয়েছে আমি জোড় হাতে তাকে প্রণাম করি।"

এই 'প্রণাম,' চিত্তের এই সর্ববিধ সংস্কার ও অহঙ্কার মুক্তি যেমন সাহিত্য সৃষ্টির মূল প্রেরণা, তেমনি সাহিত্য পাঠেরও শ্রেষ্ঠ ফল লাভ। জীবনকে সামাজিক ও শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান দ্বারা নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে পারা যায় না। জীবন সকল সীমিতবোধকে ছাড়াইয়া অনন্তব্যাপ্ত।

বিমলাও পরিশেষে জীবনের এই স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছে। এমনকি সন্দীপকেও একদিন স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, বুদ্ধির সীমা ছাড়াইয়া জীবন অনন্তপ্রসারিত। মানব বুদ্ধির ক্ষীণ আলোক সেই অনন্ত প্রসারী জীবনের এক সংকীর্ণতম অংশকে হয়ত উদ্ভাসিত করিতে পারে, কিংবা তাহাও নয়।

বিমলা বলিয়াছে, 'আমরা জানিনে আমরা শেষ কথাটা জানিনে, এইটেই স্বীকার করা ভালো আপনাকেও জানিনে। মানুষ বড়ো আশ্চর্য্য—তাকে নিয়ে কী প্রচণ্ড রহস্যই তৈরি হচ্ছে তা সেই রুদ্র দেবতাই জানেন। মাঝের থেকে দগ্ধ হয়ে গেলুম। প্রলয়। প্রলয়ের দেবতাই শিব, তিনিই আনন্দময়, তিনিই বন্ধন মোচন করেন।"

'দগ্ধ হয়ে গেলুম' এই আর্তনাদ বিমলার জীবনে, কিংবা অন্য কোন মানুষের জীবনে শেষ কথা নয়। এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়াই মানুষ সেই সত্যকে লাভ করে। জীবনের রহস্যই এই। কেবল দুঃখের দানেই আনন্দকে লাভ করিতে হয়। জীবনের স্বরূপ বুঝাইতে তাই এমন বৈপরীত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। পরম দুঃখের পাত্রে আনন্দের অমৃত আস্বাদ করিতে হয়। আর কোন পথ নাই।

সেই সঙ্গে ইহাও বোধ করিতে পারা যায় যে, মানুষের সকল অপরাধের জন্য একমাত্র মানুষই দায়ী নয়। বিমলা তাহার অপরাধের জন্য যে শাস্তি পাইয়াছে, তাহা নিরতিশয় নিষ্ঠুর। সে শাস্তিতে তাহার বক্ষস্থল পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে। বিমলা শাস্তি পাক, ক্ষতি নাই, তাহাকে সে স্বীকার করিয়াও লইয়াছে, তাহার অপরাধ সম্পর্কে সে এমনি সচেতন। কিন্তু এই শাস্তি কি তাহার জীবনে সব? ইহার যে পাষাণভার বক্ষে তুলিয়া লইয়া সে আপনার দুই হাতে আপনাকে দলিত পিষ্ট করিয়াছে, তাহার সমস্ত ভার সে কেবল একা বাড়াইয়াছে? মনুষ্য অজ্ঞাত আর কোন শক্তি নয়?

হিন্দু রমণীর সতীত্ব, স্বামী ভক্তি ইত্যাদি বোধকে আশ্রয় করিয়া নারী-জীবন সম্পর্কে যে একটি অখণ্ড-বোধ গড়িয়া উঠে, তাহার মূলে রহিয়াছে বংশানুগতি লব্ধ সামাজিক বিচিত্র সংস্কার এবং শাস্ত্রোপদেশ। এই সামগ্রিক বোধের মধ্যে হিন্দু নারী বাড়িয়া উঠে, জীবন-যাপন করে, পরিশেষে একদিন এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। একটি বাঁধা নিয়ম, বাঁধা বোধ, বাঁধা বিশ্বাস, তাহারই ছাঁচে ঢালা এই জীবন।

সত্য যত বৃহৎ বা যত ক্ষুদ্রই হোক, তাহাকে বাহির হইতে লাভ করিতে পারা যায় না। অর্থাৎ তাহা মানুষের জীবনে সত্য নয়। তাই জীবনে তাহার আধ্যাত্মিক কোন ফল লাভ নাই।

চিরন্তন সত্যবোধকে নর-নারী নিত্য নূতন ভাবে আপনার স্বধর্মের অনুকূল নিত্য নূতন পথে লাভ করিবে। ইহাই শাশ্বত ধর্ম। এমনি করিয়া আপনার ভাবে আপনার পথে সত্যকে লাভ না করিলে, কোন সত্য আপনার হয় না। সত্যকে নিয়ত জীবন দিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। গাছপালার মত অবশ স্বীকৃতির মধ্যে সত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইতেই পারে না। মানুষ তাহার

দুঃখভোগ, ত্যাগ ও তপশ্চর্যার ভিতর দিয়া যতটুকু সত্য লাভ করে, ততটুকুই তাহার একান্ত আপনার। একমাত্র এই আপন-লব্ধ সত্যে মানুষের সার্থকতা।

নিখিলেশ ইহা গভীর করিয়া বোধ করিয়াছিল বলিয়া, বিমলার জীবনকে অমনিভাবে সার্থক করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল।

বিমলার সকল পরিচয় অপেক্ষা বড় পরিচয় বিমলা নারী, একক ব্যক্তিত্বের অনন্য মহিমায় সে আপন গৌরবে আপনি সমাসীন। এইখানে সে বিধাতার পরম আনন্দের ধন। সত্তার এই অন্তহীন বিস্ময় ও মহিমা তাহার আর সকল পরিচয় অপেক্ষা বড়। সে একটি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী, একজনের স্ত্রী, পরিবারের নানা জনের সহিত তাহার নানা সম্পর্কের বন্ধন; তাহার এই সকল পরিচয়ের সীমা ছাড়াইয়া তাহার সত্তা যে অসীমে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। নিখিলেশ বিমলাকে সকল বাঁধা পথ, বাঁধা বিশ্বাস ও সংস্কারের ঊর্ধ্বে জীবনের সেই গৌরব ও দুর্লভতা বোধ করিবার কথাই নানা ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে।

ইহার জন্য নিখিলেশকে যে অনেকখানি ত্যাগ করিতে হইবে, সে সম্পর্কেও নিখিলেশ সচেতন। নিখিলেশ সেই ত্যাগ ও দুঃখভোগের জন্য প্রস্তুত। কারণ নিখিলেশ জানে যে, এই সকল ত্যাগ ও দুঃখভোগ শেষে বিমলার মধ্যে যাহা অবশেষ থাকিবে, তাহার মূল্যে আর সকল ক্ষতি অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইবে।

বিমলা আপনার স্বভাবের নিয়মে আপনার শোক তাপের ভিতর দিয়া আপনি সার্থকতা লাভ করিবে। এই যে নারীকে আপনার স্বধর্মের পথে আপনার পরিণাম লাভ করিতে দেওয়া, ইহা যে স্বামীর দিক হইতে কতবড় ত্যাগ, তাহা ওই সমস্যার সম্মুখীন না হইলে মানুষ বোধ করিতে পারে না। বিমলার এই পরিণাম নিখিলেশের চোখের সম্মুখে ঘটিয়াছে। ইহার জন্য নিখিলেশকে যে কত অন্তর্দ্বন্দ্ব জয় করিয়া উঠিতে হইয়াছে, কত দুঃসহ দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে, তাহার সীমা পরিমাপ করিবে কে।

নিখিলেশ বিমলাকে বলিয়াছে,

"আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও আমি তোমাকে পাই। ওইখানে আমাদের দেনা পাওনা বাকী আছে।"

"এখানে আমাকে দিয়ে চোখ কান মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে। তুমি যে কাকে চাও জান না, কাকে পেয়েছো তাও জান না।"

"তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘর গড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকরণাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমি হওনি, আমিও হইনি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয়, তবেই আমাদের ভালবাসা সার্থক হবে।"

নিখিলেশ অন্যত্র এই একই কথা বলিয়াছে,

"বিমলা ছিল আমার ঘরের মধ্যে, সে ছিল ঘরগড়া বিমল ছোট জায়গা এবং ছোটো কতকগুলো বাঁধা নিয়মে তৈরি। তার কাছ থেকে যে ভালবাসা নিয়মিত পাচ্ছিলুম সে কি তার হৃদয়ের গভীর উৎসের সামগ্রী, না সে সামাজিক মিউনিসিপ্যালিটির বাষ্পের চাপে চালিত দৈনিক কলের জলের বাঁধা বরাদ্দের মতো?"

"স্মৃতি সংহিতার পুঁথির কাগজের কাটা ফুলে আমি ঘর সাজাতে চাই নি, বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণ বিকশিত বিমলাকে দেখবার বড় ইচ্ছা ছিল।"

বিচিত্র সংস্কার, নীতি ও তত্ত্বের সীমাবোধের মধ্যে সীমিত আমরা যেমন আমাদের সম্পূর্ণ পরিচয় জানি না, তেমনি ওই সমস্ত সীমিতবোধের সহিত অন্বিত করিয়া আমরা আমাদের পরিচিত নর-নারীকে জানি বলিয়া তাহাদের সমগ্র প্রকাশটি আমাদের বোধের সীমার বাহিরে রহিয়া যায়।

নর-নারী আপনার পূর্ণ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া কি মিলিত হয়, না মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করে? বস্তুত ওই কথাটাই আমাদের জীবনে কোন অর্থ বহন করে না। দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ নর-নারী পারিবারিক ও সামাজিক কতকগুলি দায় ভার বহন করে মাত্র। সে জীবন জিজ্ঞাসা বিদ্ধ নয়, মুমুক্ষু নয়, চিরন্তন আশা-বিশ্বাসকে তাই নির্বিচারে মানিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত থাকে। বাঁধা পথ, বাঁধা নির্দেশের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে তাহাদের বিশীর্ণ বক্ষ মুহূর্তে বিশুষ্ক হইয়া উঠে।

মূল্য দিয়া জীবনকে দুর্মূল্য করিতে জানি না, দুঃখভোগে জীবনের সার্থকতা বোধ করি না বলিয়া, জীবন ও জগৎকে আমরা এত সহজে 'মায়া' বলিতে পারি।

বিমলার মধ্যে জীবনের এই জাতীয় কোন পিপাসা ছিল না। সে কতকগুলি সংস্কার বুকে জড়াইয়া তাহারই মধ্যে তাহার ইহকাল পরকাল ধন্য করিতে চাহিয়াছে। এই নিশ্চিত নিরুপদ্রুত পরিতৃপ্ত জীবনের মধ্যে নিখিলেশের উক্তি কেমন অর্থহীন, অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এই জীবনে সে তাহার কোন প্রয়োজন বোধ করিতে পারে না। এই সকল প্রসঙ্গে তাহার কেমন অস্বস্তি বোধ জাগে, কখন বা করুণা মিশ্রিত সস্নেহ পরিহাস করিয়া প্রসঙ্গ পরিহার করিতে চায়। বিমলা নিখিলেশকে বলিয়াছে,

"বইয়ে পড়েছি আমরা খাঁচার পাখী, কিন্তু অন্যের কথা জানিনে, এই খাঁচার মধ্যে আমার এত ধরেছে যে বিশ্বেও তা ধরে না।"

যে প্রবৃত্তি ও অজ্ঞানতা মানুষকে পাপে প্রলুব্ধ করে, দুঃখভোগের মাঝখানে টানিয়া আনে, বিমলার জীবনে তাহা আত্ম-প্রকাশ করিবার আকস্মিক সুযোগ আসিয়াছে দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের নেতা সন্দীপের আবির্ভাব আশ্রয় করিয়া।

প্রবৃত্তি এবং তাহার যে কোন বিকৃত প্রকাশের সহিত বিমলাকে ইতিপূর্বে সংগ্রাম করিতে হয় নাই। তাহার বিচিত্র ছদ্মবেশের সহিতও তাহার কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না। কোন প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন না হইবার জন্যই প্রবৃত্তি বিমলার জীবনে প্রচ্ছন্ন ছিল মাত্র। আর তাহার বধূজীবনের বিচিত্র সংস্কার ও মাধুর্য-লোক, মানুষের গভীরতম সত্তার কত বাহিরের সামগ্রী!

বিমলা আজ সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। তবে বিমলার স্বভাবের মধ্যে স্থূলতা একটু অধিক মাত্রায় ছিল বলিয়া, সন্দীপের কামনাগ্নি স্পর্শে মুহূর্তে সহস্র শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বিমলার জীবনে তাহা এমনি অপরিচিত অথচ এত সত্য। বিমলা আপনার পরিচয়ে আজ আপনি বিস্মিত। দেশাত্মবোধের একটা ছদ্মবেশ না থাকিলে এবং আপনার মনকে ভুলাইবার এমন একটা উপায় না থাকিলে হয়ত তাহার এই স্খলন এত দ্রুত হইত না।

বিমলা যখন সচেতন হইয়াছে, তখন সে ঘর হইতে বাহিরে অনেক দূরে, তখন সে এমনকি আত্মকর্তৃত্ব শূন্য; বাহির হইতে সহায়তা না পাইলে সে যে-কোন মুহূর্তে অতল শূন্যতার মধ্যে তলাইয়া যাইতে পারে। বিমলা অধঃপতনের এক একটি সোপান নিম্নে অবতরণ করিয়াছে গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতেছে এই বোধ লইয়া। সন্দীপের প্রথম বক্তৃতায় বিমলা মুগ্ধ, বিস্মিত।

"সেদিন একটা অপূর্ব্ব আনন্দ এবং অহঙ্কারের দীপ্তি নিয়ে বাড়ী ফিরে এলুম। ভিতরে একটা আগুনের ঝড়ের বেগ আমাকে এক কেন্দ্র থেকে আর এক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেল। আমার ইচ্ছা করতে লাগল, গ্রীসের বীরাঙ্গনার মতো আমার চুল কেটে দিই ওই বীরের হাতের ধনুকের ছিলা করবার জন্য আমার এই আজানুলম্বিত চুল।"

ভাবাবেগ জাগ্রত হইয়া উন্নততর প্রেরণাকে যেমন দ্রুত ঊর্ধ্বায়িত করিতে পারে, তেমনি উহা নিম্নতর প্রেরণার পশ্চাতে ক্রিয়া করিয়া মানুষকে অত্যন্ত দ্রুত নিম্নে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে। ইহা নির্ভর করে ভাবাবেগের পশ্চাদ্‌নিহিত উদ্দেশ্যের উপর। ভাবাবেগ আশ্রয়ী উন্নততর পরিণাম মনুষ্য-জীবনে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। ভক্তি ও ভাবাবেগ এক বস্তু নয়। একটি স্থায়ীবোধ, একটি অস্থায়ী। একটি মানুষের অতি উন্নত শান্তাবস্থা, অপরটি

নিম্নতর বিক্ষুব্ধ অবস্থা। একটিতে প্রাণ-মনের বিকাশ ঘটে, অন্যটিতে প্রাণ-মনের শক্তি দ্রুত নিঃশেষিত হইয়া যায়। ভক্তির মধ্যে আছে অহংকার, বিলুপ্তি, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ; ভাবাবেগের মধ্যে অহংকারই প্রবল, আত্মবোধ স্ফীত হইয়া বিশ্বের সকল মহত্ত্ববোধকে লাঞ্ছিত করিতে উদ্যত হয়। ভাবাবেগ মানুষের অনায়াসলব্ধ, সুলভ, প্রবৃত্তি প্রেরণার মত আদিম, সহজ উদ্দীপক। ভক্তি সুদীর্ঘ কালের অনুশীলন, সাধন ও সংযমের ফল, মানব হৃদয়ের অতি দুর্লভ বৃত্তি।

সন্দীপের দেশ প্রেমের পশ্চাতে ছিল আপনার স্থূল ভোগের উপকরণ সঞ্চয় করা, আপনার পাপের শক্তিকে একটি বিস্তৃত ক্ষেত্রে লীলায়িত করা। বিমলার মধ্যে সদ্য জাগ্রত ভাবাবেগকে সে ক্রমাগত স্ফীত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, পরিণামে তাহাকে আত্মকর্তৃত্ব শূন্য করিয়া কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য। নারীর সহিত এই আচরণ সে ইতিপূর্বে বহুবার করিয়াছে, ভোগশেষে উচ্ছিষ্ট পাত্রের মত তাহাদের পথপার্শ্বে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে।

বিমলা আজকাল আপনার মধ্যে প্রতিনিয়ত যে শক্তির প্রেরণা বোধ করে তাহা প্রবৃত্তির। বিমলা ইহারই চর্চা করিয়াছে, সন্দীপ সেই অগ্নিতে ক্রমাগত ইন্ধন যোগাইয়াছে। মানুষের এই প্রবৃত্তি অত্যন্ত সহজে উদ্দীপ্ত হইয়া উন্নততর বোধের সকল আলোক নিভাইয়া দিয়া আপনার চতুর্দিকে এমন এক সংকীর্ণ অন্তরাল সৃষ্টি করে যাহাতে মৃত্যুও আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠে, অপরূপ তাহার মোহন রূপ।

সন্দীপ জানে বিমলাকে তাহার ক্ষুধিত ব্যগ্র দুই বাহুর মাঝখানে টানিয়া আনিতে যথেষ্ট সময় লাগিবে। সন্দীপ তাই নিখিলেশের গৃহে আরও কিছুকাল কাটাইতে মনস্থ করিয়াছে। ইহার জন্য সে তাহার কাজের ধারা পরিবর্তিত করিয়াছে, বিমলাকে বলিয়াছে, "আপনি আমাদের মৌচাকের মক্ষীরাণী আমরা আপনাকে চারিদিকে ঘিরে কাজ করব কিন্তু সেই কাজের শক্তি আপনারই—তাই আপনার থেকে দূরে গেলেই আমাদের কাজ কেন্দ্রভ্রষ্ট আনন্দহীন হবে। আপনি নিঃসঙ্কোচে আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।"

বিমলা আপনার মধ্যকার নবলব্ধ প্রেরণাকে নারী জীবনের এক অত্যাশ্চর্য অনুভূতি বোধ করিয়া ধন্য হইয়াছে। তাহারই প্রেরণায় সন্দীপের মত পুরুষের অন্তর্লোক হইতে কর্ম-ধারা সহস্র দিকে বহিয়া চলিয়াছে। তাহারই কটাক্ষপাতে সহস্র তরুণ প্রাণ আত্ম-ত্যাগের জন্য দিকে দিকে উন্মত্ত অধীর হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহারই চতুর্দিক ঘিরিয়া কী আশ্চর্য কর্ম-জাল বোনা চলিতেছে। সেই বিচিত্র কর্ম-জাল কোন্ নূতন রূপ গড়িয়া তুলিবে কে জানে। তবে আজ বিমলা ধন্য। তাহার অন্তরের এই শক্তিকে যে পুরুষ নিত্য বন্দনায়

উদ্বোধিত করিয়াছে, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতায়, ভক্তিতে বিমলার অন্তর আজ পরিপূর্ণ।

প্রবৃত্তির প্রথম অনুভূতি, উহারই অনুপ্রেরণা মানুষের জীবনে যে কী অপরূপ মোহ সঞ্চার করে, তাহার সকল দিন রজনীকে উহা যে কী রঙ্গীন স্বপ্নে ভরাইয়া তুলে, বাহিরের বিপুল জগৎকে উাহারই অতি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে টানিয়া ওই সীমিত লোকটিকে কী আশ্চর্য গৌরব ও মহিমা দান করে, তাহারই পরিচয় লাভ করিতে বিমলার এই পর্যায়ের অনুভূতির দুই একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"কখন একদিন কোনো খবর না দিয়ে সমুদ্রের বান ডেকে এল—আমার বুক ফুলে উঠল, আমার কূল ছাপিয়ে গেল, সমুদ্রের ডমরুর তালে তালে আমার স্রোতের কলতান আপনি বেজে বেজে উঠতে লাগল ; আমি আপনার রক্তের ভিতরকার সেই ধ্বনির ঠিক অর্থটাতো কিছুই বুঝতে পারলুম না। সে আমি কোথায় গেল ? হঠাৎ আমার মধ্যে রূপের ঢেউ কোথা থেকে এমন করে ফেনিয়ে এল ? সন্দীপবাবুর দুই অতৃপ্ত চোখ আমার সৌন্দর্য্যের দিকে যেন পূজার প্রদীপের মত জ্বলে উঠল।"

"আমি পারি সমস্তই পারি, আমার মধ্যে একটা দিব্য-শক্তি এসেছে—সে এমন একটা কিছু যাকে ইতিপূর্বে আমি অনুভব করি নি, যা আমার অতীত।"

বিমলার দিন-রাত্রি এমনি ঘোরের মধ্যে কাটিয়া চলিয়াছে। এই প্রেরণায় তাহার বধূ-জীবনের সকল সংস্কার একের পর এক যে কখন ভাসিয়া গিয়াছে, তাহা বিমলা বুঝিতেও পারে নাই। নৈতিক বিচিত্র সংস্কার মানুষকে ঊর্ধ্বতর পরিণাম লাভ করিতে হয়ত সহায়তা করে না, কিন্তু নৈতিক স্খলন হইতে কতকটা রক্ষা করে। যে সকল নর-নারী সত্যের পিপাসা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যে পিপাসায় জীবনের আর সকল মূল্যবোধ অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠে, তাহাদের জীবনে এই সকল সংস্কার যে বন্ধন সৃষ্টি করে তাহাতে সংশয় নাই। উহা জয় করিয়া উঠিতে তাহাদের কোথাও মরণান্তিক সংগ্রাম করিতে হয়।

বিমলা সংস্কার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে স্বেচ্ছায় নয়, ইহার জন্য তাহাকে নিরন্তর সংগ্রামও করিতে হয় নাই, তাহার ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তি প্রেরণা তাহাকে সংস্কারবহির্ভূত জীবনে টানিয়া আনিয়াছে! সেদিন বিমলা তাহার জীবনের অতবড় পরিণাম-সম্পর্কে কিছুমাত্র সচেতন ছিল না। বিমলা সে পরিচয়ও দিয়াছে।

"আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো সম্পর্কের মধ্যে যখন ছুরি চলছিল তখন আমার মন এমন একটা তীব্র আবেগের গ্যাসে আগাগোড়া আচ্ছন্ন হয়ে রইল যে, আমি টেরই পেলুম না কতবড় নিষ্ঠুর একটা কাণ্ড ঘটছে।"

বিমলার এই পরিণাম লাভের তখনও কিছু অবশেষ আছে। বিমলার এই মানসিক অবস্থায় নারী হইয়া মেজরাণী শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। যে অবস্থায় নারী সর্বনাশের অতলতায় তলাইয়া যায়, তাহার ইহকাল পরকালকে কানাকড়ির মূল্যে বিকাইয়া বসে, ইহা ঠিক তাহারই পূর্বাবস্থা।

সন্দীপ ও বিমলা অসংবৃত অবস্থায় নিভৃতে আলাপ-আলোচনা করিবার আর যাহাতে কোন সুযোগ না পায়, তাহার জন্য মেজরাণী বৈঠকখানা ঘর হইতে বিমলার গৃহে আসিবার পথে একদিন দারোয়ান বসাইয়া দিল। বিমলা বধূ-জীবন হইতে ইতিমধ্যে কতদূরে সরিয়া আসিয়াছে তাহা পরিমাপ করিতে এই ঘটনার প্রয়োজন ছিল।

এই ঘটনায় সচকিত হইয়া বিমলা তাহার জীবন-ধারা অস্বাভাবিকতা তো বোধ করে নাই, বরং ইচ্ছা প্রতিহত হইতে তাহা আরও প্রবল, আরও অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। সন্দীপ লিখিয়াছে,

"এর পরে মক্ষী রোজই বৈঠকখানায় এসে বেহারাকে দিয়ে আমাকে ডাকিয়ে এনে আলাপ করতে আরম্ভ করলে। কোনো রকম প্রয়োজনের কিংবা আকস্মিকতার ছুতোটুকু পর্য্যন্ত রাখলে না।"

সন্দীপ ও বিমলা পরস্পরকে আরও নিকটে লাভ করিয়াছে। নিভৃত আলাপ-আলোচনার সুযোগ লাভ করিয়া সন্দীপ জাতীয়তাবোধ, মানবিকতা, মডার্নিজম, বস্তুতান্ত্রিকতা ইত্যাদি মতবাদের ক্ষীণ একটি আবরণ টানিয়া, কখন বা সম্পূর্ণ অনাবৃতভাবে বিমলার ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে যত দিক দিয়া পারিয়াছে ক্রমাগত উত্তেজিত ও শিথিল করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বিমলা সন্দীপের নিকট শিক্ষা পাইয়াছে প্রবৃত্তিই নর-নারীর একমাত্র স্বভাব-ধর্ম। এই স্বভাব হইতে নর-নারীকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কতকগুলি অস্বভাবী মানুষ সমাজ ও ধর্মের নানা নৈতিক বন্ধন ও তজ্জাত নানা সংস্কার গড়িয়া তুলিয়াছে। এই সকল সংস্কার-বন্ধন একের পর এক ছিন্ন করিয়া, একের পর এক আবরণ উদ্ভিন্ন করিয়া তাহার এই স্বভাব লাভ করাই নারীর পরম লাভ।

অসংবৃত প্রবৃত্তি বিমলাকে তখন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। মানুষের উন্নততর বোধের সকল দীপ একে একে নিভাইয়া দিয়া বিমলা তখন আপনার অন্তরে বাহিরে চতুর্দিকে অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে একাকী বসিয়া। সন্দীপ সেই সুযোগে বিমলার সম্মুখে আপনার কামনা-পাত্র পাতিয়া ধরিয়াছে, তাহাতে কোথাও অন্তরাল বা অগোচরতা ছিল না।

এতদিন পরে বিমলা আপনার পরিণাম-সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে। এযে কোন সর্বনাশের স্রোতে সে ভাসিয়া চলিয়াছে, সন্দীপের সকল তত্ত্বের পশ্চাৎ

প্রেরণা যে কী, এই সমস্ত কিছু তাহার নিকট দিবা-লোকের ন্যায় মুহূর্তে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

আজকাল বিমলা তাহার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু আপনকৃত অপরাধ হইতে অত সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায় না। একদিকে শিথিল ইন্দ্রিয়ের দুর্বার নিম্নাভিমুখী প্রেরণা অন্যদিকে উহাকে জয় করিয়া উঠিবার সচেতন মনের প্রাণপণ প্রয়াস। প্রাণ-মনের এই মন্থনে যে বিষ উঠে তাহার জ্বালায় জর্জরিত নীল হইয়াও যে বাঁচিয়া যায়, সেই জীবনে অমৃত লাভ করিতে সমর্থ হয়।

মৃত্যু নিশ্চিৎ জানিয়াও মানুষ যে অগ্নি বিবিক্ষু পতঙ্গের মত এই দিকে ছুটিয়া যায়, তাহার একটা রূপ আছে বলিয়া। অপরূপ মোহিনী মূর্তির বেশে সে মানুষকে হাতছানি দিয়া ডাকে, তাহারই মায়ায় সর্বনাশও রমণীয় হইয়া উঠে। তাহারই দুর্লভরূপ মণ্ডিত মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া তাহার জীবন কাটিয়া যায় বড়ো দুঃখে, বড়ো সুখে।

"এই দুরন্ত ইচ্ছার প্রলয় মূর্তি দিনরাত আমার মনকে টানছে। মনে হতে লাগল বড়ো মনোহর নিজেকে একেবারে ছারখার করে দেওয়া। তাতে কত লজ্জা, কত ভয়, কিন্তু বড়ো তীব্র মধুর সে।

"তার কৌতূহলের অন্ত নেই—যে মানুষকে ভালো করে জানিনে, যে মানুষকে নিশ্চয় করে পাব না, যে মানুষের ক্ষমতা প্রবল, যে মানুষের যৌবন সহস্র শিখায় জ্বলছে, তার লুব্ধ কামনার রহস্য যে—কী প্রচণ্ড কী বিপুল। এ তো কল্পনাও করতে পারি নি।"

সন্দীপ সম্পর্কে বিমলার মনে আজ আর কোন মোহ নাই, তাহার সকল তত্ত্বের স্বরূপসম্পর্কে সে সচেতন, কিন্তু শিথিল ইন্দ্রিয়ের উপর তাহার কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। বহির্বস্তুর সংস্পর্শমাত্রেই আজও তাহা উন্মুখ হইয়া উঠে। আজ বিমলার মন একদিকে, বিমলার প্রাণ অন্যদিকে। এই আত্ম-সচেতনতা হইতে বুঝিতে পারা যায়, বিমলা এই সংগ্রামে কিছুটা বল ফিরিয়া পাইয়াছে। সচেতন হইয়া বিমলাকে তাহার এই অসংযত প্রবৃত্তির বিচিত্র লীলা, তাহার আশ্চর্য গতি-বিধি দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হইয়াছে। ইহাই অপরাধের নিষ্ঠুরতম শাস্তি। পরিণাম-সম্পর্কে সচেতন হইয়াই ধীরে ধীরে পরিণামকে মানিয়া লওয়া।

"তবু আমার এই রক্তে মাংসে এই ভাবে ভাবনায় গড়া বীণাটা ওঁরই হাতে বাজতে লাগল।

"সেই হাতটাকে আমি ঘৃণা করতে চাই এবং এই বীণাটাকে। তবু কিন্তু

বীণা তো বাজল। আর সেই সুরে যখন আমার দিনরাত্রি ভরে উঠল তখন আমার আর দয়া মায়া রইল না। এই সুরের রসাতলে তুমিও মজো, আর তোমার যা কিছু আছে সব মজিয়ে দাও—এই কথা আমার শিরার প্রত্যেক কম্পন, আমার রক্তের প্রত্যেক ঢেউ আমাকে বলতে লাগল।”

প্রবৃত্তি মানুষের দৃষ্টিকে ক্রমাগত সংকীর্ণ, সংকুচিত করিয়া উহারই আবর্তের মধ্যে মানুষকে ঘুরাইয়া মারে। মানুষের জগৎ যতই সংকীর্ণ হয়, প্রবৃত্তির শক্তি ততই প্রবল হয় এবং মানসিক শক্তি ততই হ্রাস পাইতে থাকে। অধ্যাত্ম প্রেরণা ও প্রবৃত্তি দুই বিপরীত দিক হইতে শক্তি সঞ্চয় করে। একটির শক্তি ব্যাপ্তিবোধে, আত্মবোধ বা অহংকারের ক্রমিক হ্রাস প্রাপ্তিতে, অন্যটির শক্তি ক্রমিক সংকীর্ণতাবোধে আত্মবোধের ক্রমিক স্ফীতিতে। চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার তীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়া বিমলার অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাহার অধ্যাত্ম সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলেন। বিমলার এই সংগ্রামে সহায়তা করিবার জন্য তিনি তাই তাহার সম্মুখে বারবার মনুষ্য-জীবনের মহত্তর মূল্যবোধের দিকগুলি উদ্ঘাটিত করিয়া ধরিয়াছেন,—এই বিরাট বিশ্বের বিপুল কর্মধারা, ইহার অপরূপ সৌন্দর্য ও মাধুর্য, অনন্তকোটি গ্রহ-নক্ষত্রের অচিন্তনীয় বেগে অনন্ত শূন্যে কক্ষাবর্তন, মনুষ্য দৃষ্টি ও বোধের অগোচরের সীমাহীন জগৎ।

বিকারতপ্ত চিত্তে, জীবনের বিপরীত প্রেরণায় মহত্ত্বের প্রেরণা মাত্রেই কটু, বিস্বাদ, একান্ত উত্তাপবিহীন বলিয়া বোধ হয়। বিমলাও ইহা বোধ করিয়াছে।

“কিন্তু কী হবে। আমি অমন করে দেখতেই চাই নে। যে নেশায় আমায় পেয়েছে সেই নেশাটা ছেড়ে যাক এমন ইচ্ছাও যে আমি সত্য করে করতে পারিনে।”

চিত্তের এই আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে আবার কোথা হইতে ক্ষীণ আলোক মুহূর্তের জন্য স্ফুরিত হইয়া যায়। যে কোন পরিণামে মানুষ একান্ত অধ্যাত্ম প্রেরণা শূন্য হইতে পারে না।

“এক একবার চমকে উঠে আপনার দিকে তাকাই আর ভাবি আমি আগাগোড়া একটা দুঃস্বপ্ন। এক সময় হঠাৎ দেখতে পাব এ আমি সত্য নয়। এ যে ভয়ানক অসংলগ্ন, এর যে আগার সঙ্গে গোড়ার মিল নেই।”

বিমলার এই মানসিক অবস্থার কালে সন্দীপ তাহাকে সর্বনাশের কোন অতলে তলাইয়া দিতে পারিত। বাহিরে কতকগুলি ঘটনা এই সময় বিমলাকে রক্ষা না করিলে বিমলা যে ওই পরিণাম লাভ করিত না তাহা সন্দীপ বিমলা কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না।

এমনি করিয়া বাহির হইতে বিমলা বারংবার রক্ষা পাইয়াছে বটে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে মানুষ যতদিন না শক্তি পায়, ততদিন তাহার ভয় ঘুচে না, কারণ যে কোন মুহূর্তে সে সর্বনাশের অতলে তলাইয়া যাইতে পারে।

বিমলা আজও ভাবিয়া উঠিতে পারে না, তাহার সন্দীপহীন জীবন কীরূপ দাঁড়াইবে। বিকারের রোগীর মত এই সমস্ত কিছু কি সেদিন দূর হইয়া যাইবে ; সে কি তখন কোন্ দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া তাহার পূর্ব জীবনের সমস্ত কিছুকে আবার কি তাহার স্বাভাবিকতায় দেখিতে পাইবে, না শূন্যতার মধ্যে হাত পা ভাঙিয়া চিরকালের জন্য হারাইয়া যাইবে ?

অন্তর্দ্বন্দ্ববিক্ষত মানুষ প্রথমে ভাবে কোন উপায়ে বিবেকবোধ লুপ্ত করিয়া দিলে এই বিক্ষোভ হইতে হয়ত নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়। বস্তুত এই বিবেকবোধই প্রায়শ্চিত্তকে একান্ত অসহনীয় করিয়া তুলে। বিমলাও এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অসহনীয় যন্ত্রণা দীর্ঘকাল সহ্য করিতে না পারিয়া অমনি আত্মহত্যার পথ বাছিয়া লইতে কতবারই না প্রলুব্ধ হইয়াছে।

"তখনই ইচ্ছে হল, ওই পরগাছটাকে জানালার বাইরে ফেলে দিই। ছবিটাকে কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে আনি—প্রলয় শক্তির লজ্জাহীন উলঙ্গতা প্রকাশ হক। হাত উঠেছিল, কিন্তু বুকের মধ্যে বিঁধল, চোখে জল এল—মেজের উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম। কী হবে, আমার কপালে কী আছে।"

বিমলার জীবনে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও কিছুকাল স্থায়ী হইয়াছে। সন্দীপের ব্যক্তিত্ব এখনও তাহার উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। তাহার স্তুতিমাত্রেই এখনও সে মুগ্ধ আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে। সে নারী নয়, কোন গৃহের বধূ নয়, কোন পুরুষের স্ত্রী নয়, কাহারও সহিত তাহার কোন আত্মীয় বন্ধন নাই। সে নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব মাত্র, সে এই সমগ্র প্রকৃতির অন্তরালবর্তী আদ্যাশক্তির মূর্ত প্রকাশ। তবে তাহার সাধারণ নারীসুলভ লজ্জা কেন, সংকোচ ও সাধ্বস কেন, সাধারণ নারীর কোন বোধ, কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহার জীবনে থাকিবে কেন ? সে সকল সমাজ-বন্ধন, নীতি-বন্ধনের ঊর্ধ্বতর, গুণাতীত সত্তা। ভাবাবেগ মানুষকে এমন বোধও করায়! সন্দীপের নিকট শুনিয়া শুনিয়া বিমলাও ইহা বোধ করিয়াছে।

সন্দীপ বিমলাকে আবার ভাবোন্নত করিয়া তাহাকে এক প্রকার সংজ্ঞাশূন্য করিয়া তাহার নিকট হইতে কয়েক সহস্র মুদ্রা দিবার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইল। এই অবস্থায় মানুষকে দিয়া যাহা ইচ্ছা করাইয়া লইতে পারা যায়।

নারীর অন্তরে এই ভাব জাগ্রত করিয়া তুলিতে হয় কেমন করিয়া তাহা সন্দীপ জানে, ইহার সকল কৌশল তাহার বিদিত।

বিমলার জীবনে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহা প্রবৃত্তি ও সংস্কারের মধ্যে নয়। সমগ্র উপন্যাস কাহিনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কোথাও তাহা উল্লেখ করেন নাই। যে-বোধ আশ্রয় করিয়া বিমলা ওই পাপ পঙ্ক হইতে উঠিয়া আসিয়াছে, তাহা নর-নারীর সকল সংস্কার-মুক্ত চিরন্তন শ্রেয়ের পথ। বিমলার অন্তর্দ্বন্দ্ব শ্রেয়ের সহিত প্রেয়ের। বিমলা সতীত্ব-বোধ হইতে, স্বামী-প্রেমের বন্ধন হইতে, বধূর সংস্কার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, পরিণামে ওই সকল বোধ ও ধর্ম-বিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহা বুঝিলে বিমলা চরিত্রের মূল ভাব প্রেরণাকেই ভুল বুঝা হইবে।

স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিবার জন্য, উন্নততর পরিণাম লাভের জন্য সে মানুষের সহজাত অধাত্ম প্রেরণাকে আশ্রয় করিয়াছে। এই প্রেরণায় সংস্কার মাত্রেই বন্ধন। মানুষের মধ্যে এই যে সহজাত অধ্যাত্ম প্রেরণা নারীর জীবনে তাহার প্রথম প্রকাশ ঘটে স্নেহ রূপে। এই স্নেহ তাহাকে প্রথম ত্যাগ করিতে শেখায়, চিত্তবৃত্তিকে ধীরে ধীরে অন্তর্মুখীন করে।

বিমলার জীবনে এই শ্রেয়ের বোধ জাগ্রত করিয়াছে কিশোর অমূল্য। এই শ্রেয়ের বোধ প্রবল হইয়া উঠিতে তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব অবসানের দিকে ঝুঁকিয়াছে।

বিমলা আজও প্রবৃত্তির প্রেরণা বোধ করে সত্য, কিন্তু উহা তাহার অন্তরের মধ্যে তেমন করিয়া প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তাহার ফলে বস্তুর নিকট সংস্পর্শে আসিবামাত্র আজও তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি অন্তরের-সম্পূর্ণ ঘৃণা ও বিরূপতা সত্ত্বেও বারংবার শিথিল হইয়া পড়ে।

মানসিক এই পরিণতি লাভের পরও বিমলা স্বামীর ক্যাস হইতে টাকা চুরি করিয়াছে; টাকা নয়, কয়েক সহস্র টাকা মূল্যের মোহর। এই অপরাধের গভীরতা সম্পর্কেও বিমলা সচেতন। এই আচরণ হইতে বুঝা যায় যে, বিমলার বিবেকবোধ আজ সম্পূর্ণ জাগ্রত হইলেও, তাহার প্রবৃত্তির উপর তাহার কোন নিয়ন্ত্রণ নাই।

"আজ আমি এই যে টাকা চুরি করে আনলুম এতো টাকা চুরি নয়, এযে আকাশের চিরকালের আলো চুরিরই মতো। এ চুরি সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি, বিশ্বাস চুরি, ধর্ম্ম চুরি।"

সে যেন প্রাণী-লোক হইতে নিঃসঙ্গ একাকীত্বের কোন এক লোকে অকস্মাৎ উৎক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাই কি প্রেত-লোকের অনুভূতি? মরিয়া গিয়া কি মানুষ এমনি বোধ করে? ইহা যেন ঠিক তাহাও নয়। কারণ মানুষের

প্রেম জন্ম মৃত্যুর মধ্যে সেতু রচনা করিয়া পারাপার করে। মৃত্যু-লোক তাই এই স্থূল জগতের একটি সূক্ষ্মতর পরিণাম। এমনি অন্তহীন জগৎ এক প্রেমের সূত্রে বাঁধা পড়িয়াছে, মৃত্যু বা বিচ্ছেদ তাই এখানে একান্ত সত্য নয়। বিমলা যে-লোকে আপনাকে বোধ করিয়াছে, সে-লোকে প্রেম নাই, ধর্ম নাই, সত্য নাই, বিশ্বাস নাই, তাহাই যথার্থ মৃত্যু-লোক।

আশ্রয়-লাভের আশায় এই কালে সে সন্দীপকে যতই নিকটে লাভ করিতে চাহিয়াছে, ততই সে তাহার দীন ও কুটিল স্বভাবের পরিচয় লাভ করিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। মানুষ হিসাবে সে একান্ত সাধারণ। যে আবেগ সঞ্চার করিয়া সে আপনার চতুর্দিক ঘিরিয়া একটি অলৌকিকত্বের আবরণ টানিয়া দিতে সমর্থ হয়, আজকাল সেই বিদ্যাটাও তাহার অনায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ইহার পর হইতে বিমলা ধীরে ধীরে সন্দীপের আকর্ষণ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া লইয়াছে।

যেবোধ আশ্রয় করিয়া বিমলা মুক্তি লাভ করিয়া বাঁচিয়াছে, তাহা বলিয়াছি কোন সংস্কার বা ঐ জাতীয় কোন বিশ্বাস বোধ নয়। বিমলা নর-নারীর সহজাত সকল সংস্কারমুক্ত শ্রেয়ের পথ অবলম্বন করিয়াছে। পরিশেষে সে নিখিলেশের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছে বটে. কিন্তু তাহার সহিত তাহার পূর্ব জীবনের কোন সংস্কার বিজড়িত ছিল না।

এই দুঃখ-দুর্দশার ভিতর দিয়া বিমলা পরিণামে যে সত্যবোধ করিয়াছে, তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে বিমলারই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"চলো, চলো, এইবার বেরিয়ে পড়, সকল ভালোবাসা যেখানে পূজার সমুদ্রে মিশেছে, সেই সাগর-সঙ্গমে। সেই নির্ম্মল নীলের অতলের মধ্যে সমস্ত পঙ্কের ভার মিলিয়ে যাবে। আর আমি ভয় করিনে আপনাকেও না আর কাউকেও না। আমি আগুনের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছি যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলুম তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তাঁর গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন।"

বিমলার অন্তরে এতদিন পরে সেই শ্রদ্ধাভক্তি জাগ্রত হইয়াছে। এতদিনে বিমলা বুঝিয়াছে, মানুষের স্নেহ প্রেম প্রীতিই পরিণামে এক সীমাহীন পরিণাম লাভ করে ;—তাহার যে নামই দেওয়া যাক-না-কেন।

বিমলা বলিয়াছে, 'আর আমি ভয় করিনে আপনাকেও না আর কাউকেও না।' আপনাকে মানুষ যতদিন ভয় করে, ততদিন সে পরকেও ভয় করে।

আপনাকে যে জয় করিয়া উঠিয়াছে, তাহার আর পরকে ভয় নাই। গভীর দুঃখভোগের ভিতর দিয়া, পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া বিমলা পরিশেষে ইন্দ্রিয় জয় করিতে শিখিয়াছে। সে আগুনে বিমলার সকল স্থূলতা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে।

এই দুঃখভোগের ভিতর দিয়া বিমলার মধ্যে আজ এমন একটি সত্ত্বা গড়িয়া উঠিয়াছে, যার 'মরণ নেই'। অন্তরের মধ্যে এই যে এক অমর সত্ত্বার উপলব্ধি, ইহাই মানুষের প্রকৃত অধ্যাত্ম উপলব্ধি। কিন্তু মানুষের পরিণাম এইখানেই শেষ হইয়া যায় না। জীবনের সর্বশেষ সার্থকতা হইল, এই অধ্যাত্ম সত্ত্বাকে ঈশ্বরীয় ভক্তিতে বিগলিত করিয়া দেওয়া—সত্ত্বার নিঃশেষ আত্ম সমর্পণে।

তাহারই প্রবৃত্তির আগুনে 'ঘরে-বাইরে' সে যে আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছে, তাহার জন্য তাহাকে যে ভয়ঙ্কর শাস্তি পাইতে হইবে, এ সম্পর্কে বিমলা সদা সচেতন। তাহার নব-লব্ধ অধ্যাত্মবোধ তাহাকে এই দিব্য-দৃষ্টি দিয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়মের ন্যায় ইহা অমোঘ। আত্মিক নিয়মে বিমলা যে কিছু লাভ করিয়াছে তাহা সত্য, প্রাকৃতিক নিয়মে বিমলাকে যে কিছু হারাইতে হইবে তাহাও সত্য। সেই উদ্যত শাস্তি যে কোন মুহূর্তে তাহার শিরে বজ্রপাতের মত নামিয়া আসিতে পারে। বিমলা তাহার জন্য সর্বদা উৎকণ্ঠিত।

যে দুই জনকে আশ্রয় করিয়া বিমলা শ্রেয়ের পথে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার অপরাধের শাস্তি আসিয়া পড়িয়াছে তাহাদের উপর। তাহার এই শাস্তি তাই আরও নিষ্ঠুর আরও ভয়ঙ্কর। এই শাস্তিতে বিমলা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

ঋষি কবির প্রার্থনায় আছে, আমাকে মৃত্যু হইতে উদ্ধার কর, কিন্তু অমৃত হইতে নয়, ইহার একটি গভীর তাৎপর্য আছে। এই জীবনকেই আর এক ভিন্নতর বোধের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া এই জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ করিলে অমৃতলোক উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। এক বোধের দৃষ্টিতে যে জীবন-মৃত্যু আকীর্ণ, আর এক বোধের দৃষ্টিতে তাহাই অমৃত।

জীবন ও জগৎ শুধু মৃত্যুতাড়িত, সদা ত্রাসগ্রস্ত, অতএব এই জীবন ও জগৎকে কোন একটি উপায়ে অস্বীকার করিতে পারাটাই জীবনের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হইল, এই জীবনে সেই বোধ লাভ করা, যে বোধে এই জীবন ও জগতই অমৃত হইয়া ওঠে।

বিমলা জীবনে দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিয়াছে সত্য এবং এই দুঃখভোগের ভিতর দিয়া সে যে ওই পূর্ণ জীবন বোধটিকে লাভ করিয়াছে তাহাও সত্য, কিন্তু ওই বোধাশ্রয়ী হইয়া জীবনের যে অমৃত আস্বাদ তাহা সে লাভ করিতে

পারে নাই। বিমলা যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার শাস্তিতে বিমলার মর্মমূল পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে।

কেবল এই ভয়ংকর শাস্তির কথা নয়, যখন অন্তরের মধ্যে ওই বোধের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, তখন হয়ত আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া আসে—ছুটির ঘণ্টাধ্বনি বাজে। যে জীবন ও জগতের জন্য এই বোধ লাভ, সেই সমগ্র জীবনকে জীবনের প্রান্তে ফিরিয়া লাভ করিবার কোন উপায় নাই।

আবার নূতন করিয়া জীবন পরিক্রমা করিবার কী মর্মন্তুদ্ ব্যাকুলতাই না ব্যক্ত হইয়াছে বিমলার উক্তির মধ্যে। অথচ তাহাকে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। ইহাই মানবের ভাগ্য!

"একেবারে নতুন হতে পারে নে কি? সব ধুয়ে মুছে আর একবার গোড়া থেকে পরীক্ষা করো প্রভু।"

"—এই মনে করে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, আজ ন বছর আগে যে নহবত বেজেছিল, সে আর ইহ জন্মে কোনো দিন বাজবে না। এ ঘরে আমাকে বরণ করে এনেছিল যে! ওগো, এই জগতে কোন দেবতার পায়ে মাথা কুটে মরলে সেই বউ চন্দন চেলি প'রে সেই বরণের পিঁড়িতে এসে দাঁড়াতে পারে? কতদিন লাগবে আর, কত যুগ, কত যুগান্তর, সেই ন বছর আগেকার দিনটাতে আর একটিবার ফিরে যেতে? দেবতা নতুন সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু ভাঙা সৃষ্টিকে ফিরে গড়তে পারেন এমন সাধ্য কি তাঁর আছে?"

২

নিখিলেশের মধ্যে ছিল জীবনকে তাহার সত্য স্বরূপে উপলব্ধি করিবার গভীর অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা। এই উপলব্ধির ভিতর দিয়া সে আপনার জীবনে যেমন একের পর এক সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে, তেমনি সেই সঙ্গে সমাজে ও ধর্মে সর্বত্র যে মিথ্যাচার রহিয়াছে, তাহা দূর করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছে। সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি ও বিচারবোধ, অপ্রমত্ত অনুসন্ধিৎসা, সুরুচি ও শালীনতার অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় নিখিলেশের মধ্যে।

বিমলা ও নিখিলেশের বিবাহিত জীবনের নয় বৎসরের দুই বৎসর কাটিয়াছে নিখিলেশের পাঠদ্দশায়, তাহার পর সাত বৎসর নিখিলেশ বিমলাকে একান্ত নিকটে লাভ করিয়াছে। নিখিলেশের প্রেম শান্ত, গভীর ও উদার। সে প্রেম তাই তাহাকে আত্মবিস্মৃত করিয়া ফেলিতে পারে নাই। নিখিলেশ যে পূর্ণ জীবনকে লাভ করিতে চায়, সে জীবনলাভ কখনই সম্ভব হইবে না, যদি বিমলাও সম্পূর্ণ ও সার্থক না হয়। প্রেম যে যুগলের সাধনা। তাই প্রেমের

ভিতর দিয়া জীবনের ধীর বিকাশ ঘটাইতে উভয়েরই চিত্তের মুক্তি, জ্ঞান ও বুদ্ধির মুক্তি, সকল বোধের মুক্তি প্রয়োজন।

তাহার যে প্রেম সমাজকে সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছে, সেই এক প্রেমই বিমলাকেও সত্য স্বরূপে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছে। আপনার এই প্রেমকে সার্থক ও মহীয়ান করিয়া তুলিবার জন্য নিখিলেশ তাই বিমলার মোহময় সুপ্তি ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে তাহার গৃহের সংকীর্ণ আবেষ্টনীর বাহিরে বিরাট বিশ্বের বিচিত্র কর্ম প্রচেষ্টা, নিত্য নূতন উদ্ভাবনা ও চিন্তার মাঝখানে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে।

জীবন সম্পর্কে সাধারণ পুরুষ ও নারীর যে বোধ, তাহা জীবনের কতটুকু পরিচয় বহন করে। বংশানুগতি লব্ধ কতকগুলি আশা, বিশ্বাস ও সংস্কার মাত্র আশ্রয় করিয়া এক প্রকার ঘোরের মধ্যে তাহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়া যায়।

নিখিলেশের মধ্যে ছিল প্রকৃত জীবন-পিপাসা।—এই দুর্লভ সত্তার আদি ও অন্ত মথিত করিয়া অমৃত আস্বাদ করিবার গভীর ব্যাকুলতা। এই আস্বাদ আপনার জীবনে কিছু ছিল বলিয়া বিমলার বধূজীবনের স্বরূপ বুঝিতে তাহার ভুল হয় নাই।

সমাজ ও সংস্কার হইতে বিমলা বধূ জীবনের যে বোধ লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ স্বামীর প্রতি নিঃশেষ আত্মসমর্পণ, তাহার সেবা ও যত্ন তাহার সকল আনন্দ বিধানের জন্য নিয়ত সচেতন প্রয়াস, তাহার আত্মীয় পরিজনদের সহিত প্রিয় ব্যবহার ইত্যাদি, জীবনে তাহার সত্য মূল্য কতখানি, বিমলা সে-সম্পর্কে গভীর করিয়া ভাবিবার কোন অবসর পায় নাই। জীবনের অর্থ কি জীবনকে কেমন করিয়া সার্থক করিয়া তুলিতে হয়, জীবনের সেই শ্রেয় বোধের সহিত মিলাইয়া কি করিয়া সদসৎ বিচার করিতে হয়, জীবনের আর সকল সম্পর্ককে কেমন করিয়া ওই বোধমুখীন করিয়া তুলিতে হয়, বিমলা তাহার কিছুই জানে না। এইরূপ একটি অপূর্ণ, অন্ধ জীবনের প্রেম বা ভক্তিতে নিখিলেশের অন্তরাত্মার কতটুকু ক্ষুধা মিটিবে!

নিখিলেশ বিমলাকে তাহার পূর্ণ জীবন-সাধনার সঙ্গীরূপে লাভ করিতে চাহিয়াছে। তাহার প্রেমের সাধনা ও পূর্ণ জীবনের সাধনা ছিল অভিন্ন। সাধারণ নর-নারী এই বোধের উপর তাহাদের দ্বৈত জীবনকে প্রতিষ্ঠা করিতে চায় না। নারীর নিকট পুরুষের কামনা কোথাও সন্তান, কোথাও গার্হস্থ্য ধর্ম, কোথাও বা অন্য কিছু। স্ত্রী নিখিলেশের নিকট আত্মার সঙ্গিনী, তাহার আর সকল ধর্ম আর সকল পরিচয় গৌণ। মূল এই বোধকে অস্বীকার করিলে আর সকল বোধ অস্বীকৃত হইয়া যায়। নিখিলেশ বিমলাকে বলিয়াছে,

"তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘর গড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকর্ণাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হও নি, আমিও হই নি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।"

পুরুষ ও নারীর নিশ্চিন্ত সর্ব জিজ্ঞাসা ও ফল লাভ শূন্য, একান্ত ভোগ সর্বস্ব, তামসিক দ্বৈত জীবনের প্রতি নিখিলেশের অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার অন্ত ছিল না।

এমনি করিয়া উভয়ের দিন কাটিতেছিল। এমন সময় স্বদেশী আন্দোলনের বন্যা সমস্ত দেশকে প্লাবিত করিয়া বহিয়া গেল। ভাবাবেগ সঞ্চার করিয়া সাময়িকভাবে জন সাধারণকে কোন কর্মে নিযুক্ত করিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে দেশের ও মানুষের স্থায়ী কোন কল্যাণ হয় না। আবেগ যেমন সহজেই উদ্দীপ্ত হয়, তেমনি সহজেই স্তিমিত হইয়া আসে। কর্মে স্থায়ী প্রেরণা লাভের জন্য আবেগমুক্ত অপ্রমত্ত সত্য দৃষ্টির প্রয়োজন। দেশের বর্তমান অবস্থার জন্য কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণ অবশ্যই দায়ী। শান্ত কল্যাণ বুদ্ধির সহায়তায় সেই মূল কারণগুলি অনুসন্ধান করিয়া সেগুলি দূরীকরণের জন্য নীরব নিয়ত আত্মত্যাগ প্রয়োজন। ইহাই প্রকৃত চরিত্র। এই প্রেরণায় অন্তর্জীবনের যে ধীর বিকাশ ঘটে, এবং ওই বিকাশবোধে যে আনন্দ তাহার কোন আস্বাদ সাধারণ নর-নারীর জীবনে নাই।

যাহারা এই ধীর পরিণামকে স্বীকার না করিয়া আশু ফললাভের জন্য জনসাধারণকে বিপ্লবাত্মক কর্মে প্ররোচিত করে, তাহারা দেশের প্রকৃত কল্যাণের পরিপন্থী। এই জাতীয় চেষ্টার ভিতর দিয়া জাতির চিত্তশুদ্ধি তো ঘটেই না, বরং বহুকাল পোষিত সহস্র দুর্বলতা নানা মহতের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করিয়া দেশকে অত্যন্ত দ্রুত অধঃপতনের পথে টানিয়া লইয়া যায়।

যেখানে উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া কার্যসিদ্ধি করিতে হয়, সেখানে মোহ জাগ্রত করিয়া রাখিবার জন্য নানা মিথ্যাবোধ গড়িয়া তুলিতে হয়। দেশকে দেশ রূপে না জানিয়া বা জানিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া (দেশকে জানা বলিতে বুঝায়, দেশের অগণিত জনসাধারণকে জানা, যে বোধ আশ্রয় করিয়া তাহাকে সার্থক করিতে চাহিয়া দেশ আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে তাহাকে মনে প্রাণে উপলব্ধি করা, সমাজে, শিক্ষায়, ধর্মে যে সকল অনাচারের ফলে বর্তমান দুরবস্থা সম্ভব হইয়াছে, সেই সকল কারণ দূর করিবার চেষ্টা, যে পূর্ণ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, সমাজের সামর্থ্য ও অসামর্থ্য উভয়দিককে সমানভাবে জানা, উভয়ের মূল প্রেরণা অনুসন্ধান করা) তাহাকে মাতৃরূপে ধ্যান করিয়া অধীর উন্মত্ততায় বিচারবোধ শূন্য

হইয়া পড়াও এক প্রকার মোহ সঞ্চারের চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের অন্তরের মধ্যে আমরা আশ্রয় পাই না বলিয়া বাহিরে অমনি অবাস্তব কল্পনা গড়িয়া তুলিতে হয়। এই সম্পূর্ণ অবাস্তব কল্পনায় আবেগের তীব্রতায় এতদূর সত্যরূপে প্রতিভাত হয় যে উহারই জন্য মানুষ সমগ্র মনুষ্যত্বকে বলি দিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়।

বস্তুত একটা ভাবাদর্শ বা জীবন-দর্শন গড়িয়া তুলিয়া মানুষ যে তাহারই অনুকূল করিয়া জীবন গড়িয়া তুলে তাহা সত্য নয়। মানুষের স্বভাব বা স্বধর্ম যেমন বিচিত্র, তেমনি জীবন-দর্শনও বহু বিচিত্র। মানুষ আপনার স্বভাব অনুকূল বা স্বভাবাশ্রয়ী একটি জীবন-দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই স্বভাবের উপর যেমন সেই জীবন-দর্শনের উপর তেমনি তাহার কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। তাহার স্বভাব আপনাকে বিকাশ করিতে চাহিয়া অমনি এক একটি জীবন-দর্শন আশ্রয় করিবেই।

নিখিলেশ সন্দীপ ও বিমলার সহিত তাই কোন তর্ক করে নাই। কারণ নিখিলেশ জানে বাহির হইতে অমন করিয়া তর্ক করিয়া তাহাদের আপন জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে পারা যাইবে না। মতের পার্থক্য স্বভাবেরই পার্থক্য। সেই স্বভাবের মধ্যে কোন পরিবর্তন না ঘটিলে তাহার উপলব্ধ সত্যকে সন্দীপ ও বিমলা কোনদিন উপলব্ধি করিতে পারিবে না। স্বভাবের পরিবর্তন বাহির হইতে বল প্রয়োগ করিয়া হয় না। নিখিলেশ তাই বিমলার উপর কোন জোর খাটায় নাই। গভীর দুঃখভোগের ভিতর দিয়াই মানুষ তাহার উন্নততর সত্ত্বালাভের জন্য ব্যাকুল হয়। এই ব্যাকুলতাই প্রকৃত অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা।

বিমলার স্বভাব-স্থূলতা নিখিলেশের ব্যক্তিত্বের নিয়ত সংস্পর্শে, তাহার গৃহের ওই আবেষ্টনীর মধ্যে এক প্রকার সুপ্ত ছিল। তাহার পর স্বদেশী আন্দোলনের ছদ্মবেশে মানুষের উদ্দাম প্রবৃত্তি যখন যদৃচ্ছা আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করিয়াছে, এবং ওই আন্দোলনের অন্যতম নেতা সন্দীপের সহিত যখন বিমলার পরিচয়লাভের সুযোগ ঘটিয়াছে, তখন বিমলার স্বভাব-নিহিত দুর্বলতা অত্যন্ত দ্রুত আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। বিমলা এতদিন পরে তাহার স্বভাব অনুকূল একটা জীবনাদর্শ লাভ করিয়া নিখিলেশের সুদীর্ঘ নয় বৎসরের সকল শিক্ষা, সকল নৈতিক প্রেরণা, সকল সাধনাকে মুহূর্তে বিস্মৃত হইতে এতটুকু ইতস্ততঃ বোধ করে নাই। মানুষের জীবনে স্বভাব এমনি অমোঘ, এমনি অনিবার্য। বিমলার স্খলনকে নির্দ্বন্দ্ব করিয়াছে দেশাত্মবোধের ছদ্মবেশ। আপনাকে ভুলাইবার এইরূপ একটি ছদ্মবেশ না থাকিলে তাহা অমন আকস্মিক ও দ্রুত পরিণামলাভের সুযোগ লাভ করে না।

বিমলা মহিমা বোধ লইয়া ঘর হইতে বাহিরে প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে।

নিখিলেশ বিমলাকে এই কথাটাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, "তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না।" বিমলার মধ্যে সতীত্বের সংস্কার, স্বামীভক্তি ইত্যাদি বোধ যে কত বাহিরের জিনিস তাহা তাহার এই দ্রুত স্খলন হইতে বোধ করিতে পারা যায়। অথচ বিমলা ইতি-পূর্বে এই সমস্ত বোধ লইয়া কত গৌরব, কত পরিতৃপ্তিই না বোধ করিয়াছে।

এই পরীক্ষায় বিমলার জীবনে যদি নিখিলেশের প্রয়োজন চিরকালের জন্য ফুরাইয়া যায়, ইহার ভিতর দিয়া বিমলা তাহার যে স্বধর্মকে নিঃসংশয়ে লাভ করিবে, তাহা যদি তাহার স্বভাবের অনুকূল না হয় এবং সেইজন্য বিমলার প্রেম যদি অন্য পাত্রে ন্যস্ত হয়, তবে নিখিলেশ বিবাদ করিবে কাহার সহিত ?

নিখিলেশের শোকের কারণ বিমলা যে পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং যে ভাবে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছে, তাহা নর-নারীর গৌরবের পথ নয়।

দ্বিতীয়ত, নিখিলেশ যে আইডিয়া ও আইডিয়েল দিয়া আপনার এবং বিমলার জীবন গড়িয়া তুলিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা এইভাবে প্রথম পদক্ষেপেই ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয়ত, নিখিলেশের অন্তরে বিমলার যে ধ্যান-রূপ ছিল, তাহার সহিত এখনকার বিমলার কোন মিল নাই।

নিখিলেশের কান্নার মূল কারণ হইল তাহার আসক্তি। এই আসক্তি নিখিলেশের জীবনে প্রেমের অমন অপরূপ মহিমা লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহার আদৌ ভিত্তি ইন্দ্রিয়বোধের উপর। প্রবৃত্তি এবং তজ্জাত সর্ববিধ সম্ভোগের জীবনে একটা মূল্য আছে সত্য, কিন্তু তাহা সমগ্র মনুষ্যসত্তার একান্ত সামান্য একটি অংশ মাত্র। প্রবৃত্তি সম্পর্কে এই সীমাবোধ মানুষের থাকে না বলিয়া হয়ত তাহা সমগ্র সত্তাকে এতদূর আচ্ছন্ন করে যে উহা আশ্রয় বিচ্যুত হইলে, বিচ্ছেদে বা বিয়োগে কিংবা অন্য সহস্রবিধ কারণে মনুষ্যসত্তা মুহূর্তে শূন্যতার মধ্যে হারাইয়া যায়।

নিখিলেশ তাহার বেদনার এই স্বরূপ প্রথমেই বোধ করিতে পারে নাই। আপনার শোককে জয় করিয়া উঠিবার বিচিত্র চেষ্টার ভিতর দিয়া নিখিলেশ উহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং ওই অনুসন্ধানের ভিতর দিয়া মনুষ্য জীবনে শোকের মূল তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছে !

সেই তত্ত্বটি হইল, মানুষ আপনাকে বিরাট রূপে বোধ করে বাহিরে বস্তুর পর বস্তু স্তূপীকৃত করিয়া। কিন্তু এই জাতীয় প্রয়াসে মানুষ যে ক্রমাগত

আপনার চতুর্দিকে ঘিরিয়া একের পর এক বন্ধন সৃষ্টি করে, উহা যে মনুষ্য-সত্ত্বাকে ক্রমাগত সীমিত করিতে থাকে, তাহা মানুষ বোধ করিতে পারে না। ইহাতে মানুষের সমস্ত প্রয়াস বস্তুমুখীন হইয়া পড়ে, উহা আহরণ করিতে, সংরক্ষণ করিতে তাহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়! বস্তুর পরিমাণ যতই বাড়িতে থাকে, বস্তুর ভার ততই মানুষকে পীড়িত করিতে থাকে। বাহিরে এইরূপে আপনাকে প্রসারিত করিবার চেষ্টা ঘোর বিনষ্টিকর। মানুষ তাহার অসীম সত্ত্বাকে বিশ্বের সকল সত্ত্বার সহিত যুক্ত করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে, যদি বাহিরে ক্রমাগত ত্যাগের ভিতর দিয়া অন্তরে ক্রমাগত মিলন বোধ করিতে থাকে।

ব্যক্তিগত দুঃখ জয় করিতে নিখিলেশ একের পর এক নানা তত্ত্ব নানা জীবন-দর্শন আশ্রয় করিয়াছে, পরিশেষে সত্য পথ লাভ করিয়া উহাকে সম্পূর্ণ-রূপে জয় করিয়া উঠিয়াছে।

এখন নিখিলেশের সেই বিচিত্র চেষ্টার সামান্য পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। নিখিলেশের একটি উক্তি সর্বাগ্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ওরে হতভাগা, একবার জগতের সদরে দাঁড়িয়ে সমস্তর সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দেখ না। সেখানে যুগ যুগান্তের মহামেলায় লক্ষ কোটি লোকের ভিড়ে বিমল তোমার কে? সে তোমার স্ত্রী? * * *

"জীবনে মানুষ যা কিছু হারায় তার সকলের চেয়েও মানুষ অনেক বেশী বড়ো—সমস্ত কান্নার সমুদ্র পেরিয়েও তার পার আছে, এই জন্যই সে কাঁদে নইলে সে কাঁদত না। ***

"এতদিন আমি আমারই মনের কতকগুলি দামি আইডিয়েল দিয়ে বিমলকে সাজিয়ে ছিলুম। আমার সেই মানসী মূর্ত্তির সঙ্গে সংসারে বিমলের সব জাগয়ায় যে মিল ছিল তা নয়, কিন্তু তবুও আমি তাকে পূজা করে এসেছি আমার মানসীর মধ্যে।

আমি আমার সেই মানসী তিলোত্তমাকে মনে মনে ভোগ করতে চেয়েছিলুম। বাইরের বিমল তার উপলক্ষ হয়ে পড়েছিল।"

জন্ম হইতে জন্মান্তরে জীবনের সীমাহীন প্রসার, লোক হইতে লোকান্তরে তাহার অনন্ত যাত্রা পথ। শুধু কি তাই! এই মর্ত্য জীবনের বিচিত্র লীলারও কি অন্ত আছে? এই জীবন ও জগৎ তাহার আপন স্বরূপেই যে অনন্ত বিস্ময় বিজড়িত। এই অন্তহীন জীবন ও জগতে সত্ত্বার এই অন্তহীন লীলায় কোন একজন নারীর সহিত বিরহ মিলন লীলা কতটুকু। এই জীবনে সে লীলা যদি ব্যর্থ হইয়া যায়, তবে তাহাতে জীবনের কতটুকু ক্ষতি!

নিখিলেশ বিমলাকে যে স্বরূপে লাভ করিতে চাহিয়াছে, তাহাতে তাহার সৌন্দর্য-পিপাসা যতই চরিতার্থ হোক, বিমলা যদি সেই ধ্যানের অনুকূল হইয়া গড়িয়া না উঠে, তবে দুঃখ যতই অসহনীয় হোক, তাহাতে সে অভিযোগ করিবে কাহাকে ? যে নিগূঢ় নিয়মে বিমলার জীবন বিকাশ লাভ করিতেছে, তাহাতে কোনদিন যদি তাহার প্রয়োজন একান্তরূপে ফুরাইয়া যায়, তবে তাহাকে দুর্ভাগ্য বলিয়া মানিয়া লওয়া ছাড়া নিখিলেশের আর কি থাকিতে পারে ?

জাগতিক সকল সম্পর্ক ও প্রাপ্তিকে ছাড়াইয়া যদি মনুষ্য সত্ত্বার-সীমাহীন প্রসার হয়, জাগতিক সকল বন্ধন ও ফললাভের ঊর্ধ্বে মানবাত্মা যদি অনন্ত বিস্তৃত হয়, তবে একথা সত্য যে জাগতিক যে কোন বঞ্চনায় মানুষ নিঃশেষিত হইয়া যায় না। জাগতিক যে কোন বঞ্চনার ঊর্ধ্বে মানুষ তাহার এই অসীম সত্ত্বায় স্থিতি লাভ করিয়া আপনাকে ফলবান করিতে পারে।

আত্মা বা ভূমার কথা থাক্। মনুষ্য-জীবন গৃহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাহা বিরাট বিশ্বের বিচিত্র কর্ম চাঞ্চল্যের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত। সংখ্যাতীত নর-নারীর কর্ম-ধারার জটিল আবর্ত-সঙ্ঘাতে বিশ্বে যে রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহাতে ব্যক্তিগত মানুষ আপনার কর্তব্যভার আপনি বহন না করিলে জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহজগতে মানুষের সার্থকতার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র তাহার গৃহে, বৃহত্তর অংশ তাহার গৃহের বাহিরে —বিরাট বিশ্বে। গৃহ যদি শূন্য হইয়া যায়, তবে মানুষের বাহির আছে। মানুষ সেখানে সার্থকতা লাভ করিতে পারে।

মানুষের অন্তরে কতকগুলি আইডিয়া ও আইডিয়েল বাসা বাঁধিয়া থাকে। সেই সমস্ত আইডিয়া ও আইডিয়েল দিয়া সে শুধু আপনার জীবনকে নয়, আপনার প্রেয়সীকে সাজাইতে বসে। এইরূপে মর্তের নারীকে মানুষ অন্তরের মধ্যে মানসীরূপে গড়িয়া তুলিয়া, তাহারই ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতে ভালোবাসে। ইহাতে পরিণামে বাহিরের রূপ গৌণ হইয়া যায়, ভাব চর্বনা চলে মানসী মূর্তির। বাহিরের রূপের সহিত অন্তরের রূপের যেখানে যতটুকু অমিল, ততটুকুকে অস্বীকার করিবার একটি অজ্ঞাত চেষ্টাও সেই সঙ্গে থাকে। তাহা না হইলে, অন্তরের ধ্যান যে নির্দ্বন্দ্ব হয় না। নিখিলেশ বস্তুত এতদিন তাহাই করিয়া আসিয়াছিল। বিমলা যতদিন অন্তঃপুরে ছিল, ততদিন তাহার বাহিরের রূপের মধ্যে নিখিলেশের ধ্যান-রূপের যথেষ্ট ব্যবধান ছিল না। বিমলা এখন যতই দূরে সরিয়া যাইতেছে, যতই তাহার জীবন-ধারা তাহার আইডিয়া ও আইডিয়েলের বিপরীত হইয়া পড়িতেছে, অর্থাৎ যতই নিখিলেশের ধ্যান-রূপের সহিত বাহিরের বিমলার ব্যবধান ঘটিতেছে, তাহার সংগ্রাম ততই তীব্র হইয়া উঠিতেছে।

দুঃসহ দুঃখভোগের ভিতর দিয়া নিখিলেশ তাহার এই ভ্রম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। বিমলা তাহার সম্পূর্ণ সত্তা লইয়া জগতের সকল দুর্লভ সত্তার মত আপনি বিকাশ লাভ করিবে। তাহার জীবনের সে রূপকে যে নিখিলেশের আইডিয়া ও আইডিয়েলের অনুরূপ হইতেই হইবে তাহার কোন কারণ নাই।

বিমলাকে বাহির হইতে একটি দুর্লভ সত্তারূপে দেখিবার চেষ্টা নিখিলেশ কোনদিন করে নাই। সেই বিমলাকে যদি কোন দিন সে আপনার জীবনে স্বীকার করিয়া লইতে পারে, তবে তাহাতেই তাহার প্রেমের সার্থকতা। প্রেম একজন মানুষকে তাহার সমগ্র স্বরূপে স্বীকার করিয়া লইতে মানুষকে শক্তি দেয়।

ইহার পর নিখিলেশ যে উপলব্ধি ও তত্ত্বদৃষ্টি আশ্রয় করিয়া তাহার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব জয় করিয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার পরিচয় লাভ করিতে তাহার ডায়েরীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই বিশ্ববস্তুর পর্দ্দার আড়ালে আমার অনন্ত কালের প্রেয়সী স্থির হয়ে বসে আছে। কত জন্মে কত আয়নায় ক্ষণে ক্ষণে তার ছবি দেখলুম—কত ভাঙ্গা আয়না, বাঁকা আয়না, ধুলোয় অস্পষ্ট আয়না। যখনই বলি আয়নাটা পরিষ্কার করে নিই, বাক্সর ভিতর ভরে রাখি, তখনই ছবি সরে যায়। থাক্ না, আমার আয়নাতেই বা কী আর ছবিতেই বা কী। প্রেয়সী তোমার বিশ্বাস অটুট রইল, তোমার হাসি ম্লান হবে না, তুমি আমার জন্য সীমান্তে যে সিঁদুরের রেখা এঁকেছ, প্রতিদিনের অরুণোদয় তাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে রাখছে।

"আমার প্রেয়সী আমাকে ঠকাবে না সে সত্য, সে সত্য—এই জন্মে বারে বারে তাকে দেখলুম, বারে বারে তাকে দেখব, ভুলের ভিতর দিয়েও তাকে দেখেছি, চোখের জলের ঘন কুয়াসার মধ্যে দিয়েও তাকে দেখেছি, জীবনের হাটের ভিড়ের মধ্যেও তাকে দেখেছি, হারিয়েছি, আবার দেখেছি, মরণের ফুকরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েও তাকে দেখব।"

বাহিরের রূপ ধ্যান-লোকে আর এক রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠে। ক্রমে বাহিরের রূপ গৌণ হইয়া যায়, অন্তরে ধ্যান-মূর্ত্তির সহিত নর-নারীর নিত্য মিলনলীলা চলে। মনুষ্য চেতনা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে থাকে তাহার ধ্যান-মূর্ত্তি ততই উজ্জ্বল হয়, উহা ততই বিস্ময় বিজড়িত হইয়া যায়, বিশ্বের সকল রূপের মধ্যে ওই ধ্যান-রূপ তত অনুপ্রবিষ্ট হয়, কিংবা বিশ্বের সকল রূপ তাহার মধ্যে ততই সমাহিত হইতে থাকে।

পুরুষের অন্তরে নারী রূপাশ্রয়ী এই যে সৌন্দর্য ধ্যান, তাহার যে ভাব-রূপ বা রস-রূপ রবীন্দ্রনাথ তাহাকে যে কোন পরিণামে অরূপ কোন তত্ত্বে একাকার করিয়া দেন নাই। মানুষের জীবনে জন্ম হইতে জন্মান্তরে, লোক হইতে লোকান্তর লাভে এই ভাব-রূপ বা রস-রূপের চিরন্তন একটি ধারা আছে। স্থূল রূপের সহিত ওই সূক্ষ্ম ভাব-রূপটাও ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। জন্ম হইতে জন্মান্তরের ভিতর দিয়া এই ভাব-রূপ ধীরে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া চলিয়াছে। এই ভাব-রূপ যেখানে পূর্ণ বিকশিত শতদলের মত সম্পূর্ণতা লাভ করে, সেখানে জীবনেরও সম্পূর্ণতা। তাহার পর এই পূর্ণ বিকশিত ভাব শতদলটিকে ঈশ্বরের কণ্ঠে মাল্যরূপে দুলাইয়া দেওয়া।

নিখিলেশ আপনার সৌন্দর্য-ধ্যান আশ্রয় করিয়া ভাব ও রস রূপের এমনি একটি চিরন্তনতা বোধ করিয়াছে। কত না রূপ এবং ওই রূপাশ্রয়ী কত না প্রেম আশ্রয় করিয়া কত জন্ম কত জন্মান্তরের ভিতর দিয়া তাহার এই ধ্যান-রূপ গড়িয়া উঠিয়াছে। সে রূপ কখন উজ্জ্বল, কখন মলিন, কখন নিষ্ঠুর, কখন আনন্দ মূর্তি, কখন বিষাদ রূপিণী। এই ক্ষণকালীন এক একটি রূপ যেন নানা রূপের এক একটি দর্পণ,—যে এই দর্পণ আশ্রয় করিয়া চিরন্তন রস-রূপের সেই ছবি প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছে, এই জীবনে সেই ধন্য। তখন কোন রূপ তাহাকে হাসাইতে বা কাঁদাইতে পারে না। তাহার জীবন তখন সকল দ্বন্দ্বাতীত এক শান্ত পরিণাম লাভ করে।

অনুভূতির তীব্রতায় জগৎ ও জীবনের এক একটি সত্যের দ্বার এমনি করিয়া উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। এই সত্য লাভ করিয়া নিখিলেশ বিমলাকে তাহার ওই স্বরূপেই ভালোবাসিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই উপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিখিলেশ যে বিমলা ধূলি মলিন, অস্পষ্ট, বিকৃত, তাহাকে চুম্বন দিতে পারিয়াছে।

ইতিপূর্বে নিখিলেশ যে বোধাশ্রয়ী হইয়া তাহার ব্যর্থ প্রেমের বেদনা জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাকে নির্বিশেষ আত্মতত্ত্ব বা ভূমাতত্ত্ব বলা যাইতে পারে। কিন্তু রূপ নিখিলেশের জীবনে মিথ্যা নয়, উহার পিপাসা তাহার জীবনে একান্ত সত্য। উহাকে তাই নিখিলেশ অত সহজে অস্বীকার করিতে পারে নাই, উহার বেদনাকেও না।

ভূমাতত্ত্বের সহিত বিজড়িত করিয়া নিখিলেশ যে উপায়ে ভাব-রূপের আর একটি শাশ্বত তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং এইরূপে যে উপায়ে বাস্তব ক্ষণিক রূপের সহিত চিরন্তন সূক্ষ্ম ভাব-রূপের দ্বন্দ্ব জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিল, আমরা সে পরিচয় লাভ করিয়াছি।

শাশ্বত অরূপ-তত্ত্ব হোক কিংবা শাশ্বত রূপ-তত্ত্ব হোক, তাহাতে রূপের সমস্যা থাকিয়া যায়। নিখিলেশ স্বয়ং তাহার এই সাধনার অসামর্থ্য এবং অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে পরিশেষে সচেতন হইয়াছে।

যে তত্ত্বাশ্রয়ী হইয়া নিখিলেশ বাস্তব ও আদর্শ, ভাব ও রূপ, ব্যক্তি ও নৈর্ব্যক্তিকতার দ্বন্দ্ব জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহার পশ্চাতে ছিল রূপের আসক্তিকেই কোন একটি উপায়ে চরিতার্থ করা। তাই সে বিমলাকে যে কোন স্বরূপে আপনার জীবন হইতে নিঃশেষে সরাইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছে। ইহার জন্য নিখিলেশকে দুঃখ পাইতে হইবে সত্য, কিন্তু এই দুঃখ জয় করিতে না পারিলে তাহার মুক্তিও নাই। নিখিলেশ তাই বলিয়াছে, "তাকে আমি মুক্তি দেব। নইলে, মিথ্যার হাত থেকে আমিও মুক্তি পাব না।"

মানুষের মধ্যে একটি শাশ্বত সত্তা আছে, তাহা স্বয়ং সম্পূর্ণ আত্মতত্ত্ব হোক, অথবা পরিণামী ভাব বা আদর্শ-লোক হোক। মানুষের এই সত্তা জন্ম জন্মান্তর ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। বহির্জগতের বিচিত্র রূপ আশ্রয় করিয়া এই ভাবলোক গড়িয়া উঠে, ধীর সমৃদ্ধি লাভ করে। একথা যেমন সত্য, তেমনি একথাও সত্য যে মানুষ রূপের দর্পণে অন্তরের ভাবলোকটিকে বাহিরে সাক্ষাৎ করিয়া ধন্য হয়। রূপ তাই অরূপ বা ভাবের দর্পণ। রূপ ও অরূপের, আদর্শও বাস্তবের এই সীমা ও সম্পর্ক। মানুষ যখন এই সীমা লঙ্ঘন করে, অর্থাৎ বাস্তব রূপকে তাহার সীমায় অরূপের দর্পণমাত্র রূপে না দেখিয়া উহাকেই যখন একমাত্র করিয়া তোলে, তখন আসক্তি একান্ত হইয়া উঠে। রূপের বঞ্চনায় জীবন তাই শূন্য হইয়া যায়।

নিখিলেশের জীবনে বিমলা এই একই কারণে সর্বস্ব হইয়া উঠিয়াছিল। ঈশ্বরের যে প্রেম নিখিল বিশ্ব পরিপূর্ণ করিয়া সকল রূপকে ভাসাইয়া ডুবাইয়া দিয়া অন্তহীন মহাশূন্যে নিত্যকাল নীরবে উপচাইয়া পড়িতেছে, তাহারই অতি ক্ষীণ একটি আভাস নর-নারীর প্রেমে চকিতে বিলসিত হইয়া যায়। ইহা না বুঝিয়া পুরুষ নারী বিগ্রহ বা দর্পণের মধ্যে উহাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাই ওই বিগ্রহ হারাইয়া গেলে, রূপ-দর্পণ বিকৃত মলিন অথবা ভগ্ন হইলে জীবন হাহাকারে ভাঙিয়া পড়ে। নিখিলেশ তাই বিমলাকে সম্পূর্ণ-রূপে মুক্তি দিয়াছে।

এইরূপে সকল দ্বন্দ্ব শেষে নিখিলেশ পরিণামে যে সত্য লাভ করিয়াছে, তাহার পরিচয় নিখিলেশেরই উক্তির মধ্যে লাভ করিতে পারা যাইবে।

"মুক্তিই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড়ো জিনিষ তার কাছে আর কিছুই নেই, কিছুই না। শাস্ত্রে পড়েছিলুম, ইচ্ছাটাই বন্ধন, সে নিজেকে বেঁধে অন্যকে

বাঁধে। * * * যাকে আমি খাঁচায় বাঁধি সে আমাকে আমার ইচ্ছেতে বাঁধে, সেই ইচ্ছের বাঁধা যে শিকলের বাঁধনের চেয়ে শক্ত।"

"যখনই চোখে ওকে আভাস মাত্রেও দেখি তখন দেখি যে ওইটাই অমৃত। দেবতারা এইটেই পান করে অমর। সুন্দরকে আমরা দেখতেই পাইনে যতক্ষণ না তাকে আমরা ছেড়ে দিই।"

কিন্তু ঔপন্যাসিক নিখিলেশের জীবনে এইখানেই সমাপ্তি টানিয়া দেন নাই। নিখিলেশ তাহার এই তত্ত্ব দৃষ্টির মধ্যেও, যাহা তাহার নিকট মুক্তি তত্ত্বই বটে, অসম্পূর্ণতা ও অসামর্থ্য বোধ করিয়াছে। নিখিলেশ বোধ করিয়াছে তাহার এই তত্ত্ব সাধনা তাহাকে বেদনা জয় করিয়া উঠিতে শক্তি দিয়াছে সন্দেহ নাই, সকল বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে আপনার ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে একপ্রকার আশ্চর্য মানসিক শক্তি দিয়াছে, ইহাও সত্য, কিন্তু তাহা এই বেদনাকে অসম্ভব করিয়া তুলিতে শক্তি দেয় না, প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূল করিতে পারে না। উহা বিরোধ জাগাইয়া রাখিয়া ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে, কিন্তু নির্বিরোধে সকলের সহিত একাত্ম হইয়া ক্রমিক ব্যক্তিত্ব হ্রাসের ভিতর দিয়া ব্যক্তিত্বের যে বিশিষ্ট প্রসার, তাহা বোধ করিতে পারে না।

যে-প্রতিভা সৃষ্টি করে—অন্যকে রূপান্তরিত করে, নিখিলেশের প্রতিভা সেই শ্রেণীর নয়। নিখিলেশের মত বিমলার আশ্চর্য নৈতিক ও মানসিক বল ছিল না, কিন্তু সেই বিমলা তো অনায়াসে অমূল্যের জীবনকে রূপান্তরিত করিয়া দিতে পারিল। তাহার আত্মতত্ত্বে তো সৃষ্টির এই রহস্য নাই।

আত্মতত্ত্ব ও প্রেম তত্ত্ব এক বস্তু নয়। প্রেম সমগ্র জীবনকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হয়, অন্যদিকে মনুষ্যবোধ অতিক্রম করিয়া আত্মতত্ত্ব লাভ করিতে হয়।

এই জীবন ও জগৎ তাহার স্বরূপেই কী অপরূপ, কী দুর্লভ, কী মহিমময়, কী অন্তহীন রহস্য ও বিস্ময় পরিপূর্ণ। তাই কোন একটা তত্ত্ব-সূত্রে বাঁধিয়া জীবন ও জগতের অচিন্তনীয় রহস্যকে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারা যায় না।

সামাজিক অধিকারের দাবী তুলিয়া নিখিলেশ বিমলাকে বঞ্চিত করিতে চায় নাই সত্য, কিন্তু নিখিলেশের মধ্যেও অত্যাচার ছিল। সে আপনার তত্ত্ব দিয়া বিমলার জীবনকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে।

নর-নারী আপন আপন বিশিষ্ট স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই স্বভাবই ধর্ম। ধর্ম তাই অন্তহীন এবং বিচিত্র। প্রকৃত ধর্ম তাই একক। সাম্প্রদায়িক ধর্ম বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহা কেবল বহির্জীবনে।

নিখিলেশ আপনার জীবনে যেমন, বিমলার জীবনে তেমনি, সেই প্রেম সেই ধর্মকে আজ ফিরিয়া লাভ করিতে চাহিয়াছে। ইহা সেই ধর্ম, যাহা মানুষকে তাহার সম্পূর্ণ নিজের স্বরূপে স্বীকার করিয়া লইতে ইতস্ততঃ করে না। ইহা সেই প্রেম, যে প্রেমে জীবনের আদি-অন্ত পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করে।

এই উপলব্ধি নিখিলেশের উক্তির মধ্যেই লাভ করিতে পারা যাইবে।

"—স্পষ্ট দেখতে পেলুম, নিজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চারিদিককে যারা সহজেই সৃষ্টি করতে পারে, তারা এক জাতের মানুষ, আমি সে জাতের না। আমি মন্ত্র নিয়েছি, কাউকে মন্ত্র দিতে পারিনি। যাদের কাছে আপনাকে সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছি, তারা আমার আর সবই নিয়েছে, কেবল আমার এই অন্তরতম জিনিসটি ছাড়া।"

বিমলা চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে মনুষ্য-জীবনে ট্র্যাজেডির স্বরূপ বুঝাইতে যাহা বলিয়াছি ট্র্যাজেডির সেই এক সুর নিখিলেশের হৃদয় ভরিয়াও ধ্বনিত হইয়াছে।

"আবার কি সেই গোড়ায় ফেরা যায় না? একবার সহজের রাস্তায় চলি। আমার পথের সঙ্গিনীকে এবার কোন আইডিয়ার শিকল দিয়ে বাঁধতে চাইব না। কেবল আমার ভালোবাসার বাঁশি বাজিয়ে বলব, আমাকে ভালোবাসো, সেই ভালোবাসার আলোতে তুমি যার, তারই পূর্ণ বিকাশ হ'ক, আমার ফরমাশ একেবারে চাপা পড়ুক, তোমার মধ্যে বিধাতার যে ইচ্ছা আছে, তারই জয় হ'ক, আমার ইচ্ছা লজ্জিত হয়ে ফিরে যাক।"

"কিন্তু আর কি সময় আছে? এতদিন গেল ভুল ভাঙতে, কতদিন লাগবে ভুল শোধরাতে। তারপরে? তারপরে ক্ষত শুকাতেও পারে কিন্তু ক্ষতি-পূরণ কি আর কোন কালে হবে?"

৩

জীবনকে কোন একটি তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না; তাহা সন্দীপের দেহতত্ত্ব কিংবা নিখিলেশের আত্মা বা ভূমা-তত্ত্ব যাহাই হোক-না-কেন। সকল তত্ত্বকে ছাড়াইয়া জীবনের অনন্ত প্রসার, তাই কোন তত্ত্বের ছাঁচে ঢালিয়া জীবনকে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারা যায় না। নিম্নে উদ্ধৃত সন্দীপের উক্তি কয়েকটির মধ্যে এই উপলব্ধির একটি সামগ্রিক পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"আমি যা চাই, যা ভাবি যা সিদ্ধান্ত করছি আমি যে আগাগোড়া কেবল তাই, তা তো নয়, আমি যা ভালোবাসিনে যা ইচ্ছে করি নে আমি যে তাও।"

"আমার আইডিয়া আমার জীবনকে নিয়ে আপনার মতলবে গড়ছে,

কিন্তু সেই মতলবের বাইরেও অনেকখানি জীবন বাকি পড়ে থাকছে—সেইটার সঙ্গে আমার মতলবের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল থাকে না।"

"একটি মাত্র আইডিয়ার ছাঁচে জীবনটাকে পরিমিত করতে চাই, জীবন তাকে ছাপিয়ে যায়। থেকে থেকে মানুষ ছিটকে ছিটকে পড়ে।"

"পণ করেছিলুম জীবনটাকে আগাগোড়া একেবারে নিরেট বাস্তব করে তুলব। কিন্তু তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত জীবন কাহিনীটাকে কী দেখছি? কোথায় সেই ঠাস বুনোনি? এ যে জালের মতো সূত্র বরাবর চলেছে, কিন্তু সূত্র যতখানি, ফাঁক তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। এই ফাঁকটার সঙ্গে লড়াই করে করে একে সম্পূর্ণ হার মানানো গেল না।"

"—জীবনের স্রোতঃ পথের গভীরতম তলটা বহুকালের গতি দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে, ইচ্ছার বন্যা যখন প্রবল হয়ে বয় তখন সেই তলার পথটাকে কোথাও বা ভাঙ্গে আবার কোথাও বা এসে ঠেকে যায়। ভিতরে একটা সঙ্কোচ কোথাও রয়ে গেছে,—সেটা কী। সে কোন একটা জিনিস নয়, সে অনেক গুলোতে জড়ানো। সেই জন্যে তার চেহারা স্পষ্ট বুঝতে পারি নে, এই কেবল বুঝি সেটা একটা বাধা, এই বুঝি আমি আসলে যা, তা আদালতের সাক্ষ্য দ্বারা কোনো কালে পাকা দলিলে প্রমাণ হবে না।"

বৃহৎ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, মানুষমাত্রেরই জীবনে সচেতন একটি অভিপ্রায় আছে। ইহারই মত করিয়া সে আপনার জীবনকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে, জীবনের আর সব প্রেরণাকে এই অভিপ্রায়মুখীন করিয়া তুলিতে চায়, সর্বত্র ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করে।

মানুষের এই যেমন একটি সত্তা, তেমনি আর একটি সত্তা আছে যাহা তাহার সম্পূর্ণ অননুভূত। সচেতন সত্তা তাহার সমগ্র সত্তার অতি ক্ষীণ একটি অংশ মাত্র। মানুষের সেই অপর সত্তা সীমাহীন। মানুষ তাহার সচেতন মন দিয়া ইহার সামান্যমাত্র রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে পারে।

সমগ্র জীবন রূপায়ণে এই উভয় শক্তিই ক্রিয়া করে। একটি সচেতন অপরটি তাহার অতিচেতন প্রেরণা। একটি ব্যাখ্যাগম্য অপরটি ব্যাখ্যাতীত। এই উভয় প্রেরণা যখন অন্যোন্য নির্ভরশীল হয়, তখন মানুষ অসাধ্য সাধন করে। অন্যদিকে এই উভয় প্রেরণা পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া পড়িলে, মানুষের জীবনে মহৎ বিনষ্টি ঘটে।

মানুষের মধ্যে কতকগুলি সার্বভৌমিক নৈতিক বোধ আছে। এই নৈতিক বোধ তাহার সমগ্র প্রকৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। ইহা মানুষের এক প্রকার শাশ্বত মূল্যবোধ।

কালের অগ্রগতির সঙ্গে, মানুষের চিন্তা ও জীবন-জিজ্ঞাসার বিকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে নূতনতর, উন্নততর নৈতিক বোধের একের পর এক দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যাইতেছে সত্য, কিন্তু তাহা মানুষের আদি প্রকৃতি ও নৈতিক বোধকে কোথাও ক্ষুন্ন করে নাই। আদি প্রকৃতি ও নৈতিক বোধকে মানিয়া লইয়া উহারই বিচিত্র শাখা-প্রশাখার মত ওই সকল বোধের বিকাশ ঘটিতেছে। ইহার অনন্ত সম্ভাবনা। আদৌ ওই বোধকে ক্ষুন্ন করিয়া কোন নৈতিক বোধ গড়িয়া উঠিতে পারে না। কোন যুক্তি বিচারের প্রশ্ন নয়, যে দুর্জ্ঞেয় নিয়মে সুদূর অতীত কাল হইতে মানুষের বর্তমান প্রকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই দুর্জ্ঞেয় নিয়মে বিপ্রকৃতিক যে কোন নৈতিক বোধ একদিন অস্বীকৃত হইয়া যাইবে।

সন্দীপের জীবন-দর্শন মানুষের এই আদি ধর্মের প্রতিকূল। তাহার সচেতন ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষের এই চিরন্তন স্বভাব তাই বারংবার বিদ্রোহ করিয়াছে। নিখিলেশও ভিন্ন দিক হইতে এই একই চেষ্টা করিয়াছিল। আপনার এই ইচ্ছা দিয়া সে বিমলার জীবনকেও গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। জীবনের শাশ্বত স্বভাব প্রেরণায় প্রত্যেকের এই সচেতন প্রয়াস ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিয়াছে জীবন আপনার কোন এক দুর্জ্ঞেয় নিয়মে আপনি গড়িয়া উঠিতেছে, ইহাতে মানুষের সচেতন যে কোন প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায়।

সমগ্র উপন্যাস কাহিনীর পশ্চাতে জীবনের এই সাক্ষাৎকার প্রেরণা ক্রিয়াশীল। এই সাক্ষাৎকারই সমগ্র উপন্যাসের বীজ-মন্ত্র। নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নানা কাহিনীর মধ্য দিয়া এই বীজ পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে।

যে তত্ত্ব দিয়া সন্দীপ তাহার জীবনকে নিশ্ছিদ্র করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে, তাহার পরিচয় সন্দীপের উক্তি হইতেই লাভ করিতে পারা যাইবে। তাহার কয়েকটি উক্তি পর পর উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"লাভ করিবার স্বাভাবিক শক্তি আছে বলেই লোভ করা স্বাভাবিক। কোন কারণেই কিছু থেকে বঞ্চিত হব প্রকৃতির মধ্যে এমন বাণী নেই। মনের দিক থেকে যেটা চাচ্ছে, বাইরের দিক থেকে সেটা পেতেই হবে, প্রকৃতিতে ভিতরে বাইরে এই রকমটাই সত্য।"

"যারা সমস্ত মন দিয়ে চাইতে পারে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভোগ করতে জানে, যাদের দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই, তারাই প্রকৃতির বরপুত্র।"

"আমি যে চালে চলি তাতে মেয়েদের হৃদয় জয় করতে আমার দেরি হয় না। ওরা যে বাস্তব প্রকৃতির জীব, পুরুষের মত ওরা ফাঁকা আইডিয়ার বেলুনে চড়ে মেঘের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় না। ওরা আমার চোখে মুখে দেহে

মনে কথায় ভাবে একটি প্রবল ইচ্ছা দেখতে পায়—সেই ইচ্ছা কোন তপস্যার দ্বারা শুকিয়ে ফেলা নয়, কোনো তর্কের দ্বারা পিছন থেকে মুখ ফেরানো নয়, সে একেবারে ভরপুর ইচ্ছা* * *। মেয়েরা আপনার ভিতর থেকে জানে, এই দুর্দ্দম ইচ্ছা হচ্ছে জগতের প্রাণ। সেই প্রাণ আপনাকে ছাড়া আর কাউকে মানতে চায় না বলেই চারিদিকে জয়ী হচ্ছে। * * * যে শক্তিতে এই মেয়েদের পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে বীরের শক্তি—অর্থাৎ বাস্তব জগৎকে পাবার শক্তি।"

মনের মধ্যে নিয়ত কামনা জাগ্রত করিয়া রাখা এবং উহা চরিতার্থ করিবার জন্য বাহিরে সংগ্রাম করা, ইহাই মানুষের ধর্ম। কামনা নিয়ন্ত্রণ করা এবং সেই সঙ্গে কামনা চরিতার্থ করিবার নিয়ত প্রয়াস সংযত করাকে সন্দীপ স্বভাব-বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ করে। এই জাতীয় চেষ্টায় মানুষ কেবল বঞ্চনাই লাভ করে। সন্দীপ প্রাণ-মনের ঊর্ধ্বতর কোন সত্তায় বিশ্বাস করে না। উহাকে লাভ করিবার সাধনা তাই তাহার নিকট মৃত্যুর সাধনা। ইহা জীব ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রেরণা। এক প্রকার বিকৃত স্বভাবী মানুষ আত্মনিপীড়নে অহেতুক আনন্দ পায় মাত্র। বিশ্ব জুড়িয়া যে প্রাণের লীলা চলিতেছে মানুষের মধ্যে সেই এক প্রাণের প্রকাশ। প্রাণ প্রাণের প্রতি নিয়ত আকর্ষণ বোধ করিতেছে। এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করাই মানুষের ধর্ম।

নর-নারীর এই স্বভাব ধর্মকে কতকগুলি মানুষ নানা তত্ত্ব, আদর্শ ও নীতি বোধ দিয়া অস্বীকার করিবার চেষ্টা করে। এই সকল আদর্শ ও নৈতিক বোধ যে সত্য নয় তাহার প্রমাণ প্রাণের প্রবল ইচ্ছার বেগে উহারা কোথায় ভাসিয়া যায়, বিধি-নিষেধের সকল আবরণ একের পর এক উদ্ভিন্ন হইয়া যায়। এই সকল বিধি-নিষেধ ও বন্ধনসত্ত্বেও নর-নারীর প্রাণ নানা ছদ্মবেশে আপনাকে চরিতার্থ করিবার পথ খুঁজিয়া লইতেছে। সর্বত্রই এই প্রাণের জয় যাত্রা।

সন্দীপের জীবন-দর্শনের বিচার ও বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। কারণ এই জীবন-দর্শনের উপর তাহার নিজের কোন নিষ্ঠা ও বিশ্বাস নাই। এই বোধ আশ্রয় করিয়া সন্দীপের যে অতি নিষ্ঠুর, অতি ক্রূর চরিত্র গড়িয়া উঠিতে পারিত, তাহা তাই গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। সন্দীপ চরিত্র সৃষ্টির পশ্চাতে জীবনের কোন বিস্ময় প্রেরণা নাই বলিয়া তাহা তুচ্ছতায় পর্যবসিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে সন্দীপ কোন কিছুতেই বিশ্বাস করে না। এই কোন কিছুতে বিশ্বাস না করা যদি একটি দর্শন হয়, তবে তাহাই সন্দীপের একমাত্র জীবন-দর্শন। নিখিলেশ সন্দীপের এই স্বভাবের কথা জানিত। তাই সন্দীপের স্বভাবের পরিচয় দিতে গিয়া নিখিলেশ একস্থলে মন্তব্য করিয়াছে,

"ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি সন্দীপ হচ্ছে আইডিয়ার জাদুকর, সত্যকে আবিষ্কার করায় ওর কোন প্রয়োজন নেই, সত্যের ভেলকি বানিয়ে ভোলাতেই ওর আনন্দ। ভোলানোই যার কাজ নিজেকেও না ভুলিয়ে সে থাকতে পারে না।"

সন্দীপ জীবনে একমাত্র প্রবৃত্তির দিকটিকে সত্য বলিয়া মানে, এই প্রেরণায় মানুষ বহির্মুখী, ভোগের উপকরণ সঞ্চয়ে তৎপর। অন্যদিকে নিখিলেশ একমাত্র নিবৃত্তির দিকটিকে জীবনে সত্য বলিয়া মানে। নিখিলেশ এমন একটি পরিণাম লাভ করিতে চাহিয়াছে, যেখানে মানুষ সম্পূর্ণরূপে আসক্তিমুক্ত। সম্পূর্ণ আসক্তিমুক্ত চিত্তের যে শান্তাবস্থা, নিখিলেশ সেই মানসিক অবস্থা লাভ করিতে চাহিয়াছে।

ইহাদের কোন একটি পূর্ণতার সাধনা নয়। ইহাদের কোন একটিতে জীবনকে স্পষ্ট দ্বিধা করিয়া লইতে পারা যায় না। মানুষের জীবন এই উভয়ের যোগে এক অপরূপ, আশ্চর্য প্রকাশ। এই অপরূপতা কেবল প্রবৃত্তি বা কেবল নিবৃত্তির মধ্যে নাই। উভয়ের অনিবার্য অবিচ্ছেদ্য যোগে জীবনের সম্পূর্ণতা। জীবনের অপরূপতা বলিতে যাহা বুঝায় তাহার পরিচয় যেমন কোন একটি প্রেরণার মধ্যে নাই, তেমনি তাহা উভয়ের যোগের মূল্যকেও ছাড়াইয়া যায়। এই যে অপরূপতা তাহাকে মানুষ কোন তত্ত্ব দিয়া কোনদিন ব্যাখ্যা করিতে পারিবে না।

সন্দীপের দেশাত্মবোধের পশ্চাতে আছে আপনার প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা-শক্তিকে একটা বৃহত্তর ক্ষেত্রে লীলায়িত করিবার আকাঙ্ক্ষা। তাহার রাজনীতি গ্রহণের উদ্দেশ্য হইল, মানুষের মধ্যে ভাবাবেগ সঞ্চারিত করিয়া দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ভিতর দিয়া মানুষের বিচার ও নৈতিক বোধকে সাময়িকভাবে বিচলিত করিয়া দিতে না পারিলে, তাহার মত মানুষ অপরিমিত, যদৃচ্ছা ভোগের প্রভূত উপকরণ সঞ্চয় করিতে পারে না।

তাহার ভাবাবেগ-স্রোতে কত নারী তাহাদের ইহকাল ও পরকালের ধর্ম ভাসাইয়া দিয়াছে, কত পুরুষ ধর্মভ্রষ্ট হইয়াছে, কত নর-নারী তাহাদের আজন্মের সঞ্চিত সম্পদ তাহার পদতলে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া নিঃস্ব হইয়াছে।

এমনি অবস্থায় সন্দীপের সহিত বিমলার পরিচয়। সন্দীপের ছুটিয়া চলার বেগে এমনি কত নারী তাহার জীবনপথে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। সেই নারীদের বুক দুই পায়ে দলিত করিয়া, তাহাদের সকল ধর্ম ছিনাইয়া লইয়া সে অগ্রসর হইয়াছে। তাহার মনে দ্বিধা নাই,—সংকোচ নাই,—গ্লানি নাই। সন্দীপ সম্পূর্ণ ভার মুক্ত। আজ তাহার জীবনপথে যদি কিছুকালের জন্য

বিমলা আসিয়া পড়িল, তবে তাহার সকল মাধুর্যকে সে নিঃশেষে পান করিয়া লইবে না কেন ? তাহার পর কিছুদিন পরে সে এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, আর বিমলা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে পথপার্শ্বে দলিত কুসুমের মত ।

নারীর মধ্যে প্রাণের প্রেরণা যত সত্য, যত স্বাভাবিক হোক এই চেষ্টায় সন্দীপকে শীঘ্রই উপলব্ধি করিতে হইয়াছে যে, বিমলা একজন সামাজিক, সম্পন্ন, সম্ভ্রান্ত, ধনী জমিদারের কুলবধূ । তাহার মধ্যে বধূজীবনের সকল সংস্কার অত্যন্ত প্রবল, তাহার স্বাভাবিক শালীনতা ও সৌন্দর্যবোধও যথেষ্ট আছে, সকলের উপর নিখিলেশের ব্যক্তিত্বের প্রভাব তো আছেই । এই বিমলাকে নিখিলেশের প্রভাবমুক্ত করিয়া, তাহাকে গৃহের বাহিরে টানিয়া আনা সহজসাধ্য ব্যাপার নয় । সন্দীপ যদি তাহার এই চেষ্টায় একান্ত কৃতকার্যও হয়, তবে তাহার জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন । সন্দীপকে এখানে অত্যন্ত সন্তর্পনে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ করিতে হইবে । তাহার কৌশলকে নিপুণ এবং অভ্রান্ত করিয়া তুলিতে হইবে ।

এই সমস্ত চিন্তা করিয়া সন্দীপ নিখিলেশের গৃহে কিছুকাল থাকিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছে ।

সন্দীপ তাহার দলবল লইয়া নিখিলেশের গৃহে থাকিয়া গেল । বাহিরে দেশাত্মবোধ প্রচারের সঙ্গে, গৃহে সন্দীপের আর এক কাজ হইল বিমলাকে ধীরে ধীরে তাহার পরিচিত আবেষ্টনী হইতে বাহিরে টানিয়া আনা, তাহার সংস্কারের বন্ধন একের পর এক ছিন্ন করিয়া দেওয়া । সচেতন হইয়া বিমলা কোন দিন এই আগুনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না, তাহা সন্দীপ জানে । তাই মডার্নিজম্, মানবিকতা ইত্যাদি নানা তত্ত্বের ছদ্মবেশে একদিকে সে যেমন বিমলার নব জাগ্রতবোধের সমর্থন খুঁজিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি দেশাত্মবোধের অন্তরাল দিয়া তাহার মধ্যে যতদূরসম্ভব ভাবাবেগ সঞ্চারিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে । সন্দীপ দিনের পর দিন বিমলার স্তবগান করিয়া চলিয়াছে । সে যে শক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সে যে সাধারণ নারীসুলভ লজ্জা, বিনয়, সঙ্কোচ ও সামাজিক সকল সংস্কারবোধের ঊর্ধ্বে, তাহা শুনাইয়া শুনাইয়া তাহার নৈতিক সংগ্রামকে পর্যন্ত সে নিরুদ্ধ করিয়া দিয়াছে ।

বিমলার মধ্যে ভাবান্তর ঘটাইতে ইতিমধ্যে সন্দীপ যে কতটা কৃতকার্য হইয়াছে তাহার পরিচয় সন্দীপের উক্তি হইতেই লাভ করিতে পারা যায় ।

"এ যে ঘরের বউ, বাইরের পুরুষের পক্ষে একেবারে নক্ষত্রলোকের মানুষ । এখানে কোন বাঁধা পথ নেই । এই পথহীন শূন্যের ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে টানাটানি, জানাজানি, অদৃশ্য হাওয়ায় হাওয়ায় সংস্কারের পর্দা

একটার পর একটা উড়িয়ে দিয়ে কোন এক সময়ে একেবারে উলঙ্গ প্রকৃতির মাঝখানে এসে পৌঁছানো, সত্যের এ এক আশ্চর্য্য জয়যাত্রা। * * *

"তাই চোখের সামনে সত্যের এই প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখতে আমার ভারি চমৎকার লাগছে। কত লজ্জা, কত ভয়, কত দ্বিধা তাই যদি না থাকবে তবে সত্যের রস রইল কী। বাস্তবকে যখন অবাস্তবের সঙ্গে লড়াই করতে হয়, তখন ছলনা তার প্রধান সহায়। * * * যে রকম অবস্থা তাতে জোর করে বলতে পারে না যে, হাঁ আমি স্থূল, কেন না আমি মাংস, আমি প্রবৃত্তি, আমি ক্ষুধা, নির্লজ্জ নির্দ্দয়।"

সন্দীপ ভাবিয়াছে, বিমলা যখন তাহার পরিণামসম্পর্কে সচেতন হইবে, যখন আড়াল দিবার কোথাও আর কিছু থাকিবে না, তখন বিমলা তাহার জীবনের রাশ প্রাণপণবলে টানিয়া ধরিতে চেষ্টা করিবে সত্য, কিন্তু শিথিল ইন্দ্রিয়কে ওই পরিণামে পোঁছাইয়া নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। ওই সংগ্রামের ভিতর দিয়া সম্পূর্ণ সচেতন হইয়াই বিমলাকে তাহার কামনা-সমুদ্রের অতলে এক সময় ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। নারীর এই পরিণাম সন্দীপ আপনার জীবনে কতবার প্রত্যক্ষ করিয়াছে। সম্পূর্ণ বিরূপতা ও ঘৃণা লইয়াই কত নারী তাহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সর্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছে। সন্দীপ বলে ওই ঘৃণাটা কতকগুলি মিথ্যা নৈতিক সংস্কারপ্রসূত। সত্যের অনিবার্য প্রকাশে মিথ্যার সকল বন্ধন এমনি করিয়া বারংবার ছিন্ন হইয়া যায়। তাই এমনি করিয়া বিমলাকেও যে একদিন আসিতে হইবে, তাহাতে সন্দীপের কোন সংশয় নাই।

এ পর্যন্ত সন্দীপেব চরিত্রে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। ইতিমধ্যে নারীর জীবন লইয়া সে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়াছে, বিমলাকে লইয়া তাহাই করিয়াছে মাত্র।

প্রবৃত্তিকে নর-নারীর একমাত্র ধর্ম বলিয়া মানিয়া লইলে কী হইবে। মানুষ তাহার হৃদয়বোধকে পরিহার করিবে কেমন করিয়া। হৃদয়ের সঙ্গে বেদনাকেও অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। যে হৃদয় দিয়া মানুষ আনন্দ বোধ করে, সেই হৃদয় আবার মানুষকে আসক্তিতে বাঁধে, মানুষ রূপের বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া যায়। আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিতে মানুষ তাই নিরানন্দ হইয়া পড়ে। পূর্বের বেদনা জয় না করিয়া, মানুষ অন্য রূপকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারে না। মানুষ বেদনার এই শাশ্বত তত্ত্বকে স্বীকার না করিয়া পারে না। বেদনা আছে বলিয়া মানুষকে বাধ্য হইয়া সংযম শিক্ষা করিতে হয়। রূপের প্রতি নিষ্ঠা আসে এই বেদনা হইতে। এই বেদনার ভিতর দিয়াই মানুষের অধ্যাত্মবোধের প্রথম বিকাশ ঘটে।

সন্দীপের অন্তরেও বেদনা সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। ইহা সেই বেদনা, যে বেদনায় বিশ্বে সৌন্দর্য ও মাধুর্যের দ্বার খুলিয়া যায়। এতদিন সন্দীপ তাহার যে হৃদয় নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা কেমন করিয়া সহসা উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। বিমলা আজ তাহার শুধু প্রবৃত্তি চরিতার্থতার বস্তু নয়, সে আজ তাহার অনেক ঊর্ধ্বের সামগ্রী। ইহা যে কী. সন্দীপ তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারে না।

একাকী বসিলে অকারণ বেদনায় তাহার বুকের ভিতর টন্ টন্ করিয়া উঠে। রাত্রের নির্জনতায় বিমলার প্রত্যেকটি রূপ, তাহার অসংলগ্ন কত কথা, তাহার প্রত্যেকটি ভঙ্গী ছায়ারূপে তাহার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া অপার্থিব এক সুরের জাল বুনিতে থাকে। সেই সুরের ধারায় তাহার সমগ্র সত্ত্বা ধীরে ধীরে ডুবিয়া যায়। ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া অকারণ আনন্দে তাহার অন্তর শরতের শিশির ধোওয়া প্রথম আলোক ছোঁওয়া দীর্ঘ নারিকেলপত্রের মত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে।

ইহার স্বরূপ কি? ইহাতে তাহার জীবনের প্রয়োজন কি? ইহার কোন কিছুই সন্দীপ আজও না বুঝিতে পারিলেও, ইহা অন্ততঃ বুঝিয়াছে যে সচেতনভাবে মানুষ যেমন করিয়া তাহার জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করুক না কেন, তাহার দুর্জ্ঞেয় সত্ত্বা ওই সকল বোধ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আপনার নিয়মে জীবন গড়িয়া তুলে। দুর্জ্ঞেয় কোন এক নিয়মে মানুষের জীবন গড়িয়া উঠিতেছে।

যত স্থূলভাবেই হোক, সন্দীপের অন্তরে এই প্রেম অনুভূত হইয়াছে বলিয়া আজ বিমলার জন্য করুণায় তাহার অন্তর বিগলিত হইয়া যায়। সন্দীপের জীবনে আজ ইহাও সম্ভব হইয়াছে! তাহার এই অনুভূতি তাহার জীবন-দর্শনের যতই বিরুদ্ধ ও বিপরীত হোক, তাহা তাহার জীবনের আর সকল প্রেরণার মত সত্য।

সন্দীপ বিমলার অভিভূত মুহূর্তের সুযোগ কতবার লাভ করিতে পারিত। ইতিপূর্বে এই সুযোগকে সে কখন ব্যর্থ হইতে দেয় নাই। কিন্তু বিমলার ক্ষেত্রে সন্দীপ এই সকল মুহূর্তকে হেলায় বহিয়া যাইতে দিয়াছে। বিমলার এবং আপনার এই মানসিক অবস্থাকে যতই সে নিরাসক্ত দ্রষ্টার মত সম্ভোগ করুক এবং ইহাকে দুর্বলতা বলিয়া যেভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করুক না কেন, তাহার ভোগসর্বস্ব জীবন-দর্শনের প্রেরণা তাহার জীবনে আর তেমন কার্যকরী হইতেছে না এবং যে বোধ তাহার এই ভোগ-প্রেরণাকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে, যত স্থূল ভাবে হোক না কেন, তাহা যে সন্দীপের প্রেম-বোধ, তাহাতে সংশয় নাই।

তাহার এই আসক্তি, তাহার এই প্রেম—আজ বিমলাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে, অথচ সন্দীপ রাজনীতিও ত্যাগ করিবার চিন্তা করিতে পারে না।

সন্দীপ রাজনীতি আশ্রয় করিয়াছিল তাহার জীবন-দর্শনকে তাহার এবং তাহার জীবনের চতুর্দিককে একটি বিস্তৃত ক্ষেত্রে সার্থক করিয়া তুলিতে। ইহা তাহার সচেতন মনের প্রেরণা। আজ তাহার হৃদয়ে যে বোধ জাগ্রত হইয়াছে, তাহা এই প্রেরণার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার এই বোধ আজও পর্যন্ত তেমন প্রবল হইয়া উঠে নাই। তাই রাজনীতি পরিহার করিবার চিন্তামাত্রও করিতে সন্দীপের নিকট জীবন শূন্যময় বলিয়া বোধ হয়। সন্দীপ আজ তাই বিমলা ও রাজনীতিকে একত্রে লাভ করিতে চাহিয়াছে।

সন্দীপ যে মানুষহিসাবে অত্যন্ত সাধারণ, তাহা বিমলা আজকাল বুঝিতে পারে। কিন্তু যে ভাব ও আদর্শের আলোকে সে একপ্রকার অসামান্য দীপ্তি লাভ করিত, সে দীপ্তি কেন যে ম্লান হইয়া গেল, তাহা সে বোধ করিতে পারে নাই। বিমলার প্রতি আসক্তিই তাহার সর্ববিধ দুর্বলতার কারণ। তাহার ওই বীরের ছদ্মবেশ আজ ধুলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে শুধু এই একমাত্র কারণে। বিমলা সন্দীপ-সম্পর্কে তাহার পূর্বের মোহটাকে বড় করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি, সন্দীপের প্রেম সন্দীপকে আজ এতদিন পরে স্বাভাবিক মানুষে পরিণত করিয়াছে—যে মানুষের মধ্যে ত্রুটি আছে, দুর্বলতা ও মোহ আছে; আবার প্রেম ও করুণা ত্রুটি-দুর্বল ও মোহ-কাতর মানুষকে দেবের মহিমা দান করে। প্রেম মানুষের সমস্ত দুর্বলতাকে অনাবৃত করিয়া সকল তত্ত্বের সংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া মানুষকে স্বভাবস্থিত করে। তাহার পর এই প্রেম আবার ধীরে ধীরে মানুষকে পূর্ণতার দিকে, মুক্তি লোকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।

সন্দীপ বিমলার কাছে টাকা চাহিয়াছিল দেশের নামে ব্যক্তিগত যদৃচ্ছা ভোগ ও বিলাস ব্যসনের জন্য। আর এমনি করিয়া তাহাকে ইতিপূর্বে কতবারই তো অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কিন্তু বিমলার দেওয়া মোহর এইভাবে সে ব্যয় করিতে পারে নাই। ব্যয় করিতে পারে নাই, তাহার কারণ সে বিমলাকে ভালোবাসে! মানুষ যাহাকে ভালোবাসে তাহার অর্থ অসংযত বিলাসে ব্যয় করিতে পারে না। প্রেম মানুষের অন্তরে এমনি করিয়া অনিবার্য ভাবে নৈতিকবোধ জাগ্রত করে। অমূল্যের উক্তির মধ্যে সন্দীপের এই আশ্চর্য আচরণের পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়।

"এখান থেকে গিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে রুমাল থেকে সমস্ত গিনি মেজের উপর ঢেলে রাশ করে তুলে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল;

বললে, এ টাকা নয়, এ ঐশ্বর্য্য পারিজাতের পাপড়ি, এ অলকাপুরীর বাঁশি থেকে সুরের মত ঝরে পড়তে পড়তে শক্ত হয়ে উঠেছে, একে তো ব্যাঙ্ক নোটে ভাঙ্গান চলে না। এযে সুন্দরীর কণ্ঠহার হয়ে থাকবার কামনা করছে।"

এই প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ যত স্থূল হোক, সন্দীপের ওই পরিণামকে নিঃসংশয়িত করিয়া তুলিয়াছে। এই মোহর বিমলাকে হয়ত নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহাতে সন্দীপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর সন্দীপ বিমলার নিকট হইতে শেষ বিদায় লইয়া গেল। যাওয়ার পূর্বে বলিয়া গেল,

"তোমার কাছে আমার আসার কাজ শেষ হয়ে গেছে। তারপরেও যদি থাকি, তা হলে একে একে আবার সব নষ্ট হয়ে যাবে। পৃথিবীতে যা সকলের চেয়ে বড়ো, তাকে কালের মধ্যে ব্যাপ্ত করতে গেলেই সর্ব্বনাশ ঘটে—মুহূর্ত্তের অন্তরে যা অনন্ত তাকে কালের মধ্যে ব্যাপ্ত করতে গেলেই সীমাবদ্ধ করা হয়। আমরা সেই অনন্তকে নষ্ট করতে বসেছিলুম। ঠিক এমন সময়ে তোমার বজ্র উদ্যত হল, তোমার পূজাকে তুমি রক্ষা করলে, আর তোমার এই পূজারীকেও। আজ আমার এই বিদায়ের মধ্যেই তোমার বন্দনা সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল। দেবী! আমিও আজ তোমাকে মুক্তি দিলাম, আমার মাটির মন্দিরে তোমাকে ধরছিল না, এ মন্দির প্রত্যেক পলকে ভাঙ্গবে ভাঙ্গবে করছিল—আজ তোমার বড়ো মূর্ত্তিকে বড়ো মন্দিরে পূজা করতে চললুম। তোমার কাছ থেকে দূরেই তোমাকে সত্য করে পাব। এখানে তোমার কাছে প্রশ্রয় পেয়েছিলুম, সেখানে তোমার কাছ থেকে বর পাব।"

বিমলাকে ভালোবাসিয়া সন্দীপ আজ জীবনে এমন একটি মূল্যবোধ অর্জন করিয়াছে, যাহা প্রবৃত্তির অনেক ঊর্ধ্বের সামগ্রী, যাহাকে মানুষ যুক্তি বিচার দিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে পারে না। সেই গুহাশায়িত অচিন্তনীয় মহাশক্তির ইচ্ছায় মানুষের জীবন গড়িয়া উঠিতেছে। এই জীবনের সকল উদ্দেশ্য সকল অর্থ তাহারই মধ্যে নিহিত।

আসক্তি মানুষকে বাঁধে অন্তরে প্রেমের বোধ সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য। এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এ কথাও সত্য যে, এই প্রেমকে উন্নততর পরিণাম দান করিতে আবার এই আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিতে হয়। নহিলে আসক্তি মোহ সৃষ্টি করিয়া জীবনে ঘোর বিনষ্টি ঘটায়। সন্দীপের অন্তরে প্রেম উপলব্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের উপর এখনও পর্যন্ত তাহার কোন

নিয়ন্ত্রণ নাই। ইহা তো সহজ নয়, ইহার জন্য প্রয়োজন সুদীর্ঘকালের তপশ্চর্যা। প্রেম প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হইলে নর-নারী ইন্দ্রিয়ের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে। বিমলার নিকট সংস্পর্শে এই প্রবৃত্তিকে শাসন করা সন্দীপের পক্ষে অসম্ভব। ইহারই প্রেরণায় সন্দীপ তাহার হৃদয়-প্রতিমাকে কোন এক দুর্বল মুহূর্তে যে তমসা-সমুদ্রে ডুবাইয়া দিত না, তাহা সে জোর করিয়া বলিতে পারে না। যে প্রতিমা তাহাকে মুক্তির বর দিতে পারিত, তাহাকে সে হয়ত সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় কখন বিসর্জন দিয়া বসিত।

প্রেমাস্পদকে অন্তরে ধ্যান-মূর্তিতে পাওয়াই সার্থক পাওয়া, বাহিরে তাহাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষার মানুষের আসক্তির প্রকাশ ঘটে। অন্তরে ধ্যান-মূর্তিতে যে দুর্লভ রূপ ফুটিয়া উঠে, তাহার কতটুকু পরিচয় বাহিরে রূপের বন্ধনে লাভ করিতে পারা যায়। অন্তরের ধ্যানমূর্তিই মানুষকে ক্রমাগত উন্নততর চেতনা-লোকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। যাহা কেবল অন্তরময়, তাহাকে অন্তর দিয়া অন্তরের মধ্যে লাভ করিতে হয়, তাহাকে বাহিরে লাভ করিতে গেলে তাহার সকল মাধুর্য, সকল অপরূপতা ধূলায় লুটাইয়া যায়।

সন্দীপ বিমলাকে মুক্তি দিয়াছে, কিন্তু তাহার নিজের বন্ধন তখনও পর্যন্ত ঘুচে নাই। তাই, এই সর্বশেষ বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য সন্দীপকে পুনরায় বিমলার নিকট ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।

"মক্ষীরাণী, এতদিন পরে সন্দীপের নির্ম্মল জীবনে একটা কিন্তু এসে ঢুকেছে। রাত্রি তিনটের পর জেগে উঠেই রোজ তার সঙ্গে একবার ঝুটোঝুটি লড়াই করে দেখেছি, সে একান্ত ফাঁকি নয়। তার দেনা চুকিয়ে না দিয়ে সন্দীপেরও নিষ্কৃতি নেই। সেই আমার সর্ব্বনাশিনী কিন্তুর হাতে দিয়ে গেলুম আমার পূজা। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখলুম পৃথিবীতে কেবলমাত্র তারই ধন, আমি নিতে পারব না। তোমার কাছে আমি নিঃস্ব হয়ে তবে বিদায় পাব, দেবী।"

প্রেমের বোধই যে সন্দীপের জীবনে এই ক্রমিক উন্নততর নানা নৈতিক বোধের সঞ্চার করিতেছে তাহাতে সংশয় নাই। এই প্রেম সন্দীপের দৃষ্টিকে আবরণ-মুক্ত করিয়াছে। জীবন ও জগতের সমস্ত কিছুই তাই আজ দুর্লভ বলিয়া বোধ হয়। একমাত্র প্রেমিকই জীবনকে ভালোবাসে, ইহার দুর্লভতা বোধ করিয়া ধন্য হয়। জীবনের মূল্যবোধ কোথা হইতে জাগে, তাহা স্পষ্টই বোধ করিতে পারা যায়। সন্দীপ তাই এই জীবনকে ফিরিয়া নূতন করিয়া লাভ করিতে চাহিয়াছে, "কিন্তু আমার বেঁচে থাকার দরকার।"

৪

সদ্‌ ও অসতের দ্বন্দ্ব আমাদের পুরাণে এই ভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। কর্ণ ও অর্জুন যখন মহাসমরে প্রবৃত্ত হইতে চলিয়াছেন, তখন ত্রিলোকে দুটি দল গড়িয়া উঠিল। সেই অংশটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি। উদ্ধৃতিটির মধ্যে অভিনিবেশসহকারে লক্ষ্য করিবার অনেক বিষয় আছে।

"ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর কর্ণ ও অর্জ্জুনের নিমিত্ত আকাশে বিবাদ হইতে লাগিল এবং তত্রত্য প্রাণিগণের মধ্যে পরস্পর মতভেদ হইল ।। ৩৯ ।।

"মাননীয় রাজা! ভূতলের সমস্ত লোকও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই পক্ষ অবলম্বন করিল। কর্ণ ও অর্জ্জুনের সেই যুদ্ধ সম্মেলনের সময়ে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ এবং রাক্ষসরাও ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ গ্রহণ করিল। তাহার মধ্যে নক্ষত্রগণের সহিত আকাশ থাকিল কর্ণের পক্ষে ।। ৪০-৪১ ।।

"মাতা যেমন পুত্রের পক্ষ গ্রহণ করেন, তেমন বিশালা পৃথিবী অর্জ্জুনের পক্ষ গ্রহণ করিলেন। আর নরশ্রেষ্ঠ! নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ ও লতাগণ অর্জ্জুনের পক্ষ হইল। শত্রুসন্তাপক রাজা! অসুর, রাক্ষস, গুহ্যক, আকাশচর ভূত ও অমাঙ্গলিক পক্ষীরা কর্ণের পক্ষ আশ্রয় করিল। রত্ন, সমস্ত নিধি, বেদ, ইতিহাস, উপবেদ, উপনিষদ, মন্ত্র, সংগ্রহগ্রন্থ, বাসুকি, চিত্রসেন, তক্ষক, উপতক্ষক, পর্ব্বত, কদ্রু হইতে উৎপন্ন সন্তান-সন্ততিযুক্ত, বিষধারী ও মহাক্রোধী নাগেরা অর্জ্জুনের পক্ষে গেল ।। ৪২-৪৬ ।।

"ঐরাবত, সৌরভেয় ও বৈশালেয় নাগেরা অর্জ্জুনের পক্ষে গমন করিল; আর ক্ষুদ্র সর্পেরা কর্ণের পক্ষে গেল ।। ৪৭ ।।

"রাজা! কেন্দুয়া বাঘ, হিংস্র পশু এবং মাঙ্গলিক সমস্ত পশু পক্ষী অর্জ্জুনের জয়লাভের জন্য তাহার পক্ষই আশ্রয় করিল ।। ৪৮ ।।

"বসুগণ, মরুদ্‌গণ, সাধ্যগণ, বিশ্বে দেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু এবং দশদিক—ইঁহারা অর্জ্জুনের পক্ষে গেলেন; আর দ্বাদশ আদিত্য কর্ণের পক্ষবর্ত্তী হইলেন। মহারাজা বৈশ্য, শূদ্র, সূত ও যাহারা বর্ণসঙ্কর, তাহারা সকলে কর্ণের পক্ষ লইল। পিতৃগণ, পার্শ্বচর ও অনুচরগণের সহিত অপর দেবগণ এবং যম, কুবের ও বরুণ, অর্জ্জুনের পক্ষে গমন করিলেন; আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, যজ্ঞ ও দক্ষিণা অর্জ্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিলেন ॥ ৪৯-৫২ ॥

"রাজা, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণ এবং তুরুম্বুু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ অর্জ্জুনের পক্ষে গমন করিলেন ॥ ৫৪ ॥

"পুরুষশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র ও সূর্য্য দুই পক্ষে থাকিলেন, তখন দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যেও দুই পক্ষ হইল ॥ ৬৩ ॥

"—যে দিকে অর্জ্জুন, সেই দিকে দেবগণ এবং যে দিকে কর্ণ, সেই দিকে অসুরগণ রহিলেন ॥ ৬৫ ॥" মহাভারত (কর্ণপর্ব্ব)।"

সদ্ ও অসদ্ সম্পর্কে হিন্দু ধারণার সামগ্রিক প্রকাশ-রূপটি কেবল এই একটিমাত্র উদ্ধৃতির মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

বস্তুতঃ নিখিল বিশ্বের সমস্ত কিছুকে এইরূপে সদ্ ও অসদ্ দুইটি ভাগে বিভক্ত করিবার কোন উপায় নাই।

এই দ্বিধাকরণের ভিতর দিয়া একটি সমগ্র জাতি-চিত্তের বিকাশের একটি পর্যায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই দুই-এর বোধ, পরিণামে একটি অখণ্ড স্বরূপতা লাভ করিতে চলিয়াছে।

ব্যষ্টি জীবনে একটি প্রেরণা লক্ষ্য করা যায়, যাহা নিম্নাভিমুখী, আর একটি প্রেরণা ঊর্ধ্বমুখীন।—এই উভয়মুখীন প্রেরণার সংঘাতে একটি সত্ত্বা ক্রমাগত বিকাশ লাভ করিতেছে। এই তিনটি বিক্রিয়া অভিক্ষেপের ভিতর দিয়া যে ত্রি-লোক—স্বর্গ, মর্ত্য ও নরক গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনে বিকাশ এমন একটি পরিণাম দ্রুত লাভ করিতে চলিয়াছে যে, পরিণামে এই তিন একটি অখণ্ড পরিণাম লাভ করিবে। তখন কে কাহার উপর অভিক্ষেপ করিবে? সদ্ অসতের চূড়ান্ত মাননির্ণয় মনুষ্যের-সাধ্যাতীত। ওই পরিণামে মাননির্ণয়ের সে চেষ্টাও নিরর্থক হইয়া যাইবে।

সীমার বোধ হইল মৃত্যু, আর অসীমের বোধ হইল অমৃত্যু বা অমৃত। সীমার বোধ হইল অজ্ঞান, অসীমের বোধ হইল জ্ঞান। মানবিক যে কোন বোধ এই সীমাকে আকাঙ্ক্ষিত করিয়া তুলিয়া মৃত্যুতাড়িত হয়। মানবিক বোধের ঊর্ধ্বে উঠিয়া মানুষ এই মৃত্যুকে জয় করিয়া উঠে। দেবতা হইল, জ্ঞান বা অসীমের প্রতীক, অসুর হইল অজ্ঞান বা সীমার প্রতীক।

সকল ধর্ম ও দর্শনে—এমনকি সকল আদিম মানব-সমাজের ধর্মবোধের মধ্যেও এইরূপ একটি দ্বৈতবোধ লক্ষ্য করা যায়।

"—it remains unquestionable that in the most primitive group of civilisation the belief in a representation of evil is deeply rooted, and that the myths that it is impossible to attribute it to any borrowing from Christian sources. On the contrary, we must regard it as some-thing very ancient belonging as of right to important religious groupings, albeit not universally found in all religious of the same antiquity." —Joseph Henninger.

"The devil's real home is the East. There, for the first time. the spirit of evil is personified as a mighty opponent of the spirit of good in the dualistic systems of Mazda and the Jews and Islam who imagined him as dark "double" of god, either, like him, uncreated, or a creature who had fallen from grace." —Germain Bazin.

এই উভয়ের যোগ এবং তাহার স্বরূপ আজও পর্যন্ত মনুষ্য-অজ্ঞাত। বিশ্বের সকল ধর্ম ও দর্শন এইখানে আসিয়া নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে।

আধুনিক দার্শনিক জগতে এই উভয় সত্তার সংযোগের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা লক্ষিত হয়। যাঁহারা কেবল সীমাকে মানিয়া লইয়া নিশ্চিত, কিংবা অন্যদিকে যাঁহারা কেবল অসীমকে একমাত্র বলিয়া মানেন এবং এইরূপে বিশিষ্ট চিন্তা-পদ্ধতি ও সাধন-পদ্ধতি গড়িয়া তুলিয়াছেন, আমি তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। যাঁহারা এই উভয়ের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন অথচ চিরন্তন দ্বন্দ্বকে স্বীকার করেন না, আমি তাঁহাদের কথাই বলিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ এই শেষোক্ত দলের একজন। তাঁহার দার্শনিক চিন্তা-পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনা আমি অন্যত্র করিয়াছি। এক্ষেত্রে তাহারই একটি দিক কেবল উল্লেখ করিব।

রবীন্দ্রনাথ মনুষ্য-সমাজের অজ্ঞানতার সামগ্রিক বোধটিকেই এবং তাহারই প্রতীক রূপটিকেই শয়তান বলিয়া বোধ করিতেন। মনুষ্য সভ্যতা-জ্ঞানকে যতই অধিক পরিমাণে লাভ করিতেছে, ততই তাহার এই অজ্ঞানতার দিকটি বা শয়তান-ভাগটি হ্রাস পাইতেছে।—সাময়িকভাবে কোন দেশ উন্নত অবস্থা হইতে স্খলিত হইলেও, সামগ্রিকভাবে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের জ্ঞানের ক্রমিক উন্নত পরিণাম ঘটিতেছে।

যে দেশে বা মনুষ্য-সমাজে জ্ঞানের প্রসার যত কম, সেখানে ভয়ের বিচিত্র আকার বা রূপ তত বেশি। ইহা তাহার সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, সমাজ-নীতি প্রভৃতি বিশ্লেষণ দ্বারা নির্দেশ করা যাইতে পারে। সমষ্টি-জীবনে একথা যেমন সত্য, ব্যষ্টি-জীবনে ও একথা তেমনি সত্য। এইরূপে পরিণামে বুদ্ধি ও বোধি একটি অখণ্ড পরিণাম লাভ করিতে চলিয়াছে।

সমাজের সামগ্রিক অপরাধের প্রকাশটিকে যদি শয়তান আখ্যা দান করা যায়, তবে জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের সামগ্রিক প্রকাশ-রূপটি অবশ্যম্ভাবীরূপে যে হ্রাস পাইতেছে, একথা সত্য। কিন্তু, কয়েক সহস্র বৎসরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়াও ইহাকে আমরা তেমন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারি না।

ইহার একটি কারণ আছে। যে সামাজিক কাঠামো গড়িয়া তোলা হইয়াছে, তাহাতে এই জ্ঞানের প্রসারলাভের পক্ষে বাধা আছে। তাহার ফলে অনিবার্যরূপে অপরাধ-বোধও স্থায়ী হইয়া আছে। সমাজে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভের পথ যদি সকলের জন্য সমানভাবে খোলা না থাকে, তাহা হইলে

যাহাদের নিকট পথ রুদ্ধ, তাহাদের প্রাণমনের শক্তি উন্নততর পরিণাম লাভের পথে বাধা পাইয়া নানা বিকৃত পরিণাম লাভ করে। আবার এই বিকৃতি নির্দেশ করিয়া আমরা সামাজিক-বিধান দ্বারা তাহাদের লাঞ্ছিত করাকে ন্যায়-সঙ্গত বোধ করিয়া সন্তোষ লাভ করি। আত্মা বা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করিতে ভারতীয় প্রতিভার মত এমন দুঃসাহসের পরিচয় আর কোন দেশ দান করিতে পারে নাই। সকল সীমিত বোধের ঊর্ধ্বে উঠিয়া আত্মিক প্রেরণা যেমন জয়যুক্ত হইতে চাহিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে সীমার জগতে শয়তান চূড়ান্ত প্রতিশোধ লইয়াছে। সামাজিক স্তরবিন্যাসের চেষ্টা তাহারই প্রকাশ। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা ও সমাজ-চিন্তায় তাই এমন বৈপরীত্য!

এই সমাজ রূপায়ণের পশ্চাতে যে মনস্তাত্ত্বিক কারণ সক্রিয়, আমরা অন্যত্র সে আলোচনা করিয়াছি। জ্ঞানের প্রসারের জন্য সমাজ-কাঠামোর রূপান্তর প্রয়োজন এবং সমাজ-কাঠামো রূপান্তরিত হইলে, পরিণামে ওই মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমিও ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

রবীন্দ্রনাথকে বিচিত্রমুখে একযোগে সংগ্রাম করিতে হয়। তিনি একদিকে জ্ঞান প্রসারের জন্য যেমন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, এবং প্রত্যেকের স্বাভাবিক বিকাশ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, যাহাতে গুণ কর্ম অনুসারে আপন আপন অধিকার লাভ করিতে পারে। তেমনি, অন্যদিকে যে দার্শনিক ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়াইয়া এই সংগ্রাম করিতে হইবে, সেই দার্শনিক ভিত্তিভূমিকে সুদৃঢ় করিবার জন্য এবং যে সকল চিন্তা-পদ্ধতি ইহার অন্তরায়স্বরূপ তাহা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য নিরলস চেষ্টা করিয়াছেন।

যে সমস্ত দেশ প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে অপরাধ কি ভাবে সক্রিয় হয়, তাহা লইয়া তাহাদের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নাই। তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থা, মনস্তত্ত্ব, বিচিত্র দার্শনিক জিজ্ঞাসা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানের বহু বিচিত্র দিকে ইহার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ইহার ভিতর দিয়া তাহার নিয়ত উন্নততর পরিণাম লাভ করিতেছে।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে এই অপরাধের বিচিত্র গতি-বিধি, ইহাকে লালন করিবার বিচিত্র চেষ্টার স্বরূপ বিশ্লেষণের কোন চেষ্টাই আমাদের সাহিত্যে তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। অন্ততঃ, সেই জাতীয় কোন চেষ্টা-রূপ আমাদের সাহিত্যে ধরা পড়ে নাই, যেমনটি লক্ষ্য করা যায় জর্মান, বিশেষ করিয়া ফরাসী ও রাসিয়ান সাহিত্যে। যতটুকু চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, তাহা নিঃসন্দেহে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবের ফল। সে দৃষ্টি ধ্যানতন্ময়, শান্ত, দূর-প্রসারী নয়, প্রায়ই ব্যক্তিগত বিক্ষোভ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব-প্রসূত। ইহার মধ্যে সমগ্র জাতির নিয়তি রূপটিকে উপলব্ধি করিবার কোন চেষ্টা নাই, সামর্থ্যও নাই।

যোগাযোগ

নর-নারী মাত্রেরই একটি স্বভাব বা স্বধর্ম আছে। ইহার সহিত সামাজিক জাতি-বিভাগের অনিবার্য কোন যোগ নাই। এই সমাজের এককালে এমন একটি অবস্থা ছিল, যখন সামাজিক জাতি-বিভাগের সহিত স্বভাব বা স্বধর্মকে অনিবার্য করিয়া তুলিবার সকল উপায় অবলম্বন করা হইত। তখন জাতির উল্লেখমাত্রেই নীতি, ধর্ম, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মানের একটি ছবি মুহূর্তে ভাসিয়া উঠিত।

নারী বা পুরুষকে এইরূপে চিনিবার চেষ্টা, মনের মধ্যে এইরূপ সংস্কার গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা যে কত বড় ভ্রান্তি, কত বড় মায়া, তাহা আজও আমরা তেমন করিয়া বোধ করিতে পারি না।

অতুলনীয় ঐশ্বর্যের মাঝখানে বাস করিয়াও নর-নারী স্বভাবে দীন হইতে পারে। তাহার সহিত ঐশ্বর্যলোলুপ দীনতম ভিখারীর জাতি-সাদৃশ্য রহিয়াছে। নির্ধন হইয়াও ঐশ্বর্যের প্রতি মানুষ সম্পূর্ণ আসক্তিমুক্ত হইতে পারে। তথাকথিত উচ্চকুলে জন্মিয়াও সকল প্রকার দুষ্প্রবৃত্তিপরায়ণ পাপাচারী হইতে পারে, আবার তথাকথিত নিম্নকুলে জন্মিয়াও দেবতার ঐশ্বর্য-মণ্ডিত হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ সে কথা বলিয়াছেন, "এক রকম জাতিভেদ আছে, যা সমাজের নয়, যা রক্তের,—সে জাত কিছুতে ভাঙা যায় না।" অর্থাৎ বাহিরের কোন সীমিত বোধ দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অসম্ভব। এই স্বভাব লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে। বাহিরের কোন অবস্থান্তর এই স্বভাবের অবস্থান্তর ঘটাইতে পারে না।

'যোগাযোগ' আলোচনার প্রারম্ভে একথা বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে।

মধুসূদন ও কুমুদিনীর মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহা ভালোর সহিত মন্দের দ্বন্দ্ব নয়। তাহা এক-বোধ জগতের সহিত আর-এক বোধ জগতের সংঘাত। কুমুদিনীর সংস্কার, তাহার বিচিত্র নৈতিক বোধ, জগৎ ও জীবন-সম্পর্কে তাহার যে ধ্যান-ধারণা, জীবনে সার্থকতা ও অসার্থকতা বলিতে তাহার যে বিশিষ্ট বোধ, তাহার কোন একটির সহিত মধুসূদনের মিল নাই। এক-বোধ জগতে দাঁড়াইয়া আর-এক বোধ জগতের উপলব্ধি অসম্ভব। মধুসূদন ও কুমুদিনীর জগতের মধ্যে তেমনি দুস্তর ব্যবধান। ইহাকে অতিক্রম করিতে পারা যায় না।

মধুসূদনকে রবীন্দ্রনাথ কোথাও পাপাচারী করিয়া চিত্রিত করেন নাই।

ব্যবসায়ী-জীবনে সার্থকতালাভের জন্য তাহার আশ্চর্য ইন্দ্রিয়সংযম, ত্যাগ ও নিষ্ঠার কথা তিনি বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। এই জীবনে সার্থকতা লাভের জন্য যে সকল গুণাবলীর প্রয়োজন, মধুসূদনের মধ্যে সেই সকল গুণ পূর্ণমাত্রায় ছিল। উত্তর জীবনে শ্যামাকে আশ্রয় করিয়া তাহার যে সাময়িক নৈতিক স্খলন, তাহার জন্য একমাত্র সেই দায়ী নয়, দায়ী তাহার ভাগ্য। সে যে নারীকে বিবাহ করিয়াছে, সে নারী তাহার বন্ধনমুক্ত প্রবৃত্তিকে ভোগে শান্ত করিতে পারে না। শ্যামা তাহার একান্ত দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ লইয়াছে মাত্র, ইহার জন্য মধুসূদনও কম অনুতপ্ত নয়। অসৎ লোক বলিতে যাহা বোঝায়, মধুসূদন সেরূপ কোন চরিত্রের পুরুষ নয়। অসৎ লোক সৎ হইতে পারে, কিন্তু স্বভাব—তাহা নিয়তি নিয়মের অমোঘ।

কুমুদিনী যে জগতে মানুষ হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রাচীন বিচিত্র সংস্কার, ধর্মবোধ ও অধ্যাত্মবিশ্বাস যেমন, তেমনি আধুনিক যুক্তি ও বিচারবোধ নির্বিরোধে স্থানলাভ করিয়াছিল। তাহার মনোলোক যেমন বাস্তব ও স্বপ্ন, জ্ঞান, ভক্তি ও সংস্কার বিজড়িত হইয়া কতকটা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট, তাহার বহির্লোক তেমনি শিক্ষা ও সংস্কার, যুক্তি ও দৈব বিজড়িত হইয়া কতকটা অস্থির ও অনির্দিষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "কুমুদিনীর জগৎটা আবছায়া। প্রত্যক্ষ দেখা যায়, অনেক সময়েই শুভলগ্নের শাখায় শুভফল ফলে না, তবু বাস্তবের শক্তি নেই, প্রমাণের দ্বারা স্বপ্নের মোহ কাটাতে পারে। স্বপ্নের জগতে বিচার চলে না, এক্ষেত্রে চলে মেনে চলা। এ জগতে দৈবের ক্ষেত্রে যুক্তির অসঙ্গতি, বুদ্ধির কর্তৃত্ব, মন্দের নিত্য তত্ত্ব নেই বলেই কুমুদিনীর মুখে একটা করুণা।"

বোধিলব্ধ সত্যকে মার্জিত বুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত না করিলে, তাহা ব্যক্তি-জীবনের নানা সীমিতবোধ, নানা সংস্কার, অন্ধতা ও মোহবিজড়িত হইয়া যায়। অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভূতিকে জাগতিক বুদ্ধি ও বিচারবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলে, তবেই মানবধর্ম সম্পূর্ণতা লাভ করে।

কুমুদিনীর অধ্যাত্ম-লোক তখনও পর্যন্ত নানা সংস্কার-বিজড়িত। গভীর দুঃখভোগ, প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ও পরীক্ষা এবং বিচার ও বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া তাহা তখনও পর্যন্ত একটি স্থায়ী পরিণাম লাভ করিতে পারে নাই।

কুমুদিনীর জীবনের সমগ্র পরিণাম ধারাটিকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। বিবাহ-পূর্ব জীবনে কুমুদিনীর অন্তরে যে সৌন্দর্য ও মাধুর্যলোক গড়িয়া উঠে, তাহাকে স্বর্গ-লোক রচনা বলা যাইতে পারে। বিবাহিত জীবনে কুমুদিনী সেই স্বর্গলোক হইতে সম্পূর্ণরূপে স্খলিত হইয়া যায়। কুমুদিনী পরিশেষে সেই স্বর্গলোককে ফিরিয়া লাভ করিয়াছে।

বাহিরের বৃহৎ জগৎ ও জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শান্ত ও সৌন্দর্য-মণ্ডিত পল্লীজীবনের মাঝখানে তাহার হৃদয়লোক অপরূপ সৌন্দর্য, সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। সে সৌন্দর্য-কল্পলতার মূল মৃত্তিকানিবদ্ধ ছিল না, তাহা রামধনুর মত শূন্যে অপরূপ মায়া বিস্তার করিয়াছিল। বাস্তব জীবনের কোন মালিন্য কুমুদিনীর সৌন্দর্যলোকের উপর কিছুমাত্র ছায়াপাত করে নাই। তাহার গৃহের বাহিরের উদার ব্যাপ্ত পরিবেশ ও অবকাশ কুমুদিনীর এই সৌন্দর্যলোকটিকে অতি যত্নে, অতি সূক্ষ্মতায় গড়িয়া তুলিয়াছিল।

সেখানে ফাল্গুনে আমের বন বোলে ছাইয়া যাইত। তাহার অতি লঘু, সুমিষ্ট গন্ধে তপ্ত বাতাস ভারী হইয়া উঠিত। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে নিঃসঙ্গ খিড়কির ঘাটের চাতালে দীর্ঘ কেশপাশ এলাইয়া দিয়া শুইয়া থাকিতে থাকিতে তাহার মন আলোছায়ার সহিত মৌমাছির ক্লান্ত গুঞ্জরণে স্বপ্নের জাল বুনিয়া চলিত। আর বুকের মধ্যে জাগিত অকারণ এক বেদনাবোধ। সেই বেদনায় আরক্তিম হইয়া গোধূলির রাঙ্গা আলো ধীরে কখন ম্লান হইয়া আসিত। পুকুরের নিস্তরঙ্গ কালো জলে তীরে তরুশ্রেণীর ছায়া দীর্ঘতর হইয়া ধীরে মিলাইয়া যাইত। কখন বা চিলে কোঠা হইতে চোখে পড়িত, দূরে

"গ্রামের বাঁকা রাস্তার ধারে ফুলের আগুন-লাগা সরষে ক্ষেত, খিড়কির পাঁচিলের ধারের সেই ঢিবিটা যেখানে বসে পাঁচিলের ছ্যাতলা পড়া, সবুজে কালোয় মেশা নানা রেখায় যেন কোন পুরাতন বিস্তৃত কাহিনীর অস্পষ্ট ছবি। দোতলায় ওর শোবার ঘরের জানালায় সকালে ঘুম থেকে উঠেই চোখে পড়ে দূরের রাঙ্গা আকাশের দিকে সাদা পালগুলো দিগন্তের গায়ে গায়ে চলছে যেন মনের নিরুদ্দেশ কামনার মতো।"

কুমুদিনী আপনার সমগ্র মনটিকে এমনি প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছিল, কোথাও অন্তরালে রাখে নাই। প্রকৃতি তাহার দিবস-রজনী, তাহার ষড়ঋতু লইয়া কুমুদিনীর মানস বীণায় তাহার সকল রাগিণী বাজাইয়া চলিত।

এই সৌন্দর্যলোক আরও সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহার দাদার নিকট সংস্কৃতকাব্য, পুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিয়া। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের মুখ্য প্রেরণা, অর্থাৎ জগৎ ও জীবনের কেবল সৌন্দর্য ও মহিমার দিকটিকে অপরূপ তুলিকায় চিত্রিত করা, তাহার অতুলনীয় ধ্বনি-মাধুর্য, বিশ্বপ্রকৃতির রূপ-রঙ্গ ও রেখা, এবং মানবিক বোধের অতি সূক্ষ্ম রূপায়ণ, উহাকেই মার্জনা করিতে করিতে সৌন্দর্য ও ভাবের যে এক অতীন্দ্রিয় বিলাস, ইহার ফলে

কুমুদিনীর সৌন্দর্যধ্যান এক প্রকার আশ্চর্য সমুন্নতি ও সূক্ষ্মতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এই সৌন্দর্যলোক মথিত করিয়া দাম্পত্য জীবনের যে আদর্শ তাহার মনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে সে তাহার বাবা-মার মধ্যে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাহার দাদা সেই উমাপতিরই বংশধর।

অন্তরে বাহিরে কোথাও কোন দিক হইতে বাধা না পাইয়া এবং পদে পদে মানসিক দীনতায় পীড়িত না হইবার ফলে, তাহার এই সৌন্দর্যপ্রবণ মনের সঙ্গে সঙ্গে একটি অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, ঋজুতা, মহিমা ও শালীনতাবোধ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

তাহার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে আর যেখানে যতটুকু মালিন্য ও অভাববোধ ছিল, তাহাকে সে সুরের জাল বুনিয়া ঢাকিয়া দিতে পারিত। বাস্তব সকল প্রকার ব্যথা ও দৈন্য হইতে তাহার মন সুরের তরণী বাহিয়া এক সীমাহীন সৌন্দর্যলোকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইত।

এই সৌন্দর্যধ্যানই কুমুদিনীকে নির্জনপ্রিয়, নিঃসঙ্গ করিয়া তুলিয়াছিল। সে বাস করিত যেন এক নির্জন গিরিশৃঙ্গে—মানস সরোবরকূলে।

এমনি করিয়া কুমুদিনীর নারী-সত্তা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়াছে। দাক্ষিণ্যভারে কুমুদিনীর সমগ্র সত্তা এখন পরিপূর্ণ বসন্তের পুষ্পভারাবনত লতিকার মত। কিন্তু কোথায় সেই দেবতা, যাহার পদপ্রান্তে সে আপনার এই উনিশ বছরের কুমারী জীবনের প্রতি মুহূর্তের সঞ্চিত সম্পদের ভার নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিয়া মুক্তিলাভ করিবে। কুমুদিনী দিন গনিত 'কোথায় আমার রাজপুত্র।'

সেই সুন্দর দেবতা কেবল তাহাকে নয়, তাহার দাদাকেও যে মুক্ত করিবে। কুমুদিনী সব ভুলিতে পারে, কিন্তু ঋণভারে জর্জরিত তাহার দাদার অন্তর্বেদনা শত চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারে না। কুমুদিনীর অন্তর হইতে নিরন্তর প্রার্থনা জাগিত।

এমনি একটি মুহূর্তে একদিন ঘটক বিপ্রদাসের নিকট মধুসূদনের বিবাহ-প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলে কুমুদিনী তাহাকে দৈবপ্রেরিত বলিয়া বোধ না করিয়া পারে নাই। এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাহার বামচক্ষু যে স্পন্দিত হইয়াছে। তাহার কররেখা বিচার করিয়া এক জ্যোতিষী তাহাকে বলিয়াছিল সে রাজরাণী হইবে। অবশ্য, জ্যোতিষের বিচারে ছিল, জ্যোতিষীর কুটিল চক্রান্ত। পূজার ঘরে গিয়া কতকগুলি ফুল লইয়া কুমুদিনী মনে মনে বলিল, যদি জোড়া মিলাইয়া অবশিষ্ট ফুলের রঙ ঠাকুরের নীল রঙের সহিত মিলিয়া যায়, তাহা হইলে সে এই প্রস্তাবকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া মানিবে। জোড়া

মিলাইয়া যে ফুল অবশিষ্ট রহিল তাহা অপরাজিতা। তাহার নীল রঙের সহিত ঠাকুরের রঙ মিলিয়া যায়।

কুমুদিনীর ভক্তি-প্রবণ মন সংস্কারমুক্ত ছিল না। সংস্কারমাত্রেই যে অজ্ঞানতা, এবং শুদ্ধাভক্তিও যে জ্ঞানাশ্রয়ী, তাহা কুমুদিনী জানিত না। ঈশ্বরের নির্দেশ নামে পরিশুদ্ধ, জ্ঞান-মার্জিত অন্তরে, বাহিরে তাহার কোন পরিচয় বা পরিমাপ নাই। বস্তুত, ভক্তিমার্গেও জ্ঞানের প্রয়োজন, জ্ঞানের প্রয়োজন নানা সংস্কারের জটিল বন্ধন হইতে মনকে মুক্ত রাখিবার জন্য। জ্ঞানের এই নিত্য মার্জনা না থাকিলে, যেটুকু সত্যোপলব্ধি ঘটে, তাহার সহিত নানা সংস্কার জড়িত হইয়া তাহাকে এতদূর বিকৃত করিয়া তুলিতে পারে, যাহার ফলে ওই সত্যবোধ উপকার অপেক্ষা অনুপকার, কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই করে বেশি। কুমুদিনী তাহার ভক্তিকে স্বাভাবিক যুক্তি ও বিচারবোধ দ্বারা মার্জিত করিয়া লইতে শিখে নাই। তাই, সে জীবনে এমন নিদারুণ ভুল করিয়া বসিয়াছে।

বিপ্রদাসের বারংবার সতর্কতা ও অনুরোধকেও কুমুদিনী উপেক্ষা করিয়াছে। কুমুদিনী তো যুক্তি দিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই, তবে বিপ্রদাসের যুক্তি শুনিয়া কি হইবে। কুমুদিনী ভাবিয়াছে, ঈশ্বরের নির্দেশকে আবার মানুষী বুদ্ধি দিয়া বিচার করিবার চেষ্টা কেন। বিপ্রদাসও বুঝিল কুমুদিনী ইহাকে কী জানি এক দৈববাণী বলিয়া বোধ করিয়াছে। বিপ্রদাস ইহাও জানিত, কুমুদিনীর এই জাতীয় বিশ্বাসবোধের ক্ষেত্রে তাহার সকল যুক্তি ও উপদেশ ব্যর্থ হইবে। বিপ্রদাস তাই পরিশেষে সে চেষ্টা পরিহার করিয়াছে।

কুমুদিনীর সৌন্দর্য-ধ্যান ইহার পর হইতে যেন শতধারায় উৎসারিত হইয়াছে। তাহার উনিশ বছরের কুমারী জীবনের প্রতীক্ষা চরিতার্থ করিতে তাহার প্রিয়তম তাহার গৃহে আসিতেছেন। এ আনন্দের কি আর পরিমাপ আছে! সে যে তাহার অন্তর পূর্ণ করিয়া আসিতেছে। কুমুদিনী কান পাতিয়া অন্তরের মধ্যে তাহার পদধ্বনি শুনিতে পায়।

"বিশ্বের প্রতি ওর অন্তর আজ দাক্ষিণ্যে-ভরা, বিকেলে গা ধোবার সময় খিড়কির পুকুরে গলা ডুবিয়ে চুপ করে বসে থাকে, জল যেন ওর সর্ব্বাঙ্গে আলাপ করে। বিকেলের বাঁকা আলো পুকুরের পশ্চিম ধারের বাতাবি-লেবু গাছের মাথার উপর দিয়ে এসে ঘন কালো জলের উপরে নিকষে সোনার রেখার মত ঝিকিমিকি করতে থাকে; ও চেয়ে চেয়ে দেখে, সেই আলোয় ছায়ায় ওর সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে অনির্ব্বচনীয় পুলকের কাঁপন বয়ে যায়। মধ্যাহ্নে বাড়ির ছাদের চিলেকোঠায় একলা গিয়ে বসে থাকে,

পাশের জামগাছ থেকে ঘুঘুর ডাক কানে আসে। ওর যৌবন-মন্দিরে আজ যে দেবতার বরণ হচ্ছে ভাবঘন রসের রূপটি তার কৃষ্ণ-রাধিকার যুগল রূপের মাধুর্য্য তার সঙ্গে মিশেছে। বাড়ির ছাদের উপরে এস্‌রাজটি নিয়ে ধীরে ধীরে বাজায় ওর দাদার সেই ভূপালি সুরের গানটি ঃ

"অজু মোর ঘরে আইল পিয়রওয়া
রোমে রোমে হরখীলা।"

রাত্রে বিছানায় বসে প্রণাম করে, সকালে উঠে বিছানায় বসে আবার প্রণাম করে। কাকে করে, সেটা স্পষ্ট নয়,—একটি নিরলম্ব ভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাস।"

কুমুদিনীর অন্তর্লোকে যে স্বর্গরাজ্য গড়িয়া উঠিবার কথা বলিয়াছি, আমরা এ পর্যন্ত তাহারই কিছু পরিচয় লাভ করিলাম। কুমুদিনীর জীবনে ইহা প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায় কুমুদিনীর স্বর্গ-ভ্রষ্টতার পরিচয় বহন করিয়া আছে। বাস্তব জীবনের নিরন্তর সংঘর্ষে তাহার ওই ভাব-লোক পরিণামে সম্পূর্ণ ও সত্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই অত্যুচ্চ আদর্শ লোকটিকে কুমুদিনী আবার ফিরিয়া লাভ করিয়াছে ; কিন্তু ইতিমধ্যে দুঃখ, মালিন্য ও লাঞ্ছনাভোগ তাহাকে বাস্তব জীবন-সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন করিয়া তুলিয়া তাহার ভাব-লোকটিকে মৃত্তিকা-সংলগ্ন করিয়া তাহাকে যথার্থ অধ্যাত্মফলপ্রসূ করিয়াছে।

প্রিয় মিলনের অভিসার-পথে প্রথম যে কাঁটা তাহার পায়ে বিঁধিল, তাহা মধুসূদনের কুল লইয়া।

ঈশ্বর এমনি করিয়া ভক্তকে পরীক্ষা করেন। বাহিরের এমনি সহস্র মিথ্যা পরিচয়ের অন্তরালে কত দুর্লভ মাণিক্যকে যে আমরা না দেখিতে পাইয়া হারাইয়া ফেলি, তাহা জানি না। কত কাঞ্চন ছাড়িয়া এইরূপে কত কাচকে ঘরে তুলিয়া আনি। বাহিরের সকল মিথ্যা আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া কয়জন সেই দুর্লভ পুরুষ-সত্তাটিকে চিনিয়া লইতে পারে ? সকলে তো ওই রূপের জগতে বাঁধা পড়িয়া যায়। কুমুদিনী সে ভুল করিবে না। কুমুদিনী এই গ্লানিবোধকে তাই সহজেই মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছে।

ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেখাইতে মধুসূদন বিবাহের নির্ধারিত দিনের প্রায় একমাস পূর্বে তাহাদের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত। উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট, তাহাদের আর্থিক দৈন্যকে লজ্জা দেওয়া এবং এইরূপে উভয় বংশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের প্রতিশোধ লওয়া।

এই সংবাদ অনেক বড় হইয়া কুমুদিনীর কানে আসিয়া পৌঁছাইতে

অভিমানে তাহার বুক ভরিয়া গিয়াছে। ঠাকুর তাহাকে একি পরীক্ষার সম্মুখীন করাইলেন। যে অসম্মান তাহার অমন দাদাকেও স্পর্শ করিয়াছে, কুমুদিনী কোন্ ভক্তির জোরে তাহাকে মার্জনা করিবে। তাহার হৃদয়-দেবতার অনেকখানি যে তাহার দাদার রূপ-গুণ দিয়া গড়িয়া তোলা। এ অসম্মান যে তাই তাহার অন্তর-দেবতাকেও স্পর্শ করিয়াছে।

কুমুদিনীর অন্তর ইতিমধ্যেই বিমুখ হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের পূর্বেই সে মধুসূদনের মানসিক দীনতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হইয়াছে। কুমুদিনী ভাবিয়াছে, সে এমন একটি লোকে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে, যে-লোক সকল বাস্তব মালিন্যের ঊর্ধ্বে। তাহা বাস্তব সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, ভয়-ক্রোধের ঊর্ধ্বে এক পরম শান্তাবস্থা। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন,

"এখন থেকে ও মনে মনে জোরের সঙ্গে জপতে লাগল, তিনি ভালোই হন, মন্দই হন, তিনি আমার পরম গতি।

"দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগত স্পৃহঃ
ভীতরাগভয়ক্রোধঃ"

শুধু যতিধর্ম্মের নয়, সতীধর্ম্মেরও এই লক্ষণ। সে ধর্ম্ম সুখ-দুঃখের অতীত, —তাতে ক্রোধ নেই, ভয় নেই। আর অনুরাগ? তারই বা অত্যাবশ্যকতা কিসের। অনুরাগে চাওয়া ও পাওয়ার হিসেব থাকে, ভক্তি আরও বড়ো। তাতে আবেদন নাই, নিবেদন আছে। সতীধর্ম্ম নৈর্ব্যক্তিক, যাকে ইংরাজীতে বলে ইম্পার্সোনাল। মধুসূদন ব্যক্তিটিতে দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু স্বামী নামক ভাব পদার্থটি নির্ব্বিকার নিরঞ্জন। সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানের রূপের কাছে কুমুদিনী একমনা হয়ে নিজেকে সঁপে দিল।"

এই নৈর্ব্যক্তিক যতিধর্ম ও সতীধর্ম এবং তদাশ্রয়ী সমগ্র হিন্দু সমাজ-দর্শন ও অধ্যাত্ম-দর্শনের মূল্য বিচার করিবার জন্যই যে রবীন্দ্রনাথ কুমুদিনীকে এমন একটি বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়াছেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

সতীত্ব সাধনার এই আদর্শকে যদি মানিয়া লওয়া যায়, তবে কয়জন নারী তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। অধিকাংশ যাহারা ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, তাহারা কোন্ বোধ আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে। এই সংগ্রামে তাহাদের জীবন পরিণামে সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া যায় কি না। যাহারা এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, তাহারা অন্য কোন আদর্শ, অন্য কোন জীবনবোধ আশ্রয় করিয়া জীবনকে সম্পূর্ণ সার্থক করিতে পারে কি-না। কোন বিশিষ্ট জীবনাদর্শকে সার্থক না হইতে পারার জন্য, তাহার অসামর্থ্যই কি কেবল দায়ী, তাহার জন্য তাহার বিশিষ্ট মানসিক গঠন, বিশিষ্ট আন্তর

সত্তা—, যাহাকে স্বভাব বা স্বধর্ম বলে—, কি দায়ী নয়। ভিন্ন প্রকৃতি-স্বরূপতার জন্য আদর্শের ও সাধনপথের ভিন্নতা অনিবার্য কি-না। এই সকল জিজ্ঞাসা কুমুদিনীর জীবন-জিজ্ঞাসার সহিত বিজড়িত হইয়া আছে।

বিবাহ নর-নারীর জীবনের একটি দুর্লভ আধ্যাত্মিক মুহূর্ত। সেই আধ্যাত্মিক মুহূর্তের জন্য কুমুদিনী একভাবে প্রস্তুত হইতেছে, মধুসূদন আর একভাবে। বিবাহ মধুসূদনের নিকট ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা মাত্র। নুরনগরে থাকিতে সে যে বৃত্তিটিকে শিকারে, নৃত্য-গীতে, ভোজ-পানের ভিতর দিয়া ক্রমাগত উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে ইন্দ্রিয়বৃত্তি ছাড়া আর কি আখ্যা দান করা যাইতে পারে।

আর কুমুদিনী প্রিয়-মিলনের জন্য শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার তপশ্চর্যা করিয়া চলিয়াছে,—নারী-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ যে গৌরব স্বামীর প্রিয়ভাগিনী, আত্মার সঙ্গিনী, সংসারের কল্যাণ-রূপিণী, ভাবী কুমারের জননী হইবার জন্য যে সকল শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর প্রয়োজন, সেগুলিকে জীবনে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য নিরলস সাধনা। কুমুদিনীর সমগ্র সত্তা অন্তর্মুখীন হইয়া তাহার হৃদয়-দেবতার মুখটিকে নির্নিমেষ ভাব-নেত্রে নিয়ত অবলোকন করিতেছে। তাহার স্বামীর প্রেম যে তাহার জন্ম-জন্মান্তরের পথচলার আলোকবর্তিকা-স্বরূপ। মধুসূদন শুধু তাহার জীবনে নয়, তাহার পরিবারবর্গের সকলের মুক্তি লইয়া আসিতেছে। দুটি মানুষের জীবনের স্বভাব-বৈপরীত্য ইহা অপেক্ষা অধিক কি হইতে পারে।

এদিকে বিপ্রদাস কয়েকদিন ধরিয়া জ্বরে শয্যাশায়ী। চতুর্দিক ঘিরিয়া কেন এমন মালিন্যের সুর বাজে। যে সুরের, সৌন্দর্য, ভাব ও ভক্তির পথ বাহিয়া কুমুদিনী তাহার প্রিয়তমকে অন্তরের মধ্যে বরণ করিয়া লইবার জন্য কত দীর্ঘ দিন রাত্রি ধরিয়া প্রতীক্ষায় বসিয়া তাহার সহিত ইহার কোথাও তো কোন মিল নাই। তাহার সেই স্বপ্ন-লোক আর এই বাস্তব জগৎ মাঝখানে যে সমুদ্রের পার।

বিচ্ছেদ-বেদনায় বিপ্রদাস ও কুমুদিনী এক অন্তহীন বেদনা-লোকে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিখিল-বিশ্বের নর-নারীর ব্যথা-বেদনা, অভাব, বঞ্চনা সে-লোকে নিত্য স্পন্দিত হয়। কোন্ বিস্মৃতকালে কে একজন আসিয়া তাহার বিবাহিতা কন্যার পণ পরিশোধের জন্য দুইশত টাকা প্রার্থনা করিয়াছিল। আজ সেই কথাটাই মনে পড়িয়া বিপ্রদাস ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কুমুদিনী তাহার সামান্য অর্থ-সঞ্চয় উজাড় করিয়া এক দরিদ্র নারীকে গৃহ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা করিয়াছে। এই কালে মধুসূদনের মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আর নাই বা উল্লেখ করিলাম।

মধুসূদন যে পরিবেশে মানুষ হইয়াছে, যে নারীদের সে গৃহের মধ্যে নানা

নিকট সম্পর্কান্বিত করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছে, মেলা-মেশা করিয়াছে, তাহাতে নারী-সম্পর্কে তাহার যে বোধ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা আদৌ শ্রদ্ধান্বিত নয়। নারী নিয়ত সংসারকর্মে ব্যাপৃত থাকিবে, বিবাদ করিবে, তুচ্ছ সাংসারিক ব্যাপার লইয়া স্বামীর সহিত মান-অভিমান করিবে, পুরুষের সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ হইবে, তাহাদের ব্যক্তিগত ভালোলাগা মন্দলাগা বলিয়া কোন কিছু থাকিবে না, মন যদি কখন কোন কারণে অপ্রসন্ন হয়, তবে পুরুষ মূল্যবান অলংকার বা ভূষণ দিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিবে, এই ছিল নারীসম্পর্কে তাহার সাধারণ বোধ!

সেই প্রথম স্টেশনে কুমুকে ভালো করিয়া দেখিয়া মধুসূদন চমৎকৃত হইয়াছে। তাহার পরিচিত নারীদের সহিত ইহার কোথাও তো কোন মিল নাই। এই নারীর সহিত কেমন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, তাহা মধুসূদন জানে না। এ যে তাহার বোধের সীমার অতীত কোন লোক। এ জগতের রীতি-নীতি, ধর্মাধর্ম তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

নীলার আংটি লইয়া বিতর্কের মধ্য দিয়া মধুসূদনের স্থূল প্রবৃত্তি কুমুদিনীর নিকট অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। সে জানে কেবল লোভ করিতে এবং লোভের সামগ্রীকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইতে। প্রেমে, ত্যাগে, স্নেহে ও করুণায় যে আনন্দবোধ, তাহার কোন উপলব্ধি তাহার জীবনে নাই। ইহা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ।

মধুসূদনের সকল দোষ-ত্রুটি, তাহার সামর্থ্য ও অসামর্থ্য, সমস্তই বর্তমান বণিক সভ্যতা, নাগরিক ও যান্ত্রিক সভ্যতার দান। মধুসূদন আশৈশব এই সভ্যতার মধ্যে ওই পরিবেশে মানুষ হইয়াছে। অন্তর্জগৎ বা অধ্যাত্ম জগৎ, ভাব ও আদর্শ-লোকের সকল প্রকার অনুভূতি, রসের যে কোন সাধনা তাহার উপলব্ধি-সীমার বাহিরের সামগ্রী। এই জগৎটিকে সে বোঝে না, বুঝিতে পারিবার মত সংস্কার ও অন্তর্বৃত্তিও তাহার নাই।

সে জানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, প্রত্যক্ষদৃষ্ট স্থূল বস্তুর আদান-প্রদান, উহারই লাভ ও ক্ষতি। উপকরণ আশ্রয় করিয়া যে স্থূল ভোগ, জীবনে একমাত্র সেই আনন্দের সহিত তাহার পরিচয়। এই স্থূল উপকরণ ও ভোগ এবং তাহাকে স্তূপীকৃত করিয়া তুলিতে সকল প্রকার সাধ্য-সাধনা—জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ইহাই তাহার ধারণা। এই ক্ষুদ্র পরিসীমার বাহিরে যে সীমাহীন জগৎ, উহার যে বিশিষ্ট রীতি নীতি, যে গতিবিধি, যে মূল্যবোধ, তাহা তাহার জীবন প্রয়াসের একপ্রকার বিপরীত বলিয়া তাহার জীবনে সম্পূর্ণ অননুভূত।

নববধূ কুমুদিনী তাহার শ্বশুরগৃহ বরণ করিয়া লইল। কিন্তু, "যে অনুষ্ঠানের দ্বার দিয়া কুমুকে তাহার নতুন-পাতা সংসারে আহ্বান করলে, তাতে এমন কোন বজ্রগম্ভীর মঙ্গলধ্বনি বাজল না কেন, যার ভিতর দিয়ে

এই নববধূ আকাশের সপ্তর্ষিদের আশীর্ব্বাদমন্ত্র শুনতে পেত। সমস্ত অনুষ্ঠানকে পরিপূর্ণ করে এমন বন্দনা-গান উদাত্তস্বরে কেন জাগল না—

"জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ—"

সেই "জগতঃ পিতরৌ" যাঁর মধ্যে চিরপুরুষ ও চিরনারী বাক্য ও অর্থের মতো একত্র হয়ে আছে?

অনুষ্ঠানের পালা শেষ হইয়া গেলে কুমুদিনী যখন আপনাকে একটু একা পাইয়াছে, তখন রাত্রি গভীর। কুমুদিনী দেখিল, তাহার এতদিনের শাসিত মন এই কয়েকদিনের ঘটনায় সম্পূর্ণ বিপরীত পথ ধরিয়াছে। কিন্তু যত কঠিন হোক, এই সংগ্রামকে সে জয় করিয়া উঠিবেই। না হইলে সে যে তাহার একমাত্র আশ্রয় হারাইয়া কোন্ শূন্যে তলাইয়া যাইবে।

"দেবতা তাঁর পূজাকে বড়ো কঠিন করেছেন, এ প্রতিমা স্বচ্ছ নয়, কিন্তু এই তো ভক্তির পরীক্ষা। শালগ্রাম শিলা তো কিছুই দেখায় না, ভক্তি সেই রূপহীনতার মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথের রূপকে প্রকাশ করে, কেবল আপন জোরে। যেখানে দেখা যাচ্ছে না, সেখানেই দেখব এই হোক আমার সাধনা, যেখানে ঠাকুর লুকিয়ে থাকেন সেইখানে গিয়েই তাঁর চরণে আপনাকে দান করব, তিনি আমাকে এড়াতে পারবেন না।"

মানুষ যেমন স্বভাব-বিশিষ্ট হয়, তাহার পরিবেশকে সে ঠিক তেমনি করিয়া গড়িয়া তুলে। ইহার বিপরীত ভাবটা সকল সময় সত্য হয় না। অর্থাৎ মানুষ সকল সময় তাহার পরিবেশের মত হইয়া গড়িয়া উঠে না। এইখানে জড়ের উপর মানবাত্মার জয় ঘোষণা।

মধুসূদন আপনার স্বভাবের অনুকূল করিয়া তাহার গৃহসজ্জা রচনা করিয়াছিল। তাহার চতুষ্পার্শ্ব তাহারই মনের বহিঃক্ষেপ। রবীন্দ্রনাথ ইহার কী সূক্ষ্ম এবং বিস্তারিত পরিচয়ই না প্রদান করিয়াছেন। কুমুদিনীকে মধুসূদনের বিরুদ্ধ স্বভাবের সহিতই কেবল সংগ্রাম করিতে হয় নাই, তাহার শ্বশুরগৃহের সমগ্র পরিবেশটাই অশ্লীল, সর্বত্রই স্থূল-হস্তাবলেপের চিহ্ন। কুমুদিনী কেবল এক ভাব-লোক হইতে আর এক ভাব-লোকে স্থানান্তরিত হয় নাই, এক বস্তুজগৎ হইতে আর এক বস্তুজগতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কুমুদিনী সংগ্রাম করিবে কাহার সহিত।

নর-নারী অন্তরের নিগূঢ় আনন্দকে, আত্মার মিলন-বোধকেই বাহিরে দেহের দুয়ারে বিনিময় করিতে চায়। ইহাই শাশ্বত নীতি-ধর্ম। যেখানে মনের মিল নাই কিংবা ওই অবস্থা তখনও পর্যন্ত গড়িয়া উঠে নাই, সেখানে যে দৈহিক মিলন, তাহা নিছক কাম মাত্র, তাহাতেই নর-নারী উভয়েই মনুষ্যত্ববোধ হইতে

স্খলিত হইয়া যায়। ফলের যে দান তাহা পূর্ণতার, শ্রদ্ধার, তাহার পূর্বে যে গ্রহণ—তাহাতে থাকে বাহির হইতে বলপ্রয়োগ, তাহা লোভের প্রকাশ। কুমুদিনীর আশংকা এই প্রস্তুতির জন্য মধুসূদন হয়ত অপেক্ষা করিবে না, তাহার পূর্বেই তাহার সর্বস্ব বিকাইয়া যাইবে। বিকাইয়া যাওয়াই বটে! কারণ মধুসূদন যাহা লইবে, তাহা বাহির হইতে জোর করিয়া, তাহা তাহার আনন্দের দান নহে। কুমুদিনী তাই মনে মনে প্রার্থনা করিয়া চলিয়াছে, যদি তাহার ঠাকুর কোন একটা উপায়ে এই লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করেন।

নারী হইয়া কুমুদিনীর এই মনের অবস্থা বুঝিতে মোতির মার বিলম্ব হয় নাই। গভীর রাত্রে প্রার্থনারত অশ্রুবিগলিত একাকী কুমুদিনীকে দেখিয়া মোতির মার "গা কেমন করতে লাগল। ও যেন একটা বিভীষিকার ছবি দেখতে পেলে,—যেখানে একটা অজানা পশু লালায়িত রসনা মেলে গুঁড়ি মেরে বসে আছে; সেই অন্ধকার গুহার মুখে কুমুদিনী দাঁড়িয়ে দেবতাকে ডাকছে।"

যেখানে নর-নারীর স্বধর্মের মিল ঘটে নাই, যেখানে উহা সম্পূর্ণ বিপ্রকৃতিক, বিজাতীয় বিরুদ্ধ, সেখানে দেহের মিলনকে কি আখ্যা দেওয়া যাইবে? সেই মিলনলব্ধ ফলের 'জাতি' নির্ণয় হয় কোন্ বোধ আশ্রয় করিয়া?

কুমুদিনী মধুসূদনকে শ্রদ্ধা বা ভালোবাসিতে পারে নাই, এখনও পর্যন্ত তাহা সুদূরপরাহত। বরং, এ পর্যন্ত মধুসূদন-সম্পর্কে তাহার মনোভাব সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সেই মধুসূদনকে কোন্ মন্ত্রের জোরে, কোন্ ভক্তি আশ্রয় করিয়া, সে তাহার নারী-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ সমর্পণ করিবে। আশংকায়, আত্মগ্লানিতে, ভয়ে কুমুদিনীর অন্তস্থল পর্যন্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। বিরুদ্ধ মনকে অনুকূল করিতে যতদূর বলপ্রয়োগ করা সম্ভব, কুমুদিনী ততদূর করিয়াছে। শেষে ব্যর্থ হইয়া মূর্ছাহত লুটাইয়া পড়িয়াছে।

ফুল-সজ্জা গৃহে কুমুদিনীকে যখন লইয়া যাওয়া হইল, তখন তাহার মন সম্পূর্ণ অসাড়, চিন্তা-শক্তি পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে। যাইতে যাইতে কুমুদিনী মনে মনে জপিতে লাগিল, "এই আমার অভিসার, বাহিরে অন্ধকার—ভিতরে আলো।"

সেদিন রাত্রে কুমুদিনীর শেষ আশ্রয়স্থল পর্যন্ত হারাইয়া গেল। লজ্জা ঢাকিবার, মোহ জোগাইয়া রাখিবার আর কোথাও কিছু রহিল না। সর্বস্ব হারাইয়া "কুমুর মন তখন অসাড়, কোনো ভাবনা নেই, কোনো বেদনা নেই। একটি ঘন কুয়াশার মধ্যে সে যেন লুপ্ত হয়ে গেছে।"

মধুসূদন কেবল বাহির হইতেই বল প্রয়োগ করিতে জানে। যে আনন্দে

নারী স্বেচ্ছায় তাহার সকল সম্পদ পুরুষের হস্তে তুলিয়া দেয়, সে আনন্দের রহস্যভেদ সে করিতে জানে না। সে-লোক তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। মধুসূদন জানে, কুমুদিনীর মনের অনেকখানি তাহার দাদা অধিকার করিয়া আছে। তাই বোধ করিয়াছে, কুমুদিনীর মনকে তাহার দাদার আশ্রয় হইতে ফিরাইতে পারিলে, তাহার দাদার সকল স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে পারিলে, তাহার পক্ষে কুমুদিনীর ভালোবাসা পাওয়া একান্ত সহজ হইবে। শ্রদ্ধা লাভ করিতে হয় একমাত্র শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়া, শ্রদ্ধালাভের আর কোন উপায় নাই। কুমুদিনী তাহার দাদার অভাববোধ ধীরে ধীরে ভুলিয়া যাইতে পারে, কিংবা কতকটা সহনীয় করিয়া তুলিতে পারে, যদি সে-বোধ আর কাহারো দ্বারা ধীরে পূর্ণ হইয়া উঠে। ইহাই মনের ধর্ম। জোর করিয়া ভীতি প্রদর্শন করিয়া কাজ আদায় করিতে পারা যায়, শ্রদ্ধা বা প্রেম আদায় করিতে পারা যায় না।

পরদিন ভোরে উঠিয়া কুমুদিনী দেখিল, মধুসূদন তাহার দাদার দেওয়া আংটিটি লুকাইয়া রাখিয়াছে। উহা তাহার দাদার স্নেহোপহার, তাহার দাদার স্মৃতি।

কুমুদিনীর অন্তরে স্বামীভক্তির লেশমাত্র নাই। মধুসূদনের যে পরিচয় সে ইতিমধ্যে পাইয়াছে, তাহাতে তাহার পক্ষে এই জাতীয় আচরণ আদৌ অপ্রত্যাশিত নয়, তবু নিত্য নূতন দৃষ্টান্তে নিত্য নূতন করিয়া মানুষ আঘাত পায়। কুমুদিনীও নূতন করিয়া আঘাত পাইয়াছে।

জোর করিয়া দাসীর কাজ আদায় করিতে পারা যায়, স্ত্রীর ভক্তি ও প্রেম লাভ করিতে পারা যায় না। কুমুদিনী দেখিয়াছে নারীর নিকট মধুসূদনের যে দাবী, তাহা কোন উন্নত মানবিকবোধপ্রসূত নয়। তাহা পূর্ণ করিতে নারীকে তাহার সকল উন্নত বোধ বিসর্জন দিতে হয়। কুমুদিনীর মত নারী পুরুষের জীবনে যে অপার্থিব সৌন্দর্য ও রস-লোকের যে অতীন্দ্রিয় আনন্দ-লোকের সন্ধান দিতে পারে, মধুসূদনের জীবনে তাহার ক্ষীণতম অনুপ্রেরণা নাই। মধুসূদনের নিত্যদিনের স্থূল বাসনা কুমুদিনীর মত নারী পূর্ণ করিতে পারে না। নানা অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া, নানা পরিবেশ ও ঘটনা সৃষ্টি করিয়া রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের এই স্বভাবের নানা পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহার বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, যদি তাহার এই মূল স্বভাবটিকে এক প্রকার বুঝিয়া লইতে পারা যায়। কুমুদিনী মোতির মাকে সেই কথাই বলিয়াছে, "দেখো ভাই, নিজেকে দেবো বলেই তৈরি হয়ে এসেছিলুম, কিন্তু ও কিছুতেই দিতে দিলে না। এখন দাসী নিয়েই থাকুক। আমাকে পাবে না।"

কুমুদিনী সেদিন রাত্রে ভাঁড়ার ঘরের পার্শ্বে একটি ছোট কোণের ঘরে,

যেখানে প্রদীপ, পিলসুজ, তেলের ল্যাম্প প্রভৃতি জমা করা হয়, সেখানে একা সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিল।

কুমুদিনী বহির্জগতের সকল দীনতা, সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে পারে, যদি তাহার অন্তরের ভক্তি-লোকটি অবিক্ষুব্ধ থাকে। মধুসূদনের সঙ্গ তাহার মনে আজকাল এতদূর ধিক্কার জাগাইয়া তোলে, যাহাতে তাহার মনের স্বাভাবিক শুচিতা-বোধ পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। কুমুদিনী তাই অমন পরিবেশেও নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারিয়াছে এবং ভোর হইতে উঠিয়া রাশিকৃত ময়লা ও অব্যবহার্য পুরাতন জীর্ণ পিলসুজ লইয়া বারান্দায় বসিয়া তেঁতুল দিয়া মাজিতে বসিয়াছে।

মধুসূদন সেদিন স্থির বুঝিয়াছে, এ মেয়েকে বাঁধিবার সব আয়োজন ব্যর্থ হইবে। ভোগ-ঐশ্বর্য দিয়া নয়, বলপ্রয়োগ করিয়াও নয়। কুমুদিনীকে বাঁধিতে পারা যায়, একমাত্র তাহার ভাবী সন্তানের জননী করিয়া। এই জাতীয় পুরুষের সবচেয়ে বড় যে সান্ত্বনা ও আত্মতৃপ্তি, মধুসূদন তাহাতে পরিতৃপ্ত হইয়াছে।

কাজ সারিয়া কুমুদিনী প্রার্থনায় বসিল, কিন্তু বিশুষ্ক হৃদয়ে ভক্তির ধারা বহিল না। দুঃখে, অভিমানে, হতাশায় তাহার দুই চোখ ভরিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তীর না ছাড়িতেই তাহার জীবন-তরীর ভরাডুবি হইয়া গেল। এখন কি কেবল অথৈ অশ্রু-সমুদ্রে নিরুদ্দিষ্ট ভাসিয়া যাওয়া?

মধুসূদনের নিকট সংস্পর্শ হইতে কিছুদিনের জন্য কতকটা দূরে সরিয়া আসিতে কুমুদিনীর ভক্তি-ভাবটি আবার ফিরিয়া আসিতেছে। তাহার ঠাকুর আবার তাহার বুকের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহার নিরাশ্রয়, শয্যাশায়ী দাদার জন্য ব্যথা কিছুতেই ঘুচে না। এই কয়েকদিন সে তাহার কোন সংবাদই পায় নাই।

এই ব্যথা বুকে করিয়া কুমুদিনী পরদিন রাত্রেও সেই ছোট কুঠরীর মধ্যে আপনার শয্যা বিছাইয়া লইয়াছে।

সেদিন সমস্ত রাত্রি ঘর ও বাহির করিয়া, মধুসূদন শেষে কুমুদিনীকে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, মলিন ছোট একটি কুঠরীর মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখিতে পাইল।

সে যেন কোন্ দূরকালের অতিদূরের এক অপরূপ মায়াময় স্বপ্নবিজড়িত ছবি। সে কেমন করিয়া তাহার অন্তর জয় করিবে! বিস্মিত নির্বাক মধুসূদন অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

বিপ্রদাসের টেলিগ্রাম হাতে দিয়া সেদিন রাত্রে মধুসূদন কুমুদিনীর হৃদয়

কতকটা প্রসন্ন করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। সেই প্রসন্নতার সুযোগ লইয়া মধুসূদন কুমুদিনীকে তাহার শয্যায় টানিয়া আনিয়াছে।

কুমুদিনীর সাধনা হইল সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, ভয়-ক্রোধের অতীত একটি অবস্থালাভ। কুমুদিনী মাঝে মাঝে এমন একপ্রকার ভাবতন্ময় অবস্থা যে লাভ করে না, তাহা নহে ; তাহার মানস-হংস তখন সাংসারিক তুচ্ছতার বহু ঊর্ধ্বে এক অপার্থিব সৌন্দর্য-সরোবরের মাঝখানে একাকী কেলি করিয়া বেড়ায়, বাস্তবের রূঢ় আঘাতে পুনরায় ওই সৌন্দর্য-সরোবর মুহূর্তে শুষ্ক হইয়া যায়, তাহার মানস-হংস শরবিদ্ধ হইয়া কর্দমে লুটাইয়া মর্মন্তুদ্ আর্তনাদ করিতে থাকে। কুমুদিনী বারংবার চেষ্টা করিয়াছে—ব্যর্থ হইয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়িতেছে।

"যেখানে কুমু ব্যক্তিগত মানুষ, সেখানে যতই তার মন ধিক্‌কারে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ভরে উঠছে, যতই তার সংসার সেখানে আপন গায়ের জোরের রূঢ় অধিকারে তাকে অপমানিত করছে, ততই সে আপনার চারিদিকে একটা আবরণ তৈরি করছে। এমন একটা আবরণ যাতে করে নিজের কাছে তার ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সত্যতাকে লুপ্ত করে, অর্থাৎ নিজের চৈতন্যকে কমিয়ে দেয়। এ হচ্ছে ক্লোরোফর্মের বিধান।"

কুমুদিনী ভাবিয়াছে, তাহার যে দেহ মধুসূদনের কামনা-র স্পর্শে অশুচি হইয়াছে, তাহা মায়া মাটিমাত্র, তাহা একদিন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। অন্তরে সূক্ষ্ম ভাব-দেহে ঈশ্বরের সহিত তাহার যে নিত্য বিহার, নিত্য মিলন-লীলা তাহা সকল জন্ম-মৃত্যু, সকল সুখ-দুঃখ বোধের অতীত।

কুমুদিনীর মন তখন সৌন্দর্য-স্বপ্নে বিভোর। সেই স্বপ্নে বিভোর হইয়া কুমুদিনী সংসার কর্মে ব্যাপৃত। কাজের মধ্যে "ওকে দেখে মনে হয়, যেন পালের নৌকা, আকাশে তোলা পালটাতে হাওয়া এসে লাগছে, নৌকোটা যেন সেই স্পর্শেই ভোর, আর তার খোলের দুধারে যে জল কেটে কেটে পড়ছে, সেটা যেন খেয়ালের মধ্যেই নেই।"

ইতিমধ্যে মোতির মা আসিয়া কুমুদিনীকে আড়ালে ডাকিয়া জানাইল যে, বিপ্রদাসের চিঠি মধুসূদন দেবরাজের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে। কুমুদিনীর মনে পড়িল গতরাত্রে মধুসূদনকে বিপ্রদাসের চিঠির কথা জিজ্ঞাসা করিতে মধুসূদন 'না' বলিয়াছিল। মুহূর্তে কুমুদিনীর মন বিষাইয়া গেল। কোথায় গেল তার মুহূর্ত পূর্বের ভাবতন্ময়তা, তাহার সৌন্দর্য-ধ্যান। মানসিক বোধগুলিকে কোন একটা উপায়ে অসাড় করিয়া না দিতে পারিলে, মানুষ দীর্ঘকাল কোন তীব্র ব্যথা বহন করিতে পারে না। কুমুদিনীর সকল চেষ্টা

মানসিক বোধগুলিতে অসাড় করিয়া দিবার জন্য। ইহাই তাহার সতীত্বের সাধনা।

কুমুদিনী একাকী সকলের অগোচরে ছাদে চলিয়া গেল। বৃহতের যতটুকু আভাস ওই গৃহের মধ্যে, সে কেবল ওইখানে আসিয়া কতকটা লাভ করে। ওইখানে কুমুদিনী একটু নিভৃত-লোক খুঁজিয়া পায়। ওখান হইতে চোখে পড়ে সীমাহীন আকাশের উদার ব্যাপ্ত নীলিমা।

"বেলা হয়েছে, প্রখর রৌদ্রে ছাদ ভরে গেছে, কেবল প্রাচীরের গায়ে এক জায়গায় একটুখানি ছায়া। সেইখানে গিয়ে বসল। একটি গান মনে পড়ল, তার সুরটি আসাবরী। সে গানের আরম্ভটি হচ্ছে, "বাঁশরী হমারী রে"। কুমু ওই অসম্পূর্ণ অংশ আপন ইচ্ছামতো নূতন নূতন তান দিয়ে ভরিয়ে পালটে পালটে গাইতে লাগল। ওই একটুখানি কথা অর্থে ভরে উঠল। ওই বাক্যটি যেন বলছে, ও আমার বাঁশি, তোমাতে সুর ভরে উঠছে না কেন? অন্ধকার পেরিয়ে পৌঁছোচ্ছে না কেন, যেখানে দুয়ার রুদ্ধ, যেখানে ঘুম ভাঙ্গ না? বাঁশরি হমারি রে, বাঁশরি হমারি রে।"

"* * * তখন ওর মন সুরে ভরপুর, সংসারে কে ওর উপর কী অন্যায় করেছে, সে সমস্ত তুচ্ছ হয়ে গেছে। ওর চিঠি নিয়ে মধুসূদনের যে ক্ষুদ্রতা, যে ক্ষুদ্রতায় ওর মনে তীব্র অবজ্ঞা উদ্যত হয়ে উঠেছিল সে যেন ওই রোদভরা আকাশে একটা পতঙ্গের মতো কোথায় বিলীন হয়ে গেল, তার ক্রুদ্ধ গুঞ্জন মিলিয়ে গেল অসীম আকাশে।"

অর্থাৎ, এতক্ষণে কুমুদিনী তাহার মনটাকে সম্পূর্ণ অনুভূতি শূন্য করিয়া দিতে পারিয়াছে। কিন্তু এই অবস্থা কুমুদিনীর জীবনে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। পরমুহূর্তে আবার কোন একটা ক্ষুদ্রতায় তাহার মন বিচলিত হয়, বিচলিত মনকে শান্ত করিতে কুমুদিনীকে আবার সংগ্রাম করিতে হয়।

রাত্রে শয়নগৃহে আসিয়া মধুসূদন কুমুদিনীকে দেখিতে পাইল না। অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া শেষে অধৈর্য হইয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। কুমুদিনী আসিতে মধুসূদন আজ প্রথম সকল অভিমান ভুলিয়া তাহার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে, কণ্ঠে প্রভুত্বের দাবী নয় প্রেমিকার মিনতি বিজড়িত সুর।

কুমুদিনীর জীবনে আবার এক নূতন সমস্যা দেখা দিল। মধুসূদনের অন্তরের ক্ষুধা সে তো পূর্ণ করিতে পারিবে না। কুমুদিনী মধুসূদনকে যদি হৃদয় দিতে না পারে, তবে সঙ্গ দিবে কেমন করিয়া। সেদিন রাত্রে মধুসূদন জোর করিয়া কুমুদিনীর নিষ্প্রাণ, হৃদয়শূন্য অসাড় দেহটাকে সম্পূর্ণ সম্ভোগ করিয়াছে।

আর মরফিয়াতে কাজ চলে না। ইহার পর হইতে কুমুদিনীর ভক্তির ঘোর সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া গিয়াছে।

"আর কিছুতে ভক্তি জাগল না। এতদিন কুমু বারবার করে বলেছে, আমাকে তুমি সহ্য করো—আজ বিদ্রোহিনীর মন বলছে, তোমাকে আমি সহ্য করব কী করে? কোন্ লজ্জায় আনব তোমার পূজা? তোমার ভক্তকে নিজে না গ্রহণ করে তাকে বিক্রী করে দিলে কোন দাসীর হাটে,—যে হাটে মাছ-মাংসের দরে মেয়ে বিক্রী হয়, যেখানে নির্ম্মাল্য নেবার জন্য কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজার অপেক্ষা করে না, ছাগলকে দিয়ে ফুলের বন মুড়িয়ে খাইয়ে দেয়।

তাহার এতদিনের ভক্তি-বিগলিত ব্যাকুল প্রার্থনার, তাহার নিঃশেষ আত্ম-সমর্পণের এই পরিণাম লক্ষ্য করিয়া কুমুদিনীর আস্তিক্যবোধ পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে ভক্তি তাহাকে কোন দিক হইতে রক্ষা করিল না, বরং রসাতলে নামাইয়া দিল, সে ভক্তিতে তাহার কোন্ প্রয়োজন। পরক্ষণেই কুমুদিনী কান্নার ভারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। তাহার হৃদয়-দেবতা যে তাহার ইহকাল-পরকাল ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া সে তো মুহূর্তের জন্যও বাঁচিবে না।

ইহার পর হইতে কুমুদিনীর জীবনে স্বামী-তত্ত্বাশ্রয়ী ভক্তিবোধ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছে। কুমুদিনী মোতির মাকে বলিয়াছে, "আজ আমার মনে একটু-মাত্র মোহ নাই। আমার জীবনটা একেবারে নির্লজ্জের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে। নিজেকে একটু ভোলাবার মত আড়াল কোথাও বাকি রইল না। মরণ ছাড়া মেয়েদের কি আর কোথাও নড়ে বসবার একটু জায়গা নেই! তাদের সংসারটাকে নিষ্ঠুর বিধাতা এত আঁট করেই তৈরি করেছে।"

কুমুদিনী বুঝিয়াছে, এ পরিবেশে দীর্ঘকাল থাকিলে হয় সে উন্মাদ হইয়া যাইবে, নতুবা তাহার আত্মার হত্যা ঘটিবে। এই অবস্থায় নারীর বাঁচিবার আর কি কোন পথ নাই? যেমন করিয়া হোক এই জীবনকে মানিয়া লইতেই হইবে?

কুমুদিনী তাহার অতুলনীয় রূপ-লাবণ্য, তাহার অনন্য সাধারণ মহিমা, তাহার সুন্দর অথচ প্রবল ব্যক্তিত্ব দিয়া মধুসূদনকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করিয়াছে, সে আকর্ষণে মধুসূদনের দীর্ঘদিনের নিয়ম সংযম ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কুমুদিনী তাহার মত্তভোগের আবেষ্টনীর মধ্যে ধরা দিতে পারে নাই। ইহার পর হইতে কুমুদিনী যতই দূরে সরিয়া গিয়াছে, মধুসূদন তাহাকে লাভ করিবার জন্য ততই অধীর হইয়াছে।

এই অবস্থায় যে ট্র্যাজিক পরিণাম অনিবার্য হইয়া উঠে, নবীন তাহা বোধ করিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছে।

"বউরাণী যে ঘুমন্ত ক্ষুধাকে জাগিয়েছেন, তার অন্ন জোগাতে পারেন নি, তাই সে অনর্থপাত করতে বসেছে। আমি তো বলি এই সময়টাই ওঁর দূরে থাকাই ভালো; তাতে আর কিছু না হোক অন্তত: উনি শান্তিতে থাকতে পারবেন।

"তবে এটা কি এমনিভাবে চলবে?"

"যে আগুন নেবাবার কোনো উপায় নেই, সেটাকে অমনি জ্বলে ছাই হওয়া পর্য্যন্ত তাকিয়ে দেখতে হবে।"

দুই বিরুদ্ধ স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া এই যে ট্র্যাজেডির বীজ, তাহারই একটি পুষ্পিত বিকাশ 'তপতী' নাটকের মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। তপতীর মত কুমুদিনীর জীবনও সম্পূর্ণ অধ্যাত্মময়। দুইজনেই আলোকের দূতী। ইহাদের সংসারে ভোগের বন্ধনে বাঁধিতে পারা যায় না মধুসূদন জাতিতে বৈশ্য। রাজা জাতিতে ক্ষত্রিয়। ভোগ-বাসনার প্রকাশের মধ্যে, নিষ্ঠুর প্রতিশোধ স্পৃহার মধ্যে তাই কিছু পার্থক্য আছে।

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথেরই অধ্যাত্ম সত্তার বাণী-রূপ এই সকল নারী-চরিত্র। ইহাকে সমগ্র জাতির অধ্যাত্ম সত্তা বলা যাইতে পারে। এই চির জ্যোতির্ময় লোকটিকে নিম্নতর লোকের বিক্ষোভের উর্ধ্বে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য একটি সংগ্রাম যে তাঁহাকে নিয়তই করিতে হয়, তাহা বোধ করিতে পারা যায়।

ইতিমধ্যে ব্যবসায়-সংক্রান্ত নানা জটিল সমস্যা দেখা দিতে মধুসূদনকে কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবিয়া যাইতে হইল। ব্যক্তিগত সমস্যা লইয়া বোঝাপড়া করিবার মত অবসর এখন তাহার নাই। এখন কুমুদিনী যদি কিছুকালের জন্য পিত্রালয়ে গিয়া থাকিতে চায়, তাহাতে মধুসূদনের আপত্তির কোন কারণ থাকিবে না।

খাঁচার পাখি এতদিন পরে যেন খাঁচার দ্বার খোলা পাইয়াছে। তেমনি মুক্তির আনন্দ লইয়া কুমুদিনী পিত্রালয়ে তাহার দাদার কাছে ফিরিয়া গিয়াছে।

মধুসূদনের ধর্মবোধের একটি বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বলিয়াছি, অন্তর্জীবন সম্পর্কে মধুসূদনের কোন জিজ্ঞাসা নাই. ওই জীবনের কোন অনুপ্রেরণাও সে বোধ করে না। জগৎ ও জীবনের অন্তরালে, সকল রূপের অতীতে এমন কোন চেতনা আছে কি-না, যাঁহার ইচ্ছার দ্বারা জগৎ ও জীবনের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তিগত কর্মফল ও দিব্য-কর্মের মধ্যে কোন যোগ আছে কি-না, যদি থাকে তবে তাহা কর্মফলকে স্বীকার করিয়া লইয়া কেমন ভাবে লীলায়িত হয়, ওই রহস্য ভেদ করিয়া মানুষ তাহার সকল ক্রিয়াকে কেমন করিয়া দিব্য ক্রিয়ার সহিত সম্পূর্ণ একাত্ম করিয়া দিতে পারে —এই সকল জিজ্ঞাসা ধর্ম-জীবনের সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত

ধর্মবোধ এই সকল জিজ্ঞাসাকে যেমন জাগাইয়া তোলে, তেমনি তাহার উত্তর একটা-না-একটা উপায়ে লাভ করে। মধুসূদনের ধর্মবোধ মিরাক্‌ল্‌-এ বিশ্বাস। মধুসূদন জ্যোতিষে বিশ্বাস করে ; তাহার কারণ, তাহার সহায়তায় সে বস্তুজীবনে কৃতকার্যতা চায়। অধিকাংশ নর-নারীর ধর্মবোধ একমাত্র এই বোধপ্রসূত। আমরা দেবতার দ্বারে মাথাকুটি এই বস্তুজীবনটিকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য। উহার এতটুকু ক্ষতির আশংকায় আমরা সদা কম্পিত, এই ত্রাসে আমরা দেবতার নিকট নিত্য মানত করি।

ধর্ম বলিতে বুঝায় সমগ্র আন্তর সত্তার রূপায়ণ। এই রূপায়ণ ঘটে চিত্তশুদ্ধির ভিতর দিয়া। জীবনকে অপরিবর্তিত রাখিয়া, জীবনের সকল প্রেরণাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে ভক্তি, তাহা আর যাহাই হোক, ধর্মবোধ নহে। উহার আধ্যাত্মিক ফল-লাভ কিছুমাত্র নাই।

মধুসূদনের অধ্যাত্ম শূন্যতার সহিত বিজড়িত হইয়া আর একটি গভীরতর জীবন-জিজ্ঞাসার প্রকাশ ঘটিয়াছে।

মধুসূদন প্রাণের সম্পদে একান্ত দীন। প্রাণকে সে একপ্রকার হত্যা করিয়াছে। বিশ্বের সৌন্দর্য ও প্রেমের ভিতর দিয়া নর-নারীর অন্তরে প্রাণ জাগে। এই প্রাণই নর-নারীর সমগ্র সত্তাকে জাগ্রত করিয়া সমৃদ্ধ করিয়া পরিণামে বিশ্ব-প্রাণের সহিত একাত্ম করিয়া দেয়। এই প্রাণকে মানুষ যখন হত্যা করে, তখনই সে বাহিরে বস্তুর পর বস্তু সঞ্চয় করিয়া অন্তরের শূন্যতাকে পূর্ণ করিতে চায়। মানুষের পাপ এইরূপে ক্রমে অপরিমিত শক্তি সঞ্চয় করে।

একদিকে নাগরিক ও যান্ত্রিক সভ্যতায় বস্তু আহরণের জন্য যেমন এই উন্মত্ততা, তেমনি অন্যদিকে উন্নততর অধ্যাত্ম জীবন লাভের জন্য তথাকথিত নৈতিক বোধের দোহাই দিয়া প্রাণকে হত্যা করিবার এক বৃহৎ ষড়যন্ত্র আছে। এই শূন্য প্রাণের জন্য অতি মানবিকতার দোহাই দিয়া আর একভাবে সমাজ জীবনের সকল অঙ্গে অমানবিকতাকে পুঞ্জীভূত করিয়া তোলা হইতেছে।

প্রাণ যখন জাগে, তখনই বোধ করিতে পারা যায় কোন্ ছন্দে জগৎ ও জীবনের সকল রূপ সকল অরূপ বিধৃত হইয়া আছে। কোন্ ছন্দে ব্যক্তির নিম্নতম হইতে উর্ধ্বতম সকল বোধ স্পন্দিত হইতেছে। জীবনের সকল আপাত-বিরোধ ও দ্বন্দ্ব কোন্ বোধের মধ্যে অবসান লাভ করে।

এই প্রাণকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া, কুমুদিনীর মত প্রাণের এমন পুষ্পিত প্রকাশও মধুসূদনের অন্তরে প্রাণ-সঞ্চার করিতে পারে নাই। ওই প্রাণ জাগ্রত হইলে মধুসূদনের জীবনে আর সকল অধ্যাত্ম সম্পদের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটিত। কুমুদিনীকে লাভ করিয়া মধুসূদনের যে বোধ জাগ্রত হইয়াছে, তাহা প্রবৃত্তি মাত্র ; তাহা বিষয় বাসনারই নামান্তর।

কুমুদিনীকে দেখিয়া বিপ্রদাসের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, তাহার বিবাহিত জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সে যে কুমুদিনীর মনের প্রত্যেকটি ভাব দর্পণের মত দেখিতে পায়, তাহারই স্নেহের মাঝখানে যে সে বাড়িয়া উঠিয়াছে।

কুমুদিনীর যে সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে ইহা বিপ্রকার বুঝিয়াছে, কিন্তু সে সর্বনাশ যে কতখানি তাহা বুঝে নাই! বিপ্রদাস ভাবিয়াছে, তাহার নিকট মধুসূদনের যে ঋণ আছে, তাহা পরিশোধ করিয়া দিলে শ্বশুরগৃহে কুমুদিনীর সম্মান এমন করিয়া ক্ষুণ্ণ হইবে না। বিপ্রদাস যথাসাধ্য তাহারই আয়োজন করিতে লাগিল।

কুমুদিনীকে শ্বশুরগৃহে আর না পাঠাইতে বিপ্রদাসের মনে যে সামান্য দ্বিধা ছিল, মধুসূদনের উচ্ছৃঙ্খলতার সংবাদে তাহাও আর রহিল না। ক্রোধে, অবজ্ঞায় বিপ্রদাসের দুই চোখ দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল।

বিপ্রদাস স্থির করিল, যেমন করিয়াই হোক, মধুসূদনের ঋণ সে পরিশোধ করিবে, কিন্তু যে গৃহে কুমুদিনীর মর্যাদা এমন করিয়া নষ্ট হইয়াছে, সে গৃহে কুমুদিনী আর ফিরিয়া যাইবে না।

কুমুদিনীও ধীরে ধীরে তাঁহার পুরাতন পরিবেশে পূর্বের ন্যায় আপনার স্থান করিয়া লইল। সেই পূর্বের মুগ্ধা সৌন্দর্যপরায়ণা, পূজারতা, ধ্যান তন্ময় কুমুদিনী আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কুমুদিনীর অন্তরে এখন আর সংশয়ের কোন পীড়া নাই, সে সকল সংশয়, সকল সংস্কার জয় করিয়া উঠিয়াছে।

মোতির মা কুমুদিনীকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু বৃথা। শেষে মধুসূদন স্বয়ং আসিল। কুমুদিনী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। প্রত্যাখ্যাত হইয়া মধুসূদনও ফিরিয়া গেল।

নারী শ্বশুরগৃহকে মানিয়া লয়, কারণ সে তো নারী বা স্ত্রী মাত্রই নয়, সে যে মা—সন্তানের বন্ধন সে ছিন্ন করিবে কোন্ উপায়ে। স্বামী তত্ত্ব, ইত্যাদি সাধনার কথা ছাড়িয়া দিলেও, নারী তাহার প্রাণ ধর্মকে তো অস্বীকার করিতে পারে না।

সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, সামাজিক সকল সম্পর্ক ও মূল্যবোধের ঊর্ধ্বে মানুষের আর এক সত্ত্বা আছে, যাহা তাহার আত্মিক সত্ত্বা এবং ওই বোধাশ্রয়ী হইয়া বাঁচাই সার্থকতম বাঁচা। ওই বোধের সহিত অন্বিত হইয়া জীবনের আর সকল বোধ মূল্য লাভ করে। যে বোধ উহার সহিত অন্বিত হইয়া নাই, জীবনে তাহা মিথ্যা ভার মাত্র। নারীর ওই বোধকে অস্বীকার করিয়া আর কোন আপেক্ষিক পরিচয়কে বড় করিয়া তুলিবার পশ্চাতে রহিয়াছে পুরুষের বিচিত্র স্বার্থসিদ্ধির প্রসাস।

সন্তানের জননী-পদ হোক, পরিবারের গৃহিণী, পদ হোক, কিংবা অন্য কোন সামাজিক মর্যাদা হোক, নারী ওই সমস্তকে যেন উপায় স্বরূপে স্বীকার করে,—উদ্দেশ্য হইল, এই সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়া উহারই বিচিত্র দায়িত্ব ও কর্ম-সম্পাদনের ভিতর দিয়া আত্মাকে ফলবান করিয়া তোলা। এই সমস্ত কিছু যদি কোন নারীর আত্মিক পূর্ণতালাভের পথে একান্ত বিঘ্নস্বরূপ হইয়া উঠে, তবে তাহার ওই সমস্ত কিছু পরিহার করাই শ্রেয়। উহার জন্য দুঃখ ও ক্ষতি যত বড়ই হোক, তাহাকে জয় করিয়া উঠিতেই হইবে। কুমুদিনীর যদি আত্মহত্যা ঘটে, তবে ঘোষাল পরিবারের জননী ও গৃহিণী পদ লইয়া তাহার কি হইবে ?

ক্ষেত্র বিশেষে নারীর জননী-পদ যে কতদূর অগৌরবের হইতে পারে কুমুদিনীর জীবনে তাহার পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়। সন্তান নর-নারীর প্রেমের শ্রেষ্ঠ ফল,—যুগল আত্মার মিলিত প্রকাশ। কুমুদিনীর সন্তান কি তাহারই প্রকাশ ? সে তো মধুসূদনের কলুষিত কামনার ধন। কুমুদিনী তাহার অন্তঃসত্ত্বা সম্পর্কে নিঃসংশয় হইবামাত্র তাই লজ্জায়, ঘৃণায় অমন সংকুচিত হইয়া উঠিয়াছে।

কুমুদিনী ঘোষাল পরিবারের সন্তানকে ঘোষাল পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইবার পূর্ব্বে বিপ্রদাসকে বলিয়াছে, "ওরা কিন্তু তোমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।"

উত্তরে বিপ্রদাস বলিয়াছে, "ওরা যা করতে পারে, তা করা শেষ হলেই আমার উপর ওদের ক্ষমতাও শেষ হবে। তখনই আমি হব স্বাধীন।"

"দাদা! সেদিন তুমি আমাকেও স্বাধীন করে নিয়ো। ততদিন ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। এমন কিছু আছে, যা ছেলের জন্যও খোওয়ানো যায় না।"

কুমুদিনী আরও বলিয়াছে, "আমাকে ওরা ইচ্ছে করে দুঃখ দিয়েছে, তা মনে ক'রো না। আমাকে সুখ ওরা দিতে পারে না, আমি এমনি করেই তৈরি। আমিও তো ওদের পারব না সুখী করতে। যারা সহজে ওদের সুখী করতে পারে, তাদের জায়গা জুড়ে কেবল একটা না একটা মুশকিল বাধবে। তা বলে কেন এই বিড়ম্বনা। সমাজের কাছ থেকে অপরাধের সমস্ত লাঞ্ছনা আমিই একলা মেনে নেব, ওদের গায়ে কোন কলঙ্ক লাগবে না। কিন্তু একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব ; চলে আসব এ তুমি দেখে নিয়ো। মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড় বৌ তার কি কোন মানে আছে, যদি আমি কুমু না হই। আজ সমস্ত দিন ধরে এ কথা

ভাবছি যে চারিদিকে এত এলোমেলো, এত উলটো পালটা, তবু এই জঞ্জালে একবারে ঢেকে ফেলেনি জগৎটাকে। সমস্ত ছাড়িয়ে গিয়েও চন্দ্র সূর্য্যকে নিয়ে সংসারের কাজ চলছে, সেই যেখানে ছাড়িয়ে গেছে সেইখানে আছে বৈকুণ্ঠ, সেইখানে আছে আমার ঠাকুর। সমস্ত গিয়েও তবু বাকি থাকে এই কথাটা বুঝতে পেরেছি। সেই আমার অফুরণ সেই আমার ঠাকুর। এ যদি না বুঝতুম, তা হলে এইখানে তোমার পায়ে মাথা ঠুকে মরতুম, সে গারদে ঢুকতাম ন।"

স্বামী বিগ্রহ, দেব-দেবীর বিগ্রহের ন্যায় সম্পূর্ণ ভাবাত্মক বা মন্ময় হইতে পারে না, তাহার এমন একটি সত্ত্বা আছে, যাহা তাহাকে আর সকল হইতে পৃথক করে। এখন প্রশ্ন এই স্বামীর ব্যক্তিত্বের সহিত যদি নারীর ভাবাদর্শের সঙ্ঘাত বাধে, তাহা হইলে তাহার সাধনা সম্পূর্ণ আত্মময় হইয়া ওই পরিণাম লাভ করিতে পারে কি না। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ নারীর এই সামর্থ্য স্বীকার করেন। তাহার পরের প্রশ্ন এই, যদি কোন নারী সম্পূর্ণ আত্মময় কোন ভাব-সাধনার দ্বারা এই দ্বন্দ্ব জয় করিয়া উঠে, এবং উহার যে অধ্যাত্মিক ফল-লাভ তাহাতে জীবনের কোন প্রয়োজন আছে কি না। অবশ্য আধ্যাত্মিক ফল-লাভ বলিতে যদি কেবল অন্তর্জীবন ও অমর্ত্যকেই না বুঝি। বস্তুতঃ অধ্যাত্ম সত্য সমগ্র জীবনকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত। তাহা ইহকাল পরকাল, অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন, উভয়লোক ও উভয় সত্ত্বাকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত ব্যাপ্ত। কিন্তু নারীর এই জাতীয় সাধনায় ইহকাল ও মর্ত্য-জীবনের সকল ফল লাভকে অস্বীকার করা হইয়াছে। অধ্যাত্ম সাধনা যদি সমগ্র জীবনাশ্রয়ী হইয়া থাকে, তবে এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জীবনটাকেই যে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ সামগ্রিক জীবন-বিকাশের আদর্শ। তাহা জীবনের কোন একটি দিককে অস্বীকার করিয়া আর একটি দিকে স্বার্থকতা অন্বেষণ করিতে চায় না। সে আদর্শে প্রাণ-মন আত্মা, মর্ত্য ও অমর্ত্য, বাস্তব ও আদর্শ, ভাব ও রূপ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যভূত।

কুমুদিনী যদি কোন একটি উপায়ে সকল দ্বন্দ্বাতীত মানসিক অবস্থালাভে সমর্থ হইত, তাহা হইলে এই সামঞ্জস্য তত্ত্বটিকে লাভ করিতে পারিত না। সে আদর্শে জগৎ ও জীবন নাই, জগৎ ও জীবনের কোন সত্য নাই।

খ্রীষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, নারীর বিবাহযোগ্য বয়স শাস্ত্রে আট-নয়, কোথাও বা তারও কম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সহিত এ দেশের সংযোগ ঘটিবার কাল পর্যন্ত

এই বয়স এক প্রকার স্থির ছিল। এই কালের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষালাভ একপ্রকার অসম্ভব। এই কালের মধ্যে নারীর প্রাণের কিছুমাত্র বিকাশ ঘটে না, মনের বিকাশ তো অনেক পরের কথা। অর্থাৎ নারীর দেহ-প্রাণ-মন ও বুদ্ধি কিছুমাত্র বিকাশ লাভ করিবার পূর্বেই যাহাতে বিবাহ হয়, তাহার জন্য এই সকল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। এই অবস্থালাভের পূর্বে নারীর বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হইয়া গেলে, ওই সকল বোধ, তজ্জাত বিচিত্র জিজ্ঞাসা ও সমস্যাকে সম্পূর্ণ হত্যা করিতে পারা যায়। তাই বিবাহের বয়সকে ক্রমাগত কমাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে হত্যা করিতে পারিলে, ব্যক্তিত্বের সহিত সঙঘাত বাধিবার প্রশ্ন উঠে না।

নারীমেধ যজ্ঞ বলিতে কি বুঝায়, তাহা এদেশের সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ-ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। এইকালে বিশেষ করিয়া অখণ্ড বাঙ্গালা দেশে নারী-নির্যাতনের যে ভয়াবহ পরিণাম লাভ করে, তাহার তুলনা বিশ্ব-ইতিহাসে কোথাও মিলিবে না। আমি কেবল বাল্য-বিবাহ, সতীদাহ-প্রথা, বিধবা-নির্যাতন, কৌলিন্য বা বহুবিবাহ-প্রথা ইত্যাদির কথাই বলিতেছি না, নারীর বিচিত্র নির্যাতন ও অপমর্যাদার কথাও বুঝাইতে চাহিয়াছি।

একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সমাজে একাধিপত্য লাভের চেষ্টা যে ইহার মূল কারণ তাহাতে সংশয় নাই। তবে ইহারও মূলে ছিল একটি বিশিষ্ট জীবন-দর্শন এবং ওই জীবন-দর্শন আশ্রয় করিয়া সমাজ রচনার চেষ্টা। তাহাতে প্রাণ-মনকে আদিতে হত্যা না করিলে চলে না।

শাস্ত্রীয় অনুশাসনে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির জন্য কুমুদিনী ভুল করিয়াছে। ওই শাস্ত্র তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিল যে, স্বামী যেমনই হোক, স্ত্রীর নিকট তাহা ঈশ্বরীয় সাধনার প্রতীক। নারীকে যে কোন উপায়ে তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইতেই হয়। স্বীকার করিয়া লইবার সাধনাই নারীর সতীত্ব সাধনা। কুমুর কথাই তুলিয়া দিই—

"তখন নিশ্চিত জানতুম স্বামী ভালোমন্দ যাই হোক-না-কেন স্ত্রীর সতীত্ব-গৌরব প্রমাণের একটা উপলক্ষ্য মাত্র। মনে একটুও সন্দেহ ছিল না যে, প্রজাপতি যাকেই স্বামী বলে ঠিক করে দিয়েছেন, তাকেই ভালোবাসবই। ছেলেবেলা থেকে কেবল যাকে দেখেছি, পুরাণ পড়েছি, কথকতা শুনেছি, মনে হয়েছে শাস্ত্রের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে চলা খুব সহজ।"

ইহার উত্তরে মোতির মা বলিয়াছে, "দিদি উনিশ বছরের কুমারীর জন্য শাস্ত্র লেখা হয় নি।"

যে কারণের জন্য হোক, বর্তমান সমাজে নারীর বিবাহযোগ্য বয়স প্রত্যাশার সীমাকেও ছাড়াইয়া চলিয়াছে। এই বয়সের ভার অধিকাংশ নারীর জীবনে কেবল ভারমাত্র নয়, সার্থকতা-সমৃদ্ধ। অর্থাৎ, এই জীবনকে তাহারা বিচিত্র শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়া, বিভিন্ন কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। অর্থাৎ, বিবাহিত জীবনলাভের পূর্বেই তাহাদের প্রাণ-মন ও বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটিতেছে। যাহাকে স্বভাব বা স্বধর্ম বলিয়া নারী ইতিমধ্যে তাহাকে পরিপূর্ণরূপে লাভ করিতেছে। কুমুদিনী নূতন যুগের এই পূর্ণ বিকাশ অবস্থাটি লাভ করিয়াছে, অথচ মধ্যযুগের সংস্কারকেও ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। কুমুদিনীর জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটিয়াছে এইজন্য।

প্রকৃত প্রেম সমগ্র সত্ত্বাকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হয়। তাহাতে তাই আত্মার ক্ষুধার সহিত প্রাণ-মনের ক্ষুধা অনিবার্যরূপে দেখা দেয়। এই প্রেমে তাই পূর্ণ ব্যক্তিত্বের, সমগ্র সত্ত্বার অনুশীলন প্রয়োজন।

কুমুদিনী প্রেমে বয়স প্রভৃতি কিছুই বিচার করিয়া দেখিতে চায় নাই। ভাবিয়াছে, তাহার ভক্তি পুরুষের এই সকল অভাবকে জয় করিয়া উঠিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে তাহার প্রাণ-মন যে পূর্ণ বিকশিত! বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হইবামাত্রই কুমুদিনী তরুণ প্রাণের স্পর্শলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বালক মোতিকে জড়াইয়া ধরিয়া জরার লোলুপ স্পর্শের অশুচিতা ধুইয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। প্রেম নর-নারীর পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা। প্রেমের এই জাতীয় সাধনাকে আমাদের সমাজ হত্যা করিতে চাহিয়াছে। জীবনের এই জাতীয় লীলার পরিচয় ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য ও পুরাণে কোথাও লাভ করিতে পারা যাইবে না। যে মূল দার্শনিক বোধের জন্য ইহা সম্ভব হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি।

প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের সামর্থ ও অসামর্থ উভয় দিক রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। সে কাল তাহার ভালোমন্দ লইয়া চিরকালের জন্য অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই, লাভও নাই। নূতন কালকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাহার ভালোমন্দ সকল দিকসমেত স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

এই নূতন কালের অশ্রদ্ধার দিকটি ফুটিয়া উঠিয়াছে মধুসূদনের জীবনে। সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে অর্থ ও উপকরণকে ক্রমাগত পুঞ্জীভূত করিয়া তুলিবার সাধনা, জীবনের উন্নততর সকল মূল্যকে ধূলায় লুটাইয়া দিয়া কেবল স্থূল বাসনা চরিতার্থতা, তাহার জন্য সকল প্রকার মনুষ্যত্বহীনতা।

একালের সকল দারিদ্র্য, অসম্মান ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আত্মার মহিমাকে দীপশিখার মত অনির্বাণ রাখিয়াছে বিপ্রদাসের মত পুরুষ, কুমুদিনীর মত নারী। যাহারা ওই ঐশ্বর্য ও মনুষ্যত্বহীন বলদর্পের দিকে তর্জনী তুলিয়া প্রতি মুহূর্তে অভিশাপ দিয়া বলিয়াছে, 'বিনিপাত'।

নূতন কালের সামর্থ্যের আর একটি দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রাচীন সমস্ত কিছুর, তাহার নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সকল দিকের নূতন করিয়া মূল্য বিচার করিবার মধ্যে। সমগ্র জীবন-জিজ্ঞাসার এমন আমূল রূপান্তর ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কখন দৃষ্ট হয় নাই। 'যোগাযোগ' হইতে কয়েকটি উক্তি পরিশেষে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আমি দেখতে পাচ্ছি, মেয়েদের যে অপমান, সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে, সে কোন একজন মেয়ের নয়।"

' সহ্য করা ছাড়া মেয়েদের অন্য কোন রাস্তা একেবারেই নেই বলেই, তাদের উপর কেবলই মার এসে পড়ছে। বলবার দিন এসেছে যে সহ্য করব না।"

"নিজের স্ত্রীকে প্রকাশ্য অপমান করা এতই সহজ—স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করতে বাহিরের বাধা এতই কম—স্ত্রীকে নিরুপায়ভাবে স্বামীর বাধ্য করতে সমাজে হাজার রকম যন্ত্র ও যন্ত্রণা সৃষ্টি করা হয়েছে, অথচ সেই শক্তিহীন স্ত্রীকে স্বামীর উপদ্রব থেকে বাঁচাবার জন্যেকোন আবশ্যক পন্থা রাখা হয় নি। * * * সতীত্ব গরিমার ঘন প্রলেপ দিয়ে এই ব্যথা মারবার চেষ্টা, কিন্তু বেদনাকে অসম্ভব করবার একটুও চেষ্টা নেই। স্ত্রীলোক এত সস্তা, এত অকিঞ্চিৎকর।"

"মেয়েদের সম্মান মেয়েদের কাছেই সবচেয়ে কম। তারা জানেও না যে, এই জন্যে মেয়েদের ভাগ্যে ঘরে ঘরে অপমানিত হওয়া এত সহজ। তারা আপনার আলো আপনি নিবিয়ে বসে আছে। তারপরে কেবলই মরছে ভয়ে, কেবলই মরছে ভাবনায়, অযোগ্য লোকের হাতে কেবলই খাচ্ছে মার, আর মনে করছে সেইটে নীরবে সহ্য করাতেই স্ত্রীজন্মের সর্ব্বোচ্চ সার্থকতা। না, পুরুষের এতবড় লাঞ্ছনাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। সমাজ যাকে এতদূর নামিয়ে দিলে সমাজকে সে প্রতিদিন নামিয়ে দিচ্ছে।"

"ক্ষমতা জিনিষটা যেখানে পড়ে পাওয়া জিনিস, যার কোনো যাচাই নেই, অধিকার বজায় রাখবার জন্যে যাকে যোগ্যতার কোনো প্রমাণ দিতে হয় না, সেখানে সংসারে সে কেবল হীনতার সৃষ্টি করে। অবিচারে কোনো মানুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে নেওয়ার দ্বারা শুধু যে তারই অনিষ্ট তা নয়, তাতে করে সমাজের শ্রেষ্ঠতার আদর্শকেই খাটো করে। এ রকম অন্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা নিজেরই মনুষ্যত্বকে অশ্রদ্ধা করি এ কথা কেউ ভাবে না কেন? এই রকম যত দলগড়া শাস্ত্রগড়া নির্ব্বিচার ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমস্ত জগতে আজ লড়াইয়ের হাওয়া উঠেছে। যত সব ইচ্ছাকৃত অন্ধ দাসত্বকে বড়ো নাম দিয়ে মানুষ দীর্ঘকাল পোষণ করেছে তারই বাসা ভাঙবার দিন এল।"

শেষের কবিতা

উপন্যাস আলোচেনার প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসে যে দুইটি বোধ ক্রিয়া করিয়াছে, সেই সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। তাহা হইলে উপন্যাসটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে যথেষ্ট সুবিধা হইবে।

সৌন্দর্য-মাধুর্যের, কল্পনা ও স্বপ্নের যে জগৎ, কবি যে জগৎ নিরন্তর দৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন, পরিণত বয়সে সেই জগৎ-সম্পর্কে একটি অসম্পূর্ণতা-বোধ ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। তাঁহার কাব্যে যাহা 'দুর্গম' 'কঠোর' 'নির্মম', যাহা তপস্যার, মানুষের যে প্রয়াস মৃত্যুর মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অমৃত ছিনাইয়া আনিতে চায়, যাহা কঠোর বৈরাগ্যের, যাহা আপন অন্তরের অচঞ্চল দীপশিখা দিয়া অন্যের হৃদয়ে দীপশিখা জ্বালাইতে চায়, যাহা দুঃখ ও ত্যাগের আগুনে শুচি, যেখানে মনুষ্যত্বের অসম্মাননা, যেখানে বঞ্চনা ও শোষণ, যেখানে অমানিশার ধ্যান, তাহার কতটুকু প্রকাশ করিয়াছে! এই জীবনের জন্য একটা তীব্র ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কাব্যে স্পস্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়াছে। তিনি আপনার কাব্য-জীবনকে বলিয়াছেন, অনুত্ত বঙ্গ-সরোবর, চতুর্দিক পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। সেখানে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত রবির নানা রঙের ছায়া পড়ে—জলে নানা বর্ণের ফুল ফোটে। বধূরা কলসী ভরিয়া জল লইয়া ঘরে ফেরে। নক্ষত্রখচিত নিশীথ রাত্রি জলের বুকে আপনার মায়া বিস্তার করে। কানে কানে কোন পুরানো কথার গুঞ্জরণ তোলে।

কিন্তু ঝর্ণার যে প্রবল উচ্ছ্বাসে পাথর টুকরা টুকরা হইয়া গড়াইয়া পড়ে, তাহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে আপনার পথ করিয়া লয়, মহাপ্রাণের সেই যে দুর্জয় আবেগ, তাহার কতটুকু প্রকাশ তাঁহার কাব্যে ঘটিয়াছে! যাহারা দুরাশায় পথ চলে, রাত্রির নক্ষত্র দেখিয়া যাহারা দিক নির্ণয় করে, ঘরের মূল স্বপ্নকে যাহারা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়াছে, গিরিগুহায়, অরণ্যে যাহাদের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়, খর কণ্টকে যাহাদের চরণ রক্তাক্ত, তাহাদের বাণী রবীন্দ্র-কাব্যে কত ক্ষীণ! অথচ ইহাকে কাব্যে রূপ দিবার তীব্র ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছে।

পাঠক বোধহয় এতক্ষণে বোধ করিতে পারিয়াছেন, কবির সৌন্দর্য ও মাধুর্য-ধ্যানের অপরূপ যে প্রকাশ, তাহাই রূপলাভ করিয়াছে অমিত ও লাবণ্যের প্রেম পর্যায়ের মধ্যে, তাঁহার দুঃখের সাধনলব্ধ সম্পদলাভের ঐকান্তিক ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছে শোভনলাল ও লাবণ্যের পরবর্তী পর্যায়ের মধ্যে।

দুইটি জীবনই কবির নিকট তথা লাবণ্যের নিকট আকাঙ্ক্ষিত। অমিতের মাধুর্য-লোকের স্পর্শে তাহার চেতনার যে জাগরণ, তাহাকে লাবণ্য প্রণাম না জানাইয়া পারে নাই। কৃতজ্ঞতায় নম্রতায় বিগলিত হইয়া অমিতের সে পদধূলি লইতে চাহিয়াছে। অমিত ছাড়া তাহার জীবন যে কিরূপ শূন্যময় ও নিরর্থক হইয়া যাইত, তাহা সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। কিন্তু তাহার জীবনকে সে পরিণামে শোভনলালের নিকট সমর্পণ করিয়াছে—কথা সৃষ্টি করিতে নয়—সে জীবন দিয়া জীবনের দীপ জ্বালাইতে চায়।

একদিকে 'রোমান্সের পরমহংস'—অমিত, অন্যদিকে দুঃখের সাধনায় সে অচঞ্চল, সেই তো শোভনলাল। রবীন্দ্র-মানসে এই উভয় জগৎ লাভের জন্য সমান আকাঙ্ক্ষা মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে—সেই লাবণ্য!

* * * * *

অমিত ধনীর সন্তান। পিতার অপরিমিত অর্থের অধিকারী। বিলাতে অক্সফোর্ডে সাত বৎসর ধরিয়া পড়াশুনা করিয়া দেশে ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসে। অর্থোপার্জনে তাহার মন নাই। উচ্চ অভিজাত ইঙ্গ-বঙ্গীয় সমাজে মিলিয়া মিশিয়া দেশী ও বিদেশী সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা করিয়া এখন তাহার দিন কাটে। অমিত নিঃসন্দেহে আধুনিক, কিন্তু যে অর্থে তাহার বোনেরা সিসি লিসি এবং বিসি বোস আধুনিক, সেই অর্থে নয়। সাধারণের সহিত আচারে আচরণে মিল না থাকিলেও, সর্বত্র সৌন্দর্য ও উন্নতধরণের রুচিকে মানিয়া চলে। তাহার ব্যক্তিগত বিচিত্র ধরণের মতবাদগুলির পরিচয় দান করিবার কোন প্রয়োজন নাই। নারীর সহিত তাহার মেলামেশা অবাধ, অকুণ্ঠিত, কিন্তু কাহাকেও অন্তরের মধ্যে স্থান দান করে নাই। তাহার মানসলোকে যে নারী আছে, এ পর্যন্ত তাহার সমাজের মধ্যে এই জাতীয় কোন নারীর প্রকাশ সে দেখিতে পায় নাই। পরিচিত নারীসমাজের মধ্যে এক প্রকার কালচারের অভাব সে প্রত্যক্ষ করিয়া কুণ্ঠিত হয়, নিজেকে নানাভাবে ভুলাইয়া রাখিলেও এক প্রকার শূণ্যতাবোধের পীড়া তাহাকে যে নিয়ত পীড়িত করিত, তাহা বোধ করিতে পারা যায়। তাহার সমাজের অন্যান্য নর-নারীর সঙ্গে এইখানে তাহার পার্থক্য।

এই শূন্যতাবোধ লইয়া, অমিত একাকী শিলিং পাহাড়ে বেড়াইতে গেল। আসন্ন বর্ষার ঘন ঘটার মধ্যে সে শিলং অঞ্চলের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। সাহিত্যচর্চার মাঝে মাঝে সুনীতি চাটুজ্জের বাংলা শব্দতত্ত্বের বই পড়ে। মনটি নিয়ত সৌন্দর্যে, মাধুর্যে ও স্বপ্নে ভরপুর। এই মনটিকে রবীন্দ্রনাথ এক কথায় বলিয়াছেন রোমান্টিক।

তাই বলিতেছিলাম, অমিত বহির্মুখী বাকপটু যুবকমাত্র নহে। তাহা

হইলে, সে শিলিং-এ কোন একটি অভিজাত হোটেলে আপনার আশ্রয় করিয়া লইত। সে তাহার নিঃসঙ্গতাকে সৌন্দর্যস্বপ্নে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিত।

একদিন শিলং পাহাড়ে গাড়ী করিয়া বেড়াইতে গিয়া তাহার গাড়ীর সহিত আর একটি গাড়ীর সংঘাত লাগিল। সেই সূত্রে লাবণ্যর সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎকার। কত পক্ষ, কত জন্ম-জন্মান্তরের প্রতীক্ষার পর যেন উভয়ে উভয়কে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এই সাক্ষাৎকারের পশ্চাতে যেন সমস্ত জল-স্থল অন্তরীক্ষের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইয়াছে। দুজনের অন্তর-আকাশে সেই প্রথম অরুণোদয়ে ভোরের পাখী গান গাহিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে—"জাগো"। রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করি—

"একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। সদ্য মৃত্যু-আশঙ্কার কালো পটখানা তার পিছনে, তারই উপরে সে যেন ফুটে উঠল একটি বিদ্যুৎরেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি—চারিদিকের সমস্ত হতে স্বতন্ত্র। মন্দর পর্বতের নাড়া-খাওয়া ফেনিয়ে-ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী, সমস্ত আন্দোলনের উপরে—মহাসাগরের বুক তখনো ফুলে ফুলে কেঁপে উঠছে। দুর্লভ অবসরে অমিত তাকে দেখলে। ড্রয়িং রুমে এ মেয়ে অন্য পাঁচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে দেখা দিত না। পৃথিবীতে হয়তো দেখবার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাকে দেখবার যোগ্য জায়গাটি পাওয়া যায় না।

মেয়েটির পরণে সরু পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। তনু দীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকন শ্যাম, টানা চোখ ঘন পক্ষ্মচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললাট অবারিত করে পিছু হটিয়ে চুল আঁট করে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ক ফলের মতো রমণীয়। জ্যাকেটের হাত কব্জি পর্যন্ত, দু-হাতে দুটি সরু প্লেন বালা। ব্রোচের বন্ধনহীন কাঁধের কাপড় মাথায় উঠেছে, কটকি কাজ-করা রুপোর কাঁটা দিয়ে খোঁপার সঙ্গে বদ্ধ।"

উভয়ের সাক্ষাৎকার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আরো লিখিতেছেন—

"কোন্ দৈব নির্জন পাহাড়ের পথে হঠাৎ মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দুজনের মনে দেখাদেখির গাঁঠ বেঁধে দিলে; সবুর করলে না। আকস্মিকের বিদ্যুৎ-আলোতে এমন করে যা ঢলে পড়ল, প্রায় মাঝে মাঝে এসে রাত্রে জেগে উঠে অন্ধকারের পটে দেখা যাবে। চৈতন্যের মাঝখানটাতে তার গভীর ছাপ পড়ে গেল, নীল আকাশের উপরে দৃষ্টির কোন এক প্রচণ্ড ধাক্কায় যেমন সূর্য-নক্ষত্রের আগুনজ্বলা ছাপ।"

প্রাণের গভীর আন্দোলন অমিতের মনে কথার বন্যা বহাইয়া দিল—

"অজানা আকাশ থেকে চাঁদ এসে পড়েছিল পৃথিবীর কক্ষপথে—লাগল তাদের মোটরে মোটরে ধাক্কা, সেই মরণের তাড়নার পর থেকে যুগে যুগে দুজনে এক সঙ্গেই চলেছে ; এর আলো ওর মুখে পড়ে, ওর আলো এর মুখে। চলার বাঁধন আর ছেঁড়ে না। মনের ভিতরটা বলছে, আমাদের সুরু হল যুগল চলন, আমরা চলার সূত্রে গাঁথব ক্ষণে ক্ষণে কুড়িয়ে পাওয়া উজ্জ্বল নিমেষগুলির মালা।"

লাবণ্যের মধ্যে যাহা অমিতকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা তাহার মননশীলতার দীপ্তি। সে অনেক কিছু জানিয়াছে, অনেক কিছু পাইয়াছে, কিন্তু মনের মধ্যে শান্তি পায় নাই। লাবণ্য অমিতের মধ্যে সেই শান্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছে—জীবনের একটি চরিতার্থতা। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন—

"অমিত অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, তাদের সৌন্দর্য্য পূর্ণিমা রাত্রির মত উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন ; লাবণ্যর সৌন্দর্য্য সকালবেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত। তাকে মেয়ে করে গড়বার সময় বিধাতা তার মধ্যে পুরুষের একটা ভাগ মিশিয়ে দিয়েছেন ; তাকে দেখলেই বোঝা যায় তার মধ্যে কেবল বেদনার শক্তি নয়, সেই সঙ্গে আছে মননের শক্তি। এইটেতেই অমিতকে এত করে আপন করেছে। অমিতর নিজের মধ্যে বুদ্ধি আছে, ক্ষমা নেই ; বিচার আছে, ধৈর্য্য নেই ; ও অনেক জেনেছে, শিখেছে, কিন্তু শান্তি পায় নি—লাবণ্যর মুখেও এমন একটি শান্তির রূপ দেখেছিল—যে শান্তি হৃদয়ের তৃপ্তি থেকে নয়, যা ওর বিবেচনা শক্তির গভীরতায় অচঞ্চল।"

যোগমায়ার ব্যক্তিত্বের আনুকূল্যে লাবণ্য ও অমিতের প্রেম মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে নিবিড় হইয়া উঠিল। প্রেমের সে উত্তাপে অমিতের মধ্যে জমিয়া ওঠা কথা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে সকল কথা সৌন্দর্যে মাধুর্যে ও প্রেমের স্বপ্নে ভরপুর। তাহাদের দৃষ্টিতে আজ সমস্ত কিছু অনির্বচনীয় বিস্ময় ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ। তাহা ললিত মধুর মুগ্ধতার আবিষ্ট গদ্‌গদ ভাষণ নয়, তাহা সৃষ্টি-মহিমায় দীপ্ত। দুটি সত্ত্বার এই সৃজনশীল ক্ষমতা এতটুকু আচ্ছন্ন হয় নাই।

অমিতের প্রেম পরিণামে বিবাহে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে চাহিয়াছে। যোগমায়ার নিকট সে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে। যোগমায়াও যে অমিতকে বোঝেন না, তাহা নয়। তবে, অমিতের প্রস্তাবে তাঁহারও সস্নেহ প্রশ্রয় ছিল।

মোগমায়ার নিকট প্রশ্রয় পাইয়া অমিতের দেহ-মন যেন লঘু হইয়া গিয়াছে। অমিত ঘর ছাড়িয়া বাহিরে লাবণ্যর নিকট উপস্থিত হইল।

লাবণ্য তখন জীবসেবায় ব্যস্ত। অমিতের উৎসাহে সে নিজে বিশেষ উৎসাহ-বোধ করিলনা। অমিত কত কথা বলিয়া চলিয়াছে, লাবণ্য উদাসীন। লাবণ্য স্পষ্ট করিয়াই অমিতকে বলিল, "মিনতি করে বলছি, আমাকে বিয়ে করতে চেয়ো না। বিয়ে করে গ্রন্থি খুলতে গেলে তখন তাতে আরো জট পড়ে যাবে। তোমার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি, সে আমার পক্ষে যথেষ্ট, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চলবে, তুমি কিন্তু নিজেকে ভুলিয়ো না।" অমিত যে আপনাকে বোঝে না, তাহা নয়। কিন্তু বুঝিয়াও সে বুঝিতে চাহিল না ; বর্তমানের রস আস্বাদে পাছে বাধা পড়ে।

লাবণ্য আরো স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে—"তুমি তো সংসার ফাঁদবার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে ফেরো ; সাহিত্যে সাহিত্যে তাই তোমার বিহার, আমার কাছেও সেইজন্যেই তুমি এসেছ। বিয়েটাকে তুমি মনে মনে জান, যাকে তুমি সর্বদাই বল, ভালগার। ওটা বড়ো রেস্‌পেক্‌টেবল ; ওটা শাস্ত্রের-দোহাই-পাড়া সেইসব বিষয়ীলোকের পোষা জিনিস, যারা সম্পত্তির সঙ্গে সহধর্মিনীকে মিলিয়ে নিয়ে খুব মোটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে।"

অমিত এই কথাটি বুঝিতে চায় না। সে লাবণ্যকে অনেক কথা বলিয়াছে—মুগ্ধ প্রেমের স্বপ্নের কথা। লাবণ্যের বুদ্ধি স্থির। তাহার মত মুহূর্তের জন্যও টলিল না। লাবণ্য যে কত বড় প্রলোভনকে জয় করিয়া উঠিয়াছে, তাহা আমরা স্পস্টই বোধ করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লাবণ্যর হইয়া কথা কহিয়াছেন—

"অমিতর মনের গড়নটা সাহিত্যিক, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় ওর মুখে কথার উচ্ছ্বাস তোলে। সেইটে ওর জীবনের ফসল, তাতেই ও পায় আনন্দ। আমাকে ওর প্রয়োজন সেইজন্যেই। যে-সব কথা ওর মনে বরফ হয়ে জমে আছে, ও নিজে যার ভার বোধ করে কিন্তু আওয়াজ পায় না, আমার উত্তাপ লাগিয়ে তাকে গলিয়ে পরিয়ে দিতে হবে।"

জগতের আনন্দ-যজ্ঞে আলো জ্বালাবার ভার পড়েছে অমিতের উপর। অমিত উৎসব সাজাতে চায়। লাবণ্যের জীবনের তাপ-জীবনের কাজের জন্য। অমিতের মানসিক গঠন হইতে লাবণ্যের মানসিক গঠন এইখানে পার্থক্য।

অমিত গৃহের পথে ফিরিতে ফিরিতে আপন মনে এই কথা ভাবিয়াছে। অমিত ও অসাধারণ বুদ্ধিমান। "অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি বাহিরে প্রকাশ করতেই হয়—কেউ-বা করে জীবনে, কেউ-বা করে রচনায়—জীবনকে ছুঁতে

ছুঁতে, অথচ তার থেকে সরতে সরতে, নদী যেমন কেবলই তীর থেকে সরতে সরতে চলে তেমনি। আমি কি কেবলই রচনার স্রোত নিয়েই জীবন থেকে সরে সরে যাব। এইখানেই কি মেয়ে-পুরুষের ভেদ। পুরুষ চায় তার সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে, সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে পদে-পদে ভোলে। মেয়ে তার সমস্ত শক্তিকে খাটায় রক্ষা করতে, পুরানোকে রক্ষা করবার জন্যই নতুন সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়। রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিঘ্ন। এমন কেন হল। এক জায়গায় এরা পরস্পরকে আঘাত করবেই। যেখানে খুব ক'রে মিল, সেইখানেই মস্ত বিরুদ্ধতা। তাই ভাবছি, আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো যে পাওনা, সে মিলন নয়, সে মুক্তি।"

লাবণ্য-তর্ক অধ্যায়টির ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ লাবণ্যের এই কথাটিকে আরো স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। দুজনের প্রকৃতি যদি না মেলে, বিয়েতে অন্ততঃ একজনকে আর একজনের মতো হইতে হয়। হয় সে কাজ, অমিতের জন্য লাবণ্যকে করিতে হইবে নতুবা লাবণ্যর জন্য অমিতকে করিতে হইবে। তাহাতে দুইজনের একজনের হইবে অপমৃত্যু। লাবণ্য তাহা ঘটিতে দিতে চায় না। তাহার জীবনে অমিতের আবির্ভাব একটি আশীর্বাদের মতো। সে যে নারী এই কথাটিই সে এক প্রকার ভুলিয়াই ছিল। তাহার নারী-সত্তাকে জাগ্রত করিয়াছে অমিত। অমিত ছাড়া তাহার জীবন ছিল বন্ধ্যা। অমিতের স্পর্শে সে জাগিয়া উঠিয়া অন্তরের মধ্যে যে বিরাট ক্ষুধাবোধ করিয়াছে, তাহা কিন্তু মিটাইবার সাধ্য অমিতের নাই। সে ক্ষুধা মিটাইতে পারে শোভনলাল। সে তাই বেদনায় জাগিয়া উঠিয়া শোভনলালকে স্মরণ করিয়াছে। সে অমিতকে বিবাহ করিবে না ইহা নিশ্চিত। যতদিন শোভনলাল আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া না যায়, ততদিন অন্ততঃ সে অমিতের লীলাসঙ্গিনী হইয়া কিছু কাল কাটাইবে। অমিতের রুচি ও প্রকৃতি অত্যন্ত উন্নত ধরনের, তাহার নিকট তাহার নারী-সত্তা যে লাঞ্ছিত হইবে না, তাহা লাবণ্য নিঃসংশয়ে জানিত। তাইত অমিতের হাতে সে আপনাকে অমন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

"যতদিন পারি, না হয় ওঁর কথার সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হয়েই থাকব। আর স্বপ্নই বা তাকে বলব কেন। সে আমার একটা বিশেষ জন্ম, একটা বিশেষ রূপ, একটা বিশেষ জগতে সে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। না হয় সে ওটি থেকে—বের হয়ে আসা দু' চারদিনের একটা রঙ্গিন প্রজাপতিই হল, তাতে দোষ কী—জগতে প্রজাপতি আর কিছুর চেয়ে যে কম সত্য তা তো নয়—না হয় সে সূর্যোদয়ের আলোতে দেখা দিলে আর

সূর্যাস্তের আলোতে মরেই গেল, তাতেই বা কী। কেবল এইটুকুই দেখা চাই যে সেটুকু সময় যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়।"

তার জীবনে অমিতের আবির্ভাবের একান্ত প্রয়োজন। অমিত ছাড়া তার জীবন কী পরিণতি লাভ করত, তা সে ভাবিতেই পারে। লাবণ্য সে কথা কর্তা-মাকে বলিয়াছে। "এক সময়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি নিতান্তই শুকনো—কেবল বই পড়ব আর পাশ করব, এমনি করেই আমার জীবন কাটবে। আজ হঠাৎ দেখলুম আমিও ভালবাসতে পারি। আমার জীবনে এমন অসম্ভব যে সম্ভব হল, এই আমার ঢের হয়েছে। মনে হয়, এতদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি। এর চেয়ে আর কী চাই। আমাকে বিয়ে কর্তে বলো না, কর্তা-মা।"

কয়েক দিনের মধ্যে অমিত বাসা বদল করিল। উদ্দেশ্য লাবণ্যকে আরো একটু কাছে পাওয়া। লাবণ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া অমিত নিয়ত দৃষ্টির ভিতর দিয়া উদ্দাম স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। অন্যদিকে লাবণ্যও মিলনের জন্য উৎসুক। প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় তাহার দিন যেন আর কাটিতে চায় না। মিলন ক্রমে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে—সেই সঙ্গে মাধুর্যের বিচিত্র স্বপ্ন—মাধুর্যের আকাশে তাহারা উভয়ে ডানা মেলিয়া উধাও হইয়াছে।

ঠিক হইল, আগামী অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ হইবে। যোগমায়া কলকাতায় গিয়া বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিবেন। লাবণ্য স্থির করিল, বিবাহের আগে তাহাদের দুজনের আর দেখা হইবে না। বিয়ের পর তাহাদের মিলন কিরূপ হইবে, সেই স্বপ্নের একের পর এক ছবি অমিত আঁকিয়া গিয়াছে। লাবণ্য দু-একটি কথা দিয়া সেই স্বপ্নকে জাগাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহার পরিচয় দান সমালোচনার ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। পাঠকবর্গ মূল গ্রন্থ পাঠ করিয়া সেই রস-নিবিড় সৌন্দর্যলোকটিকে ফিরিয়া ফিরিয়া আস্বাদ করিতে পারিবেন।

অমিত ও কলিকাতায় যাইবে। সেদিন আসন্ন সন্ধ্যায় অমিত লাবণ্যকে শেষ বিদায় দিল। সেই বিদায় মুহূর্তটিকে রবীন্দ্রনাথ যে রস সুনিবিড় করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় তাহাদের উভয়ের স্বপ্ন যেন সেই মুহূর্তে চরম পরিণাম লাভ করিল। আমি সেই সমগ্র অংশটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

'কিছুদূরে যেতে যেতে দুজনের হাত মিলে গেল। ওরা কাছে কাছে এল ঘেঁষে। নির্জন পথের ধারে নিচের দিকে চলেছে ঘন বন। সেই বনের একটি জায়গায় পড়েছে ফাঁক, আকাশ সেখানে পাহাড়ের নজরবন্দি থেকে একটুখানি ছুটি পেয়েছে; তার অঞ্জলি ভরিয়ে নিয়েছে অস্ত-সূর্য্যের শেষ

আভায়। সেইখানে পশ্চিমের দিকে মুখ করে দুজনে দাঁড়াল। অমিত লাবণ্যর মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার মুখটি উপরে তুলে ধরলে। লাবণ্যর চোখ অর্ধেক বোজা, কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আকাশে সোনার রঙের উপর চুনি-গলানো পান্না গলানো আলোর আভাগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভীর নির্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে যেখানে কেহ নাই, শুধু আনন্দ আছে, সেই অমর্ত জগতের অব্যক্ত ধ্বনি আসছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হল ঘন। সেই খোলা আকাশ-টুকু, রাত্রিবেলায় ফুলের মতো, নানা রঙের পাপড়িগুলি বন্ধ করে দিলে।"

এর পর বিবাহ। দুজনেই জানে বিবাহে এতদিনের সেই সুরটি ঠিকমত আর বাজবে না। দুজনের জীবনে তা ভারস্বরূপ হইয়া উঠিবে।

এই পরিপূর্ণ স্বপ্নের মধ্যে লাবণ্য বেদনার একটি কণ্টক জাগাইয়া তুলিল। তার প্রথম জীবনের প্রেমের কথা। অমিতও বুঝিল, লাবণ্য এমনি করিয়া দূরে সরিয়া যাইতে চায়।

লাবণ্য ও অমিতের স্বপ্ন-লোকের উপর এক মালিন্যের স্রোত আসিয়া পড়িল—কেটি-লিসি-নরেন-কুমারের দল। লাবণ্যের পরিচিত সমাজ হইতে তাহা কত দূরে! অমিত এই সমাজেরই একজন। অমিতকে একভাবে শ্রদ্ধা করিলেও এই সমাজকে সে মনে মনে অবজ্ঞা করে। স্বভাবের সঙ্গে সমাজ আসিয়া প্রতিবন্ধকতাকে দুস্তর করিয়া তুলিল।

এই সময় লাবণ্যর নিকট শোভনলালের একটি চিঠি পৌঁছাইল। শোভন-লাল তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়। এই মৃত্যুঞ্জয়ী, দুঃখের আগুনে উজ্জ্বল প্রেমকে লাবণ্য বুকে টানিয়া লইল। এই জীবনে শোভনলালের চেয়ে বড় বন্ধু তাহার আর কেউ নাই। এই প্রেমে তাহার স্বভাব ও সমাজ সম্পূর্ণ আনুকূল্য করিবে।

বিস্তরিত আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। লাবণ্য অমিত ও কেটিকে তাহার দলসমেত চেরাপুঞ্জীতে বেড়াইতে যাইবার পরামর্শ দিল। এই অবসরে সে শোভনলালকে সঙ্গে লইয়া চিরকালের জন্য শিলং ত্যাগ করিয়া গেল। এদিকে অমিত কেটিকে জীবনে বধূরূপে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইল। অমিত লাবণ্যের জীবনে শিলং স্বপ্নমালা দিনগুলি অন্তরে ধ্রুব-তারকার রূপ ধরিয়া ভরিয়া উঠিল। তাহা উভয়ের চিরকালের বেদনার লোক।

দুই বোন

শশাঙ্ক শর্মিলার নিকট হইতে যদি স্নেহ-যত্ন, সুখ-সম্ভোগ সমস্ত কিছুই লাভ করিত, তাহাতে তাহার অপর সকল ক্ষুধাই মিটিত, কেবল মনের ক্ষুধা মিটিত না। যে ক্ষুধায় বাহিরের আর সকল ক্ষুধা গৌণ হইয়া যায়, যাহার পূর্ণতায় মানুষ বাহিরের অনেক অপূর্ণতা, অনেক বঞ্চনা হাসিমুখে বহন করে, তাহা মানুষের অন্তর্জগতের এমন এক উপলব্ধি, যাহার আস্বাদে মানুষের সমগ্র সত্তা এক অখণ্ড সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, নিত্যদিনের সমস্ত কিছু তাহার দেশ-কালের পূর্ব পরিচয় হারাইয়া এক নূতন রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে, মূল্যবোধ পর্যন্ত পরিবর্তিত হইয়া যায়। ইহা মানুষের গভীরতম সত্তার দুর্লভতম এক অনুভূতি।

শশাঙ্ক শূন্যতা বোধ করিলেও, ইহার স্বরূপ তাহার নিকট অজ্ঞাত। তাহার সচেতন মনের বাহিরে ইহার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের ধীর একটা আয়োজন চলিতেছিল, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

শশাঙ্ক যতদিন চাকরি-ক্ষেত্রে ছিল, ততদিন শর্মিলা ও শশাঙ্কের জীবনের মধ্যে কোথাও পার্থক্য ঘটিতে পায় নাই। চাকরির সংকীর্ণ ক্ষেত্রের বাহিরে সর্বত্র শর্মিলারই একাধিপত্য। সেখানে শর্মিলার বিধি-বিধান দ্বারা শশাঙ্কের জীবন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হইত। শশাঙ্কের ব্যক্তিত্বের তাই কোন বিকাশ ঘটিতে পায় নাই। শশাঙ্ক মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিয়াছে, কিন্তু অভ্যস্ত জীবনকে আবার মানিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। এমনি করিয়া তাহার দিন কাটিতেছিল।

ইতিমধ্যে শশাঙ্ককে চাকরি ছাড়িয়া কন্‌ট্রাক্‌টরের ব্যবসা সুরু করিতে হইল। ব্যবসায়ের বিরাট অনিয়ন্ত্রিত কর্মক্ষেত্রের মাঝখানে আসিয়া পড়িতে এতদিন পরে স্বামীর উপর শর্মিলার প্রভাব শিথিল হইয়া পড়িল। স্বামীর ব্যবসায়িক জীবন এবং শর্মিলার সংসার-জীবন দুটি ভিন্ন ধারায় আবর্তিত হইতে লাগিল। স্বামীর ব্যবসায়িক জীবনের উপর শর্মিলার বিধি-বিধান অনুরোধ-উপরোধ আর খাটিবার সুযোগ লাভ করিল না। সংসার-জীবন নারীর—কর্ম-জীবন পুরুষের, উভয়ের সার্থকতার ক্ষেত্র তাই ভিন্ন—পরিশেষে এইরূপ চিন্তা করিয়া শর্মিলা আপন ভাগ্যকে কতকটা সহনীয় করিয়া লইল মাত্র। বহির্জীবনে স্বামীর কর্মের সঙ্গিনী হইবার ক্ষমতা যে নারীর আছে, শর্মিলা সে শ্রেণীর নারী নয়। শর্মিলা সে শিক্ষা পায় নাই, সে নারীর সহিত শর্মিলার পরিচয়ও হয় নাই। বস্তুতঃ পুরুষ ও নারীর কর্মের ভেদকে শর্মিলা

স্ব-ধর্মের ভেদ বলিয়া জানে। ইহাকে লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা পুরুষ ও নারীর দিক হইতে অধর্ম।

এই ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া ঔপন্যাসিক শশাঙ্কের মধ্যে সেই ব্যক্তিত্বটিকে ফুটিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার যে ব্যক্তিত্ব ইতিপূর্বে শর্মিলার অতি লালনে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

বহির্জীবনে শশাঙ্ক আপনার কর্ম-ক্ষমতা, সৃষ্টি-ক্ষমতার বিরাট প্রসার বোধ করিয়া, মুক্তির আনন্দে সহস্র কর্মের মধ্যে ডুবিয়া গেল। কাজ, কাজ, আর কাজ, কাজ না হইলে আজকাল শশাঙ্কের একটি মুহূর্তও চলে না। অন্যদিকে গৃহের সহিত, শর্মিলার সহিত, তাহার মনের যোগ দিনের পর দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। শর্মিলা আজকাল স্বামীর যতটুকু সেবা করিতে পায়, তার অনেকখানি অগোচরে। আজকাল শশাঙ্কের উপর তাহার এতটুকুও জোর খাটে না। আজকাল শশাঙ্ক কাজের অজুহাত তুলিয়া তাহার স্নেহ, মান, অভিমান, কাতর অনুনয়, অশ্রুপাত সমস্ত কিছুই উপেক্ষা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না। শর্মিলা ইহাকে ভাগ্য বলিয়া মানিয়া লওয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখিতে পায় না। আর এই ভাবিয়া সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করে যে "এই কাজের প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারা পুরুষ মানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করে, এ তার আপন শক্তির কাছে আপনাকে নিবেদন।"

শর্মিলা শশাঙ্ক-সম্পর্কে যাহাই চিন্তা করুক এবং চিন্তা করিয়া যেমন ভাবে সান্ত্বনা লাভ করিবার চেষ্টা করুক না কেন, তাহার এই গৃহ ও সংসার-জীবনকে অস্বীকার করিবার, শর্মিলার স্নেহ-যত্ন, কাতর অনুরোধ, অনুনয়-বিনয়, স্ত্রীর স্বামীর উপর সকল প্রকার দাবীকে উপেক্ষা করিবার এই চেষ্টার যে একটি গূঢ় কারণ আছে, তাহা আমাদের বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন।

প্রকৃতি ভিন্নতার জন্য হোক, অথবা অন্য যে কারণের জন্য হোক রবীন্দ্রনাথ অবশ্য প্রকৃতি ভেদের কথাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, শশাঙ্কের অন্তরে সেই প্রেম জাগ্রত হয় নাই, যে প্রেম গৃহ ও বাহিরের মধ্যে সার্থক সামঞ্জস্য-সাধন করিতে পারে। প্রেমের সেই অখণ্ড অনুভূতি উভয় জগৎকে আশ্রয় করিয়া সমানভাবে সৃষ্টি করিতে চায়। কিংবা বলা যায়, প্রেমের সেই আনন্দাস্বাদ গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া বাহিরে নানা কর্মের ধারায় নানা স্রোতে প্রবাহিত হইতে চায়।

শর্মিলার প্রতি শশাঙ্কের সে প্রেম ছিল না। তাহার হৃদয় শূন্য ছিল বলিয়া, সে অমন বিচিত্র কর্ম আশ্রয় করিয়া ঐশ্বর্যের পর ঐশ্বর্য স্তূপীকৃত করিয়া এই শূন্যতা পূর্ণ করিয়া তুলিতে চাহিত। শর্মিলা রোগগ্রস্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেও, সে এই চেষ্টায় ক্ষান্ত হয় নাই। শর্মিলাও তাহাকে

তাহার পরিচর্যার ভার হইতে গৃহের সহস্র তুচ্ছ কর্ম হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছে। তাহাকে লইয়া তাহার স্বামীর ভাবনার কারণ সে বুঝিতে পারে। "শর্মিলা জানে শশাঙ্কের এই ভাবনা কৃপণের ভাবনা নয়, নিজের অবস্থায় নিম্নতল হতে জয়স্তম্ভ ঊর্ধ্বে গেঁথে তোলবার জন্যে পুরুষাকারের ভাবনা।" কিন্তু শর্মিলা বোঝে নাই যে, শশাঙ্কের সেই জয়স্তম্ভ তাহার প্রেমের আনন্দ-রূপের বহিঃ প্রকাশ নয়। তাহার ভিত্তি তাই সুদৃঢ় নয়। এই জাতীয় কর্ম পুরুষকে মুক্তি দেয় না, তাহাকে বাঁধে। পুরুষের এই কর্ম কেবল অহংকারের, আত্মাদরের, বিভেদের। তাহার অতবড় জয়স্তম্ভ যে চোরাবালির ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়, যখন ঊর্মিলার সহিত মাত্র কয়েক-দিনের পরিচয়ে তাহার চূড়াশুদ্ধ ওই চোরাবালির অতলে তলাইয়া গিয়াছে, বাহির হইতে তাহার চিহ্নমাত্রও আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

স্বামীকে মুক্তি দিয়া শর্মিলা আপনার সেবা ও গৃহকর্মের ভার লইবার জন্য ছোট বোন ঊর্মিলাকে ডাকাইয়া আনিল। এই প্রসঙ্গে ঊর্মিলার পূর্ব পরিচয় সামান্য প্রয়োজন।

ঊর্মিলা প্রাণ-প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ, সকল কাজে সমস্ত কিছুতেই তাহার ঔৎসুক্য সমান। মানুষের অন্তরকে কী করিয়া ভরাইয়া তুলিতে হয়, কেমন করিয়া মানুষকে সঙ্গ দিতে হয়, ঊর্মিলা তাহা ভাল করিয়াই জানে। শুধু গৃহের মধ্যে নয়, গৃহের বাহিরেও সে পুরুষের সঙ্গিনী হইতে ভালোবাসে, আর সঙ্গ দান করিতেও পারে। তাহার বাবা রাজারামবাবু সম্পূর্ণ একালের মানুষ না হইলেও, সম্পূর্ণ সেকালেরও মানুষ ছিলেন না। তাঁহার জীবনে সেকালের ধনীকের আভিজাত্যের সঙ্গে একালের সংস্কারমুক্তির মিলন ঘটিয়াছিল। ইচ্ছা থাকিলেও, তিনি ঊর্মিলার বিবাহ জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমন্তের জন্য যথা সময়ে দিতে পারেন নাই। ঊর্মিলা তাহার দাদা হেমন্তের নিকট হইতে তাহার প্রাণের এই ঐশ্বর্য, মনের এই মুক্তি লাভ করিয়াছিল। পুত্র হেমন্তের অনুরোধে রাজারামবাবু ঊর্মিলার যথোচিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। হেমন্তের মতে মেয়েদের বিবাহের পূর্বে শরীর ও মনের সম্পূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন। ইতিমধ্যে হেমন্তের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, তাহাও একজন ইংরেজ ডাক্তারের নিদারুণ ভ্রান্তির ফলে। হেমন্তের অকাল-বিয়োগে রাজারামবাবুর হৃদয় শূন্য হইয়া গেল। পুত্রের বেদনাবিকৃত অসহায় মুখ রাজারামবাবুর হৃদয়কে মুহূর্তে মুহূর্তে দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি তাই একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মানস করেন, এবং স্থির করেন ঊর্মিলা লেখাপড়া শিখিয়া বিলাত হইতে ডাক্তারি পাশ করিয়া আসিয়া হাসপাতালের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। ঊর্মিলা ইহাতে সাগ্রহে সম্মতি জানায় এবং পিতার ইচ্ছানুযায়ী আপনাকে গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হয়।

নীরদ নামে একজন নূতন পাশ-করা ডাক্তার এক ইংরেজ ডাক্তারের সহকারী হিসাবে রোগশয্যায় হেমন্তের পরিচর্যা করে। ইংরেজ ডাক্তারের মতের বিরুদ্ধে নীরদ বারবার জোরের সহিত আপন মত প্রকাশ করে এবং পরিশেষে তাহাই সত্য হয়। ইহাতে নীরদের উপর রাজারামবাবু এবং ঊর্মিলার শ্রদ্ধা অসম্ভব রকম বাড়িয়া যায়। উভয়েই তাহাকে আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারী বলিয়া বোধ করেন। শ্রদ্ধা ক্রমে স্নেহে পরিণত হয়। রাজারামবাবু শেষে ঊর্মিলার সহিত নীরদের বিবাহ স্থির করেন। এই প্রস্তাবে ঊর্মিলার মন অনুকূলই ছিল। স্থির হয়, নীরদ এখানকার গবেষণা শেষ করিয়া বিলাত হইতে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ঊর্মিলার সহিত পরিণয়বন্ধ হইয়া দুজনে এক প্রাণ-মন হইয়া তাঁহার হাসপাতালের ভার গ্রহণ করিবে। নীরদও তাহার ভাবী পত্নীকে আপনার মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। ইতিমধ্যে রাজারামবাবু ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

নীরদের মধ্যে আর যে গুন থাক, প্রাণের ঐশ্বর্যের লেশমাত্র ছিল না। লোককে সঙ্গ দিতে, লোকের সহিত মেলামেশা করিতে, জীবনের আনন্দকে সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে সে জানে না। তাহার কাছে কর্তব্য ছাড়া জীবনে আনন্দ বলিয়া কিছু নাই। এই ঐশ্বর্য ও আনন্দ পরিপূর্ণ বিরাট বিশ্ব তাহার নিকট কেবল শ্রীহীন, কর্তব্য কঠোর ও বিধি-নিষেধ পরিপূর্ণ এক বৃহৎ স্কুলঘর মাত্র। ঊর্মিলার প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

শোকে বিহবল হইয়া ঊর্মিলা কর্তব্যের যে গুরুভার বহনের সংকল্প করিয়াছিল, প্রাণ-স্পর্শে তাহার অন্তর আবার পরিপূর্ণ ও সজীব হইয়া উঠিতে, তাহা তাহার নিকট কিছুদিনের মধ্যে একান্ত ভারস্বরূপ হইয়া উঠিল। এখন অন্তর হইতে সে কোন প্রেরণা পায় না, এখন একমাত্র নীরদের ইচ্ছা তাহাকে বাহির হইতে চালনা করে। সে নীরদকে যতই বুঝিতে পারে না, তাহার প্রকৃতি তাহার নিকট যতই বিরুদ্ধ, বিপ্রকৃতিক বলিয়া বোধ হইয়াছে, ততই সে তাহাকে সাধারণ মানুষের স্তর হইতে ঊর্ধ্বে তুলিয়া প্রাণপনে শ্রদ্ধা করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার ইচ্ছানুযায়ী আপনাকে গড়িয়া তুলিবার, চালিত করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও তাহার প্রাণ-মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিয়া কখন অলক্ষ্যে তাহাকে তাহার তালিকাবদ্ধ নীরস জীবনধারার বাহিরে টানিয়া লইয়া যায়। আবার ঊর্মিলা আপনার মনকে শাসনে সংযত করিয়া গ্লানি লইয়া ফিরিয়া আসে, আপনাকে আপনি নির্মমভাবে পীড়ন করে।

অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষত ঊর্মিলার পক্ষে এ সাধনা—তাহার প্রাণের বিরুদ্ধে, —প্রকৃতির বিরুদ্ধে সাধনা। ইহা তাহার পক্ষে এক প্রকার আত্মহত্যা। নীরদের বিলাত যাত্রার পূর্বেই ঊর্মিলার মন যে কতদূর শূন্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা

তাহার এই নির্জন আত্ম-জিজ্ঞাসা হইতে কতকটা বুঝিতে পারা যায়। "সত্যই কি জীবনটা এত অবিচালিত কঠিন। আর, সে কি এত কৃপন। সে না দেবে ছুটি, না দেবে রস।"

অন্তরের যে আনন্দ আস্বাদে নারী বাহিরের কঠোর কর্ম, দুঃসহ দুঃখ-ভারকেও স্বীকার করিয়া লয়, ঊর্মিলার অন্তরে সে আস্বাদ ছিল না। নীরদ ভালবাসিতে জানে না, আত্ম প্রকাশ করিতে জানে না। তাহার হৃদয় বন্ধ্যা। ঈশ্বরের সে দান হইতে সে বঞ্চিত। কতবার বেদনায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে, সমর্পণের সে বেদনা, কতবার উন্মুখ হইয়া সে নীরদের মুখ হইতে সেই আহ্বান-বাণী শুনিবার জন্য ঊর্ধ্ব মুখ হইয়া তাকাইয়াছে, কিন্তু বৃথা। নারী যে বোধ করিতে চায়, সে যে পারে তাহার প্রাণ-মন দিয়া একজন পুরুষের অন্তরে আনন্দ সঞ্চার করিয়া দিতে, তাহার অন্তরে সৌন্দর্যের, কল্পনার, স্বপ্নের লোক সৃষ্টি করিতে, সে যে পুরুষের দুর্লভ কামনার ধন।

এই মানসিক অবস্থা লইয়া ঊর্মিলা যখন শশাঙ্কের গৃহে আসিয়া উঠিল, নীরদ তখন বিলাতে।

শশাঙ্কের গৃহে আসিয়া ঊর্মিলা এতদিন পরে একটু মুক্তি লাভ করিয়া বাঁচিল। ইহা কেবল কর্তব্যের নিগড়বন্ধ, কেবল দায়িত্বভার বহনের জীবন নয়, এখানে কর্মের সহিত আনন্দ মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এই পরিবেশে কিছুদিনের মধ্যেই ঊর্মিলা আপনার পূর্ব স্বভাব সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া পাইল। মাঝে মাঝে কর্তব্যের কথা মনে পড়িয়া, তাহার মন উদাস হইয়া যায়, মাঝে মাঝে নীরদের বারংবার সতর্কতার কথা মনে করিয়া ঊর্মিলা আপনাকে সংযত করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু আজকাল নীরদের উপদেশ তাহার উপর বিশেষ ক্রিয়া করে না, কর্তব্য ত্রুটির অনুশোচনাও তেমন আর তীব্র হইয়া তাহার মনে জাগে না। তাহার এই মনের অবস্থাটা তাহার দাদার মৃত্যুর পূর্বে ছিল। মাঝখানে নীরদ তাহার জীবনে এক ব্যতিক্রমমাত্র। আজ সেই মনটিকে ফিরিয়া লাভ করিলেও, অতীত আনন্দমুখর দিনগুলির কথা ফিরিয়া ফিরিয়া মনে পড়িলেও সেই সঙ্গে নীরদের কথা, তাহার কর্তব্যের কথা মনে পড়িয়া তাহার অন্তর ভরিয়া দীর্ঘ শ্বাস বাহির হইয়া আসে। সেই অতীত দিনের প্রজাপতির রঙ্গিন পাখনার মত লঘু দিনগুলি আর ফিরিয়া আসিবে না, এখানকার আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলিও আর কতদিনের। তাহার পর তাহার জীবন-ধারা কর্তব্য কঠোর শুষ্কতার মধ্যে হারাইয়া যাইবে।

ঊর্মিলা আসিতে শশাঙ্কের সংসার-কর্মে বিশেষ কিছু সুবিধা তো হইলই না, বরং গৃহের বিশৃঙ্খলা ও শর্মিলার কাজ আরও বাড়িয়া গেল। কিন্তু ঊর্মিলা দেখিল কাজ দিয়া সে গৃহের কোন অভাবই মিটাইতে পারে নাই সত্য,

কিন্তু কেবল তাহার অস্তিত্ব দিয়াই সে এই গৃহের অনেকখানি অভাব পূর্ণ করিয়াছে, সেই অভাব যে কী তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারে না। তাহার অস্তিত্ব যে শশাঙ্কের অন্তরে আনন্দ সঞ্চার করিতে পারে, এই তথ্যটাই তাহার নিকট সম্পূর্ণ নূতন। নীরদের নিকট তাহার এই গৌরব লাঞ্ছিত হইয়াছিল। শর্মিলাও লক্ষ্য করিতে পারে ঊর্মিলার উপস্থিতিতে আজকাল তাহার স্বামীর মন অমনিতেই অকারণে প্রসন্ন।

এতদিন পরে আপন স্বভাবের অনুকূল পরিবেশ পাইয়া, আপন স্বভাবের অনুকূল শশাঙ্কের মত পুরুষ পাইয়া ঊর্মিলার কর্তব্য, আদর্শ ইত্যাদি বড় বড় বোধ সব ভাসিয়া গেল। ঊর্মিলা ছোটখাট নানা উপদ্রবে, ছেলে-মানুষিতে শশাঙ্কের সহিত মাতিয়া উঠিল। শশাঙ্কের মধ্যেও এমনি একটি প্রতীক্ষা ছিল, এমনি একজন নারীর জন্য তাহার অন্তরও ভিতরে ভিতরে তৃষিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই পরস্পর পরস্পরের একান্ত নিকটে অত্যন্ত দ্রুত আসিয়া পড়িল।

কেবল গৃহকর্মে গৃহের মধ্যেই নয় ঊর্মিলা শশাঙ্কের কর্মক্ষেত্রের মধ্যেও শীঘ্রই স্থান করিয়া লইল। স্বামীর যে জীবনটা কেবল মাত্র গৃহের বিশ্রামের সুখসম্ভোগের, শর্মিলা কেবলমাত্র সেই জীবনের ভার গ্রহণ করিয়াছিল, স্বামীর কর্মের সঙ্গিনী সে হইতে পারে নাই। সে এই কর্মের বিভাগকে পুরুষ ও নারীর স্বধর্মের বিভাগ বলিয়া মানিয়া লইয়া নিশ্চিত হইয়াছিল।

শশাঙ্ক শর্মিলার মধ্যে যে সহকর্মিনীকে খুঁজিয়া পায় নাই, ঊর্মিলার মধ্যে এতদিন পরে সেই সহকর্মিনীকে খুঁজিয়া পাইল। ঊর্মিলা তাহার গৃহের শুধু আনন্দদায়িনী নয়, তাহার বহির্জীবনের সকল কর্মের সহচরীও। এমনি করিয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি যে অত্যন্ত দ্রুত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল—নারী হইয়া তাহা শর্মিলার দৃষ্টি এড়ায় নাই। শর্মিলা এতদিন পরে নারীহিসাবে আপনার সামর্থ ও অসামর্থ সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে, এতদিন পরে স্বামীর জীবনে এতকাল কীসের অভাব ছিল, তাহাও বুঝিতে সুরু করিয়াছে।

"মরবার আগে এই কথাটুকু বুঝে গেলুম। আর সবই করেছি, কেবল খুশি করতে পারিনি। ভেবেছিলুম, ঊর্মিলার মধ্যে নিজেকেই দেখতে পাব, কিন্তু ও তো আমি নয়, ও যে সম্পূর্ণ আর এক মেয়ে। আমার জায়গা ও নেয়নি, ওর জায়গা আমি নিতে পারব না। অমি চলে গেলে ক্ষতি হবে, কিন্তু ও চলে গেলে সব শূন্য হ'বে।"

প্রকৃতি-সাম্যের জন্য হোক, অথবা অন্য যে জন্যই হোক, আজ শশাঙ্কের হৃদয় যে ঊর্মিলার মাধুর্যে প্রেমে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন, তাহা শর্মিলা বুঝিতে

পারে। বুক ফাটিয়া গেলেও সে ইহার জন্য কাহাকেও দোষ দিতে পারে না—না তাহার স্বামীকে, না ঊর্মিলাকে।

যে ঘটনার আলোড়নে ঊর্মিলার হৃদয় পরিপূর্ণ মধুকোষের মত বেদনায় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহা দোল-পূর্ণিমার দোল উৎসব। আবির ও রঙ লইয়া শশাঙ্ক ও ঊর্মিলা দোল-পূর্ণিমার সমস্ত দিন উদ্দাম মাতামাতি করিয়া ফিরিয়াছে। ঊর্মিলার হৃদয়ে প্রাণের এই প্রথম অনুভূতিকে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"দিন গেছে। রাত্রি হয়েছে অনেক। পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখা জাল ছাড়িয়ে পূর্ণ চাঁদ উঠেছে অনাবৃত আকাশে। হঠাৎ ফাল্গুনের দমকা হাওয়ায় ঝর ঝর্ শব্দে দোলাদুলি করে উঠেছে বাগানের সমস্ত গাছপালা, তলাকার ছায়ায় জাল তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। জানালার কাছে ঊর্মি চুপ করে বসে। ঘুম আসছে না কিছুতেই। বুকের মধ্যে রক্তের দোলা শান্ত হয়নি। আমের বোলের গন্ধে মন উঠেছে ভরে। আজ বসন্তে মাধবীলতার মজ্জায় যে ফুল ফোটাবার বেদনা, সেই বেদনা যেন ঊর্মির সমস্ত দেহকে ভিতর থেকে উৎসুক করেছে।

রাত্রি তিনটের সময় ঘুম ভেঙেচে। চাঁদ তখন জানালার সামনে নেই। ঘরে অন্ধকার, বাহিরে আলোয় ছায়ায় জড়িত সুপারি গাছের বীথিকা। ঊর্মির বুক ফেটে কান্না এল, কিছুতেই থামতে চায় না। উপুড় হয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল।"

ঊর্মিলা তাহার পূর্বের নিয়মবন্ধ জীবনে পলাইয়া গিয়া আপনার হৃদয়কে সংযত করিতে চাহিল। তাহার এতদিনের ব্রত ও সাধনা, তাহাকে এমনি করিয়া সে ভাসাইয়া দিবে না। সেই সাধনার নিকট সে যে বাগদত্তা। নীরদের তপস্যার উত্তরসাধিকা সে। তাহার বাবার অন্তিম ইচ্ছা, তাহার দাদার পুণ্য স্মৃতি সে ভুলিবে কেমন করিয়া। এতদিন ধরিয়া সে কাজে যত অবহেলা করিয়াছে, তাহা আবার শুধরাইয়া লইবে। এই সংকল্প লইয়া ঊর্মিলা পরের দিনই তাহার গৃহে ফিরিয়া আসিল। শর্মিলা সকল বুঝিত, তাই ঊর্মিলার চলিয়া যাওয়াতে আপত্তি করিতে পারিল না।

ফিরিয়া আসিয়া ঊর্মিলা দেখিল, তাহার টেবিলের উপর নীরদের চিঠি আসিয়া পড়িয়া আছে। চিঠি পড়িয়া ঊর্মিলা চমৎকৃত হইয়া গেল। নীরদ একজন ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করিয়া কী এক গবেষণা কার্যে আপাততঃ সেই দেশেই থাকিবার সংকল্প করিয়াছে। ঊর্মিলার জীবনে নীরদ যে ইতিপূর্বে কতবড় বন্ধন কতবড় ভার হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাহার উল্লাসবোধের ভিতর

দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার হৃদয় হইতে একটা মস্তবড় পাষাণভার যেন নামিয়া গেল।

নীরদের মত পুরুষ ভালোবাসিতে পারে না। প্রেমই মুক্তি ও কর্মের বন্ধনের মধ্যে সেতু রচনা করিতে পারে, কর্তব্য ও আনন্দের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধন করে। নীরদের মত পুরুষ নীরস কর্তব্য সাধনের ক্ষেত্রে নারীকে বাছিয়া লয় কেবল কামনা চরিতার্থ করিতে। রাজারামবাবুর ব্যক্তিত্বের মাঝখানে ঊর্মিলার মত সুরুচিসম্পন্না নারীর সান্নিধ্যে এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কোন সুযোগ সে এদেশে পায় নাই। নীতি, আদর্শ ইত্যাদি বড় বড় কথা তাহার জীবনে যে কিছুমাত্র সত্য নয়, তাহা তাহার ওই পরিণাম হইতে বুঝিয়া লইতে পারা যায়।

ঊর্মিলা তাহার হৃদয়-বোধ সম্পর্কে সচেতন হইলেও, দীর্ঘকালের তৃষিত, তাপিত জীবনে ইহার পরিণামসম্পর্কে কোন চিন্তা করিতে চাহিল না। ভবিষ্যৎ চিন্তা কিছুমাত্র না করিয়া শশাঙ্কের আনন্দের টানে সে আপনাকে সম্পূর্ণ ভাসাইয়া দিল।

এদিকে নিজ কাজ-কর্মে ফাঁকি পড়িয়া শশাঙ্কের ব্যবসায়ের দুর্দশা চরমে উঠিয়াছে। শর্মিলা ব্যবসায়ের আশঙ্কাজনক অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া ঊর্মিলাকে সকল অবস্থা খুলিয়া বলিয়া সংযত করিতে চাহিল। ঊর্মিলাকে গৃহের মধ্যে আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে কী হইবে। ঊর্মিলাকে আপনার আয়ত্তের মধ্যে না পাইয়া শশাঙ্কের আর কোন উৎসাহ রহিল না। কাজে মন বসিবে বলিয়া শর্মিলা যে উপায় স্থির করিয়াছিল, এখন দেখিল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল ফলিয়াছে। শশাঙ্কের কাজে ইতিপূর্বে যতটুকু মন ছিল, তাহাও আর রহিল না। কেবল তাহাই নয়, ঊর্মিলাকে না পাইয়া শশাঙ্কের অবস্থা দিন দিন আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিতে লাগিল। শর্মিলা ভাবিল, "যদি ভালোবাসায় বাধা পায়, তা হলে সেই ধাক্কায় ওর কাজকর্ম সব যাবে নষ্ট হয়ে। ওর মন যখন তৃপ্ত হবে, তখনই আবার কাজকর্মে শৃঙ্খলা আপনি আসবে।"

বাধা দূর হইয়া যাইতে শশাঙ্ক ও ঊর্মিলার নিরুদ্ধ কামনা দুর্বার হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এমন উভয়ে উভয়ের গোপন কামনা সম্পর্কে সচেতন। সমস্ত কিছু জানিয়া শুনিয়াই উভয়ে দিনের পর দিন বাসনার গভীর হইতে গভীরতর লোকে ডুবিয়া গিয়াছে।

রোগশয্যায় শুইয়া শর্মিলা সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করিয়াছে, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে। শর্মিলার বাঁচিবার আশা নাই। শর্মিলা ভাবিয়াছে, তাহার স্বামী যদি ঊর্মিলাকে পাইয়া খুশি হয়, তবে মৃত্যুর পূর্বে ঊর্মিলারই

হস্তে তাহার স্বামীকে সমর্পন করিয়া দিয়া যাইবে। শর্মিলা তাহাই করিয়াছে। মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া শর্মিলা একদিন স্বামীকে ডাকাইয়া বলিল, "সে আমার বোন। তার মধ্যে আমাকেই পাবে, আরও অনেক বেশি পাবে, যা আমার মধ্যে পাওনি।"

কিন্তু শর্মিলা মরিল না, আকস্মিকভাবে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। এদিকে শশাঙ্ক ও ঊর্মিলার যে অবস্থা তাহাতে উভয়ের বিচ্ছিন্ন জীবনের কথাও চিন্তা করিতে পারা যায় না। সকল দিক চিন্তা করিয়া শর্মিলা ঊর্মিলার সহিত শশাঙ্কের বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিল। ইহাতে শশাঙ্কের অসম্মতি ছিল না। ঊর্মিলা তাহাদের উভয়ের উপর আপনার ভাবনা সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিয়াছিল। ইহার জটিল সমস্যা তাহার চিন্তাশক্তির সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল শশাঙ্কের লক্ষাধিক টাকার উপর ব্যবসা সম্পূর্ণ ডুবিয়া গিয়াছে। নেপালের রাজদরবারে একটা চাকরি পাইবার আশায় শাশঙ্ক শর্মিলা ও ঊমির্লাকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। শর্মিলা তাহারই আয়োজন করিতে ব্যস্ত। স্থির হইয়াছে, শশাঙ্ক সেখানে গিয়া ঊর্মিলাকে বিবাহ করিবে। সেখানকার সমাজে এ ব্যবস্থা বিধিবহির্ভূত নয়।

এমনি করিয়া সমস্যাকে সম্পূর্ণ এড়ান যাইতে পারা যাইবে না তাহা শর্ম্মিলাও বুঝে। শর্ম্মিলা তাই ভাবিয়াছে, "আমার ভাগ্যে যা ছিল, তা তো হল, কিন্তু দৈন্য অপমানের এই নিদারুণ শূন্যতা একদিন কি পরিতাপ আনবে না ওঁর মনে। যার মোহে অভিভূত হয়ে এটা ঘটতে পারল একদিন হয় তো তাকে মাপ করতে পারবেন না, তাঁর দেওয়া অন্ন ওঁর মুখে বিষ ঠেকবে। নিজের মাতলামির ফল দেখে লজ্জা পাবেন, কিন্তু দোষ দেবেন মদিরাকে। যদি অবশেষে ঊর্ম্মির সম্পত্তির উপর নির্ভর করা অবশ্য হয়ে ওঠে, তা হলে সেই আত্মাবমাননার ক্ষোভে ঊর্ম্মিলাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জ্বালিয়ে মারবেন।"

এই আত্মাবমাননাকে শশাঙ্কও মানিয়া লইতে পারেন না। যাত্রার দুই একদিন পূর্বে শশাঙ্ক স্থির করিল, নেপাল না গিয়া সে ঊর্মিলা ও শর্মিলাকে লইয়া সমাজের সকল প্রতিকূলতা উপেক্ষা করিয়া কলিকাতাতেই থাকিয়া তাহার ভাঙা ব্যবসা পুনরায় গড়িয়া তুলিবে। শশাঙ্ক কাপুরুষ নয়। মনস্থির করিতে ঊর্মিলা কিছুদিনের জন্য তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিল। সেখান হইতে তাহারা যখন ঊর্মিলার চিঠি পাইল, তখন ঊর্মিলা বোম্বের পথে। পত্রে জানিতে পারিল, ঊর্মিলা সুদীর্ঘ ছয় বৎসরের জন্য বিলাতে তাহার অসমাপ্ত শিক্ষা সমাপ্ত করিতে চলিয়াছে।

ঊর্মিলা জানিত ভাগ্যকে অমন করিয়া এড়ান যায় না, একের দুঃখের হাত এড়াইতে গিয়া, মানুষ গভীরতর দুঃখের মধ্যে জড়াইয়া পড়ে মাত্র। বিচ্ছেদ মানিয়া লইলে তাহার জীবনে দুঃখ অসীম হইয়া পড়িবে সত্য, কিন্তু কালে সে বেদনা সহনীয় হইয়া যাইবে। সহনীয় হইয়া গেলেও, ইহার খোঁচা জীবনভোর তাহার মনের মধ্যে উঠিতে বসিতে লাগিবে। কিন্তু দুঃখকে ঊর্মিলা ভয় করে না, ঊর্মিলা ভয় করে ভুল করিতে। শশাঙ্ককে বিবাহ করিয়া সে হয়ত এমন ভুলের মধ্যে জড়াইয়া পড়িবে, যাহাতে তিনজনের জীবনে শুধু অবমাননাই সার হইবে। লাঞ্ছিত সে জীবনে সান্ত্বনালাভের স্থানও থাকিবে না। আত্মার সকল গৌরববঞ্চিত সেই জীবন অপেক্ষা এই দুঃখ স্বীকারে, গৌরব অনেক বেশি।

মালঞ্চ

একদিন এই মর্তলোক ত্যাগ করিয়া, মর্তের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, মানুষকে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়া যাইতে হয়। ইহার জন্য মানুষের কান্নার অন্ত নাই। সৃষ্টির কোন আদিম প্রভাত হইতে এ কান্না সুরু হইয়া বহিয়া চলিয়াছে সৃষ্টির কোন পরম অবসানের দিকে।

মৃত্যুতেই কি জীবনের সব শেষ, না মৃত্যুর পরেও কিছু অবশেষ থাকে? সেই অবশেষের স্বরূপ কি? তাহার সহিত মর্ত-জীবনের কি কোন যোগ থাকে? যদি থাকে তবে তাহারই বা স্বরূপ কি? আর মৃত্যুতেই যদি জীবনের সব ফুরাইয়া যায়, তবে এই জীবনের অর্থ কি? ইহার সার্থকতা কোন্‌খানে? ইহা কি তবে শুধুমাত্র নিরর্থকতা, অলীক স্বপ্ন বা মায়া? তবে এই হৃদয়ে কেন এত প্রেম, এত প্রীতি, প্রেমে এমন ব্যাকুলতা এমন আত্মত্যাগ কেন?

এমনি সহস্র জিজ্ঞাসার কত সহস্র উত্তর আবার মানুষই দিয়াছে। কারণ, এই উত্তর না হইলে, তাহার যে এক মুহূর্ত চলে না। এই উত্তর না হইলে মর্তের সকল আলো তাহার নিকট মুহূর্তে কালো হইয়া উঠে। একটা না একটা উত্তর লাভ করিয়া মানুষকে সান্ত্বনা লাভ করিতে হয়। কোন একটা উত্তর দিয়া অন্তরের এই মহারন্ধ্রের মুখ বন্ধ না করিলে, সমগ্র জীবনটা ওই রন্ধ্রপথ দিয়া মুহূর্তে কোন সীমাহীন শূন্যের মধ্যে তলাইয়া যাইবে।

কিন্তু এই সমস্ত উত্তর লাভ করিয়াও মানুষের সংশয় ঘুচে নাই, তাই আজও পর্যন্ত তাহার কান্নার অবসান ঘটিল না। জীবনের এই মহা জিজ্ঞাসা উত্তর সন্ধানে আজও মানুষ সমানভাবে ব্যাপৃত, আজও মানুষ নিত্য নূতন উত্তর লাভ করিতেছে। মহাকালের সেই মহাগ্রন্থের এক একটি পৃষ্ঠা মানব শিশু অনন্ত কাল ধরিয়া উল্টাইয়া গেলেও তাহার পাঠ সমাপ্ত হইবে না।

নিরজার দুঃখ তেমনি মানব সাধারণ, নিরজার ভাগ্য চিরন্তন মানব ভাগ্য। শোক এক—তবে, মানুষে মানুষে তাহার প্রকাশে পার্থক্য আছে। ইহার সহিত ব্যক্তিগত নানা সমস্যাজড়িত হইয়া ইহাকে এক একটি অনন্য সাধারণ রূপ দান করে।

নিরজার স্বামীপ্রেম, তাহার স্বপ্ন, সৌন্দর্য, কল্পনা, মাধুর্য, সেবা ও ত্যাগ সমস্ত কিছু অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার মালঞ্চ আশ্রয় করিয়া। সে প্রেম গৃহ ছাড়িয়া সমাজে যতটুকু অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাও ওই মালঞ্চের ভিতর দিয়া। মালঞ্চ ছিল তাহার সমগ্র অন্তর্জীবনের বহিঃ প্রকাশ। স্বামীর নিকট হইতে সে যাহা কিছু পাইয়াছে, তাহাও ওই মালঞ্চের ভিতর দিয়া। সে এবং

তাহার মালঞ্চ এমনি করিয়া তাহার বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া এক হইয়া গিয়াছে। তাহাদের উভয়ের প্রেমধারায় মালঞ্চের প্রতি ধূলিকনা অভিষিক্ত, তাহাদের ভালোবাসার রঙ্গে মালঞ্চের প্রত্যেকটি কুসুম রঞ্জিত।

একের পর এক ঋতু আসিয়াছে, কত শরৎ, কত বসন্ত, তাহাদের সৌরভের, বর্ণের, মাধুর্যের কত দান কত ভার ওই মালঞ্চের থালায় পরিপূর্ণ করিয়া সাজাইয়া তাহাদের অর্ঘ দিয়াছে। এমনি করিয়া বৎসর আসিয়াছে, বৎসর গিয়াছে। একটি একটি করিয়া দশটি বৎসর গিয়াছে। সে ছিল স্বামীর সহ-ধর্মিনী, স্বামীর গৃহলক্ষ্মী, তাহার সচিব। নারীর বিচিত্র প্রকাশ ও পরিচয়ের সহিত মিলাইয়া তাহার স্বামীর কত না প্রিয় সম্বোধন। পরিতৃপ্তিতে তাহার দুই চক্ষু মুদিয়া আসিত। এই বোধে তাহার ইহকাল, পরকাল, জন্ম-মৃত্যু একাকার হইয়া যাইত।

আজ তাহার স্বামী, তাহার সেই মালঞ্চ, মালঞ্চের পরিচিত প্রত্যেকটি বৃক্ষ, লতা, বৃক্ষের প্রত্যেকটি কুসুম, এই পরিজনবর্গ, তাহাদের এত প্রেম, প্রীতি, এই অপরূপ, দুর্লভ মর্তভূমি, তাহার এক প্রভাত হইতে অন্য প্রভাত পর্যন্ত সৌন্দর্যের একের পর এক পট পরিবর্তন, এই সব, এই সমস্ত কিছু ত্যাগ করিয়া বড় অকালে তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। নিরজার শোকের কী পার আছে। এমন পরিপূর্ণ পাওয়া মৃত্যুতে এমন শূন্য হইয়া যায়? মৃত্যুর পর তাহার কোন অবশেষ কোন রূপে কোন একটা উপায়ে এখানে কিছুমাত্র থাকিবে না? তাহার জন্য এ জগতে কোথাও এতটুকু একটা শূন্যতা বিরাজ করিবে না;—মৃত্যুর পর যে শূন্যতা পূর্ণ করিয়া নিত্য দিন অতি করুণ একটি সুর ধ্বনিত হইয়া চলিবে। এই মর্তের সমস্ত কিছুই সেদিনও সত্য হইয়া থাকিবে আর মৃত্যুতে সেই শুধু মিথ্যা হইয়া যাইবে? তাহার কোন কর্ম, কোন গতি বন্ধ হইবে না, কেবল তাহারই বক্ষস্পন্দন চিরকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া যাইবে। সব চলিবে, সব থাকিবে, কেবল সেই শুধু চলিবে না, থাকিবে না। নিরজার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া এমনি কত-না জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে। নিরজার এ শোকে কান্নাও জাগে না; সমগ্র সত্তা মুহূর্তে বিশুষ্ক হইয়া উঠে।

নিরজা রমেনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "কোনোখানে কি এতটুকু ফাঁক থাকবে না, যেখানে আমার জন্যে একটা বিরহের দীপ টিম্‌টিম্‌ করেও জ্বলবে।"

নিরজা তাহার স্বামীকে বলিয়াছে, "ওই যে দারোয়ানটা ওইখানে বসে তামাক কুটছে, ও থাকবে দেউড়িতে, কিছুদিন পরেই আমি থাকব না। ওই যে গোরুর গাড়িটা পাথুরে কয়লা আজাড় করে দিয়ে খালি ফিরে যাচ্ছে, ওর

যাতায়াত চলবে রোজ রোজ, কিন্তু চলবেনা আমার এই হৃদয়-যন্ত্রটা। * * * সন্ধ্যেবেলায় অমনি করেই অস্পষ্ট আলোয় কাকেরা ফিরবে বাসায়, এমনি করেই দুলবে সুপারিগাছের ডাল ঠিক আমারই চোখের সামনে। সেদিন তুমি মনে রেখো আমি আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় আমি আছি। মনে করো বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াচ্ছে আমার আঙুলের ছোঁয়া আছে তাতে। *** আমি থাকব, আমি এইখানেই থাকব, আমি তোমারই কাছে থাকব, একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। *** তোমার বাগানের গাছ-পালা সমস্ত আমি দেখব, যেমন আগে দেখতুম, তার চেয়ে অনেক ভালো করে দেখব। এতদিন তুমি আমাকে যেমন আদরে স্থান দিয়েছ তোমার ঘরে সেদিনও তেমনই করেই স্থান দিয়ো। ঋতুতে ঋতুতে তোমার যে সব ফুল ফুটবে, তেমনই করেই মনে মনে তুলে দিয়ো আমার হাতে।"

মানবপ্রেম এমনি করিয়া মৃত্যুকে জয় করিয়া উঠিতে চায়। এই বিচ্ছেদ সত্য নয়, একমাত্রও নয়। মৃত্যুর পর মানুষ আর একটি জগৎ আর একটি জীবন লাভ করে। মানবিক এই বোধ একান্তরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায় না, বিলুপ্ত হইয়া যায় না জীব-জীবনের সকল লীলা। মৃত্যুর পর মানুষ এই জীবনকে আরও সত্য করিয়া লাভ করে। পরলোক অস্তিত্বের কোন প্রমান থাকুক কিংবা না-থাকুক, সে বিচার নিষ্প্রয়োজন, মানুষ যে তাহার প্রাণের গরজে উহা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। মৃত্যুতে যে প্রিয়জনকে চিরকালের জন্য হারাইয়াছি, সে একেবারে নাই, কোন রূপে নাই, ইহা অপেক্ষা সে আর কোন লোকে, আর কোন স্বরূপে আছে, এই কল্পনায় মানুষের অধিক সান্ত্বনা। মৃত্যুতে যে প্রিয়জনদের চিরকালের জন্য ছাড়িয়া যাইব, তাহাদের অন্য কোন লোক হইতে নিত্যকাল দেখিতে পাইব, তাহাদের সহিত আমার স্নেহবন্ধন অটুট থাকিবে, ইহাতে অধিক সান্ত্বনা। নিরজার এই প্রেম কত সত্য কত গভীর! সত্য বলিয়া সে আদিত্যকে বলিতে পারিয়াছে, "জনমে মরণে তোমার পা দুখানি নিঃসন্দেহে রইল আমার কাছে বাঁধা।"

মানুষের প্রেম এমনি করিয়া নিত্য লীলার কল্পনা করে, এমনি করিয়া মৃত্যুকে জয় করিয়া উঠিতে চায়। সকল মানুষের ন্যায় নিরজাও তাহার প্রেমে জীবনের এই শাশ্বত নিয়তিকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে।

কিন্তু নিরজার এই চেষ্টা সার্থক হয় নাই, তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সান্ত্বনাশূন্য হাহাকারের মধ্যে নিরজার জীবন-দীপ ফুৎকারে নিভিয়া গিয়াছে। সে তাহার আসক্তির পাত্রকে প্রাণপণ বলে জড়াইয়া ধরিয়া অসহায়ভাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। একমাত্র মৃত্যুতে সে বাহুবন্ধন শিথিল হইয়াছে।

সৌন্দর্য-ধ্যানের মধ্যে ডুবিয়া চিরমিলনের স্বপ্ন লইয়া, নিরজা যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিত, পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে বিশ্ব জগৎ হইতে শেষ দৃষ্টি ফিরিয়া লইতে পারিত, তাহাতে কোন সংশয় নাই, যদি নিরজা স্বামী-প্রেমের সেই আশ্বাস লাভ করিত।

মৃত্যুপথ যাত্রী তাহার প্রিয়জনের দৃষ্টিতে সেই আশ্বাস প্রত্যক্ষ করিতে চায়, সেই কথাটি শুনিতে চায়, আমরা মানি, তুমি এতদিন ধরিয়া এতরূপে যাহা দিয়াছ, তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত আমরা স্বীকার করি। তোমার মৃত্যুতে আমাদের সেই শ্রদ্ধা অফুরান হইয়া থাকিবে। মানব-প্রেমের এই প্রতিশ্রুতিতে মৃত্যু অপ্রমাণ হইয়া যায়। মৃত্যুশয্যায় আদিত্যের নিকট হইতে নিরজা কি সেই প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছে? তাই তাহার শেষ পরিণাম অমন নিষ্করুণ, বিকৃত, ভয়াবহ, মনুষ্যত্বের অবমাননাকর।

নিরজা আদিত্যকে সে কথা বলিয়াছে,

"বলো, বলো, আমি তোমার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হব না, তাহলে সবাইকে আমার ভালোবাসা দিয়ে যেতে পারব।"

নিরজার একথা যে সত্য, ইহা যে তাহার মর্মের কথা তাহাতে সংশয় নাই। প্রেমবঞ্চিত না হইলে, নিরজা হাসিমুখে ইহ-সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিত, যাওয়ার পূর্বে আপনার সমস্ত কিছু নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিত না। হৃদয় আড়াল দিয়া সে শুধু আপনার প্রেম-প্রদীপখানি মর্ত্যলোক হইতে বহন করিয়া লইয়া যাইত মাত্র। সেই অপার্থিব অন্ধকারলোক যাত্রায় একমাত্র এই প্রদীপটুকুই আলোক ফেলিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। নিরজার অন্তরে সে আলোক ছিল না। তাহার যাত্রাপথ এত অন্ধকারময়। সেই অন্ধকারলোকের মাঝখানে নিরজা অসহায় আর্তনাদ তুলিয়া পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

রমেন নিরজার, কেবল নিরজার কেন, মানব প্রেমের এই স্বরূপ বুঝিত না। অনেক বড় কথা, অনেক তত্ত্ব কথা, সে নিরজাকে শুনাইয়াছে বটে, কিন্তু ওই সমস্ত তত্ত্ব তাহার নিজের জীবনে উপলব্ধি সত্য নয়।

রমেন ও নিরজার সেই কথোপকথনটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। রমেন নিরজার বেদনার যথার্থ স্বরূপ তো উপলব্ধি করিতে পারে নাই, বরং তাহার বেদনাকে অসম্মানই করিয়াছে কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য তত্ত্বকথা শুনাইয়া।

"যদি ডাক্তারের কথা সত্যি হয়, যদি যাবার দিন এসে থাকে, তা হলে যাকে বড়ো করে পেয়েছ, তাকে বড় করে ছেড়ে যাও। এতদিন যে গৌরবে কাটিয়েছ, সে গৌরবকে খাটো করে দিয়ে যাবে কেন!"

নিরজা। "যখন চোখের জলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেসে যায় তখন ওই পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু ওঁর বাণী তো হৃদয়ে পৌঁছয় না।'

"রমেন। যতক্ষণ মনে করবে তোমার ধন কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ বুকের পাঁজর জ্বলবে আগুনে। পাবে না শান্তি। কিন্তু স্থির হয়ে বসে বলো দেখি একবার,—'দিলেম আমি। সকলের চেয়ে যা দুর্মূল্য তাই দিলেম তাঁকে, যাঁকে সকলের চেয়ে ভালোবাসি'—সব ভার যাবে একমুহূর্তে নেমে। মন ভরে উঠবে আনন্দে।"

রমেন যে তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া নিরজাকে শোকে সান্ত্বনা দিতে চাহিয়াছে, সে তত্ত্বটি এই। জীবনের অবসানকে যখন অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তখন আসক্তি না রাখিয়া সব কিছু ত্যাগ করিয়া যাওয়াই ভাল। প্রকৃতি একদিন যাহা জোর করিয়া ছিনাইয়া লইবে, তাহাকে তাহার সে দান পূর্বেই ফিরাইয়া দেওয়া ভাল। তাহাতে মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটে না। এই দৃষ্টি এবং অধ্যাত্ম দৃষ্টি এক নয়। অধ্যাত্মতত্ত্বে জীবনের একটি শাশ্বত মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা আছে। রমেনের এই তত্ত্বে জীবনের শাশ্বত কোন মূল্যবোধ নাই। মৃত্যুতে মানুষের নিঃশেষ বিলুপ্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়াই, সে এমন একটি তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে।

নিরজার জীবনে প্রাপ্তির সীমা নাই, তাহা সত্য, নিরজা গৌরবে সর্বস্ব ত্যাগও করিতে পারে সত্য, যদি নিরজার জীবনে সে ফল লাভ থাকে, যাহা প্রাপ্তির আনন্দ ও হারানোর বেদনার অতীত। জীবনের নিবিড় সুখ ও গভীর দুঃখ ভোগের ভিতর দিয়া সে সত্য ফলবান হইয়া উঠে।

সে অধ্যাত্ম দৃষ্টি রমেনের ছিল না। রমেনের এই তত্ত্ব দৃষ্টিতে মানুষ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে না, নিরজাও পারে নাই।

নিরজা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে নাই—তাহার অন্য কারণও আছে। তাহার স্বধর্ম এবং তদাশ্রয়ী সাধন ফল লাভ যে কী তাহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

জীবনের গভীরতর কোন সত্যোপলব্ধি রমেনের ছিল না, তাহা তাহার এই জাতীয় সান্ত্বনা দানের প্রয়াস হইতে বুঝিতে পারা যায়। কেবল তাহাই নহে, নিরজার জীবনে এই ত্যাগকে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য সে; যে জাতীয় চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাতে তাহার হৃদয়হীনতারই পরিচয় লাভ করা যায়। আমি রমেনের সেই চেষ্টার কথাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে চাহিয়াছি, যে চেষ্টায় সে আদিত্য ও সরলার প্রেমকে ন্যায় ও ধর্মসঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইয়া এবং

নিরজার নিকট ইহাকে নিঃসংশয় দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া নিরজার হাত দিয়া সরলাকে আদিত্যের হস্তে সমর্পণ করিতে চাহিয়াছে।

রমেনের ওই যে উক্তি "যা নিজে ভোগ করতে পারবে না, তাও প্রসন্ন মনে দান করতে পার না—যাকে এতদিন এত দিয়েছ।"

অর্থাৎ আজ নিরজা যখন স্বামীর সকল কর্মের অংশ গ্রহণ করিতে অসমর্থ, সেখানে আর একজন নারী যদি সেই স্থান অধিকার করে, তবে তাহাকে নিরজা প্রসন্ন মনে স্বীকার করিয়া লইবে না কেন? মনুষ্যত্বের কোন বোধ হইতে রমেন একজন মৃত্যুপথযাত্রিনীর নিকট এই অভিযোগ করিতে পারে, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

নিরজা ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু কোন বোধ আশ্রয় করিয়া তাহা ইতি-পূর্বে নিরজার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া উল্লেখ করিয়াছি। বৈরাগ্যের সাধনা নিরজার সাধনা নয়, তাই পরমহংসদেবের বাণী তাহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। তাহার সাধনা, প্রকৃতি বলিব না—প্রেমের সাধনা। তাহার সেই প্রেমের আলোক শিখাটুকুকে আদিত্য রমেন সরলা সকলে মিলিয়া ফুৎকারে নিভাইয়া দিয়াছে। তাই সে অমন হাহাকার করিয়া ফিরিয়াছে, অমন মাথা কুটিয়া মরিয়াছে।

রমেন পরে আদিত্যকে বলিয়াছে, "বৌদিদি যা জানবার তা তিনি আপনিই জেনেছেন। আর কটা দিন পরেই তো এই পরম দুঃখের জটা আপনিই এলিয়ে যাবে।"

সরলা ও আদিত্যের প্রেম-সম্পর্কের কথা নিরজা সন্দেহ করিয়াছিল মাত্র, তাহার এই সন্দেহ খুবই স্বাভাবিক ; কিন্তু ইহা গোপন রাখিতে আদিত্য রমেন এমনকি সরলাও কোন চেষ্টা করে নাই। নিরজার নিকট মিথ্যার আড়াল দিয়া ইহা গোপন রাখিলে কাহারও কোন ক্ষতি হইত না। তাহারা কেহই সে চেষ্টা তো করে নাই, বরং তাহার সম্মুখে সমস্ত সম্পর্ক উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে।

আদিত্য ও সরলার একটু পূর্ব পরিচয় আছে। তাহা এই, আদিত্য সরলার জ্যাঠামশায়ের গৃহে দীর্ঘকাল থাকিয়া অধ্যয়ন করিবার সুযোগ লাভ করে। শৈশবে সরলার বাপ-মা মারা যায়। তবে তাহার এই স্নেহের অভাব তাহার জ্যাঠামশায় পূর্ণ করিয়া দেন। জ্যাঠামশায়ের ফুলের বাগানের শখ ছিল। ইহার জন্য তিনি যে-কোন শ্রম এবং যে-কোন পরিমান অর্থ ব্যয় করিতে কার্পণ্য করিতেন না। তাঁহার এই বাগানের কাজে তিনি এই দুইজন কিশোর-কিশোরীর সহায়তাও লাভ করিতেন। তিনি ফুলের চাষ যেমন বুঝিতেন, ব্যবসা তেমন বুঝিতেন না। ফুলের বাগান করিতে গিয়া তাই তিনি শীঘ্রই প্রভূত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। যাহারা তাঁহার নিকট হইতে ঋণ লইয়াছিল, এই বিপদের দিনে

তাহারা কেহই সে ঋণ পরিশোধ করিল না। ঋণের দায়ে তাহার সাধের বাগান তাহার ঐশ্বর্য-সম্পদ—সমস্ত কিছু বিকাইয়া গেল।

কলেজের পাঠ শেষ করিয়া আদিত্য যখন নিরজাকে বিবাহ করিয়া নতুন করিয়া সংসার পাতিল, তখন জ্যাঠামশায় তাহাকে অমন দুর্দিনেও ফুলের ব্যবসা করিবার জন্য টাকা ঋণ দিয়া, নানা যন্ত্রপাতি উপহার দিয়া নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহারই টাকায় আদিত্যের ফুলের ব্যবসায়ে দিনে দিনে উন্নতি ঘটিতে লাগিল। আদিত্য তাই জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পূর্বেই তাহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে পারিয়াছিল। এমনি করিয়া আদিত্যের বিবাহিত জীবনের দশটি বছর এবং জ্যাঠামশায়ের গৃহে সরলার সহিত প্রথম পরিচিত হইয়া উঠিবার পর প্রায় তেইশ বছর কাটিয়া গিয়াছে।

তেইশ বছর পরে আজ সরলা জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর নিঃস্ব হইয়া আদিত্যের গৃহে আশ্রয় লইয়াছে। আদিত্যের স্ত্রী নিরজা তখন মৃত্যু-শয্যায়। সরলাকে আদিত্য আশ্রয় দিয়াছে কৃতজ্ঞ অন্তরে। কারণ, এখানকার সকল সুখৈশ্বর্যের মূলে একমাত্র তাহার জ্যাঠামশায়ের আর্থিক সহায়তা, তাহার নিকট লব্ধ শিক্ষা, নানা উপদেশ ও পরামর্শ।

আদিত্যের সংসারে সরলা ভার তো হইলই না, বরং সরলাকে পাইয়া আদিত্যের সংসারের ভার লঘু হইয়া গেল। সরলা বাগানের কাজে সমস্ত দিন পরিশ্রম করে। জ্যাঠামশায়ের নিকট সেও বাগানের কাজ শিক্ষা করিয়াছিল। কেবল তাহাই নয়, গৃহিনীহীন সংসারের সকল ভার লইয়া, সে সংসারের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিয়াছিল। নিরজার প্রতিও তাহার কর্তব্যের এতটুকু ত্রুটি ছিল না। তাহার সেবা ও যত্নে সরলা নিরলস ছিল।

এখন সরলা না হইলে আদিত্যের এক মুহূর্তে চলে না। বাগানের কাজে, ব্যবসায়ের পরামর্শে, গৃহের ও বাহিরের সকল কাজে, এখন সরলা আদিত্যের একমাত্র সহায়। সরলার প্রতি তাহার হৃদয়বোধ এখনও স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে নাই। সরলাও তাহার যৌবন-সমাগমসম্পর্কে এখনও সম্পূর্ণ উদাসীন। আদিত্যকে ওই দৃষ্টি দিয়া সে আজও দেখিতে পারে নাই।

উভয়ের জীবনে যে ক্ষীণ অন্তরাল ছিল, তাহা নিরজার ঈর্ষার আগুনে একদিন নিঃশেষে পুড়িয়া ঝরিয়া গেল। কোথাও আর কিছুমাত্র অগোচরতা রহিল না। নিরজার ঈর্ষা স্বাভাবিক। প্রেম স্বাভাবিকভাবে এই ঈর্ষার সঞ্চার করে। স্বামীর সকল কর্মের সঙ্গিনী আজ সরলা। আর সে প্রাণের ঐশ্বর্যে বঞ্চিত হইয়া বিছানায় পড়িয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় একটির পর একটি দিন গুনিতেছে। তাহার স্বামীর জন্য বিশ্বের সমস্ত কিছু, অফুরন্ত প্রাণশক্তি, সুস্থ সবল দেহ, আশা ও উদ্দীপনা-পরিপূর্ণ সজীব মন,—তাহারই শুধু

অকালে সব শূন্য হইয়া গেল। অথচ মাত্র কয়েকদিন পূর্ব পর্যন্ত তাহার স্বামীর প্রতিটি মুহূর্ত স্বপ্নে, সৌন্দর্যে, ধ্যানে, কল্পনায়, রঙে, রসে, সেবায় ও কল্যাণে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল—এই তো সেদিন। অথচ এই কয়েক-দিনের মধ্যে তাহার এবং তাহার স্বামীর জগতের মাঝখানে যেন অন্তহীন এক ব্যবধান সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

ইহা ছাড়া, আদিত্যের পরবর্তী আচরণ হইতে আমরা নিরজার ঈর্ষার আরও একটি কারণ অনুমান করিতে পারি। আদিত্য তাহার হৃদয়সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হইবার পূর্বে, নিরজা যে তাহার হৃদয় প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। এ সম্পর্কে নারীর একটি স্বাভাবিক বোধ-শক্তি থাকে। দীর্ঘ রোগভোগে নিরজার ওই বোধ আরও সূক্ষ্ম ও তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। আদিত্য নিরজার সহিত এখন যে আচরণ করিত, তাহা দীর্ঘকালের অভ্যাসপ্রসূত। প্রাণেই প্রাণের ক্ষুধা মেটে। আদিত্যের মধ্যে সে প্রাণ ছিল না বলিয়া, নিরজার প্রাণ অমন শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। নিরজার অভিযোগে আদিত্য কতকটা উষ্মার সহিত সরলার নিকট তাহার দশ বৎসরের বিবাহিত জীবনের নিষ্ঠার কথা বলিয়াছে। কিন্তু, আদিত্য সরলার অভিযোগের উত্তর দিতে পারে নাই, অর্থাৎ নিরজার এই অভিযোগ যে অমূলক, অন্যায়—তাহা সরলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে নাই। নিরজার অভিযোগকে আদিত্য যখন সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে, যখন আপনার মনকে আপনি ফাঁকি দিতে পারে নাই, তখন ইহা যে অন্যায় নয়—না নীতির দিক হইতে—না ধর্মের দিক হইতে—তাহাই সপ্রমান করিতে চাহিয়াছে। আদিত্য তাহার এই নীতি ও ধর্মবোধকে একবার রমেনের নিকট এবং একবার সরলার নিকট যাচাই করিয়া লইয়াছে। তাহারাও তাহার এই মনোভাবকে কেহই অসমর্থন করিতে পারে নাই, বরং ন্যায় ও ধর্মসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

তাহাদের কথা থাক। আদিত্য এমনকি তাহার স্ত্রীর নিকট এই কথাই জানাইয়াছে। নিরজার এই অভিযোগ সত্য, তবে সমস্ত দিক বিচার করিয়া দেখিলে সরলার প্রতি তাহার প্রেম অন্যায় বা অধর্ম নয়। সরলা ইহ সংসারে নিঃসহায়, সরলার জ্যাঠামশায়ের দাক্ষিণ্যের উপর তাহার বর্তমান সৌভাগ্য দাঁড়াইয়া, ইত্যাদি নানা যুক্তির কথা থাক। কারণ, এই জাতীয় মানবিক বোধের সমাধান একান্ত সহজ এবং তাহা অন্যভাবেও করা যায়। আদিত্য আরও বলিয়াছে, নিরজার সহিত তাহার সম্পর্ক মাত্র দশ বছরের, কিন্তু সরলার সহিত সম্পর্ক তেইশ বছরের, তখন তাহার জীবনে কোথায় ছিল নিরজা।

আদিত্যের এই যুক্তিকে রমেন অস্বীকার করিতে পারে নাই। রমেন সরলাকে বলিয়াছে, "দাবির হিসাব বিচার করবে কোন্ সত্য দিয়ে। তোমাদের

মিলন কত কালের, তখন কোথায় ছিল বৌদি।" সরলাও নীরবে এই যুক্তিকে মানিয়া লইয়াছে, প্রতিবাদ করিতে পারে নাই।

তবে যতটুকু মানবিক বোধ সরলা ও রমেনের ছিল, আদিত্যের তাহাও ছিল না। সরলা নিরজার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে চায়। নিরজা ক'টা দিনই বা আর জীবিত থাকিবে? আহা! এই কটা দিন আদিত্য তাহার হৃদয় দিয়া নিরজার শূন্য হৃদয়কে দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করিয়া দিক। এই কটা দিন নিরজা তাহার স্বামীর প্রেম পূর্ণ করিয়া লাভ করুক। নিরজা আদিত্যকে বলিয়াছে, "দিদির জীবনান্ত কালের শেষ কটা দিন তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করে দাও। একেবারে ভুলিয়ে দাও যে, আমি এসেছিলাম ওঁর সৌভাগ্যের ভরা ঘট ভেঙ্গে দেবার জন্যে।" এই কথা প্রায় অনুরূপ ভাষায় রমেনও আদিত্যকে বলিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যেও উন্নততর নৈতিক বোধের কোন পরিচয় লাভ করিতে পারা যায় না।

আদিত্য তাহার প্রেমসম্পর্কে সরলাকে যাহা বলিয়াছে, সেই উক্তি দুইটি পর পর উদ্ধৃত করিতেছি, পরে ইহার স্বরূপ বিচার করিতে পারা যাইবে।

"তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় তা ফুঠে উঠেছে। আমি বলছি, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, সে হবে অধর্ম্ম।" (মৃত্যুশয্যায় শায়িত স্ত্রীর নিকট এই সমস্ত উক্তি করিয়া আদিত্য সেই সাহসের পরিচয় দিয়াছে!)

আদিত্য সরলাকে আরও বলিয়াছে,

"কেন আমি তোমাকে চিনলুম না, কেন বিয়ে করতে গেলুম ভুল করে। তুমি তো করনি, কত পাত্র এসেছিল তোমাকে কামনা করে সেতো আমি জানি। * * * তোমার মনের গভীরে তোমার সত্য উজ্জ্বল। না জেনেও তার কাছে তুমি বাঁধা রেখেছিলে নিজেকে। আমাকে তুমি কেন চেতন করে দাওনি। আমাদের পথ কেন হল আলাদা!"

আদিত্য এই কথাটাই আপনাকে এবং সরলাকে বারবার করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছে, যে তাহাদের উভয়ের শৈশবের সেই প্রেম ছিল একমাত্র সত্য। শৈশব প্রেমের সেই কুঁড়ি ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করিয়া তেইশ বছর পরে আজ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই পূর্ণ বিকশিত প্রেম সকল আবরণ, সকল অন্তরাল উদ্ভিন্ন করিয়া আজ বাহির হইয়া পড়িতেছে। আদিত্য আপনার প্রেমের এতদিন পরে নিঃসংশয় পরিচয় লাভ করিয়াছে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে নিরজার সহিত তাহার এই দশ বৎসরের বিবাহিত জীবনকে কী আখ্যা দিব?

এই দশ বৎসরের বিবাহিত জীবন যদি মিথ্যাই হয়, তবে এই মিথ্যার ভারে তাহার অবশিষ্ট সমগ্র জীবন ভাঙ্গিয়া পড়িবে না ? এতবড় মিথ্যাকে বহন করিবার মত শক্তি আদিত্যের মত পুরুষেরও নাই। আদিত্য জানে না যে, প্রেমে কালের পরিমানটা বড় কথা নয়। সত্য প্রেমের অনুভূতি মুহূর্তে সকল দেশ ও কালের সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে। এই অনুভূতি আদিত্য তাহার বিবাহিত দশ বছরের জীবনেও যদি এক মুহূর্তের জন্য না পাইয়া থাকে, তবে সরলার সহিত প্রেমসম্পর্কেও সে ইহার আস্বাদ লাভ করিতে পারিবে না। এই অনুভূতির জগতের সহিত তাহার কোন পূর্ব পরিচয় নাই।

আদিত্যের প্রকৃতির স্বরূপ এই সম্পর্কে বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে তাহার নীতি ও ধর্মবোধের স্বরূপও বুঝিয়া লইতে পারা যাইবে। আদিত্য প্রাণসর্বস্ব পুরুষ। ইহার ঊর্ধ্বতর কোন জগতের সহিত তাহার পরিচয় নাই। প্রাণের যোগে প্রাণ সঞ্জীবিত হয়। প্রাণের সংযোগ ছিন্ন হইয়া গেলে হয়, প্রাণ শূন্যতার অতলে তলাইয়া যায়, নতুবা নূতন প্রাণের সংযোগে তাহা আবার প্রাণময় হইয়া উঠে। আদিত্য যতদিন নিরজার প্রাণের সম্পদ লাভ করিয়াছে, ততদিন তাহার জীবনে এই জাতীয় কোন সমস্যা জাগে নাই। তথা-কথিত কোন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীনও তাহাকে হইতে হয় নাই।

আজ নিরজার প্রাণসম্পদ শূন্য হইয়া যাইতে আদিত্য তাহার শূন্য প্রাণ পূর্ণ করিতে অজ্ঞাতে সরলার প্রাণের সংযোগ কামনা করিয়া ফিরিয়াছে। এই জাতীয় পুরুষ জীবনের সকল পর্যায়ে প্রাণের সংযোগ কামনা করে ; কারণ, প্রাণের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে, ওই শ্রেণীর পুরুষের সকল সৃষ্টি-কর্ম মুহূর্তে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। সৃষ্টি প্রেরণা অব্যাহত রাখিতে হইলে, তাহার, প্রাণের সংযোগ কোন রূপে হারাইলে চলিবে না। প্রাণসম্পদে নিরজা যদি আজ দেউলিয়া হইয়া গিয়া থাকে, তবে সরলা আছে।

নিরজা স্ত্রী হইয়া স্বামীর প্রাণের এই ধর্মের কথা যে জানিত, তাহাতে সংশয় নাই ; তাই অমন আশংকায় নিরজা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোন সান্ত্বনায় সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে নাই।

সৃষ্টি প্রাণ-লোকে আছে, সৃষ্টি মানস-লোকে আছে, তাহার ঊর্ধ্বতর চেতনা-লোকে আছে। একটি জগতের নীতি ও ধর্মবোধের সহিত অন্য জগতের নীতি ও ধর্মবোধের কোন মিল নাই। আদিত্যের নীতি ও ধর্মবোধ ওই প্রাণ-লোকের।

প্রাণের ধর্মের মধ্যেই মানুষের সাধনা সীমাবদ্ধ নয়। মনুষ্যত্বের সাধনার পরিচয় কেবলমাত্র সেইখানেই পাওয়া যায়, যেখানে মানুষ প্রাণের ধর্মকে ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করে।

প্রাণের সংযোগ হারাইলে প্রাণ যে শূন্য হইয়া যায়, তাহা সত্য কিন্তু এইখানেই সব শেষ নয়। মানুষ তাহার সাধনা দিয়া প্রাণের এই শূন্যতা পূর্ণ করিয়া তুলে, নূতন করিয়া প্রাণের যোগে প্রাণের বোধ সঞ্চারিত করিয়া নয়, প্রাণের ঊর্ধ্বে উঠিয়া। মৃত্যুতে রূপ চিরকালের জন্য হারাইয়া যায় না, মানস-লোকে চিরস্থির ধ্যান-রূপ পরিগ্রহ করে। এই ধ্যান-রূপ আশ্রয় করিয়াও মানুষের সৃষ্টি-প্রেরণা অব্যাহত থাকে। তবে মানস-লোকের এই সৃষ্টি এবং প্রাণ-লোকের সৃষ্টি এক নয়। তাহার নীতি ও ধর্মবোধেও পার্থক্য আছে।

সরলা আদিত্যের প্রেমের বৈধতা স্বীকার করে। এই বৈধতা সম্পর্কে তাহার মনে কোথাও এতটুকু সংশয়ের দ্বন্দ্ব জাগে নাই। আদিত্যের প্রেম ব্যাকুলতার উত্তরে সরলা শুধু বলিয়াছে,

"ন্যায় অন্যায়ের কথা নয় ভাই, সম্বন্ধের বন্ধন যখন ফাঁস হয়ে উঠে, তার ব্যথা বাজে নানা লোকের মধ্যে, টানাটানি পড়ে নানা দিক থেকে, কাকেই বা দোষ দেব।"

সরলা তাহাদের উভয়ের প্রেমের বৈধতা স্বীকার করে কিন্তু সেই সঙ্গে মানব ভাগ্যকেও মানে। ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে গেলে সৌন্দর্যের সকল আবরণ উড়িয়া গিয়া কেবল কণ্টক অবশেষ থাকে, দুঃখ নিঃসীম হইয়া পড়ে। সরলা তাই দুঃখ বহন করিতে চাহিয়াছে, যে দুঃখ বক্ষের মাঝখানে মণি-দীপ হইয়া জ্বলে।

সরলা জানে, ভাগ্য তাহাকে যেখানে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, সেখানে আর কাহাকে দুঃখ দিয়া আর কাহারও হাত হইতে সে দান ফিরাইয়া লইতে পারা যায় না। অভিযোগ যদি কাহারও নিকট কিছু করিতে হয়, তবে সেই অনির্দিষ্ট শক্তির নিকট যাহার ইচ্ছায় এই জীবনের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

আদিত্য শেষে অধৈর্য হইয়া কী জানি কী করিয়া বসে, হয়ত তাহার নিরুদ্ধ প্রেম সকল সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গৃহের অশান্তিকে সহস্র গুণ বাড়াইয়া তুলিবে—এই আশংকায় সরলা পলাইয়া কারাবরণ করিয়াছে। যাওয়ার পূর্বে আদিত্যকে অনুরোধ করিয়া গেল, যেন সে নিরজার মর্ত জীবনের শেষ কটা দিন তাহার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করিয়া দেয়। নিরজার প্রতি সরলার এই যে করুণা, তাহা উন্নততর কোন বোধের প্রকাশ তো নয়ই, বরং ইহা নিরজাকে আরও অসম্মানিত করিয়াছে।

সরলা কারাবরণ করিয়া আদিত্যের নিকট হইতে কিছুকালের জন্য দূরে থাকিতে চাহিয়াছে তাহাকে সংযত করিয়া রাখিবার জন্য। তাহার পর

ইতিমধ্যে নিরজার মৃত্যুতে দুঃখের জট আপনি খুলিয়া যাইবে। সরলা গোপনে গৃহত্যাগ করে নাই, আদিত্যকে জানাইয়া গিয়াছে, তবে কারাবরণের ইচ্ছাটা স্পষ্ট করিয়া জানাইতে পারে নাই, পাছে আদিত্য বাধা দেয়।

বিদায় লইবার পূর্বে আদিত্য সরলাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, দূরে গিয়া তাহার জন্য তাহার মন কেমন করিবে কি না। উত্তরে সরলা শুধু বলিয়াছে, করিলেও তাহার অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ তাহা জানিতে পারিবে না।

সরলা যদি তাহার বর্তমান অবস্থাকে প্রকৃতই ভাগ্য বলিয়া মানিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইত, জীবনের এই নিয়তি রূপটিকেই যদি সে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিত, তাহা হইলে বুক ফাটিয়া গেলেও আদিত্যের নিকট তাহার প্রেম প্রকাশ হইয়া পড়িত না। আদিত্যকে দূরে সরাইয়া রাখা একান্ত দুঃসাধ্য হইয়া পড়িলে, সে গোপনে আদিত্যের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইত। রমেন ও নিরজার অনুরোধে কেমন করিয়া সে নিরজার দান গ্রহণ করিতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা আমরা সামান্য নৈতিক বোধ দিয়াও উপলব্ধি করিতে পারি না। সরলার স্বীকৃতি না পাইলে, আদিত্যের আকাঙ্ক্ষা যে বাধ্য হইয়া সংযত হইত, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

আদিত্যের অন্তরে কামনার শিখা জ্বালাইয়া দিবার পর, কিছুকালের জন্য কারাবাস যাপনের সংকল্পের সার্থকতা কিছুমাত্র নাই—ইহার নিগূঢ় উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি। সরলা যখন কারাবরণ করিবার সংকল্প করিয়াছে, তখন নিরজার গৃহ-দাহ যতদূর হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহার পর তাহার যাওয়া ও থাকা সমার্থক।

আশৈশব নিষ্ঠার সহিত সরলা দেব-পূজা করিয়া আসিয়াছে, নিত্যদিন ভক্তিভরে দেবতার নিকট কুশল কামনা করিয়াছে। ইহার ফল সে কী পাইয়াছে? শৈশবে সে পিতৃমাতৃহীন হইয়াছে। যে জ্যাঠামশায় তাহাকে কন্যার অধিক স্নেহে মানুষ করিয়াছিলেন, তিনিও অকালে ইহ-লোক হইতে বিদায় লইয়াছেন। ইহ-সংসারে তাহার আত্মীয়-পরিজন সহায়-সম্বল বলিয়া কিছু নাই। আর সে শৈশব হইতে যাহার প্রতীক্ষায় দিন গুনিয়াছে, সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে সেই আদিত্যের সংসারে সৌভাগ্যের সীমা নাই। সে তাহার গৃহে একদিন গৃহিনীর সর্বোচ্চ সম্মান লইয়া আসিতে পারিত, কিন্তু আজ সে এ সংসারে মাত্র একজন আশ্রিতা। আর তাহারই জন্য আবার এ সংসারে আগুন জ্বলিয়াছে, অশান্তির সীমা নাই। আদিত্য যখন তাহার প্রেম যাঞ্চা করিয়াছে, তখন তাহাকে স্বীকার করিয়া লইবার কোন উপায় নাই। মাঝখানে অন্তহীন দুঃখের সাগর। সরলা তাই দেব-পূজা পরিহার করিয়াছে।

সরলা নিরজাকে বলিয়াছে,

"অপরাধ আমার নয়, অপরাধ সেই আমার ঠাকুরের—যাঁকে সরল বিশ্বাসে রোজ দু বেলা পূজা করেছি। সেও আজ আমার শেষ হ'ল।"

নিরজার স্বধর্ম ও তদাশ্রয়ী সাধনা ইহার বিরুদ্ধ ছিল বলিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী তাহার অন্তর স্পর্শ করে নাই। কিন্তু সরলা তাহার ঠাকুরের উপাসনা ত্যাগ করিয়াছে মিথ্যা বোধের বশে। জীবনের গভীরতর কোন সত্যবোধ, কোন উপলব্ধির পরিচয় তাহার জীবনের কোন পর্যায়ে আমরা প্রত্যক্ষ করি না।

চার অধ্যায়

১

ইন্দ্রনাথ তো কেবল একা নয়, ইন্দ্রনাথের মত আরও অনেকে ইন্দ্রনাথেরই মত অসাধারণ প্রতিভা ও কর্মশক্তি লইয়া এই পথে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। অসহনীয় হইয়া আত্মঘাতী হইবার জন্য তাহারা এই পথ অবলম্বন করে নাই। ঐতিহাসিক জ্ঞান তাহাদেরও ছিল। অর্থাৎ, তাহারাও জানিত যে, পশ্চাতে সুদীর্ঘ কালের কারণ থাকে বলিয়া, একটা দেশ বা জাতি গৌরবের উচ্চ শিখর হইতে স্খলিত হইয়া যায়। এক একটি জাতির পশ্চাতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অপরাধ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে থাকে। তাহার পর একদিন ওই পুঞ্জীভূত অপরাধ সঙ্গে লইয়া সমগ্র দেশ একদিন তলাইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

ভারতবর্ষ যদি বিদেশীর পদানত হইয়া থাকে, যদি অগৌরবের সর্বশেষ সীমায় পৌঁছাইয়া যায়, তবে তাহার কারণ নিশ্চয় আছে। সে কারণ বহু এবং তাহা একদিনে গড়িয়া উঠা কোন কারণ নয়—তাহা বহুদূর প্রসারী। ভারতবর্ষের এই অগৌরব দূর করিয়া তাহাকে তাহার পূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সুদূর ব্যাপ্ত সেই কারণগুলি অনুসন্ধান করিয়া তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অপরাধ ক্ষালনের এই সংগ্রাম সম্পূর্ণ না হইলে বাহিরে সংগ্রাম করিয়া কোন লাভ হইবে না, তাহাতে পরাভব অনিবার্য। অন্যায়কারীর সহিত অন্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতি আরও দ্রুত আত্মভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, কারণ অন্তরের যে প্রবল শক্তি অন্যায়কারীকে কিছুকালের জন্য দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারে, দুর্বল জাতির জীবনে তাহার অভাবহেতু মারাত্মক বিষক্রিয়া করে।

অপরাধ একদিনের নয়, তাহার ক্ষালনও তাই একদিনে করিতে পারা যায় না। ইহা লোভের পথ হইতে পারে, সিদ্ধির পথ নয়। ইহার জন্য প্রয়োজন সুদীর্ঘ কালের প্রস্তুতি, নিরলস ত্যাগ, দুঃখভোগ, জাতির বিচিত্র অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিচিত্র বন্ধন ও জড়তা দূরীকরণের জন্য শুশ্রূষুর মন ; আঘাত ও সমালোচনাও নয়, পূর্ণ একাত্মতা বোধ, সকলের সব পাপকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহারই বিষে জর্জরিত নীল হইয়া মৃত্যুতে ক্ষমা করিয়া যাওয়া। ইন্দ্রনাথ এ কথা জানে। ইন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছে,

"দেখেছি কত মহা মহা সাম্রাজ্য গৌরবের অভ্রভেদী শিখরে উঠেছিল, আজ তারা ধুলোয় মিলিয়ে গেছে তাদের হিসেবের খাতায় কোথায় মস্ত

সরলা নিরজাকে বলিয়াছে,

"অপরাধ আমার নয়, অপরাধ সেই আমার ঠাকুরের—যাঁকে সরল বিশ্বাসে রোজ দু বেলা পূজা করেছি। সেও আজ আমার শেষ হ'ল।"

নিরজার স্বধর্ম ও তদাশ্রয়ী সাধনা ইহার বিরুদ্ধ ছিল বলিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী তাহার অন্তর স্পর্শ করে নাই। কিন্তু সরলা তাহার ঠাকুরের উপাসনা ত্যাগ করিয়াছে মিথ্যা বোধের বশে। জীবনের গভীরতর কোন সত্যবোধ, কোন উপলব্ধির পরিচয় তাহার জীবনের কোন পর্যায়ে আমরা প্রত্যক্ষ করি না।

চার অধ্যায়

১

ইন্দ্রনাথ তো কেবল একা নয়, ইন্দ্রনাথের মত আরও অনেকে ইন্দ্রনাথেরই মত অসাধারণ প্রতিভা ও কর্মশক্তি লইয়া এই পথে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। অসহনীয় হইয়া আত্মঘাতী হইবার জন্য তাহারা এই পথ অবলম্বন করে নাই। ঐতিহাসিক জ্ঞান তাহাদেরও ছিল। অর্থাৎ, তাহারাও জানিত যে, পশ্চাতে সুদীর্ঘ কালের কারণ থাকে বলিয়া, একটা দেশ বা জাতি গৌরবের উচ্চ শিখর হইতে স্খলিত হইয়া যায়। এক একটি জাতির পশ্চাতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অপরাধ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে থাকে। তাহার পর একদিন ওই পুঞ্জীভূত অপরাধ সঙ্গে লইয়া সমগ্র দেশ একদিন তলাইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

ভারতবর্ষ যদি বিদেশীর পদানত হইয়া থাকে, যদি অগৌরবের সর্বশেষ সীমায় পৌঁছাইয়া যায়, তবে তাহার কারণ নিশ্চয় আছে। সে কারণ বহু এবং তাহা একদিনে গড়িয়া উঠা কোন কারণ নয়—তাহা বহুদূর প্রসারী। ভারতবর্ষের এই অগৌরব দূর করিয়া তাহাকে তাহার পূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সুদূর ব্যাপ্ত সেই কারণগুলি অনুসন্ধান করিয়া তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অপরাধ ক্ষালনের এই সংগ্রাম সম্পূর্ণ না হইলে বাহিরে সংগ্রাম করিয়া কোন লাভ হইবে না, তাহাতে পরাভব অনিবার্য। অন্যায়কারীর সহিত অন্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতি আরও দ্রুত আত্মভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, কারণ অন্তরের যে প্রবল শক্তি অন্যায়কারীকে কিছুকালের জন্য দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারে, দুর্বল জাতির জীবনে তাহার অভাবহেতু মারাত্মক বিষক্রিয়া করে।

অপরাধ একদিনের নয়, তাহার ক্ষালনও তাই একদিনে করিতে পারা যায় না। ইহা লোভের পথ হইতে পারে, সিদ্ধির পথ নয়। ইহার জন্য প্রয়োজন সুদীর্ঘ কালের প্রস্তুতি, নিরলস ত্যাগ, দুঃখভোগ, জাতির বিচিত্র অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিচিত্র বন্ধন ও জড়তা দূরীকরণের জন্য শুশ্রূষুর মন ; আঘাত ও সমালোচনাও নয়, পূর্ণ একাত্মতা বোধ, সকলের সব পাপকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহারই বিষে জর্জরিত নীল হইয়া মৃত্যুতে ক্ষমা করিয়া যাওয়া। ইন্দ্রনাথ এ কথা জানে। ইন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছে,

"দেখেছি কত মহা মহা সাম্রাজ্য গৌরবের অভ্রভেদী শিখরে উঠেছিল, আজ তারা ধুলোয় মিলিয়ে গেছে তাদের হিসেবের খাতায় কোথায় মস্ত

একটা দেনা জমে উঠেছিল, যা তারা শোধ করে নি। আর এই দেশ, যেহেতু এ আমারই দেশ, সৌভাগ্যের চিরস্বত্ব নিয়ে ইতিহাসের উঁচু গদিতে গদিয়ান হয়ে বসে থাকবে পরাভবের সমস্ত কারণগুলোর গায়ে সিঁদুর চন্দন মাখিয়ে ঘণ্টা নেড়ে পুজো করতে করতে, বোকার মতো এমন আবদার করব কার কাছে?"

তবু ইন্দ্রনাথ কেন এ পথ বাছিয়া লইল, তাহার কারণও সে উল্লেখ করিয়াছে।

উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ইন্দ্রনাথকে বিদেশে দীর্ঘকাল কাটাইতে হয়। তাহার শিক্ষার বিষয় ছিল বিজ্ঞান। কেবল বিজ্ঞান নয়, বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সে যতদূর পারিয়াছে, আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। খ্যাতি ও সম্মান এবং বিদেশের মুক্ত মন লইয়া ইন্দ্রনাথ এদেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রতি মুহূর্তে অসহনীয় বন্ধনপীড়া বোধ করিতে লাগিল। এখানে তাহার প্রতিভা বিকাশের, জ্ঞান অনুশীলনের কোন সুযোগ নাই, এখানে মানুষ তাহার সম্মান ও মর্যাদা লইয়া বাস করিতে পারে না, এখানে প্রতিক্ষেত্রে প্রতিমুহূর্তে বাধা ও অসম্মান।

মানুষ যত মুক্ত মন লইয়া জন্মগ্রহণ করে, অনুভূতি যাহার যত তীব্র, হৃদয়বোধ যাহার যত গভীর, আত্মপ্রসারের বা আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা যাহার যত অধিক, বাহিরের বন্ধন, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা তাহাকে তত অধিক পীড়িত করে। জাতির লাঞ্ছনা ইন্দ্রনাথকে তাই মর্মান্তিক পীড়া দান করিয়াছিল।

আত্ম-প্রসারের স্বাভাবিক পথ নিরুদ্ধ দেখিয়া, ইন্দ্রনাথ শেষে এই পথ অবলম্বন করিয়াছে। ইন্দ্রনাথ বলিয়াছে, "দেশের চরম দুরবস্থা আমার মাথা হেঁট করতে পারবে না, আমি তারও অনেক ঊর্ধ্বে—আত্মার অবসাদ ঘটতে দেব না, মরবার সমস্ত লক্ষণ দেখেও।"

আত্মার প্রেরণা দেশ-কালের সমস্ত অবস্থাকে ছাড়াইয়া আত্মপ্রকাশ করে। ইন্দ্রনাথ কেবল আপন শক্তিকেই বৃহত্তর ক্ষেত্রে লীলায়িত করিতে চায় নাই, সে এমনি করিয়া জাতির আচ্ছন্ন চেতনায় সাড়া জাগাইয়া তাহার সুপ্ত ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটাইতে চাহিয়াছে।

"ওরা চারিদিকের দরজা বন্ধ করে আমাকে ছোটো করতে চেয়েছিল, মরতে মরতে প্রমাণ করতে চাই আমি বড়ো। আমার ডাক শুনে কত মানুষের মত মানুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে চারিদিকে এসে জুটল। * * * মানুষ নিয়ে এই আমার রসায়নের সাধনা। * * * ঐতিহাসিক মহাকাব্যের সমাপ্তি হতে পারে পরাজয়ের মহাশ্মশানে। কিন্তু মহাকাব্য তো বটে। গোলামিচাপা এই খর্ব মনুষ্যত্বের দেশে মরার মত মরতে পারাও যে একটা সুযোগ।"

ঐতিহাসিক কারণের জন্যই ইন্দ্রনাথ এই জাতীয় চেষ্টার অনিবার্য পরাভবকে স্বীকার করে, কিন্তু সেই সঙ্গে স্বীকার করে আত্মার প্রেরণাকে। মানুষের জাগ্রত চেতনা অনিবার্য মৃত্যুর মাঝখানে আত্মরূপ সাক্ষাৎ করিয়া যায়। সে প্রকাশ—সে সাক্ষাৎকার কোন ফলাফলের অপেক্ষা করে না।

ইন্দ্রনাথ আত্ম-প্রসারের জন্য যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, যে পথে জাতির অবসাদগ্রস্ত চেতনায় সাড়া জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছে, সে পথ সাধারণ মানুষের বিচারে হয়ত হিংসার পথ কিন্তু ইন্দ্রনাথ ইহাকে হিংসাত্মক সংগ্রাম বলিয়া মানিয়া লইতে চায় নাই। ইন্দ্রনাথ এই কথাটাই সেদিন এলাকে বুঝাইতে চাহিয়াছে,

"তোমাকে যদি বাঘে খেতে আসত, আর তুমি যদি ভীতু না হতে, তা হলে তখনই তাকে মারতে দ্বিধা করতে না। আমরা সেই বাঘটাকে মনের সামনে স্পষ্ট দেখছি, দয়ামায়া দিয়েছি বিসর্জন; নইলে নিজেকে সেন্টিমেন্টাল বলে ঘৃণা করতুম। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথাটাই বুঝিয়েছিলেন। নির্দয় হবে না, কিন্তু কর্তব্যের বেলা নির্মম হতে হবে।"

সশস্ত্র সংগ্রামে যে প্রতিপক্ষের প্রতি ঘৃণা পোষণ করিতে হয় এবং এই ঘৃণাবোধ না হইলে যে সশস্ত্র সংগ্রাম অসম্ভব এবং নিয়ত এই ঘৃণাবোধ পোষণ করিবার জন্য মানুষ যে ক্রমাগত মনুষ্যত্ব হারাইতে থাকে, এইরূপ একটা যুক্তি অহিংসাবাদীরা উপস্থাপিত করিয়া থাকেন। ইন্দ্রনাথ এই যুক্তিকেও স্বীকার করিতে পারে নাই। তাহার মতে প্রতিপক্ষের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ বা ঘৃণাবোধ পোষণ না করিয়াও এই সংগ্রাম করা যাইতে পারে এবং তাহা একান্ত সম্ভব। ইন্দ্রনাথ তাহার জীবন দিয়া ইহা সপ্রমান করিয়াছে। এই সম্পর্কে ইন্দ্রনাথ কানাইকে যাহা বলিয়াছে, তাহার দুই একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"যে জোয়ান মদ খেয়ে চোখ লাল না করলে লড়তেই পারে না, সেই গ্রাম্যকে আমি অবজ্ঞা করি। রাগের মাথায় কর্তব্য করতে গেলে অকর্তব্য করার সম্ভাবনাই বেশি।"

"আমি অবিচার করব না। উন্মত্ত হব না, দেশকে দেবী বলে মা মা বলে অশ্রুপাত করব না, তবু কাজ করব, এতেই আমার জোর।"

"রাস্তায় পাথর পড়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার চালাই যেমন ক'রে, অপ্রমত্ত বুদ্ধি নিয়ে। ওরা ভালো কি মন্দ সেটা তর্কের বিষয় নয়। ওদের রাজত্ব বিদেশী রাজত্ব, সেটাতে ভিতর থেকে আমাদের আত্মলোপ করেছে—এই স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থাকে নড়াতে চেষ্টা করে, আমার মানব স্বভাবকে আমি স্বীকার করি।"

ইন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের আর একটি দিক এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ইন্দ্রনাথের সাধনা প্রাণ ও মনের সাধনা। ইন্দ্রনাথ আপনাকে কর্মযোগী বলিয়া জানে এবং প্রাণ ও মনের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি ব্যতীত কর্ম অসম্ভব। পুরুষ ও নারীর মিলিত সাধনায় প্রাণ ও মনের বিকাশ যেমন হয়, তেমন আর কোথাও হয় না। ইন্দ্রনাথের দেশব্যাপী মহাযজ্ঞে তাই নারী ও পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন। একের সান্নিধ্য অন্যের প্রাণ-মনে যে বেগ সঞ্চার করিবে, সেই শক্তির বেগকে তাহারা মহত্তর কর্মে নিঃশেষ করিয়া দিবে। প্রাণ ও মনের সেই অগ্নিতে যে সংসারী আপনাকে পুড়াইয়া ফেলে, কিংবা প্রাণ ও মনের সকল প্রকাশকে নিরুদ্ধ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয় যে সন্ন্যাসী, তাহারা কেহই কর্মের মহাব্রত পালনের যোগ্য নয়।

"ইন্দ্রনাথ বলে, শরীরটাতে ছাই দিয়েছে যে সন্ন্যাসী আর প্রবৃত্তিকে ছাই করেছে যে ভস্মকুণ্ড, সেই ক্লীবদের নিয়ে কাজ হবে না * *। যখন দেখব আমাদের দলের কোনো অগ্নিউপাসক অসাবধানে নিজের মধ্যেই অগ্নিকাণ্ড করতে বসেছে—দেব তাদের সরিয়ে। আমাদের অগ্নিকাণ্ড দেশ জুড়ে, নেবানো মন দিয়ে তা হবে না, আর হবে না তাদের দিয়ে, আগুন যারা চাপতে জানে না।"

"শুধু মা মা স্বরে দেশকে যারা ডাকাডাকি করে তারা চির শিশু। দেশ বৃদ্ধ শিশুদের মা নয়, দেশ অর্ধ-নারীশ্বর—মেয়ে পুরুষের মিলনে তার উপলব্ধি!"

ইন্দ্রনাথ তো কোন চরিত্র নয়, ইন্দ্রনাথ একটা আইডিয়ার প্রতীকমাত্র! ঔপন্যাসিক তাই তাহার চরিত্রের ধীর বিকাশের কোন পরিচয় দান করেন নাই, তাহার আইডিয়াটিকেই একপ্রকার উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইন্দ্রনাথের পরিচয় দিতে বসিয়া, তাই তাহার আইডিয়ারই সামান্য পরিচয় দিলাম।

২

অতীন জীবনে যে পথ বাছিয়া লইয়াছিল, তাহার সহিত তাহার স্বভাব বা স্বধর্মের কোন মিল ছিল না। মানুষের সমগ্র সত্তা তাহার স্বধর্ম আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হয়। স্বভাব-বিরুদ্ধ আচরণে তাই অতীনের সমগ্র সত্তা ছিন্নমূল হইয়া দিনে দিনে নীতি ও ধর্মহীনতার অতলে তলাইয়া গিয়াছে। একদিকে স্বভাবস্থিত হইবার জন্য আত্মার দুর্নিবার প্রেরণা, অন্যদিকে কর্তব্যের টানে ঘটনার আবর্তে ধিক্‌কার দিতে দিতে আপনার অধিকার-লোক হইতে ক্রমাগত

দূরে সরিয়া যাওয়া। দুই বিরুদ্ধ শক্তির প্রবল পীড়নে তাহার সমগ্র সত্তা পরিণামে শতধা হইয়া গিয়াছে।

স্বভাবে অতীন ছিল কবি। সাহিত্যের প্রতি তাহার অনুরাগ ছিল প্রগাঢ়। একদিন সে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক হইবে—এই ছিল তাহার আশৈশবের স্বপ্ন। কিন্তু ভাগ্য-বিপর্যয়ে অতীন শেষে যে পথ বাছিয়া লইয়াছে, তাহাতে এই স্বপ্ন সার্থক করিবার আর কোন উপায় রহিল না। এই পথে পরিণামে তাহাকে বঞ্চনা ও পরাজয় বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। পরাজয়ে তো অগৌরব নাই, অতীনকে এ পরাজয় বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়া। অতীনের এ পরাজয়ে তাই কোন সান্ত্বনা নাই।

অথচ যে পথে অতীন সকল সার্থকতা লাভ করিতে পারিত, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সে পথ তাহার নিকট চিরকালের জন্য বন্ধ। দেশকে বিদেশী শাসন-মুক্ত করিবার জন্য যে পথ সে বাছিয়া লইয়াছিল, তাহা তাহার স্বধর্ম বিরুদ্ধ বলিয়াই ধর্মহীনতায় তাহার মনুষ্যত্বই কেবল নষ্ট হইয়াছে। অথচ স্বধর্মে থাকিয়াই অতীন আপনার ভাবে আপনার পথে দেশের সেবা করিতে পারিত। তাহার সাহিত্যে থাকিত চিরকালের মানুষের বন্দনা গান, যে ধর্ম আশ্রয় করিয়া চিরকালের মানুষ গর্ব অনুভব করে, যে ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া চিরকালের মানুষ তাহার মনুষ্যত্বের সৌধ গড়িয়া তুলে, সেই ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, তাহারই জয় ঘোষণা।

যে কর্তব্য অন্যায় ও অধর্ম, যে কর্তব্যাচরণে মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত হয়, সে কর্তব্য-ত্রুটিতে যে অপরাধ স্পর্শ করে না, তাহা অতীনও বুঝে, অন্ততঃ একটা পরিণাম পর্যন্ত পৌঁছাইয়া অতীন তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছে। তবু অতীন ওই পথ পরিহার করিতে পারে নাই, প্রথমতঃ, ঘটনাস্রোত তাহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া (ইহা গৌন কারণ), দ্বিতীয়তঃ, এলাকে ছাড়িয়া একাকী পূর্ব জীবনে ফিরিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব (ইহা মুখ্য কারণ)।

তাহার সাধনা মোহেরই সাধনা, যে মোহ সৃষ্টি করে, মনুষ্য-হৃদয়কে এক অলৌকিক সৌন্দর্য-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। তাই এলার মোহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার চেষ্টা সে করে নাই। একমাত্র এলার রূপ আশ্রয় করিয়া সে সৌন্দর্য-ধ্যান করিতে পারে, ওই রূপ আশ্রয় করিয়াই তাহা বিশ্বের সকল রূপের সহিত যুক্ত হয়। ওই রূপ হারাইয়া গেলে তাহার সৌন্দর্য-ধ্যান তাই মুহূর্তে শূন্যময় হইয়া যায়। এলার সঙ্গলাভের কামনায় আপনার সৌন্দর্য-ধ্যানকে অটুট রাখিবার জন্য, অর্থাৎ ওই আত্মারই ক্ষুধায় সে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের ন্যায় আত্মহত্যার পথ বাছিয়া লইয়াছে; তাহার জাগ্রত চৈতন্যই তাহাকে দিয়া আত্মহত্যা করাইয়াছে।

এই আলোচনার পূর্বে অতীনের জীবনের দুই একটি ঘটনা বিবৃত করা প্রয়োজন। তাহা অতীনের প্রেমোপলব্ধির ঘটনা। সে উপলব্ধিকে তাহার চৈতন্যের প্রথম জাগরণ বলা যাইতে পারে। অতীন তাহার এই উপলব্ধির কথা এলাকে বলিয়াছে। ফিরিয়া ফিরিয়া তাহার সেই প্রথম উপলব্ধির দিনটির কথা মনে পড়ে।

"সেদিন যে পরিবেশের মধ্যে আমার কাছে দেখা দিয়েছিলে, সে তো হায়ার ম্যাথম্যাটিক্‌স নয়, লজিক নয়। সেটা যাকে বলে মোহ। শঙ্করাচার্য্যের মতো মহামল্লও যার উপর মুদগর পাত করে একটু টোল খাওয়াতে পারেন নি। তখন বেলা পড়ে এসেছে, আকাশে যাকে বলে কনে-দেখা মেঘ। গঙ্গার জল লাল আভায় টলমল করছে। ওই ছিপছিপে ক্ষিপ্র গমন শরীরটি সেই রাঙা আলোর ভূমিকায় চিরদিন আঁকা রয়ে গেল আমার মনে।"

এই উপলব্ধির পূর্বে পুরুষের জীবনে যে সৌন্দর্য-কল্পনা যে সৌন্দর্য, সাক্ষাৎকার তাহার মধ্যে কোথাও কোন সামঞ্জস্য থাকে না। তাহা তাই মানুষের জীবনে কোন অধ্যাত্ম ফল লাভ ঘটায় না। সত্ত্বার এই নিবিড় উপলব্ধিতে একটি বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া মানুষের চেতন ও অবচেতন মনের, অন্তর ও বাহিরের সকল রূপ সামঞ্জসীভূত হইয়া যায়। শিল্পীর জীবনে ইহাই তাই প্রথম অধ্যাত্ম উপলব্ধি।

অন্তরের মধ্যে এই যে সৌন্দর্য-লোক রচিত হইয়া যায়, সৌন্দর্য-সাধক, শিল্পী ও স্রষ্টা তাহারই ধ্যানমগ্ন। গভীর হইতে গভীরতর লোকে রস-লোকের একটির পর একটি দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাহার অন্তহীন মানস-অভিসার চলে। প্রথম সেই অধ্যাত্ম জাগরণের কথা অতীন এলার নিকট কতবার কত ভাবেই না বলিয়াছে।

"তোমার গলার সুরটি শুনেই আমার সর্ব্বশরীর চমকে উঠল, সেই সুর আমার মনের মধ্যে এসে লাগল হঠাৎ আলোর ছটার মতো; যেন আকাশ থেকে কোন এক অপরূপ পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার চিরদিন-টাকে।"

এই সৌন্দর্য-লোক সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মন আপনিই দ্বিধা হইয়া একটিকে আর একটির সহায়তায় সম্ভোগ করে। একটি মন প্রজাপতি, আর একটি মন সৌন্দর্য-কুসুম। সেই সৌন্দর্য-কুসুমের মধুপানে মানস-প্রজাপতি বিভোর। কোন্ কল্পলতায় কোন শূন্য ডালে সে ফুল ফোটে, তাহা কেইবা জানে। এলাকে ঘিরিয়া মনে মনে অতীন কত না সৌন্দর্য-লোক সৃষ্টি করিয়াছে।

"যে সব দিন চরমে না পৌঁছাইতেই ফুরিয়ে যায়, তারা ছায়ামূর্ত্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কল্প-লোকের দিগন্তে। তোমার সঙ্গে আমার মিলন সেই মরীচিক বাসরঘরে।"

এলার সৌন্দর্য্য বেষ্টন করিয়া অতীত আপনার ভাব-রসে সৌন্দর্যের কত আলপনা না আঁকিয়াছে। সে বিস্ময় সে মুগ্ধতার কী অন্ত আছে। অতীন এলাকে বলিয়াছে, "তোমার এই ছিপছিপে দেহখানিকে কথা দিয়ে দিয়েই মনে মনে সাজিয়েছি, তুমি আমার সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা, তুমি আমার সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা। আমার চারিদিকে আছে অদৃশ্য আবরণ, বাণীর আবরণ, সাহিত্যের অমরাবতী থেকে নেমে এসে ভিড় ঠেকিয়ে রাখে তারা। আমি চির স্বতন্ত্র।"

পুরুষের চিত্ত-লোক ভরিয়া এই যে সৌন্দর্য-ধ্যান, তাহা একটি বিশিষ্ট সাধনা। এই সাধনায় পুরুষের পৌরুষ বিনষ্ট হয় না। ইহা তাই স্খলিত পৌরুষের চিত্ত-বিকার নয়। যে মোহে, যে সৌন্দর্য-ধ্যানে স্বয়ং বিধাতা এই অনন্ত কোটি রূপ-লোক নিত্যকাল ধরিয়া সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন, ইহা পুরুষের সেই এক মোহ, সেই এক সৌন্দর্য-ধ্যান। সৌন্দর্যের এই অধ্যাত্ম-সাধনার দিকটির কথা ঔপন্যাসিক অতীনের মুখ দিয়া বলিয়াছেন।

"যথার্থ পুরুষ যারা, তারা যথার্থ মেয়ের জোরেই চরিতার্থ হবে—বিধাতার নিজের হাতে এই হুকুমনামা আছে আমাদের রক্তে। যে সেই বিধিলিপিকে ব্যর্থ করে, সে পুরুষ নামের যোগ্য নয়।"

"ভোলাবার শক্তি তোমার অমোঘ, নইলে ভুলেছি বলে লজ্জা করতুম। আমি হাজারবার করে মানব যে, তুমি আমাকে ভোলাতে পার, যদি না ভুলতুম, সন্দেহ করতুম আমার পৌরুষকে।"

"তুমি কী করে জানবে? তোমাদের শক্তি তোমাদের নিজের নয়, ও মহামায়ার। কী আশ্চর্য্য সুর তোমার কণ্ঠে, আমার মনের অসীম আকাশে ধ্বনির নীহারিকা সৃষ্টি করে। আর তোমার এই হাতখানি, ওই আঙুলগুলি, সত্য মিথ্যে সব কিছুর, পরে পরশমণি ছুইয়ে দিতে পারে।"

অতীনের মধ্যে যথার্থ পৌরুষ ছিল বলিয়া, অতীনের অন্তরে এলাকে বেষ্টন করিয়া অমন অপরূপ সৌন্দর্য-লোক রচিত হইয়াছে, আবার তাহার এই সৌন্দর্য-লোক অধ্যাত্ম বোধাশ্রয়ী প্রকৃত সৌন্দর্য-লোক বলিয়া অতীন এলাকে পরিহার করিবার চেষ্টা করে নাই, সে চেষ্টা তাহার পক্ষে আত্মঘাতী।

আত্মার এই পিপাসার জন্য অতীন এমন একটি পথ আশ্রয় করিয়াছে, যাহা তাহার পক্ষে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তাহার জাগ্রত চৈতন্যই দ্বি-ধারায় তাহাকে দুই বিপরীত দিকে প্রবল আকর্ষণ করিয়াছে। একটি অমৃতের দিক আর একটি মৃত্যুর। বিয়াত্রিচের মত তাহার সৌন্দর্য-লক্ষ্মী তাহাকে ক্রমাগত ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর লোকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় নাই, তাহাকে ক্রমাগত নিম্ন হইতে নিম্নতর লোকে আকর্ষণ করিয়া

লইয়া গিয়াছে। ঊর্ধ্বে বন্ধনের পর বন্ধন মোচন করিয়া মহামুক্তি দান করে নাই, নিম্নে বন্ধনের পর বন্ধন সৃষ্টি করিয়া চিরান্ধকারলোকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে।

এলাকে কতবার ধরিয়া অতীন স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইতে চাহিয়াছে, সে তাহাকে কেবল ভালবাসিয়া, কেবল তাহারই সঙ্গলাভের জন্য, এই সন্ত্রাসবাদী দলে যোগদান করিয়াছে। সে কবি, সে স্রষ্টা, সে সৌন্দর্য-সাধক। এলাকে পরিপূর্ণ করিয়া জীবনে লাভ করিতে পারিলে তাহার সৃষ্টি-প্রেরণা অফুরান হইয়া উঠিবে। একমাত্র এলা পারে তাহাকে তাহার ধর্মাচরণে সহায়তা করিতে। এলা যদি তাহার প্রেমকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার না করে, যদি পূর্ণ মিলনে তাহাদের প্রেম সর্ব সার্থকতা লাভ করিতে না পায়, তবে তাহাকে এই দলের মধ্যে থাকিয়াই তাহার স্বভাবকে তিলে তিলে হত্যা করিতে হইবে।

অতীনের এই আহ্বান যে কত গভীর, কত সত্য, কত ব্যাকুল, তাহা এলা বুঝিতে পারে নাই। এলা নানা সাংসারিক জীবন দেখিয়া বুঝিয়াছে, বিবাহ প্রকৃত মনুষ্যত্ব-বিকাশে অন্তরায়, বন্ধন ও ভারস্বরূপ। ব্রত ও সংকল্পের কথা তুলিয়া এই জাতীয় যুক্তির জাল বিস্তার করিয়া এলা অতীনের প্রেমকে বারবার প্রতিহত করিয়াছে। এলার পক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শন করা স্বাভাবিক, কারণ এলা আশৈশব এই বিড়ম্বনাই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাহার মা, তাহার বাবার মহত্ত্ব কোন কালেই উপলব্ধি করিতে পারে নাই, কেবল তাহাই নয়, তাহার ক্ষুদ্রতা তাহার বাবাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়াছে। তাহার মায়ের আচরণ হইতে তাহার মনের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইয়া যায় যে. আত্মসম্মানকে পঙ্গু করিয়া মেয়েদের বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। তাই বিবাহের প্রতি বিরূপতা তাহার সংস্কারগত। তাহার পর বড় হইয়া বাঙ্গালী-সমাজে ইহার কত না পরিচয় সে লাভ করিয়াছে। বিবাহে ব্যক্তিগত অনিচ্ছা, সংস্কারগত বিরূপতার সহিত মিশিয়াছে তাহার দেশহিতৈষণা ব্রত এবং ইন্দ্রনাথের নিকট প্রতিশ্রুতি।

অতীতের বিবাহ প্রস্তাবে এলা বলিয়াছে, "মেয়েদের সম্বল জীবনের যত সব খুটিনাটি, সেই বোঝা দিয়ে তোমাদের মতো পুরুষের জীবনকেও চাপা দিতে ভয় পায় না, এমন মেয়ে হয়তো আছে; তারা ট্রাজেডি ঘটিয়েছে কত, আমি জানি। চোখের সামনে দেখছি লতার জাল বনস্পতিকে বাড়তে দিলে না।"

উত্তরে অতীন বলিয়াছে নারীর মাধুর্যলোক অন্তরের সামগ্রী। পুরুষের চেতনা যতদূর প্রসারিত হোক না কেন, তাহা এই মাধুর্যলোকের সীমা উত্তীর্ণ হইতে পারে না। যথার্থ পুরুষ নারীকে আশ্রয় করিয়া সম্পূর্ণতা

লাভ করে ; যে ইহাকে অস্বীকার করে, সে পুরুষনামের অযোগ্য। এলা তখন তাহার সংকল্পের কথা বলিয়াছে। সে দেশের নিকট বাগদত্তা, তাহার পক্ষে তাই বিবাহ অসম্ভব। অতীন বুঝাইতে চাহিয়াছে, তাহার এই সংকল্প নারীধর্ম আশ্রয় করে নাই বলিয়াই তাহা মিথ্যা. মিথ্যা সংকল্প-ভঙ্গে অপরাধ নাই।

বস্তুতঃ তখনও পর্যন্ত এলা অতীনকে সত্য করিয়া ভালবাসিতে পারে নাই। আমি সেই সত্য প্রেমের কথা বুঝাইতে চাহিয়াছি, যে প্রেমে এই জাতীয় সহস্র সংকল্পের প্রতিবন্ধকতা. নানা মিথ্যা সংস্কার বুদ্বুদের মত শূন্যে মিলাইয়া যায়। বস্তুতঃ এলার জীবনে. এই পরিণাম আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সকল মিথ্যাবোধমুক্ত প্রেয়সী নারী সে, প্রেমাস্পদের জন্য সর্বস্ব. এমন কি প্রাণ পর্যন্ত. ত্যাগ করিবার জন্য উৎসুক।

ইন্দ্রনাথ একদিন এলাকে বলিয়াছিল. "ভালোবাসার গুরুভারে তোমার ব্রত ডোবাতে পারে তুমি তেমন মেয়ে নও।" ইন্দ্রনাথ নর-নারীর প্রেমের এই ধর্ম বুঝিত না। এই এলাই একদিন সকল সংকল্প ভাসাইয়া দিয়া স্বয়ম্বরা হইয়া গান্ধর্বমতে বিবাহ করিতে অতীনকে অনুরোধ করিয়াছে, অতীনের সহিত দেখা করিতে সে দলের নির্দেশও মানে নাই। ইহার জন্য দল যে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না, চূড়ান্ত শাস্তি পর্যন্ত দিতে পারে, সে-সম্পর্কে সচেতন হইয়াই এলা সমস্ত কিছু ভাসাইয়া দিয়া অতীনের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।

অতীনের মহাপ্রাণের মহাব্রত সম্পর্কে যখন এলা সচেতন হইয়াছে, যখন সে অতীনের সর্বনাশের গভীরতা পরিমাপ করিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছে, যখন আপনার হৃদয়কে অনাবৃতভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তখন ফিরিবার সমস্ত পথ বন্ধ, ঘটনাস্রোতে অতীন তখন অন্য এক দূরে ভাসিয়া গিয়াছে, মাঝখানে মৃত্যুর স্রোত উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে।

অতীন সম্পর্কে ইন্দ্রনাথ এলার নিকট মন্তব্য করিয়াছিল, "ও বাঁধা পড়েছে নিজেরই সংকল্পের বন্ধনে। ওর মন থেকে দ্বিধা কোনো কালেই মিটবে না, রুচিতে ঘা লাগবে প্রতি মুহূর্তে, তবু ওর আত্মসম্মান ওকে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত।"

অতীন সন্ত্রাশবাদী দলে যোগদান করে শুধু এলার জন্য। ওই দলে আসিয়া সে তাই ফিরিয়া ফিরিয়া এলার প্রেম যাঞা করিয়াছে। আর তাহারই সৌন্দর্য-ধ্যানে ডুবিয়া দলের নির্দেশে এমন অনেক কাজ করিয়াছে, যাহা সাধারণ মনুষ্য-ধর্ম বিবর্জিত। ধর্মভ্রষ্টতা সম্পর্কে যখন অতীন সচেতন হইয়াছে, তখন উদ্ধারলাভের কোন উপায়ই নাই। আর এই পরিবেশে পৌঁছাইয়াই সে

এলার অকুণ্ঠিত প্রেম লাভ করিয়াছে। তাই এলার অমন প্রেম, তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা সম্পর্কেও সে স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। ওই পথের অন্যায় ও অধর্মাচরণ সম্পর্কে সে যদি ইতিপূর্বে সচেতন হইতে পারিত, যদি এলাও ইতিপূর্বে তাহার চিরন্তন নারী স্বভাবকে আবিষ্কার করিতে পারিত, তবে অতীন যে এই পথ পরিহার করিয়া যাইত, তাহাতে সংশয় নাই।

এলার ব্যাকুল প্রেম-নিবেদনের উত্তরে অতীন বলিয়াছে, "স্বভাবকেই হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ। কোন অহিতকেই সমূলে মারতে পারিনি, সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে। সেই পাপে আজ তোমাকে হাতে পেলেও তোমার সঙ্গে মিলতে পারব না।"

অতীন আজ জীবনে এমন একটি পরিণাম লাভ করিয়াছে, যেখানে এলার প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে। যে ধর্মাচরণের জন্য সে এলাকে লাভ করিতে চাহিয়াছিল, সেই ধর্ম হইতে সে চিরকালের জন্য স্খলিত হইয়া গিয়াছে।

স্খলিত জীবনের সর্বশেষ পরিণাম লাভ করিয়াও অতীন এজগতের কাহারও উপর কোন ক্ষোভ রাখিয়া গেল না। এলাকে সে ক্ষমা করিয়াছে, আর তাহার জীবনে বিধাতার অভিপ্রায় পূর্ণ হইতে পারিল না বলিয়া ঈশ্বরের অসীম ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। সর্বনাশের শেষ সীমায় পৌঁছাইয়াও, অতীন কিন্তু তাহার সামগ্রিক তত্ত্ব-দৃষ্টি হারায় নাই।

এই বিশ্বে বিধাতার অভিপ্রায় নানা ভাঙা-গড়া, মন্দ-ভালোর ভিতর দিয়া ধীরে চরিতার্থ হইয়া উঠিতেছে, একটির পর একটি যবনিকা সরাইয়া দিয়া ধীর সম্পূর্ণতা লাভ করিতেছে। এই বিশ্বে বিধাতার যে কর্মভার লইয়া সে আসিয়াছিল, তাহা সে সম্পন্ন করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু ইহাতে বিধাতার সে ধর্ম অসম্পূর্ণ হইয়া থাকিবে না, আর কোন মানব-হৃদয় আশ্রয় করিয়া তাহা চরিতার্থ হইবে। জীবনের এই রীতি। এই তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া অতীন সান্ত্বনা লাভ করিতে চাহিয়াছে।

মহাপ্রাণ বা মহামৃত্যুর সীমাশূন্য নিথর সমুদ্রের বুকে জীবনের এক একটি কুসুম ফুটিয়া উঠিয়া আবার ঝরিয়া যাইতেছে। বিশ্ব-নাট্যমঞ্চে এই মানব-পুতুল আপন আপন অংশ অভিনয় করিয়া মৃত্যু-যবনিকার অন্তরালে চলিয়া যাইতেছে। কোন্ মহানাটক যে অভিনীত হইয়া চলিয়াছে, তাহা শুধু সেই মহানাট্যকারই জানেন। এই লীলার দিক হইতে জীবনকে দেখিয়া অতীন তাহার ব্যর্থ জীবনে সান্ত্বনা খুঁজিয়াছে।

এই লীলার দিক হইতে যে আপনার সকল কর্ম এমনকি পাপ কর্মকেও সাক্ষাৎ করা সম্ভব, অতীন আপনার জীবন দিয়া তাহা সপ্রমান করিয়াছে।

অতীন এলাকে বলিয়াছে,

"যা অত্যন্ত করে চেয়েছি, তার গায়ে মোটা অঙ্কের দাম লেখাছিল বর্তমানের ফাঁকির কলমে, যা অত্যন্ত করে হারিয়েছি, তার গায়ে দুর্দ্দিনের কালি লেবেল মেরে লিখেছে অপরিসীম দুঃখ। মিথ্যে কথা। জীবনটা জালিয়াৎ, সে অনন্ত কালের হস্তাক্ষর জাল করে চালাতে চায়। মৃত্যু এসে হাসে, বঞ্চনার দলিলটা লোপ করে দেয়। সে হাসি নিষ্ঠুর হাসি নয়, বিদ্রূপের হাসি নয়, শিবের হাসির মতো সে শান্ত সুন্দর হাসি মোহ রাত্রির অবসানে। * * *মৃত্যু সবচেয়ে নিশ্চিত জীবনের সব গতি স্রোতের চরম সমুদ্র, সব সত্য-মিথ্যা ভালো-মন্দের নিঃশেষ সমন্বয় তার মধ্যে। * * * পিছনে মরনের কালো পর্দ্দাখানা নিশ্চল টানা রয়েছে অসীমে, তারই উপর জীবনের কৌতুক নাট্য নেচে চলছে অন্তিম অঙ্কের দিকে।"

জীবনের ব্যর্থতা যেমনই হোক, শোক যত একান্ত, যত কালো হোক, অনন্ত কালের পটে একদিন কোথাও তাহার চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। অতীনের ব্যর্থ জীবনের কয়েকটি অধ্যায় একদিন মৃত্যু-কীট দষ্ট হইয়া ধূলি হইয়া ঝরিয়া যাইবে। অন্তহীন এই জীবনের প্রসার, সেই পথ চলার মাঝখানে এই ব্যথা গীতি একদিন উতলা বাতাসের মর্মর ধ্বনির সহিত মিশিয়া হারাইয়া যাইবে।

জন্ম হইতে মৃত্যুর ভিতর দিয়া কত লোক লোকান্তর পার হইয়া মানবাত্মা চির অভিসার করিয়া চলিয়াছে। সেই অন্তহীন পথ চলায় কোন একটি জীবন যদি ব্যর্থ হইয়া যায়, তবে অনন্ত জীবন ব্যর্থ হইয়া যায় না। মৃত্যু বর্তমান জীবনের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য সব ভুলাইয়া দিয়া সেই অনন্ত জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই অনন্ত জীবনের তত্ত্বে অতীন আপনার ব্যর্থ জীবনের শোক প্রশমিত করিতে চাহিয়াছে।

অতীন ও এলার প্রেম-পর্যায়ের যে পরিচয় উপন্যাসের মধ্যে লাভ করিতে পারা যায়, তাহার একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষনীয়।

অন্তরে যে প্রেম অঙ্কুরিত হইয়া ধীর বিকাশ লাভ করিয়া সমস্ত জীবনকে অপূর্ব সুষমাময় করিয়া তোলে, প্রেমের সেই ধীর প্রশান্ত পরিণাম তাহাদের জীবনে লক্ষিত হয় না। প্রথম দিনের সেই অনুরাগ সঞ্চার, সৌন্দর্য-বোধের সেই প্রথম বিকাশের দিন হইতে তাহারা অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছে। উভয়ে উভয়ের প্রেম সম্পর্কে যখন সচেতন হইয়াছে, তখন সেই সৌন্দর্য ও স্বপ্ন-লোকটিকে ফিরিয়া লাভ করিবার কোন উপায় নাই। তাহারা বেদনা সমুদ্রের দুই তীরে দাঁড়াইয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে চাহিয়াছে, কিন্তু মিলিত হইতে পারে নাই। অতীন ও এলা তাই সেই অতীত সৌন্দর্য-স্বপ্নকে, প্রেমের আশ্চর্য প্রথম অনুভূতির দিনটিকে বারবার স্মরণ করিয়াছে, অন্তরে সেই সৌন্দর্য-ধ্যান করিয়া তাহারা জীবনের সকল সীমা পার হইয়া গিয়াছে,

সেখানে কত ষড়যন্ত্র, কত ছলনা, কত প্রতারণা, কত মিথ্যা ও গোপন প্রয়াস, কত হীনতা ও দীনতা, মনুষ্যত্বের কত-না লাঞ্ছনা। ঊর্ধ্বে সেই সৌন্দর্য-প্রতিমার দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া অতীন পাপ-পঙ্কে ধীরে ধীরে ডুবিয়া গিয়াছে। এই প্রেমে তাই সৃষ্টি নাই, এ প্রেমে সকল অধ্যাত্ম পরিণাম শূন্য। তাহার প্রেম-প্রতিমা বেষ্টন করিয়া শুধু অথৈ অশ্রু সমুদ্রের উদ্বেলতা।

মৃত্যুতে যে প্রেম হারাইয়া যায়, সে প্রেমের শোক মানুষকে বাঁধে না, অন্তরে সেই প্রেমই নূতন রূপ লইয়া ফিরিয়া আসে, স্বপ্নে কত রূপেই না আসঙ্গ দান করে। সে প্রেমে প্রত্যাশা থাকে। অতীনের শোকে এই প্রত্যাশা নাই, সৃষ্টি নাই, মুক্তি নাই। যে অন্তরে প্রেম লক্ষ্মী তাঁহার স্বর্ণপদ্মের আসনখানি পাতেন, অতীনের সেই অন্তরের শুচিতা নষ্ট হইয়াছে, তাহা স্বেচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত,—যাহাই হোক না কেন। অতীন অনন্ত জীবনের কথা যেমন করিয়া বলুক না কেন, প্রেমের এই স্বাভাবিক প্রত্যাশার কথা একটি বারের জন্যও বলিতে পারে নাই। এলা এই প্রত্যাশার কথা বলিয়াছে, "অন্তু, নিশ্চয় জেনো তুমি চলে গেলে এক মুহূর্ত আমি বাঁচব না। তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার, এ কথায় আজ যদি বা সন্দেহ কর, একান্ত মনে আশা করি, মৃত্যুর পরে সে সন্দেহ সম্পূর্ণ ঘোচাবার একটা কোন রাস্তা কোথাও আছে।" অতীনের জীবনে স্বাভাবিক এই প্রত্যাশার মূল পর্যন্ত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাই তাহার শোকে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে, সকল আলোক মুহূর্তে নিভিয়া যায়। এ শোক মানবাত্মাকে কেবল পীড়িত করে।

নিয়তি নিপীড়নে মানবাত্মার যে শাশ্বত রূপ উদ্ঘাটিত হইয়া যায়, তাহা সাক্ষাৎ করাই সাহিত্য-পাঠের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ। যুগের পর যুগ অতিক্রান্ত হইয়া যায়, মানবজীবনে সমস্যার নিত্য নূতন উদ্ভব ঘটে। জীবনের এই সমস্ত চলমান, অপসৃয়মান বৈচিত্র্যের মাঝখানে, তাহাদের অতীতে মানবাত্মার চিরন্তন ধ্রুব প্রকাশটিকে প্রত্যক্ষ করাই কবি-ধর্ম; একই জীবন সুধা রস ভিন্ন যুগ ও ভিন্ন ঘটনার পাত্র ভরিয়া পান করা। পাত্র-ভেদে ওই আস্বাদটাও যেন বিশিষ্ট হইয়া ওঠে। সাধারণ সাহিত্য কর্মে কেবল যুগের পরিচয়টাই থাকে, কোথাও হয়ত কিছু ভাব ও ভাবনা, কিন্তু চিরন্তন মানব-সত্যের কোন অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার থাকে না।

মরণ দোলায় দোল খাইয়া সমস্ত জাত তখন নিশীথরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া উৎকণ্ঠায় প্রহর গননা করিয়া চলিয়াছে। যাহা চিরাচরিত, তাহা অভাবিত হইয়া পড়িয়াছে। সে কালে প্রেমের এমন চকিত আভাসই লাভ করা সম্ভব। লজ্জা সংকোচের অবসর নাই, প্রণয়ের বিচিত্র বঙ্কিম গতি, তাহার বিচিত্র ছলা-কলা, মান-অভিমান, প্রসাধন সব ভাসিয়া গিয়াছে। দুটি

আত্মা সম্পূর্ণ নগ্ন হইয়া পরস্পরকে নিবিড় বাহুবন্ধনে বাঁধিতে চাহিয়াছে। সৌন্দর্য-সম্ভোগের সে অবসর কোথায়? তাই, অমন করিয়া তাহারা উভয়ে উভয়কে আকাঙক্ষা করিয়াছে, নিবেদন করিয়াছে। সে প্রেম সার্থকতালাভের জন্য সহজতম, নিকটতম, শুভ্রতম একটি পথ অবলম্বন করিয়াছে। ইন্দ্রনাথের ভাষায় ইহা প্রেমের সেই 'রুদ্ররূপ' বজ্রের মত, শানিত অসিফলকের মত উজ্জ্বল. সংক্ষিপ্ত, সকল বাহুল্যবর্জিত, অতি ভয়ংকর দীপ্তি বিজড়িত। হৃদয়ের মাঝখানে এই শানিত তরবারি বহন করিতে পারে একমাত্র এলা আর অতীনের মত নারী ও পুরুষ।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে অসম্মাননার নানা রূপ আছে। সুবৃহৎ জাতীয় পরাধীনতা হইতে ব্যষ্টির পরাধীনতা পর্যন্ত ইহার নানা ক্রম। এই সকল অসম্মানের মূলে একটি অজ্ঞানতা হয়ত আছে, এবং সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারের সহায়তায় তাহা হয়ত প্রতিপন্নও করিতে পারা যায়, কিন্তু মানবিক বোধ এক একটি অবস্থায় ইহাতে কিছুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে না।

নিদারুণ বঞ্চনা ও অবমাননার ক্ষেত্রেও 'স্টোইক'রা এবং খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের নিকট অজ্ঞানতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কথা, প্রেম ও প্রীতির কথা বলেন। কিন্তু যে পরিণাম লাভ করিলে, এই তত্ত্ব-দৃষ্টি লাভ সম্ভব, তাহা কয়জনের জীবনে সত্য। কেবল তাহাই নয়, এই তত্ত্ব-দৃষ্টির মূলে জীবনের সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি আছে।

মানুষের জীবনে এমন অবস্থা আসে, যখন প্রতিশোধ গ্রহণ ছাড়া মানসিক সুস্থতালাভ অসম্ভব। ব্যর্থতায় মানুষ উন্মাদ হইয়া যায় কিংবা ভাব-জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া যায়। প্রাণ-শক্তি দ্রুত নিঃশেষিত হইয়া, তাহাকে অতি নিকৃষ্ট অবস্থা দান করে। সমষ্টি জীবনেও একথা সত্য।

জাগ্রত চেতনা ও সমৃদ্ধ মন অথচ জাতীয় পরাধীনতার জন্য দুঃসহ গ্লানি-বোধ পরাধীন ভারতবর্ষের মহান ও প্রতিভাবান ব্যক্তিমাত্রেই বোধ করিয়াছেন। তাহার কত প্রকাশরূপ না প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। সেই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একটি না একটি উপায়ে তাঁহাদের এই গ্লানি জয় করিয়া উঠিতে হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে তাহার বিস্তারিত পরিচয় দান নিষ্প্রয়োজন।

এই গ্লানিবোধ রবীন্দ্রনাথের অন্তরেও ছিল। এই গ্লানিবোধ তাঁহাকেও নানারূপে জয় করিয়া উঠিতে হইয়াছে। এই গ্লানি জয় করিয়া উঠিতে ইন্দ্রনাথ একভাবে চেষ্টা করিয়াছে। এই উভয়জাতীয় চেষ্টার রূপ রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। যে তত্ত্ব-দৃষ্টির সহায়তায় অতীন তাহার ব্যর্থ জীবনের কান্নাকে জয় করিয়া উঠিতে চাহিয়াছে—আমি এক্ষেত্রে কেবল সেই তত্ত্ব-দৃষ্টির কথাই বিশেষ করিয়াই উল্লেখ করিতে চাহিয়াছি।

ইহার একটি ধারা তাঁহার স্রষ্টা জীবনের প্রায় আদি হইতে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়।

এই তত্ত্ব-দৃষ্টির পরিচয় কেবল উপন্যাসেই নয়, তাঁহার কাব্যে, নাটকে, ছোটগল্পে সর্বত্র লাভ করিতে পারা যায়।

সে দৃষ্টি কি না, ব্যক্তি জীবনে ব্যথা-বেদনা, আঘাত-বঞ্চনা যত বড়ই হোক, তাহা সহনীয় হইয়া ওঠে, যদি ইহা বোধ করিতে পারা যায় যে অন্তহীন গ্রহ নক্ষত্রের অচিন্তনীয় বেগে কক্ষাবর্তনের মাঝখানে এক কনাতম দেশ-কালের মধ্যে এই পৃথিবীর প্রকাশ। তাহাতে একটি মানুষের ব্যথা বেদনা কত তুচ্ছ। মনুষ্য জীবন ও জগৎ কি অচিন্তনীয় বিরাট, তাহাতে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ যেন বুদ্বুদের বক্ষে বিচিত্র রঙের প্রকাশ।

মনস্বী বার্ট্রান্ড রাসেলের একটি উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণে পড়িতেছে। তিনি এই জাতীয় দার্শনিক বোধের সামর্থ ও অসামর্থ উভয় দিক উল্লেখ করিয়া একস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন।

"There are even times when it is comforting to reflect that human life with all that it contains of evil and suffering is an infinitesimal part of the life of the universe. Such reflections may not suffice to constitute a religion, but in a painful work they are a help towards sanity and an antidote to the paralysis of after despair."

এই জাতীয় চেষ্টা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর একটি যে চেষ্টা ছিল, তাহার প্রকাশ ঘটিয়াছে ইন্দ্রনাথের মধ্যে। এই জাতীয় একটি চেষ্টার ধারাও তাঁহার রচনায় পূর্বাপর লক্ষ্য করিতে পারা যায়। ইন্দ্রনাথের ওই যে উক্তি 'সব মানুষের সামনেই ধর্মক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ আছে; সেখানে মৃত্যো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং।'—তাহাকেই সত্য করিয়া তুলিয়াছেন আপনার জীবনে। জাতির আত্মাকে রক্ষা করিতে জাতিকে সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিতে তাঁহার ত্রুটি ও যত্নের অন্ত ছিল না। ইন্দ্রনাথের যে উক্তি, 'দেশকে মা মা—ইত্যাদি' ইহা তাঁহারও দেশ প্রেমের মূল মন্ত্র। জাতির মনের সর্ববিধ বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে এই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিতে তাঁহার বহুমুখী নিরলস চেষ্টার উল্লেখও বাহুল্য।

পরিশেষে উপন্যাস হইতে কয়েটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"মানুষকে আত্মশক্তির বৈচিত্র্যবান জীব মনে করলেই সত্য মনে করা হয়।"

"সব মানুষের সামনেই ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মযুদ্ধ আছে, যেখানে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ংজিত।"

"পেট্রিয়টিজ্‌মের চেয়ে যা বড়ো, তাকে যাঁরা সর্ব্বোচ্চে না মানে, তাদের পেট্রিয়টিজ্‌ম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়া নৌকা।"

"দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ঙ্কর মিথ্যে কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশনালিষ্ট আজকাল পাশব গর্জ্জনে ঘোষণা করতে বসেছে।"

"স্বভাবকেই হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ।"

গ্রন্থপঞ্জী